মাসুদ রানা

কালপুরুষ

১ম খন্ড

কাজী আনোয়ার হোসেন

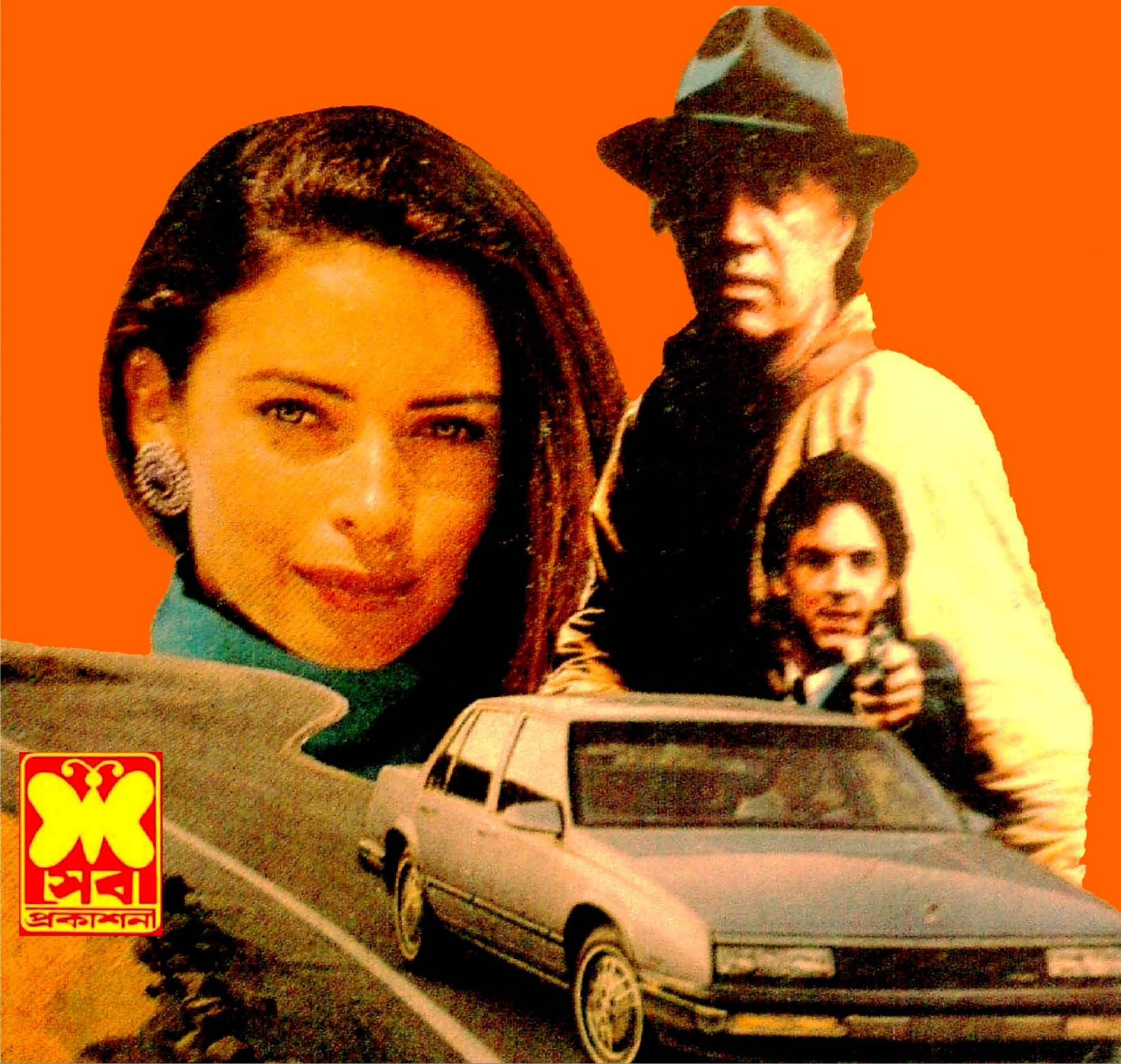

মাসুদ রানা

কালপুরুষ

প্রথম খণ্ড

কাজী আনোয়ার হোসেন

হঠাৎ করে আগুন লাগল রানা এজেন্সির নিউ ইয়র্ক অফিসে।
লাগল মানে, লাগানো হলো।
কে করল কাজটা? আর্থার স্যাণ্ডলার? কেন?
আসলে কি ছিল চুরি যাওয়া দলিলে?
অগ্নিকাণ্ডের খবর পেয়ে পিছন দিক দিয়ে ফ্ল্যাট ত্যাগ করল মাসুদ রানা, একই সময়ে ফ্ল্যাটের সামনে খুন হয়ে গেল আরেক যুবক। আকারে-গঠনে অবিকল মাসুদ রানার মত সে।

ভুল করেছে হত্যাকারী? নিজেকে লেসলি ম্যাকঅ্যাডাম বলে দাবি করছে মেয়েটি, অথচ, আসল লেসলির কবর দেখে এসেছে রানা আর্ল'স কোর্টের এক কবরস্থানে। তাহলে?

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

সেবা প্রকাশনী, ২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
শো-রুম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
শো-রুম: ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

Help Us To Keep Banglapdf.net Alive!

Edited By - Sewam Sam

Please Give Us Some Credit When You Share Our Books!

Don't Remove This Page!

Edited BY
Sewam.Sam

Front & Back Cover
Salmir Saadat

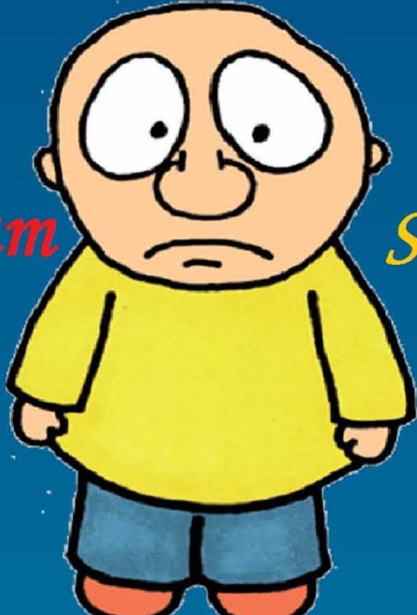

Edited BY
Sewam.Sam

Scanned By
Shuva 969

Visit Us at Banglapdf.net

If You Don't Give Us Any Credits, Soon There ll Nothing Left To Be Shared!

কাল পুরুষ-১

প্রথম প্রকাশ: ১৯৯৬

এক

'দারুণ কোন আরসনিস্টের কাজ এটা,' মধ্যমা দিয়ে নাকের পাশ চুলকাতে চুলকাতে বলল চিন্তিত করিগান, নিউ ইয়র্ক সিটি ফায়ার ডিপার্টমেন্টের এক তরুণ লেফটেন্যান্ট। 'এমনভাবে ঘটানো হয়েছে অগ্নিকাণ্ড, বোঝা খুব মুশকিল যে কারও কারসাজি আছে এর পিছনে। আপনাদের নাইটগার্ড যদি সময় থাকতে আমাদের টেলিফোন না করত, এতক্ষণে হয়তো পুরো বিল্ডিঙে ছড়িয়ে পড়ত আগুন। এবং সে-ক্ষেত্রে আগুন লাগানোর ব্যাপারে যে ওস্তাদীর আশ্রয় নেয়া হয়েছে, তা ধরার কোন পথ থাকত না।'

মুখ তুলে কোণের দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়ানো দামী কাঠের আধপোড়া ফাইলিং কেবিনেটটা ইঙ্গিত করল করিগান। 'অল্পের জন্যে বেঁচে গেছে ওটা।'

দুই কোমরে হাত রেখে নিজের অফিস রুমে দাঁড়িয়ে আছে কাঁচা ঘুম থেকে উঠে আসা মাসুদ রানা। হতভম্ব। এবং চিন্তিত বিহ্বল দৃষ্টিতে এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে। এইমাত্র পৌঁছেছে ও 'রানা এজেন্সি'র অফিস বিল্ডিঙে আগুন লাগার খবর পেয়ে। বিশেষ কাজে এক সপ্তাহ আগে নিউ ইয়র্ক এসেছে রানা। কয়েক ঘণ্টা আগেও এই রুমে বসে কাজ করেছে অনেক রাত পর্যন্ত, তারপর ফিরে গেছে নিজের ঈস্ট সেভেন্টি থার্ড স্ট্রীটের অ্যাপার্টমেন্ট হাউসে। আর তারপর···

ঘড়ি দেখল মাসুদ রানা। ভোর চারটে প্রায়। মাত্র পাঁচ ঘণ্টার ব্যবধান। এরই মধ্যে ঘটে গেছে এত কিছু। ওর নিজের অফিসরুমসহ স্থানীয় এজেন্সি প্রধান ও কয়েকজন কী-অপারেটরের অফিসরুমের বারোটা বেজে গেছে। কার্পেট, টেবিল-চেয়ার, ফাইল কেবিনেট, সব জায়গায় জায়গায় পুড়ে বিচ্ছিরি অবস্থা। ঘরের মধ্যে ভেসে বেড়াচ্ছে হালকা ধূসর রঙের পাতলা ধোঁয়ার স্তর। ছাই আর পানির মিলিত গন্ধ রয়েছে ওতে। মিষ্টি মিষ্টি একটা গন্ধ।

'আগুন কি ভাবে ধরানো হয়েছে বলে মনে করেন আপনি?' লেফটেন্যান্টের দিকে তাকাল মাসুদ রানা। 'ধরানো হয়েছে' ব্যাপারটা এখনও মেনে নিতে পারছে না ও। কেন কেউ করবে এ কাজ? কী উদ্দেশ্যে?

কাঁধ ঝাঁকাল লেফটেন্যান্ট। 'ফিউজের সাহায্যে। একজন ভাল আরসনিস্ট এ কাজে অবশ্যই ফিউজের সাহায্য নেবে। এতে সরে পড়ার জন্যে সময় পাওয়া যায় যথেষ্ট।'

'বৈদ্যুতিক ফিউজ?' প্রশ্ন করল নাইটগার্ড জ্যাকবাস। লোকটা দীর্ঘদেহী, মাঝারি মোটা। বয়স ষাটের মত। কিছু বেশিও হতে পারে

'না। টাইমিং ফিউজ। মোমবাতি, তার, ঘড়ি অথবা এমনকি সিগারেটও হতে পারে।' আবার শ্রাগ করল করিগান। 'যা পুড়ে শেষ হতে সময় লাগে, এবং সেই সুযোগে সরে পড়তে পারে আরসনিস্ট। ভাগ্য ভাল যে সময়মত আমরা এসে পড়ায় ঠিক কোত্থেকে আগুনের সূত্রপাত ঘটেছে সেটা চিহ্নিত করা গেছে। আসুন

আমার সঙ্গে। দেখাচ্ছি।'

লোকটাকে অনুসরণ করে পাশের রুমের পরের রুমে এল মাসুদ রানা। এজেন্সি প্রধানসহ আরও কয়েকজন পৌঁছে গেছে এর মধ্যে, তারাও এল। একই রকম মানসিক অবস্থা সবার। হতভম্ব, চিন্তিত সবাই। জ্যাকবাস এল সবার পিছনে। মেঝেতে একটা জায়গা দেখাল করিগান।

'দেখেছেন? ট্র্যাকস। এই ট্র্যাক ধরে এগিয়েছে আগুন!'

ঝুঁকে পড়ে দেখল রানা। এখানে-ওখানে খাবলা খাবলা পোড়া কার্পেটের মাঝখানে ফিতের মত সরু পোড়া দাগ দেখা যাচ্ছে। কার্পেটের পুরো দৈর্ঘ্য পেরিয়ে পাশের ঘরের কার্পেটে গিয়ে ঠেকেছে দাগটা, সেখান থেকে মাসুদ রানার রুমের দিকে গেছে।

'ট্রেইলারটা যা দিয়েই তৈরি হয়ে থাকুক, সম্ভবত কেমিক্যালি ট্রিটেড ছিল,' ব্যাখ্যা করল লেফটেন্যান্ট। 'ফালি করে কাটা কম্বল হতে পারে, কাগজ হতে পারে অথবা প্লাস্টিকও হতে পারে। ফিউজের গোড়ার সঙ্গে সংযুক্ত ছিল জিনিসটা, ওটা পুড়ে নিঃশেষ হয়ে যাওয়ামাত্র স্পার্ক করেছে ট্রেইলার, অত্যন্ত দ্রুতগতিতে ছুটে গেছে আগুন ট্র্যাক ধরে, বিভিন্ন ডিরেকশনে।'

আবার চিন্তায় ডুবে গেল মাসুদ রানা। কে করল কাজটা? কেন করল? একটা অফিসের ফাইলপত্র, টেবিল-চেয়ার, কার্পেট পুড়িয়ে কার কি লাভ? কোন বিশেষ রেকর্ড ধ্বংস করা? কারও ব্যক্তিগত ফাইল, বা এমনি আর কিছু? কিন্তু সে জন্যে পুরো অফিস বিল্ডিং কেন পোড়াতে হবে? অথচ করিগানের বক্তব্যে এবং ট্র্যাক স্বচক্ষে দেখে বুঝতে অসুবিধে হয় না, তাই ঘটাতে চেয়েছিল কেউ। এসব কাজে রানা নিজেও একজন এক্সপার্ট। বলতে গেলে জীবনটাই কেটেছে ওর এইসব ফিউজ-ডিভাইস ইত্যাদি নিয়ে। আর আজ কিনা ও নিজেই···লোকটার প্রশ্ন শুনে সচকিত হলো মাসুদ রানা।

'দামী কিছু ছিল আপনার অফিসে, স্যার? কোন আর্ট, জুয়েলস?'

'না।'

'তাহলে কেন এ কাজ করবে কেউ?' মাথা চুলকাতে লাগল লেফটেন্যান্ট। 'কিসের আশায়?'

জ্যাকবাসের দিকে ফিরল মাসুদ রানা। 'আপনি কোথায় ছিলেন আগুন লাগার সময়? এত তাড়াতাড়ি টের পেলেন কি করে?'

'বাউণ্ডারির ভেতর রাউণ্ডে ছিলাম, স্যার। ধোঁয়ার গন্ধ পেয়ে জানালা দিয়ে তাকিয়ে দেখি অল্প অল্প আগুন। সঙ্গে সঙ্গে ফায়ার ডিপার্টমেন্টে ফোন করি আমি তারপর আপনাকে।'

'খুব দ্রুত কাজ করেছেন আপনি,' প্রশংসার চোখে দীর্ঘদেহী জ্যাকবাসকে দেখল করিগান। 'চমৎকার দায়িত্ব সচেতনতার পরিচয় দিয়েছেন। নইলে বোঝাই যেত না যে ব্যাপারটা ষড়যন্ত্রমূলক।'

মাথা দুলিয়ে সায় দিল মাসুদ রানা। চিন্তিত, অন্যমনস্ক। 'হ্যাঁ, সত্যি।'

ম্যানহাটন। ঈস্ট সেভেন্টি থার্ড স্ট্রীট। ভোর চারটা প্রায়। টিপ টিপ বৃষ্টির মধ্যে

ছাপহীন একটা পুলিস কার ধীরগতিতে এসে থামল দু'শো ছেচল্লিশ নম্বর অ্যাপার্টমেন্ট হাউসের সামনে। ছাদে লাল আলো ফ্ল্যাশ করছে ওটার, তবে সাইরেন বন্ধ। ভেজা সাইডওয়াক ও আশপাশের ভবনগুলোর কাঁচের জানালায় প্রতিফলিত হচ্ছে আলোটা।

অ্যাপার্টমেন্টের প্রবেশ পথের সামনে পুলিসের কম্বল ঢাকা একটা নিথর দেহ পড়ে আছে। ওটার পাশে দাঁড়িয়ে আছে এক ইউনিফর্ম পরা পেট্রলম্যান, এবং এক সাদা পোশাকের ডিটেকটিভ। গাড়ি থেকে নামল দুই হোমিসাইড ডিটেকটিভ, অ্যারাম সাশাদ ও প্যাটি হেরেন। প্রথম দু'জনকে দেখল তারা ধীরপায়ে এসে দাঁড়াল মৃতদেহটার পাশে।

'দেখে মনে হয় বাধা দেয়ার চেষ্টা করেছিল লোকটা,' মৃদু কণ্ঠে সাশাদকে লক্ষ করে বলল ডিটেকটিভ রেনফ্রো।

দার্শনিকের মত মাথা দোলাল সাশাদ। 'কাঠের পুতুল না হলে প্রত্যেকেই তাই করে থাকে অপঘাতের পাখায় ভর দিয়ে মৃত্যু এসে গেছে টের পেলে।' কম্বলের তলা দিয়ে বেরিয়ে ছয় ফুট দূরের পেভমেন্টে পৌঁছা রক্তের ধারা দেখল সে খানিক বৃষ্টিতে ধুয়ে যাচ্ছে রক্ত। গড়িয়ে নেমে যাচ্ছে রাস্তায়।

'মুখটা দেখতে চান?' জিজ্ঞেস করল রেনফ্রো।

'কেন নয়?' বলে হাঁটুতে বাঁ হাতের ভর রেখে ঝুঁকল সাশাদ। কম্বলের কোনা ধরে আস্তে করে টান দিল। পানি পেয়ে ফুলে ভারি হয়ে গেছে জিনিসটা ওপর থেকে দেখে আগেই অনুমান করে নিয়েছে সে, প্রায় ছ'ফুট দীর্ঘ ছিল লোকটা। যুবক। চকের মত সাদা হয়ে আছে মুখমণ্ডল চোখ পুরো মেলে চেয়ে আছে। চাউনিতে তীব্র আতঙ্ক। এসব দেখে অভ্যস্ত অ্যারাম সাশাদ। তবু মুখ গলে বেরিয়ে আসা 'জেসাস!' শব্দটা ঠেকাতে ব্যর্থ হলো শেষ পর্যন্ত

যুবকের ডান দিকের গলার মাঝখানে, চোয়ালের হাড়ের সামান্য নিচে বিরাট একটা গর্ত সম্ভবত কসাইয়ের ছুরির কীর্তি। ওখানকার অনেকটা জায়গা একেবারে নেই হয়ে গেছে যুবকের। তার কোট, শার্টের এখানে-ওখানে লেগে আছে ছোপ-ছোপ রক্ত। আরেকবার, অজান্তেই সাশাদের গলা দিয়ে ঠেলে উঠল 'জেসাস!' কম্বল ছেড়ে সোজা হলো সে।

'পরিচয় পাওয়া যায়নি মৃতের,' বলল রেনফ্রো 'শুধু কিছু খুচরো পয়সা, একটা আংটি আর চাবির রিং পাওয়া গেছে।'

'ওয়ালেট?' জানতে চাইল প্যাটি হেরেন।

'পাইনি।'

ব্লকের শেষ মাথার দিকে ঘুরে তাকাল সবাই। বাঁক ঘুরে একটা অ্যাম্বুলেন্স আসছে এদিকে তার হেডলাইটের জোরাল আলো এসে পড়েছে ওদের ওপর মাথায় ঘূর্ণায়মান ওটার লাল টপ লাইট ফ্ল্যাশ করছে নিঃশব্দে। নগরবাসীর শেষ রাতের ঘুমে বিঘ্ন ঘটাতে চায় না সাইরেন বাজিয়ে।

'হত্যাকাণ্ডের একজন প্রত্যক্ষদর্শী পাওয়া গেছে।'

তেতো খাওয়া চেহারা করে রেনফ্রোর দিকে ফিরল অ্যারাম সাশাদ। 'যন্ত্রণা!' ওদের গজ দশেক তফাতে থেমে দাঁড়িয়েছে ততক্ষণে অ্যাম্বুলেন্সটা। হাত

তুলে ওদের ঠিক সোজা, রাস্তার ওপারে সাইডওয়াকে অপেক্ষমাণ এক ছোটখাট মহিলাকে দেখাল রেনল্ডো। 'পুরো ঘটনা চাক্ষুষ করেছে মহিলা।'

'হেল!' বলে ঘুরে দাঁড়াল সাশাদ, ওপার যাবে। মনে মনে বিরক্ত। ভেবেছিল 'ন্যাচারাল কজ' বলে হত্যাকাণ্ডের তদন্ত চালাবার ঝুট ঝামেলা থেকে বাঁচার চেষ্টা করবে। কিন্তু হলো না সাক্ষী থাকলে হবেই বা কি করে? ঘাড় ফিরিয়ে সঙ্গীর উদ্দেশে বলল, 'তুমি আসবে?'

'তুমি এগোও। আমি আসছি।'

মাপা, দীর্ঘ পায়ে রাস্তা পেরিয়ে এল অ্যারাম সাশাদ। সাইডওয়াকে উঠে মহিলার সামনে এসে দাঁড়াল, সংক্ষেপে জানাল নিজের পরিচয়। 'আমার বাসায় আসুন, অফিসার,' কাঁপা, ভীত কণ্ঠে বলল মহিলা।

ওদের সঙ্গে যোগ দিল এসে হেরেন। সাইডওয়াকের সঙ্গেই দুই রুমের এক অ্যাপার্টমেন্টে থাকে মহিলা, মিনি ইয়াঙ্কোভিচ। বিধবা। পঁচাত্তরের মত বয়স। দাঁত নেই একটিও। সারা মুখে গিজ গিজ করছে বলিরেখা। তার মিনি লিভিংরুমে বসল ওরা। সাশাদের হাতে নোটবই, পেন্সিল। ঘটনাটা প্রথম থেকে নিজের মত করে বলে গেল মহিলা। মন দিয়ে শুনল দুই ডিটেকটিভ।

রাতে ঘুম একেবারেই হয় না মিনি ইয়াঙ্কোভিচের। প্রায় আট-দশ বছর ধরে চলছে এরকম, অভ্যেসে দাঁড়িয়ে গেছে এখন ব্যাপারটা একলা একজনের সংসার। পোষা বেড়াল আছে একটা, ওটার সঙ্গে কথা বলে আর রাস্তা দেখে রাত কাটায় সে। আজও তাই করছিল মিনি ইয়াঙ্কোভিচ, তার কোলে ঘুমে ঢুলছে বেড়ালটা। এই সময়, ভোর সোয়া তিনটার দিকে, রেইনকোট পরা ভদ্রবেশী দুই লোকের ওপর চোখ পড়ে তার। একজন দাঁড়িয়ে ছিল দু'শো ছেচল্লিশ নম্বর অ্যাপার্টমেন্ট হাউসের প্রবেশ পথের পাশে ছায়ামত একটা জায়গায়।

আরেকজন ছিল সাইডওয়াকে, হাঁটাহাঁটির ওপর। দু'বার তাকে থার্ড অ্যাভিনিউর দিকে যেতে দেখেছে মহিলা। অ্যাভিনিউর শেষ মাথায় একটা ফোন বুদ আছে, ওর মধ্যে ঢুকেছে সে দু'বারই। দ্বিতীয়বার ওখান থেকে ফিরে সঙ্গীর পাশে অবস্থান নেয় সে। ওর পর আর নড়েনি সে জায়গা ছেড়ে একই জায়গায় দাঁড়িয়ে ছিল ওরা দু'জন অনেকক্ষণ। ভাব-সাব দেখে পরিষ্কার বোঝা গেছে কারও জন্যে অপেক্ষা করছে ওরা।

তারপর?

তারপর দু'শো ছেচল্লিশের দরজা খুলে বেরিয়ে এল এক যুবক। চোখের পলকে তার ঘাড়ে লাফিয়ে পড়ল লোক দুটো। একজনের হাতে: হাঁটাহাঁটি করছিল যে লোক, ইয়া বড় এক ছোরা ছিল। রাস্তার আলোয় পলকের জন্যে ঝিকিয়ে ওঠে ছোরাটা, পরক্ষণেই মাটিতে পড়ে যায় যুবক। মরিয়া হয়ে আবার বাড়ির ভেতর ঢুকে যাওয়ার চেষ্টা করেছিল হতভাগ্য যুবক, কিন্তু পারেনি ততক্ষণে তার গলায় ছোরা ঢুকিয়ে দিয়েছে সেই লোক। প্রকাণ্ড ছোরা, কসাইরা যা দিয়ে মাংস কাটে, তেমনি। না, আক্রমণ-কারীদের চেহারা দেখতে পায়নি মিনি ইয়াঙ্কোভিচ চোখে কম দেখে সে।

'আক্রান্ত যুবক চিৎকার করেনি?' জানতে চাইল হেরেন।

মাথা দোলাল বৃদ্ধা। 'সময়ই পায়নি। কিছু বুঝে ওঠার আগেই শেষ হয়ে গেছে বেচারা। তারপর তার পকেট থেকে ওয়ালেট বের করে নেয় অন্যজন। আমার মনে হয় না ওটার জন্যেই লোকটা খুন হয়েছে, অফিসার। নিশ্চই এর মধ্যে আর কিছু আছে। শুধু মানিব্যাগের লোভে এভাবে কাউকে খুন করা,' সরু কাঁধ দুটো মুহূর্তের জন্যে ওপরে তুলেই ছেড়ে দিল মিনি ইয়াঙ্কোভিচ, 'অবিশ্বাস্য একটা ব্যাপার।'

'অবিশ্বাস্য কেন ভাবছেন?' নোটবুক থেকে মুখ তুলল অ্যারাম সাশাদ।

নার্ভাস হাসি ফুটল বৃদ্ধার ফোকলা, ফ্যাকাসে মুখে। 'খুনী দুটোর পোশাক-আশাক দামী বলেই মনে হয়েছে আমার। রেইনকোটও তাই। যথেষ্ট দামী।'

'নিগ্রো?'

'না, সাদা। ওটাও আমার সন্দেহের আরেকটা কারণ। সাদা ছিনতাইকারী...' আবার কাঁধ ঝাঁকাল বৃদ্ধা। থেমে গেল বক্তব্য শেষ না করে।

মিনি ইয়াঙ্কোভিচকে ধন্যবাদ জানিয়ে বেরিয়ে এল দুই গোয়েন্দা অফিসার। রাস্তা পার হয়ে মৃতদেহটার কাছে এসে দাঁড়াল। সাদা পোশাক পরা দুই মেল নার্স অ্যাম্বুলেন্স থেকে বেরিয়ে এল ওদের দেখে। মাথা দুলিয়ে লাশ তুলে নিয়ে যাওয়ার অনুমতি দিল তাদের অ্যারাম সাশাদ।

'কি বলল মহিলা?' জানতে চাইল রেনফ্রো। 'কাজের কিছু?'

মাথা দোলাল সাশাদ। আনমনে অ্যাম্বুলেন্সের বিলীয়মান টেইল লাইটের দিকে তাকিয়ে আছে সে। 'বুঝতে পারছি না।'

'অর্থাৎ সাধারণ ক্যাশ-অ্যাণ্ড-ক্যারি স্ট্রীট জব না এটা?'

খুনীরা যেখানটায় ওঁৎ পেতে দাঁড়িয়ে ছিল সেদিকে তাকিয়ে নিচের ঠোঁট চুষতে লাগল সাশাদ। ওখানে পায়ের ছাপ খুঁজে লাভ নেই, ভাবছে সে। ওটা পাকা জায়গা, এবং বৃষ্টি পড়ছে। কাজেই... সচকিত হলো অ্যারাম সাশাদ। তাকাল রেনফ্রোর দিকে। 'সিদ্ধান্তে পৌঁছার আগে আরও একটু ভেবে দেখতে হবে। এখনই কোন মন্তব্য করতে চাই না।'

ছ'টার দিকে দুই সিটি ফায়ার ডিটেকটিভের ওপর রানা এজেন্সির অগ্নিকাণ্ডের তদন্ত-ভার ছেড়ে দিয়ে বিদায় নিয়েছে লেফটেন্যান্ট করিগ্যান। মাসুদ রানা, এজেন্সির স্থানীয় প্রধান এবং কয়েকজন বাঙালি কর্মকর্তা-কর্মচারী রয়েছে এ মুহূর্তে অফিসে। জ্যাকবাস ছাড়া আমেরিকান স্টাফদের কেউ নেই। বড়দিন আর নববর্ষের ছুটি চলছে এখন। তারা সবাই ছুটিতে। এজেন্সির স্বাভাবিক কাজকর্ম প্রায় বন্ধ আছে গত কয়েক দিন থেকে। আরও প্রায় এক সপ্তাহ চলবে এ অবস্থা।

বড়দিনের ছুটি জ্যাকবাসের প্রয়োজন হয় না, কারণ সে ইহুদী। চাইলে নববর্ষের ছুটি অবশ্য পেত, কিন্তু পৃথিবীতে সম্পূর্ণ একা সে। আত্মীয়-স্বজন কেউ নেই। যাওয়ার কোন জায়গা নেই। তাই ছুটি নেয়নি জ্যাকবাস। ছয় বছর ধরে রানা এজেন্সির নাইটগার্ডের চাকরি করছে লোকটা, এর মধ্যে একদিনের জন্যেও ছুটি নেয়নি কখনও। অত্যন্ত বিশ্বস্ত, কাজপাগল মানুষ জ্যাকবাস।

সাতটা পাঁচে তদন্ত কাজ শেষ করল ডিটেকটিভদের একজন, ফ্র্যাঙ্ক

বিয়ানকো। চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছল। 'প্যারাফিন ক্যান্ডেল,' মাসুদ রানার দিকে তাকিয়ে ঘোষণা করল সে 'এবং সেলুলয়েড। টেকনিকটা বেশ পুরানো, তবে বিশ্বস্ত।'

বিভিন্ন রুমের ভেজা কার্পেটের সাতটা জায়গা চিহ্নিত করেছে সে এর মধ্যে। পানিতে ভিজে এমনিতেই গাঢ় রং পেয়েছে ওগুলো, তার মধ্যে এই সাতটা জায়গা আরও বেশি গাঢ় প্যারাফিনের মোমবাতি গলে মিশে গেছে কার্পেটের গায়ে। খোঁচা দিলে উঠে আসে 'সাতটা স্ট্র্যাটেজিক্যাল স্থানে বসানো হয়েছে এগুলো যাতে বাতাসের অনুকূল ক্রসকারেন্ট একেবারে শেষ পর্যন্ত জ্বলতে সাহায্য করে বাতিগুলোকে, অনায়াসে আগুনের স্পর্শ পায় সেলুলয়েডের ট্রেইলার। প্যারাফিনে আগুন ধরিয়ে কেটে পড়ার জন্যে এক ঘণ্টারও বেশি সময় পেয়েছে আরসনিস্ট ব্যাটা।'

'তার মানে আড়াইটার দিকে ধরানো হয়েছে মোমবাতিগুলো?' প্রশ্ন করল মাসুদ রানা। কপালে গভীর চিন্তার ছাপ

'পাঁচ-দশ মিনিট এদিক-ওদিকও হতে পারে।'

'তা কি করে সম্ভব?' ভাজ্জব হয়ে গেল জ্যাকবাস। 'ওই সময় আমি নিজে উপস্থিত ছিলাম এখানে বাউণ্ডারির ভেতর রাউণ্ডে ছিলাম আমি'

তাকে দেখল ডিটেকটিভ কয়েক সেকেণ্ড। 'একাই ছিলেন আপনি?'

'হ্যাঁ। ছয় বছর ধরে একাই এ কাজ করে আসছি আমি। কখনও একটা ইঁদুরও ঢুকতে পারেনি ভেতরে'

আনমনে মাথা ঝাঁকাল মাসুদ রানা, জ্যাকবাসের বক্তব্য মনেপ্রাণে সমর্থন করে ও। আসলেই মানুষটা সদা সতর্ক। এই ক'বছরে এক মিনিটের জন্যেও পাহারাদারীর কাজে ফাঁকি দেয়নি জ্যাকবাস। অন্তত কেউ তোলেনি এ অভিযোগ প্রায়ই আকস্মিক ভাবে মাঝরাতে, কি ভোররাতে হানা দিয়ে তার কাজ দেখতে আসে এজেন্সির কেউ না কেউ। একবারও জ্যাকবাসকে অপ্রস্তুত অবস্থায় দেখা যায়নি। সব সময় দুই পায়ে খাড়া থাকে সে, অতন্দ্র প্রহরী।

হাসল বিয়ানকো। 'ইঁদুর ইঁদুর-ই, মিস্টার, মানুষ নয়। মানুষের মত কূট বুদ্ধি ইঁদুর পাবে কোথায়?'

'কিন্তু…'

'আপনার মনোভাব বুঝতে পারছি। দায়িত্ব পালনে আপনার শিথিলতা ছিল এমন মীন করিনি কিন্তু আমি। আমি বলতে চাইছি আপনি যখন সামনে ছিলেন, লোকটা বা লোকগুলো তখন পিছন দিয়ে ভেতরে ঢুকেছে অথবা উল্টোটাও হতে পারে। মোট কথা ঢুকেছে ভেতরে কেউ না কেউ ইউ নো, চোর যখন ঘরে ঢোকার জন্যে সত্যিকারভাবে সিরিয়াস হয়ে ওঠে তখন তাকে ঠেকানো খুব মুশকিল।'

রাবারের সার্জিক্যাল গ্লাভস পরা হাতে এক টুকরো সেলুলয়েড নিয়ে নাড়াচাড়া করছে ফ্র্যাঙ্ক বিয়ানকো ওপাশের এক রুমের একটা ওল্টানো টেবিলের তলা থেকে টুকরোটা উদ্ধার করেছে সে একটু আগে চার ইঞ্চিমত লম্বা হবে ওটা। দেখতে কালচে নেগেটিভের মত

'টেবিলটা উপুড় হয়ে এটার ওপর পড়েছিল বলে অক্ষত পাওয়া গেছে টুকরোটা,' বলল সে মাসুদ রানার উদ্দেশে 'সাজ্ঞাতিক দ্রুত পোড়ে এ জিনিস প্রমাণ সাইজ একটা রুমের এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে আগুন পৌঁছে দিতে পারে সেকেণ্ডের মধ্যে।'

মাথা দোলাল মাসুদ রানা। তবে খুব একটা আমল দিচ্ছে না এখন ও করিগান ও বিয়ানকো, দু'জনেই নিজ নিজ পেশায় বিশেষজ্ঞ রানা এজেন্সিতে আগুন লাগানো হয়েছে ইচ্ছে করে, এ সত্য প্রতিষ্ঠিত করে ছেড়েছে তারা রানা নিশ্চিত হয়েছে আরও আগেই। সেই থেকে ভীষণ গম্ভীর হয়ে আছে ও এখন শুধু দুটোই প্রশ্ন রানার, কে করেছে কাজটা, এবং কেন।

'আপনি কাউকে সন্দেহ করেন, স্যার?' প্রশ্ন করল ফায়ার ডিটেকটিভ

'নাহ!' মাথা দোলাল রানা। মনে মনে চাইছে তাড়াতাড়ি বিদেয় হোক এরা, তাহলে নিরিবিলিতে খানিক মাথা ঘামানো যাবে বিষয়টা নিয়ে

বারোটার দিকে রেহাই পাওয়া গেল দুই ডিটেকটিভের হাত থেকে যাওয়ার আগে সেলুলয়েডের টুকরোটা দেখিয়ে আশ্বস্ত করে গেছে বিয়ানকো, ওটায় যদি কারও আঙুলের ছাপ পাওয়া যায়, তাহলে অপরাধীকে ধরা কোন সমস্যাই হবে না। রানাও সৌজন্যের খাতিরে মাথা দুলিয়ে ভাব করেছে যেন সফল হয় তারা, বের করতে সক্ষম হয় আরসনিস্ট ব্যাটার পরিচয়। যদিও মনে মনে নিশ্চিতভাবে জানে, কিছুই পাওয়া যাবে না ওটায় কোথাও আঙুলের ছাপ রেখে যাওয়ার মত বোকামি নিশ্চয়ই করেনি লোকটা বা লোকগুলো।

সন্ধে পর্যন্ত ধস্তাধস্তি করে রুমগুলোকে কোন রকমে গোছগাছ করে ফেলল ওরা সবাই মিলে। প্যাকেট লাঞ্চ আনিয়ে অফিসে বসেই খেয়ে নিয়েছে ওরা দুপুরে সবার মাথায় এক চিন্তা—কে করল কাজটা? কেন করল? প্রায় নীরবেই হাত চালাল ওরা পুরোটা সময় সাতটা বাজতে সবার ক্লান্তির কথা ভেবে ক্ষান্ত দিল মাসুদ রানা

'আজ আর নয় কাল সকালে এসে যে যার অফিস রুম চেক করবে খুঁজে দেখবে জরুরী কোন ফাইল খোয়া গেছে কি না।'

শাখা প্রধান শওকত ছাড়া সবাই চলে গেল একে একে। ছোটখাট মানুষ শওকত। চোখে পুরু কাঁচের চশমা চেহারা ইন্টেলেকচুয়ালদের মত কম কথার মানুষ সে। 'আমি এর মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারছি না, মাসুদ ভাই,' বিড় বিড় করে বলল সে। 'অভাবনীয় একটা ব্যাপার।'

নিজের আধপোড়া ফাইল কেবিনেট খুলে ভেতরে উঁকি দিল রানা 'ঠিকই বলেছ। আমিও কিছু বুঝতে পারছি না।' ভেতরটা দেখে মোটামুটি সন্তুষ্ট হলো ও। ফাইল সব অক্ষতই আছে, এবং যেভাবে সাজানো ছিল ঠিক সেভাবেই আছে সব অন্তত ওপর থেকে দেখে সেরকমই মনে হচ্ছে। এক আধটা খোয়া গেছে কি না, তা জানতে হলে ফাইল রেজিস্টারে চোখ বোলাতে হবে।

'শওকত, ফাইল রেজিস্টারটা নিয়ে এসো।'

চেহারা করুণ হয়ে উঠল শওকতের। 'ওটা নেই, মাসুদ ভাই ছাই হয়ে গেছে।'

'সেরেছে! ওটা না দেখে কি করে বুঝব সব ঠিক আছে কি না?'

'আমিও তাই ভাবছি.' মাথা চুলকাল শওকত। 'এর একমাত্র সলিউশন হলো কার কাছে কোন্ কোন্ ফাইল আছে, তার নতুন একটা তালিকা তৈরি করা।'

'সাঙ্ঘাতিক ঝামেলার কাজ।'

'ভাববেন না। লিস্ট তৈরির কাজে হাত লাগাচ্ছি আমি এখন। আপনার কেবিনেটের চাবি দিয়ে যান আমাকে।'

'বলো কি তুমি?' চোখ কপালে উঠল রানার। 'একা একা রাত জেগে এই পাহাড় ঘাঁটবে তুমি? কোন দরকার নেই। কাল সকালে আমরা সবাই মিলে হাত লাগাব এক সঙ্গে।'

'না। আজই শুরু করতে চাই আমি কাজটা। যেটুকু বাকি থাকবে আপনারা কাল সেরে ফেলবেন।'

মিনিট পাঁচেক তর্কাতর্কির পর শওকতের কাছে হার মানল মাসুদ রানা। চাবিটা তার হাতে তুলে দিয়ে বেরিয়ে এল ও অফিস ছেড়ে। দশ মিনিট পর ম্যানহাটনের ইস্ট সেভেন্টি থার্ড স্ট্রীটের পিছনের সমান্তরাল সেভেন্টি ফোর্থ স্ট্রীটের একটা আণ্ডারগ্রাউণ্ড কার পার্কে গাড়ি ঢোকাল রানা। তারপর পিছনের সংক্ষিপ্ত গলিপথ ধরে সেভেন্টি থার্ডের দু'শো ছেচল্লিশ নম্বর অ্যাপার্টমেন্ট হাউসের ছয়তলায় নিজের ফ্ল্যাটে এসে ঢুকল। আসার পথে আজকের একটা নিউ ইয়র্ক পোস্ট কিনে এনেছে।

ওটা লিভিংরুমের সোফার ওপর ফেলে সোজা এসে বাথরুমে ঢুকল ও। গরম পানিতে দশ মিনিট ধরে গোসল করল, তারপর শেভ সেরে বেরিয়ে এল তরতাজা হয়ে এ মুহূর্তে অফিস নিয়ে ভাবছে না মাসুদ রানা, ভাবছে পেট নিয়ে। প্রচণ্ড খিদেয় নাড়ীভুঁড়ি হজম হয়ে যাওয়ার জোগাড়। কিচেনে এসে চারটে ডিমের প্রকাণ্ড এক ওমলেট তৈরি করল রানা। কফির জন্যে পানি বসিয়ে সরু ফালি করে কাটা টম্যাটো, ওমলেট আর পাউরুটি দিয়ে দুটো তাগড়া সাইজের স্যাণ্ডউইচ তৈরি করল। তারপর ধূমায়িত কফি ও স্যাণ্ডউইচ নিয়ে লিভিংরুমে এসে বসল

স্যাণ্ডউইচে বিরাট এক কামড় বসিয়ে পত্রিকাটা কোলের ওপর টেনে নিল ও চোখ বোলাতে লাগল আনমনে। প্রথম পাতার নিচের দিকে সাব-হেডিংসহ বড় একটা হেডিঙের ওপর চোখ পড়ল। জমে গেল নজর। ওটা এরকম:

কোটিপতি স্যান্ডলার পরিবারের সর্বশেষ সদস্য
ভিক্টোরিয়া স্যান্ডলার লোকান্তরে
রাজকীয় স্যান্ডলার ম্যানসনের লিভিংরুমে অশিতীপর নিঃসঙ্গ
ভিক্টোরিয়াকে মৃত পাওয়া গেছে

চোখ কোঁচকাল রানা। হেডিঙের নিচে ছোট করে ছাপা ভিক্টোরিয়া স্যান্ডলারের ছবিটা দেখল কিছু সময় ধরে। তারপর নিচের বিস্তারিত রিপোর্ট পড়ায় মন দিল সঙ্গে হাত আর মুখও চলছে, তবে আগের তুলনায় অনেক ধীরগতিতে। রিপোর্টের সংক্ষিপ্তসার অনেকটা এরকম: ১৯৬৪ সালে আমেরিকার বিখ্যাত কোটিপতি,

অবিবাহিত আর্থার স্যান্ডলারের মৃত্যুর পর তাঁর চিরকুমারী বোন, ভিক্টোরিয়া স্যান্ডলার একাই বাস করতেন তাঁদের ম্যানহাটনের এইটি নাইনথ স্ট্রীটের ঐতিহাসিক, প্রাসাদোপম বিশাল স্যাণ্ডলার ম্যানসনে। ভাইয়ের মৃত্যুর পর এখানে প্রায় আড়াই দশক একেবারে নিঃসঙ্গ অবস্থায় দিন কাটিয়েছেন ভিক্টোরিয়া। মানসিক প্রতিবন্ধী ছিলেন তিনি।

অনেকের মতে আদরের একমাত্র ছোট ভাইয়ের হত্যাকাণ্ড চাক্ষুষ করার পর পুরোপুরি মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটে মহিলার। দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, কখনও এমনকি বছরও কাটিয়ে দিতেন তিনি একই পোশাকে। সারা বছর পুরু উলের মোজা আর পাম্প শূ পরে থাকতেন। স্যান্ডলার ম্যানসনের বিভিন্ন রুমে মার্বেল ও জিঙ্কের তৈরি সাতটা প্রকাণ্ড বাথটাব থাকা সত্ত্বেও বছরের পর বছর গোসল করতেন না মহিলা। অ্যাকুয়াফোবিয়া ছিল তাঁর, পানি সম্পর্কে মারাত্মক মানসিক ভীতি ছিল। নিতান্ত প্রয়োজন ছাড়া পানি স্পর্শ পর্যন্ত করতেন না ভিক্টোরিয়া স্যান্ডলার।

কুকুর এবং এক ডলারের কড়কড়ে নতুন বিলের প্রতি প্রচণ্ড দুর্বলতা ছিল তাঁর। এক ডলারের বিল জমা করতেন তিনি আদরের ছোট ভাইকে দেয়ার জন্যে। তাঁর ধারণা একদিন ফিরে আসবে ছোট ভাই আর্থার স্যান্ডলার, টাকা চাইবে স্নেহময়ী বোনের কাছে, তখন ওগুলো তাকে দেবেন ভিক্টোরিয়া স্যান্ডলার। স্থানীয় দোকানদাররা খুব ভাল জানত মহিলার এই ধারণার কথা, যে কারণে তাঁর জন্যে কড়কড়ে এক ডলারের বিল সব সময় মজুদ রাখত তারা কেনাকাটা করতে এলে সব সময় বড় বিল দিতেন ভিক্টোরিয়া, বাকিটা এক ডলারের বিলে ফেরত দিতে হত তাঁকে। যদিও আমেরিকার প্রায় সবারই জানা আর্থার স্যান্ডলারের পরিণতির কথা।

এছাড়া অগুনতি কুকুর পুষতেন ভিক্টোরিয়া বেশিরভাগই ক্ষুদ্র আকারের লোমশ কুকুর ছিল ওগুলো। এবং প্রতিটিরই নাম রাখতেন তিনি অ্যান্ডি। সকাল-বিকাল রাজকীয় খাবার দেয়া হত অ্যান্ডিদের। কোন কুকুরের মৃত্যু হলে আখরোট গাছের কাঠ দিয়ে তার প্রতিকৃতি তৈরি করাতেন ভিক্টোরিয়া। তবে শেষ এক দশক কাঠের বদলে ভেলভেট কুশন দিয়ে ওগুলো তৈরি করিয়েছেন তিনি। ম্যানসনের ভেতরেই কোথাও আছে সে সব, কিন্তু কোথায় কেউ জানে না। স্যান্ডলার ম্যানসন সাধারণ নগরবাসীর কাছে যেমন চিররহস্যময়, তেমনি তার অধিবাসী স্যান্ডলারদের তিন পুরুষ। আজ পর্যন্ত কোন টিভি ক্যামেরা দূরে থাকুক, একজন সাংবাদিকও প্রবেশের সুযোগ পায়নি ওখানে। যে জন্যে ওই পরিবার সম্পর্কে খুব সামান্যই জানে মানুষ ইত্যাদি ইত্যাদি।

পত্রিকা রেখে সিগারেট ধরাল রানা। ভীষণ রকম চিন্তিত। উঠে গিয়ে টিভি অন করে দিল ও। খবর হচ্ছে। দেখছে অন্যমনস্ক রানা। এক মিনিট পর চমকে উঠল ও। আজ খুব ভোরে ওর-ই অ্যাপার্টমেন্ট হাউসের সামনের রাস্তায় খুন হয়েছে এক যুবক, সেই খবর পড়ছে সংবাদ-পাঠক। আশ্চর্য হয়ে ভাবল রানা, এর কিছুই জানি না আমি! হত্যাকাণ্ডের সময়টা বিভ্রান্তিকর।

আশ্চর্যের ওপর আশ্চর্য!

দ্রুত বেরুবার জন্যে তৈরি হয়ে নিল রানা। এখনই যেতে হবে ওকে রানা এজেন্সিতে খুবই জরুরী

দুই

বায়ুতাড়িত ভারি, ঘন তুষারপাতের মধ্যে দিয়ে সাইডওয়াক ধরে দ্রুত পায়ে এগিয়ে চলেছে মেয়েটি। লেসলি ম্যাকঅ্যাডাম তার নাম। মেয়েটির মাত্র বিশ গজ সামনে রয়েছে টকটকে লাল রঙের বিচ্ছিন্ন একটা মেপল পাতা, কিন্তু পরিষ্কার দেখা যায় না ওটা পোলের মাথায় একটা পতাকার সঙ্গে জোড়া আছে পাতাটা, ক্যানাডিয়ান পতাকা। ওটার পাতা বা লাল বর্ডার, কোনটিই পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে না

বিশ্রী আবহাওয়া, মনে মনে বলল লেসলি ম্যাকঅ্যাডাম। আরও বাড়িয়ে দিল চলার গতি। তাড়াতাড়ি নিজের ছোট, উষ্ণ অ্যাপার্টমেন্টে ফিরে স্বস্তির দম ছাড়তে চায় সে। সমগ্র মনট্রিয়লে গত কয়েক দিন ধরে চলছে এই অবস্থা, পথে বের হওয়াই দায়। অবশ্য অস্বাভাবিক কিছু নয় এটা। ডিসেম্বর-জানুয়ারির এই হচ্ছে এখানকার স্বাভাবিক আবহাওয়া এসব এখন আর লেসলির বিরক্তি উদ্রেক করতে পারে না। একজন মনট্রিয়লবাসীর মতই খাপ খাইয়ে নিয়েছে সে এর সঙ্গে

প্রতিদিন আট ইঞ্চি করে বরফ জমে এখন এ শহরে। কম করেও। কোন কোনদিন এক ফুটও ছাড়িয়ে যায় কুইবেকের সমস্ত অটোরুট বন্ধ এখন, কোন উপায় নেই গাড়ি চালানোর। এয়ারপোর্টও বন্ধ। ধপধপে সাদা চাদর মুড়ি দিয়ে আছে যেন শহরটা। ম্যাকগিল ইউনিভার্সিটি, ওয়েস্টমাউন্টের চূড়ায় বিখ্যাত ইলিউমিনেটেড ক্রস, পুরানো শহরের জ্যাকস কার্টারের সুউচ্চ পাথরের মূর্তি, সেইন্ট লরেন্সের সুপ্রাচীন গির্জা নোটর ডেম ডি বনসিকোর্স, সব বরফের পুরু স্তর গায়ে মেখে দাঁড়িয়ে আছে। অদ্ভুত লাগে দেখতে। ন্যাড়া গাছগুলো দাঁড়িয়ে আছে মাথায় কাঁধে বরফের বোঝা নিয়ে। যখন আর বইতে পারে না ভার, ঝুপ ঝুপ করে সব ফেলে দেয় নিচে, তারপর আবার অপেক্ষা করে নতুন বোঝা ধারণের জন্যে

তাই বলে থেমে নেই শহরের জীবনযাত্রা। মাটির নিচে আছে আরেক মনট্রিয়ল, সবই চলছে সেখানে। প্রায় চব্বিশ ঘণ্টাই চালু আছে মেট্রো। বাজার, শপিং সেন্টার, কাফে-রেস্তোরাঁ চলছে ধুমসে ওপরে প্রকৃতির সঙ্গে যুদ্ধে কুলিয়ে উঠতে না পেরে মাটির নিচে নেমে এসেছে মনট্রিয়লবাসী।

একটা বাঁক ঘুরল লেসলি ম্যাকঅ্যাডাম, পরক্ষণেই তীব্র বাতাস আর তুষারের ধাক্কায় পড়ে যাওয়ার দশা হলো। বহু কষ্টে সামাল দিল সে। ইচ্ছে করলে আণ্ডারগ্রাউণ্ড দিয়েই আসতে পারত সে কিন্তু আসেনি কারণ তার কর্মস্থল, ম্যাকগিল ভার্সিটি, বাসার কাছেই, কয়েক ব্লক দূরে আরও এক বছর কাটাতে হবে লেসলিকে এখানে, আরও একটা থিসিস শেষ করতে হবে। তারপর ডক্টরেট ডিগ্রী লাভ করবে সে

বাসায় ঢুকে মাথা এবং ওভারকোটের দুই কাঁধে জমে ওঠা তুষার ঝেড়ে ফেলল লেসলি ম্যাকঅ্যাডাম। ভেতরের গরম পরিবেশে আসতে পেরে যেন নতুন জীবন লাভ করেছে সে। মনে মনে ক্যানাডিয়ান তেলের প্রতি কৃতজ্ঞ বোধ করল লেসলি তার জন্মস্থান, ইংল্যাণ্ডের এক্সিটারে ঘর গরম রাখার জন্যে ব্যবহৃত কাঠ আর কয়লার থেকে অনেক সস্তা আর নির্ভরযোগ্য এদের এই সম্পদ

গলায় পেঁচানো স্কার্ফটা খুলল লেসলি, তারপর উলের হ্যাট। ওগুলোও ঝাড়ল সে। কাঁধে ছড়িয়ে পড়ল তার একরাশ ঘন, বাদামী চুল। ভেজা কাপড় শুকোবার জন্যে বাথরুমের টাবের ওপর টাঙানো দড়িতে মেলে দিল লেসলি। হ্যাটটা ওরই সঙ্গে ঝোলানো একটা ক্লিপে আটকে দিল। কেএলএইচ সিস্টেমে মোজার্টের একটা কনসার্ট চাপাল সে। তারপর ধূমায়িত ভারতীয় চায়ে চুমুক দিল। মনটা অতীতে হারিয়ে গেল লেসলির।

নজর ঘরের দেয়ালে। উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর দুর্লভ কয়েকটা প্যাস্টেল শেডেড পেইন্টিং ঝুলছে দেয়ালে, আনমনে সেগুলো দেখছে। লেসলি ম্যাকঅ্যাডাম নিজেও একজন আর্টিস্ট। খুব ভাল নয় অবশ্য, মোটামুটি শিশুকালটা যদি একটা দোদুল্যমান, অনিশ্চয়তার মধ্যে না কাটত ওর, তাহলে আজ হয়তো নাম করা আর্টিস্ট হিসেবে ক্যারিয়ার গড়ে তুলতে পারত লেসলি সে মনে-প্রাণে বিশ্বাস করে, পিতার মত তার হাতেরও ঐশ্বরিক ক্ষমতা রয়েছে সুযোগ পেলে শিল্প পিপাসুদের অনেক কিছু দিতে পারে সে। কিন্তু···দুর্ভাগ্য

নিজেকে প্রকাশ করার কোন ঝুঁকি নিতে পারে না লেসলি। এখনও সে সময় আসেনি। চা শেষ করে উঠল লেসলি। বেডরুমে এসে ঢুকল। ও ঘর থেকে মিউজিকের আওয়াজ আসছে। চাপা হলেও বোঝার জন্যে যথেষ্ট। বড় জানালার সামনে কিছু সময় দাঁড়িয়ে থাকল লেসলি, বাইরের তুষারপাত দেখল ভীষণরকম প্রতিকূল আবহাওয়া। তবু উপায় নেই তার এর মধ্যেই যাত্রা করতে হবে

ক্লজিট থেকে একটা সিঙ্গল সুটকেস বের করল মেয়েটি চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে এ দেশ ত্যাগ করতেই হবে তাকে চলতি সেমিস্টারের শেষ দুটো সপ্তাহ মিস করবে লেসলি, কিন্তু তবু যেতে হবে তার প্রফেসরেরা সমস্যাটা বোঝার চেষ্টা করবেন, আশা করছে সে। ওদিকে যদি সব ভালয় ভালয় মিটে যায়, এর মধ্যে ফিরে আসবে লেসলি, তাড়াতাড়ি বাকি থিসিস শেষ করে জমা দেবে

সুটকেস খুলে কাপড়-চোপড় ভরতে লাগল লেসলি ম্যাকঅ্যাডাম আমেরিকায় যাচ্ছে সে। নিউ ইয়র্কে। কিছু অসমাপ্ত পারিবারিক কাজ পড়ে গেছে, ওগুলো সারতে। আর ক'টা দিন পর যদি মরত ভিক্টোরিয়া স্যান্ডলার, বড্ড উপকার হত ওর। শেষ মুহূর্তের কাজ বন্ধ রেখে হুড়োহুড়ি করে ছুটতে হত না তাকে

কেন এমন কাজ করল লোকটা? বিয়ের আংটি খুলে পকেটে কেন রাখল? এর দ্বিতীয় কোন কারণ খুঁজে পেল না সাশাদ বা হেরেন তাদের মতে এর একটাই কারণ হতে পারে, এবং সেটা অবশ্যই একমাত্র কারণ। তা হলো, স্ত্রী ছাড়া আরও এক নারী আছে তার জীবনে মানে, ছিল আর কি। এক নারী? না কি···যাই

হোক, সেটাও এখন আর বড় কথা নয়। আংটিটা বেশ দামী। ব্যাণ্ডে এনগ্রেভ করা আছে কয়েকটা অক্ষর ও বিয়ের তারিখ কে. এফ- এম. আর। ৬ ডিসেম্বর, ১৯৮২।

বিকেল তিনটায় নিহতের ময়না তদন্তের রিপোর্ট পৌছল নাইনটিনথ প্রিসিঙ্কটে, ডিটেকটিভ অ্যারাম সাশাদের হাতে। রিপোর্ট পড়ে সন্তুষ্টচিত্তে মাথা দোলাল সে। তার ধারণাই ঠিক। মৃত্যুর কিছুক্ষণ আগেই সহবাস করেছে যুবক।

'ওই জিনিসটা,' কাগজটা হেরেনের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে দার্শনিকের ভঙ্গিতে মাথা দোলাল সাশাদ। 'যে জায়গায় খাটানোর কথা সেখানেই যদি খাটাত, তাহলে হয়তো প্রাণ হারাতে হতো না বেচারীকে। অজায়গায় খাটাতে গিয়েই গেল ব্যাটা।'

কাগজটার ওপর চোখ বোলাল হেরেন। তারপর ফিরিয়ে দিল। 'তাই তো মনে হয়।'

'আবার মনে হয় কি? মনে হওয়া-টওয়ার কিছু নেই। আমি যা বললাম, ঠিক তাই ঘটেছে! বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। লিখে রাখো, তিনটে পর্যন্ত কুকাজ করেছে ব্যাটা। তারপর কাপড় পরে বেরিয়েছে ওই বিল্ডিঙেরই কোন অ্যাপার্টমেন্ট থেকে; এবং পথে নেমেই পড়েছে রিসেপশন কমিটির সামনে।' খানিক বিরতি দিল সাশাদ। 'কিন্তু ওইরকম সময় কেন পথে বের হলো সে? যেখানে ছিল, বাকি রাতটা সেখানেই কেন থেকে গেল না? বউয়ের ভয়ে?'

'বউ তার আছে কি নেই তাই বা কে জানে?'

'আছে। নইলে বিয়ের আংটি সঙ্গে নিয়ে ঘুরবে কেন সে?'

'হয়তো অভ্যাস,' কাঁধ ঝাঁকাল হেরেন।

'উঁহুঁ! মিলছে না। আমার ধারণা...'

সন্তুষ্ট হতে পারছে না দুই ডিটেকটিভ। নিজেদের মধ্যে আলোচনা করছে তারা বিষয়টা নিয়ে। টেনিস বলের মত একজন একটা আইডিয়া ছুঁড়ে দিচ্ছে, অন্যজন তা ফিরিয়ে দিয়ে আরেক আইডিয়া ছুঁড়ছে। একসঙ্গে বেশ কয়েক বছর কাজ করেছে এরা, অপরাধ-রহস্য উদঘাটনের এই 'সক্রেটিক মেথডকে' প্রায় ফাইন আর্টের পর্যায়ে নিয়ে এসেছে তারা এভাবে পরস্পরের মধ্যে আইডিয়া চালাচালির মাধ্যমে।

'কেন অত রাতে পথে বের হলো সে?' সাশাদের একটু আগের প্রশ্নটা উচ্চারিত হলো হেরেনের কণ্ঠে। চেয়ারে হেলান দিয়ে হাত-পা ছড়িয়ে বসে আছে সে।

'তোমার ধারণাটা শুনি!'

'হয়তো মেয়েটির, মানে, নিহতের গার্লফ্রেণ্ডের স্বামী হতে পারে আকস্মিকভাবে ফিরে আসে বলে। হয়তো শহরের বাইরে ছিল সে, ফেরার কথা ছিল না রাতে। কিন্তু হঠাৎ করে...'

'অথবা,' বাধা দিল সাশাদ। 'হয়তো পুরো রাতের পয়সা পে করেনি সে মেয়েটিকে। অর্ধেক রাতের জন্যে ভাড়া করেছিল।'

দুটো পয়েন্টই পছন্দ হলো ওদের। তাই ও দুটো নিয়েই জাবর কাটতে লাগল সাশাদ-হেরেন। 'এখনও লোকটার নাম জানা গেল না,' এক সময় বলে

উঠল সাশাদ। 'ওটা জানা গেলে আংটির ব্যাপারটা সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যেত।'

ওদিকে, চারশো চল্লিশ ম্যাডিসন অ্যাভিনিউ, ব্র্যাডফোর্ডের এক অর্থ লগ্নিকারী প্রতিষ্ঠান মেহর অ্যাণ্ড কোম্পানির এক জুনিয়র অ্যাকাউন্টস নির্বাহীর খবর নেই। দুপুর গড়িয়ে যায় তবু সে অফিসে আসছে না দেখে তার শহরতলীর বাসায় টেলিফোন করল অফিসের এক সেক্রেটারি। টেলিফোন ধরল তার স্ত্রী, এবং অপর প্রান্তের প্রশ্ন শুনে জবাব দিল, না, তার স্বামী গতরাতে বাসায় ফেরেনি।

কাল দুপুরে ফোন করে বাসায় সে বলেই রেখেছিল যে রাতে সে আসছে না। বলেছিল অফিসে খুব জরুরী কিছু কাজ জমে গেছে হঠাৎ করে, ওগুলো তাড়াতাড়ি না সারলেই নয়। কাজ শেষ করতে করতে রাত হয়ে যাবে অনেক, তাই রাতে পথে বের হওয়ার ঝুঁকি নেবে না নির্বাহী। তাতে বিপদ ঘটতে পারে। রাতটা ম্যানহাটন ভার্সিটি ক্লাবে কাটাবে বলেছিল সে। কেন, কোন ঝামেলা হয়েছে?

না, কোন ঝামেলা হয়নি। লাইন কেটে ক্লাবে ফোন করল সেক্রেটারি। জানা গেল সেখানে যায়নি নির্বাহী গত রাতে। কোথায় গেল তাহলে মানুষটা? কেন বাসায় মিথ্যে বলল সে? একটার সময় মেহর অ্যাণ্ড কোম্পানির তরফ থেকে বিষয়টা জানানো হলো নিউ ইয়র্ক সিটি পুলিস ডিপার্টমেন্টের মিসিং পারসন'স সেকশনে। ফ্যাক্সের মাধ্যমে মুহূর্তে সবখানে ছড়িয়ে গেল খবরটা। হাসপাতাল, পুলিস স্টেশন, শহরে যত মর্গ আছে, সর্বত্র।

তিনটে বিশে সাশাদের ডেস্কের টেলিফোন বেজে উঠল। ফোনটা করেছে ভোর রাতে সেভেন্টি থার্ড স্ট্রীটে জবাই হওয়া অজ্ঞাতপরিচয় যুবককে যে মর্গে নিয়ে যাওয়া হয়, তার ল্যাব অ্যাসিসটেন্ট গ্যারি ডেডমারশ।

'আপনার পাঠানো লাশটার পরিচয় সম্ভবত পাওয়া গেছে, অফিসার,' বলল সে। 'অন্তত তার ডেসক্রিপশন সেরকমই বলে।'

চট করে আংটিটা চোখের সামনে তুলে ধরল অ্যারাম সাশাদ 'কি নাম?'

'মার্ক রাইডার।'

'ধন্যবাদ। নামটাও মিলে গেছে মনে হয় রিসিভার রেখে দিল সাশাদ। আংটির ব্যাণ্ডের খোদাই করা অক্ষরগুলো দেখল আবার তারপর মাথা ঝাঁকাল হেরেনের উদ্দেশে 'এতক্ষণে আত্মপরিচয় জানাল লাশটা

রানা এজেন্সি। নিজের রুমে বসে আছে মাসুদ রানা। তার মুখোমুখি শওকত। আনমনে শওকতের পিছনের কালচে পোড়া দাগ ভরা দেয়াল দেখছে রানা, শওকত দেখছে রানাকে। কথা নেই কারও মুখে।

আধ ঘণ্টা আগে হঠাৎ করেই ফিরে এসেছে রানা। নিজের ফাইল কেবিনেটের মধ্যে কিছু একটা খুঁজেছে হন্যে হয়ে। তন্নতন্ন করে। কিন্তু পাওয়া যায়নি জিনিসটা। সেটা কি জানে না শওকত জানার আগ্রহে ছটফট করছে ভেতরে ভেতরে কিন্তু মাসুদ ভাইকে প্রশ্ন করতে সাহস হচ্ছে না তার। ভীষণ রকম গম্ভীর হয়ে আছে রানা। হাত গুটিয়ে বসে আছে শওকত কখন মাসুদ ভাই মুখ খুলবেন সেই আশায়।

সচকিত হলো মাসুদ রানা। নড়েচড়ে বসল দৃষ্টি নেমে এল শওকতের

মুখের ওপর। মুচকে হাসল রানা। 'খুব অস্থির হয়ে পড়েছ মনে হচ্ছে?'

মুখে কিছু বলল না ইন্টেলেকচুয়াল। তবে চেহারায় বুঝিয়ে দিল ঠিকই ধরেছেন আপনি। শুধু অস্থির নয়, সাজ্যাতিক অস্থির হয়ে আছি।

'আমি জানি কেন আগুন লাগানো হয়েছে আমাদের অফিসে,' বলল মাসুদ রানা।

'জ্বি?' শিরদাঁড়া সোজা হয়ে গেল শওকতের। পুরু চশমার নিচে কুঁচকে উঠল তার দু'চোখ।

'হ্যা। আমার ফাইল কেবিনেট থেকে বিশেষ একটা ফাইল সরিয়েছে কেউ, এবং ব্যাপারটা যাতে প্রকাশ না পায় সে জন্যে আগুন লাগিয়ে সব পুড়িয়ে ছাই করে দিতে চেয়েছিল যাতে আমরা ধরে নিতে বাধ্য হই আর সব ফাইলের মত ওটাও ধ্বংস হয়ে গেছে। কিন্তু দুর্ভাগ্য ওদের। ওরা বুঝতে পারেনি সতর্ক জ্যাকবাসের কারণে পরিকল্পনার শেষ অংশ এভাবে কেঁচে যাবে।'

চোখ পিট পিট করে উঠল শওকতের। বিভ্রান্ত ভঙ্গি। 'বুঝলাম না, মাসুদ ভাই। কোন ফাইল সরিয়ে ফেলা হয়েছে? কে করল কাজটা?'

মাথা দোলাল মাসুদ রানা। তোমার শেষ প্রশ্নের উত্তর এখনই দিতে পারছি না। কারণ, জানি না। তবে প্রথমটার ব্যাপারে কিছু আলোকপাত করতে পারি,' ঠোঁট টিপে হাসল ও। 'গল্পটা শুনতে মন্দ লাগবে না তোমার।'

অস্থিরতা আরও বেড়ে গেল শওকতের 'তাহলে আর দেরি কেন? শুরু করে দিন, প্লীজ!'

'এখনই?'

'হ্যাঁ, এখনই। দম আটকে আসছে আমার।'

'বেশ।' সিগারেট ধরিয়ে নাক-মুখ দিয়ে গল গল করে ধোঁয়া ছাড়তে লাগল মাসুদ রানা। বক্তব্য গোছাচ্ছে মনে মনে। 'এ শহরের এক সময়ের বিখ্যাত অ্যাটর্নি উইলিয়াম ওয়ার্ড ড্যানিয়েলসের নাম শুনেছ কখনও? শুধু বিখ্যাত নয়, খুবই বিখ্যাত ছিলেন ভদ্রলোক। তাঁর মত দিনকে রাত করতে সক্ষম কোন অ্যাটর্নি গোটা আমেরিকায় দ্বিতীয়টি ছিল না। সাক্ষী-সাবুদ আর তথ্য প্রমাণের জোরে অনেক জঘন্য অপধারীকেও নিশ্চিত মৃত্যুদণ্ডের হাত থেকে বাঁচিয়ে নিয়ে আসার ব্যাপারে রীতিমত ওস্তাদ ছিলেন উইলিয়াম ওয়ার্ড ড্যানিয়েলস। এবং মজার কথা হলো, তাঁর ব্যাপারে একটা গুজব খুব জোরেসোরে চালু ছিল, তিনি যে সব সাক্ষী-প্রমাণ হাজির করতেন তার বেশিরভাগই ছিল ভুয়া। সোজা কথায় বানানো। শুনেছ?'

মাথা নাড়ল শওকত ইতস্তত ভঙ্গিতে। 'খুব সম্ভব শুনেছি ভদ্রলোকের কথা, মাসুদ ভাই। খেয়াল পড়ছে না।' একটু বিরতি। 'ভুয়া সাক্ষী-প্রমাণের সাহায্যে আসামী মুক্ত করাতেন ভদ্রলোক? তা-ও এ দেশে?'

'হ্যাঁ। এ দেশেই।'

'প্রশাসন জানত?'

'জানত হয়তো। সঠিক বলতে পারি না। তবে গুজবটা যেমন জোরাল ছিল, তাতে প্রশাসনের না জানার কোন কারণ আছে বলে আমি মনে করি না। অবশ্য

আমি পুরোপুরি নিশ্চিত নই, যা শুনেছি তাই বললাম। তবে একটা কথা ঠিক, রাষ্ট্র বনাম অমুক জঘন্য চোরাকারবারী, কি তমুক নৃশংস হত্যাকারী জাতীয় মামলার শতকরা একশো ভাগই তাঁর হাতে পড়ত। এর মধ্যে যে-সব মামলা খুব আলোড়ন সৃষ্টি করত, আসামীর রেহাই পাওয়ার কোন পথই আর নেই মনে হত, ঠিক সেগুলোরই গতি শেষ মুহূর্তে কি করে যেন উল্টে যেত। বেকসুর খালাস পেয়ে যেত আসামী। ড্যানিয়েলসের সঙ্গী ছিলেন একজন, অ্যাডলফ জেঙ্গার। ব্যবসায়িক অংশীদার। তিনিও নাম করা আইনজীবী, কিন্তু ড্যানিয়েলসের অগাধ জ্ঞান, যোগ্যতার তুলনায় অনেক পিছনে পড়ে ছিলেন তিনি। কোন তুলনাই হত না ওদের। কিছু কিছু মামলার কথা আমি জানি। বেশিদিন নয়, এই ধরো আট-দশ বছর আগের কথা। রীতিমত অঘটন ঘটিয়ে দিতেন ভদ্রলোক কোর্টে।' আঙুলের কর গুনল মাসুদ রানা। 'ছ'বছর পাঁচ মাস হলো মারা গেছেন উইলিয়াম ওয়ার্ড ড্যানিয়েলস।'

'আপনার সঙ্গে তাঁর পরিচয় হলো কিভাবে?'

'একটা জটিল মামলায় তাঁর সাহায্য নিতে হয়েছিল আমাকে সেই সময় পরিচয়। সে দশ বছর আগের কথা।'

'তাই?' বলল শওকত।

'হ্যাঁ।' আবার সিগারেট ধরাল রানা। 'মৃত্যুর মাস দেড়েক আগে একদিন গভীর রাতে এসেছিলেন ড্যানিয়েলস আমার কাছে। খুব গোপনে।' শ্রাগ করল ও। 'কিন্তু ব্যাপারটা যে গোপন ছিল না, এই অগ্নিকাণ্ডই তার প্রমাণ

আবার ধাঁধায় পড়ে গেল শওকত। 'গভীর রাতে, গোপনে…কেন?'

সামনে ঝুঁকে টেবিলে দুই কনুইয়ের ভর রেখে বসল মাসুদ রানা দু'হাত এক করে মুঠো পাকিয়ে থুতনি রাখল তার ওপর। 'আমার জিম্মায় কিছু কাগজপত্র রেখে যেতে।'

'কিসের কাগজপত্র?'

মুহূর্তের জন্যে আনমনা হয়ে পড়ল রানা। 'জানি না। কোনদিন হয়তো জানা হবেও না। নেই তো সে সবের কিছু, কি করে জানব? সব নিয়ে গেছে।'

চুপ করে থাকল শওকত।

'গলার ক্যান্সারে মারা গেছেন ড্যানিয়েলস যেদিন ডাক্তার তাঁর আয়ুর সময়সীমা প্রকাশ করে, তার পরদিনই আমার সঙ্গে দেখা করতে আসেন তিনি। হাতে ছিল সীলগালা করা বড় একটা প্যাকেট। ভেতরে প্যাড জোড়া প্যাকেট। যথেষ্ট বয়স হয়েছিল ভদ্রলোকের, পঁচাত্তরের মত। তার ওপর ক্যান্সারের আক্রমণ, ভীষণ দুর্বল হয়ে পড়েছিলেন মৃত্যুর আগে। কথা বলতেন ফ্যাঁস ফ্যাঁস করে, সব বোঝা যেত না স্পষ্ট। মোটা ছড়ির সাহায্য ছাড়া হাঁটতে পারতেন না; তারপরও এক পা যেতে দু'মিনিট জিরিয়ে নিতে হতো। আমার হাতে প্যাকেটটা প্রায় জোর করে গুঁজে দিয়েছিলেন ড্যানিয়েলস।'

'জোর করে কেন?'

'ওর মধ্যে একটা উইল ছিল, আর ছিল দুটো চিঠি। বিষয়টা বেশ জটিল, তাছাড়া কোর্ট-কাচারীর ব্যাপার, তাই প্রথমে নিতে চাইনি আমি'

'কোর্ট-কাচারীর ব্যাপার এখানে কেন নিয়ে এলেন তিনি?'

'বলছি। আজকের পত্রিকা নিশ্চই দেখার সুযোগ পাওনি তুমি?'

'সময় পেলাম কোথায়?'

'ঠিক। আমিও পেতাম না যদি তুমি জোর করে আমাকে বাসায় না পাঠাতে। সৌভাগ্য বা দুর্ভাগ্য যা-ই হোক, দেরিতে হলেও নিউ ইয়র্ক টাইমসে চোখ বোলাবার সুযোগ হয়েছে আমার। ওতে খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা খবর ছিল আমার জন্যে।'

'আপনার জন্যে?'

'হ্যাঁ।'

'কি খবর?'

'কোটিপতি স্যান্ডলার পরিবারের শেষ ওয়ারিশ, ভিক্টোরিয়া স্যান্ডলারের মৃত্যুর খবর উইলিয়াম ওয়ার্ড ড্যানিয়েলস ছিলেন স্যান্ডলারদের ঘনিষ্ঠ পারিবারিক বন্ধু-কাম-অভিভাবক। বহু বছর ওদের হয়ে মামলা-মোকদ্দমা লড়েছেন ড্যানিয়েলস, সাহায্য করেছেন ওদের নানানভাবে। ওদের যত সম্পত্তি জমি-জমা ইত্যাদি আছে, সবকিছুর দলিল ছিল তাঁর জিম্মায়। ভিক্টোরিয়া স্যান্ডলার অপ্রকৃতিস্থ ছিলেন বলে ওসব নিজের কাছে রেখে দিয়েছিলেন ড্যানিয়েলস হয়তো তাঁকে স্যান্ডলার এস্টেট পরিচালনার দায়িত্ব দিয়ে গেছেন ভিক্টোরিয়ার ছোট ভাই আর্থার স্যান্ডলার, তাঁর মৃত্যুর আগে, ঠিক জানি না আমি। '৬৪ সালে ম্যানহাটনে অজ্ঞাতপরিচয় জনাকয়েক বন্দুকধারীর গুলিতে নিহত হন আর্থার স্যান্ডলার ম্যানসনের সামনে।

'সে যাই হোক। সে রাতে ড্যানিয়েলস নিজে থেকেই এ সব তথ্যের কিছু কিছু আমাকে জানান। প্রশ্ন করলে হয়তো বিস্তারিত জানা যেত, কিন্তু কথা বলতে ভদ্রলোকের ভীষণ কষ্ট হচ্ছে দেখে বিশেষ জোর করিনি আমি। যেটুকু বলতে পেরেছেন সেটুকু শুনেই সন্তুষ্ট থাকতে হয়েছে আমাকে। ড্যানিয়েলস আমাকে একান্ত অনুরোধ করেন, আমি যেন খামটা আমার নিরাপদ জিম্মায় রাখি আমি যত এসব ঝামেলা রাখতে পারব না বলি, তিনিও ততই নাছোড়বান্দার মত অনুনয়-বিনয় করতে থাকেন। শেষ পর্যন্ত আর না পেরে নিলাম ওটা।'

'কিন্তু রানা এজেন্সি কেন...'

'সেটাই বলছি এখন। ড্যানিয়েলসের মতে, তাঁর ক্যান্সারের বিষয়টা জানাজানি হওয়ার পর তাঁকে ঘিরে বেশ কিছু রহস্যময় ঘটনা ঘটতে শুরু করে। সারাক্ষণ কারা যেন অনুসরণ করে তাঁকে, যেখানে যান, এমন কি ডাক্তারের কাছে গেলেও পিছু লেগে থাকে তারা। খুব যে টাকা-পয়সার মালিক ড্যানিয়েলস তেমনও নয়। স্যান্ডলারদের দলিল দস্তাবেজ ছাড়া সেরকম মূল্যবান কিছু ছিলও না তাঁর কাছে তাই ড্যানিয়েলস সন্দেহ করলেন ওরা হয়তো ওগুলোই কবজা করার ফিকিরে লেগেছে।

'ভাবনায় পড়ে গেলেন অ্যাটর্নি। আর কোন ঘনিষ্ঠ আইন-জীবীকে স্যান্ডলার এস্টেট পরিচালনার পাওয়ার অভ অ্যাটর্নি দেবেন, সাহস হয় না হয়তো শেষ পর্যন্ত রক্ষকই ভক্ষক হয়ে দাঁড়াবে। আইনজীবীদের মধ্যে নাকি খুব প্রচলিত

কাল পুরুষ-১

একটা প্রবাদ আছে, "তুমি ছোট আইনজীবী হও, বা বড়, তোমার সহকর্মী আইনজীবীকেও কখনও বিশ্বাস কোরো না। কখনও না" ব্যাংকের ভল্টে রাখবেন, সে ভরসাও হয় না শেষ পর্যন্ত কোন পথ না পেয়ে অনেক ভেবেচিন্তে রানা এজেন্সির শরণাপন্ন হন ড্যানিয়েলস।'

'তারপর?'

'আমাকে তিনি অনুরোধ করে গেছেন, ভিক্টোরিয়া স্যান্ডলারের মৃত্যুর পর যেন আমি খামটা খুলি। ওর মধ্যে আরও দুটো ছোট খাম ছিল। একটায় আমাকে লেখা ড্যানিয়েলসের চিঠি ছিল। অন্যটায় ছিল তাঁর প্রাক্তন ব্যবসায়িক পার্টনার র‍্যাডলফ জেঙ্গারকে লেখা আরেকটা চিঠি।'

'তার মানে আপনাকে ওগুলো গছানোর জন্যে পুরোপুরি তৈরি হয়েই এসেছিলেন ড্যানিয়েলস!'

'নিশ্চই আগেই বলেছি কাজটা আমি নিতাম না। তারপরও নিয়েছি, ড্যানিয়েলসের একটা সদিচ্ছা আছে অনুমান করে।'

'কি সদিচ্ছা?'

'জানি না। সেটা সঠিক সময়ে খাম খুলে আমাকে লেখা তাঁর চিঠি পড়ে জানার কথা ছিল। ভিক্টোরিয়া স্যান্ডলারের মৃত্যুর পর কিন্তু… কথায় কথায় সেদিন ড্যানিয়েলস বলেছিলেন, "সারাজীবন একের পর এক পাপ করেছি; মৃত্যুর আগে অন্তত একটা ভাল কাজ করে যেতে পারলাম, এই বিশ্বাস নিয়ে শান্তিতে মরতে চাই আমি।" '

'সেই ভাল কাজটা কি?'

'স্যান্ডলারদের দলিলপত্রের নিরাপত্তা বিধান করা এবং বিশ্বস্ত কারও কাছে হস্তান্তর করে যাওয়া।'

'ও!'

'আমার মনে হয় ওতে এমন কিছু ছিল যা ভিক্টোরিয়ার মৃত্যুর আগে জানাজানি হোক চাননি ড্যানিয়েলস। ভিক্টোরিয়ার মৃত্যু-পরবর্তী সময়ের সঙ্গে হয়তো কোন যোগসূত্র…'

'আমি অন্য একটা সম্ভাবনার কথা ভাবছি, মাসুদ ভাই

'কি?'

'সেই খামটা আজই খোয়া গেছে কেন ভাবছি আমরা?'

চোখ বুজল রানা। 'বলে যাও।'

'কাজটা আরও আগেই তো ঘটিয়ে থাকতে পারে কেউ মহিলার মৃত্যুর খবর পাওয়ার পর আগুনটাই কেবল লাগানো হয়েছে! কাজটা যে বা যারা করেছে, তারা অবশ্যই জানত কখন প্যাকেটটা খুলবেন আপনি, তাই সময়মত শুধুই অগ্নিকাণ্ডের আয়োজন করেছে ওরা আমাদের বিভ্রান্ত করার জন্যে হতে পারে না? আজকের কাগজে বেরিয়েছে মহিলার মৃত্যুর সংবাদ, অর্থাৎ গতকাল মৃত্যু হয়েছে তাঁর। আগুনটাও লেগেছে কাল ভোর রাতেই।'

'কারেক্ট,' চিন্তিত ভঙ্গিতে মাথা দোলাল রানা 'হতে পারে। ড্যানিয়েলসের স্যান্ডলারদের দলিল আমার হাতে তুলে দেয়ার খবর যখন জানাই ছিল, তখন ওটা

নিশ্চই অনেক আগেই হাতিয়ে নেয়া হয়েছে। নিতে যখন হবেই, শুধু শুধু ফেলে রেখে বেহাত হতে দেয়ার ঝুঁকি নেয়া কেন? ঠিক বলেছ, শওকত। আগেই লোপাট করা হয়েছে ওগুলো। এবং আমাদের ভুল ভাবতে সাহায্য করার জন্যে আজ লাগানো হয়েছে আগুন। সে না হয় হলো। কিন্তু স্যান্ডলার পরিবারের নিজস্ব সম্পত্তির দলিল চুরি করে কার কি লাভ হবে বুঝতে পারছি না।'

'কারও হবে নিশ্চই কিছু। নইলে কেন ও-কাজ করতে যাবে?'

'ঝামেলা! জানার চেষ্টা করতে হবে কি ছিল ওই দলিলের বক্তব্য

'কি করে জানবেন?'

'অ্যাডলফ জেঙ্গারের সঙ্গে দেখা করব আমি।'

'ও হ্যাঁ, তাই তো! কিন্তু সে আছে না মরে গেছে কে জানে!'

'জানতে হবে।'

'কোথায় থাকেন ভদ্রলোক?'

'নানটুকেট। ম্যাসাচুসেটস।'

আরও একটা সিগারেট ধ্বংস করল চিন্তিত মাসুদ রানা। অন্য একটা বিষয় নিয়ে ভাবছে ও। ভাবছে ওরই অ্যাপার্টমেন্ট হাউসের সামনে এক যুবকের খুন হওয়ার ব্যাপারটা নিয়ে। মনে আছে, জ্যাকবাসের ফোন পেয়ে সাড়ে তিনটায় বেরিয়েছে রানা বাসা থেকে। আর প্রায় একই সময় খুন হয়েছে যুবকটি ভেবে দেখার মত বিষয়। প্রায় একই সময় বাড়ির পিছনের গলি দিয়ে বেরিয়ে এসেছে সে আর ওই যুবক বেরিয়েছে সামনে দিয়ে। যুবকের মৃত্যু সম্পর্কে খবর নিতে হবে, ভাবল রানা। আপাতত থাক সে চিন্তা।

'কেবিনেটের ওপরের ড্রয়ারে রেখেছিলাম আমি খামটা,' আবছা ইঙ্গিতে নিজের ফাইল কেবিনেট দেখাল রানা। 'বেশ কয়েক বছর আগের কথা, প্রায় ভুলেই গিয়েছিলাম। তবে ওখানেই যে ছিল তাতে কোন সন্দেহ নেই আমার নেই খামটা। সব আছে, কেবল ওটা নেই।'

চোখ কুঁচকে পায়ের দিকে তাকিয়ে কি যেন ভাবছে শওকত। ডান পায়ের তালু দিয়ে মৃদু থপ থপ শব্দে তাল ঠুকছে মেঝেতে 'আমাদের মধ্যে কি কোন ফুটো আছে? বাইরের কারও পক্ষে এখান থেকে কিছু সরানো কি করে সম্ভব?'

'ভাল প্রশ্ন করেছ,' বলল রানা। 'এসো, বিষয়টা নিয়ে আরেকটু খোলাখুলি আলোচনা করা যাক।'

তিন

দু'দিন পর।

বিকেল চারটা। নয় নম্বর পার্ক অ্যাভিনিউ সাউথ, রানা এজেন্সির গেটের সামনে এসে দাঁড়াল একটি ট্যাক্সি। ভেতর থেকে নামল চব্বিশ-পঁচিশ বছরের এক যুবতী। উচ্চতা মাঝারি। পরনে রয়্যাল ব্লু স্কার্ট, কলারওয়ালা হালকা নীল প্রিন্ট ব্লাউজ, তারওপর দামী উটের পশমের কোট। গলায় পেঁচানো আছে সাদা

স্কার্ফ। কাঁধে বড়সড়, পেট মোটা একটা ব্যাগ।

ট্যাক্সি ভাড়া মিটিয়ে ঘুরে দাঁড়াল মেয়েটি। গেট পেরিয়ে দৃঢ়পায়ে ঢুকে পড়ল ভেতরে। এক মিনিট পর শাখা প্রধান শওকতের সঙ্গে মাসুদ রানার বন্ধ দরজার সামনে দেখা গেল যুবতীকে। বিনা বাক্য ব্যয়ে তাকে রানার রুমে ঢুকিয়ে দিয়ে ফিরে গেল শওকত। ভেতরে এসে দ্বিধান্বিত ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে থাকল মেয়েটি। ব্যস্ত মাসুদ রানাকে দেখল ভাল করে।

কোট খুলে রেখেছে মাসুদ রানা। গলায় টাই নেই। চুল এলোমেলো। শার্টের হাতা তুলে কনুইয়ের ওপর গোটানো। হাত নোংরা। মেয়েটির অপ্রস্তুত হওয়ার কারণ বুঝতে কয়েক সেকেণ্ড সময় লাগল রানার। লজ্জিত হাসি দিল ও। 'দুঃখিত। অফিসে হঠাৎ একটা ঝামেলা বেধে যাওয়ায় এলোমেলো অবস্থায় আছি আমরা। কিছু মনে করবেন না, আপনি আমার কাছেই এসেছেন?'

'হ্যাঁ,' রানার চোখে চোখ রেখে বলল মেয়েটি। 'যদি আপনি সত্যি মাসুদ রানা হয়ে থাকেন।'

খেয়াল করল ও, ব্রিটিশ অ্যাকসেন্টে কথা বলছে যুবতী হাসল 'আপনার সন্দেহ হলে আমার বার্থ সার্টিফিকেট, পাসপোর্ট, সব দেখাতে পারি।'

মৃদু হাসি ফুটল যুবতীর মুখে। 'তার কোন দরকার নেই।'

'বাঁচালেন! দুটোর একটাও এ মুহূর্তে সঙ্গে নেই কি না! আপনি বসুন, প্লীজ। আমি আসছি।' দ্রুত পায়ে অ্যাটাচড বাথরুমে গিয়ে ঢুকল রানা। তিন মিনিট পর চেহারা ভদ্রোচিত বানিয়ে বেরিয়ে এল। গদিমোড়া আর্ম চেয়ারে পিঠ খাড়া করে বসে আছে মেয়েটি।

'মনে হয় অসময়ে এসে ঝামেলায় ফেলে দিয়েছি আপনাকে?' বলল সে

'ও নিয়ে ভাববেন না।' মেয়েটির মুখোমুখি নিজের প্রকাণ্ড সুইভেল চেয়ারে বসল মাসুদ রানা।

'অফিস বদল করছেন?'

'না। নতুন করে সাজাবার কাজ করছি।'

'তাহলে তো সত্যিই অসুবিধায় ফেলে দিলাম দেখছি!' আনমনে বলল যুবতী। চোখে-মুখে দ্বিধান্বিত ভঙ্গি ফুটে উঠেছে

একভাবে তার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকল মাসুদ রানা। কথাবার্তা, ভাবভঙ্গি দেখে বোঝা যায় যথেষ্ট শিক্ষিত এ মেয়ে এবং তেমনি চটপটে। চেহারাটা মিষ্টি। এমন চেহারা কোন নামী-দামী ম্যাগাজিনের প্রচ্ছদেই ভাল মানায় 'আপনার আগমনের কারণটা বলবেন দয়া করে?'

'ভিক্টোরিয়া স্যাভলারের মৃত্যু,' রানার মতই ওর চোখে চোখ রেখে বলল যুবতী।

কপালে দুটো চিকন ভাঁজ পড়ল মাসুদ রানার 'মাফ করবেন!'

'ভিক্টোরিয়া স্যাভলারের এক ভাই ছিল, আর্থার স্যাভলার।'

'হ্যাঁ, শুনেছি।' ভাঁজ আরেকটা বাড়ল ওর কপালে। 'তাতে কি?'

'আর্থার স্যাভলার সম্পর্কে কতটুকু জানেন আপনি?'

মাথা দোলাল রানা। বুঝতে পারছে না আলোচনা কোনদিকে গড়াচ্ছে 'প্রায়

কিছুই জানি না। ভদ্রলোক আমেরিকার প্রথম সারির ধনীদের একজন ছিলেন। '৬৪ সালে ম্যানহাটনে নিজের বাসার সামনে নিহত হন, এই পর্যন্তই। কেন?'

'ভুল,' মৃদু কণ্ঠে বলল মেয়েটি

'ভুল! কি, কোনটা?'

'পরেরটা। '৬৪ সালে মারা যায়নি আর্থার স্যান্ডলার।'

'বুঝলাম না।' হতভম্ব চেহারা হলো রানার।

'সবাই যা জানে, পত্রিকায় তার হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে যা বলা হয়েছে, তা সত্যি নয় '৭৬ সালেও আর্থারকে দেখা গেছে বহাল তবিয়তে।'

হেলান দিয়ে বসল রানা। তীক্ষ্ণ হয়ে উঠেছে চাউনি। দু'হাত বুকে বেঁধে চেয়ে আছে মেয়েটির দিকে। 'আপনি তা জানেন কি করে?'

'সে এক লম্বা কাহিনী।'

'হতেই হবে,' ওপর-নিচে মাথা দোলাল ও 'তাতে কোন সন্দেহ নেই আমার।'

'শুনতে চান সে কাহিনী?'

'অনুমান করি ওটা শোনাবার জন্যেই এখানে পায়ের ধুলো দিয়েছেন আপনি '

হাসির ভঙ্গি করল যুবতী। 'হ্যাঁ, তা ঠিক।'

'তাহলে বোধহয় তাড়াতাড়ি বলে ফেলাই ভাল ' সিগারেট প্যাকেটের দিকে হাত বাড়াতে গিয়েও থেমে গেল রানা।

'গো অ্যাহেড,' ব্যাপারটা লক্ষ করে মাথা ঝাঁকাল মেয়েটি। 'কোন অসুবিধে নেই '

'ধন্যবাদ কফি?' মেয়েটি কে হতে পারে ভেবে পাচ্ছে না রানা, তবে তার আগমনের কারণ খানিকটা আন্দাজ করতে পেরেছে বলে মনে হলো।

'হ্যাঁ, প্লীজ!'

ইন্টারকমে দু'কাপ কফি পাঠাতে বলে সিগারেট ধরাল রানা। 'এবার বলুন আপনার কাহিনী, শুনি। তার আগে একটা প্রশ্ন, এসব আমাকেই কেন শোনাতে হবে ভাবলেন আপনি?'

'আমি ভাবিনি। ভিক্টোরিয়ার মৃত্যুর পর আপনার সঙ্গে আমাকে দেখা করার নির্দেশ দিয়ে গেছেন উইলিয়াম ওয়ার্ড ড্যানিয়েলস।'

'আই...সী!' চিবিয়ে চিবিয়ে বলল মাসুদ রানা। কি যেন ভাবল একটু আনমনা

কফি এল নীরবে যার যার কাপে চুমুক দিল ওরা।

'শুরু করতে পারি?' বলল মেয়েটি

'হ্যাঁ, নিশ্চই!'

'১৯৬৪ সালে আর্থারের হত্যাকাণ্ডের খবরটা ছিল একটা ডাহা মিথ্যে। মানে আমি বলতে চাইছি, হত্যাকাণ্ড একটা ঘটেছিল ঠিকই। দিন এবং স্থানের ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই।'

'তাহলে সন্দেহটা কোথায়?'

'নিহত ব্যক্তিটির ব্যাপারে। সে আর যে-ই হোক, আর্থার ছিল না। আমি নিশ্চিত জানি। ১৯৭৬ সালে তাকে স্বচক্ষে দেখেছি আমি।'

'ভদ্রলোককে আপনি ভালই চেনেন মনে হয়!' ধাঁধায় পড়ে গেল রানা। ঘর পোড়ার মধ্যে আলু পোড়াতে এসেছে কি না এ মেয়ে কে জানে!

অদ্ভুত এক হাসি ফুটল যুবতীর সুন্দর মুখে। 'হ্যাঁ। শুধু ভাল নয়, খুব ভাল চিনি। আমি তার মেয়ে।'

চমকে উঠল মাসুদ রানা। 'কি বললেন!'

'অবাক হবেন না। ঘটনা সত্যি। আর্থার স্যান্ডলার আমার জন্মদাতা।'

'কিন্তু...'

'এর মধ্যে কোন কিন্তু নেই, মিস্টার রানা। ১৯৫৯ সালের অক্টোবরে আমার মাকে বিয়ে করে আর্থার স্যান্ডলার। ১৯৬০ সালের আগস্টে আমার জন্ম। মার সঙ্গে আর্থারের পরিচয় হয় যুদ্ধের সময়। মার বয়স তখন সবে চোদ্দ। দু'জনের বয়সের বেশ ব্যবধান ছিল, এবং অনেক দেরিতে বিয়ে হয়েছিল ওঁদের।'

'কোন যুদ্ধের কথা বলছেন আপনি?'

'দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ।'

'আমার জানামতে আর্থার স্যান্ডলার বিয়ে করেননি। ১৯৬৪ সালে যখন নিহত হন তিনি, তখনই আইনগত ফয়সালা হয় যে তাঁর কোন সন্তান বৈধ বা অবৈধ, কোনটিই নেই। যে কারণে ভিক্টোরিয়া স্যাণ্ডলার তাঁর যাবতীয় সম্পত্তির....'

'উত্তরাধিকারী বলে স্বীকৃতি লাভ করেন,' মাসুদ রানার বক্তব্য শেষ করল মেয়েটি টেবিলের ওপর রাখা ব্যাগটা খুলল সে। একটা কাগজ বের করে এগিয়ে দিল ওর দিকে

'কি এটা?'

'আমার বার্থ সার্টিফিকেট ১৯৬০ সালের ১৬ আগস্ট ইংল্যাণ্ডের এক্সিটারে জন্ম আমার। চেক করে দেখুন। ওঁদের বিয়ের ব্যাপারটা গোপন রাখা হয়েছিল।'

'এতই গোপন যে এত বছরেও কেউ তা জানতে পারেনি?' কাগজটায় চোখ বোলাতে লাগল মাসুদ রানা। এ জিনিস জাল নয়, দেখেই বুঝল ও, নিঃসন্দেহে খাঁটি।

'ঠিক, এতই গোপন।'

'কিন্তু মিস...ইয়ে, নাকি মিসেস...?'

'বিয়ে হয়নি আমার। আমার নাম ম্যাকঅ্যাডাম। লেসলি ম্যাকঅ্যাডাম।'

'ম্যাকঅ্যাডাম? স্যান্ডলার নয়?'

'এখনও নয়। তবে হতে এসেছি।'

'স্যান্ডলার পরিবারের উত্তরাধিকারী...'

'হ্যাঁ। সে দাবি নিয়ে শিগ্গিরই কোর্টে যাব আমি।'

'কিসের ভিত্তিতে দাবি জানাবেন?'

'যে সব ডকুমেন্টস আপনার জিম্মায় রেখে গেছেন উইলিয়াম ওয়ার্ড ড্যানিয়েলস, সে সবের ভিত্তিতে। ওর সঙ্গে আপনাকে লেখা তাঁর একটা চিঠি

ছিল, সেটা পড়েছেন নিশ্চই? ভিক্টোরিয়ার মৃত্যুর পর খামটা খোলার কথা ছিল আপনার।'

এই সেরেছে! ভেতরে ভেতরে আস্ত একটা ডিগবাজি খেয়ে উঠল মাসুদ রানা। সর্বনাশ! এখন কি হবে? উত্তরটা একটু ঘুরিয়ে দেয়ার চেষ্টা করল ও 'কিন্তু ওতে যে-কেউ এসে দাবি করলেই ডকুমেন্টসগুলো তাকে দিয়ে দেয়ার কোন নির্দেশ নেই। এনি ওয়ে, তখন বললেন ভিক্টোরিয়া স্যান্ডলারের মৃত্যুর পর আমার সঙ্গে আপনাকে দেখা করতে বলেছেন ড্যানিয়েলস, তাই না?'

'হ্যাঁ।'

'কি ভাবে খবরটা আপনাকে জানিয়েছিলেন ভদ্রলোক? চিঠির মাধ্যমে?'

মাথা দোলাল লেসলি। 'না। টেলিফোনে।'

'আই সী!'

'আমি যে-কেউ নই, মিস্টার মাসুদ রানা। আমি আর্থার স্যান্ডলারের সন্তান।'

'জানি। শুনেছি। কিন্তু আগে সেটা আপনাকে প্রমাণ করতে হবে আমার কাছে। কোর্ট তো পরের কথা। এই বার্থ সার্টিফিকেট জাল করা কঠিন কিছু নয়, আপনিও তা জানেন। হরহামেশা জাল হচ্ছে এসব। তার মানে আমি বলছি না যে এটা আসলেই ভুয়া।'

সুবোধ মেয়ের মত মাথা দোলাল লেসলি ম্যাকঅ্যাডাম। 'আমি বুঝেছি

'আপনাকে সত্যিকার অর্থে প্রমাণ করতে হবে যে আপনি লেসলি ম্যাকঅ্যাডাম প্রমাণ করতে হবে কাদের সন্তান আপনি। আরও প্রমাণ করতে হবে আর্থার স্যান্ডলারের সঙ্গে আপনার মার বিয়ে হয়েছিল। এ ধরনের এক-আধটা সার্টিফিকেট দেখিয়ে কোর্ট দূরে থাক, আমাকেও প্রভাবিত করতে পারবেন না আপনি।'

'জানি।'

চুপ করে থাকল মাসুদ রানা। পর্যবেক্ষণ করছে মেয়েটিকে। ব্যাগ থেকে ফিতে বাঁধা এক গাদা চিঠি বের করল সে এবার। বাঁধন খুলে সেগুলো ঠেলে দিল সামনে।

'এগুলো দেখুন। মাকে লেখা আর্থার স্যান্ডলারের চিঠি।'

একটা বিষয় খেয়াল করল মাসুদ রানা, মাকে ঠিকই মা বলছে মেয়েটি, অথচ বাবার বেলায় জন্মদাতা আর্থার স্যান্ডলার অথবা আর্থার ইত্যাদি বলে চালাচ্ছে তা-ও বেশ তাচ্ছিল্যের সঙ্গে। কেন? নিজেকেই প্রশ্ন করল ও

'আমার মার সঙ্গে আর্থার স্যাণ্ডলারের পরিচয় হয় যুদ্ধের শেষভাগে, ১৯৪৪ সালে। তখন থেকে শুরু করে ১৯৬৪ সাল পর্যন্ত বেশ কিছু চিঠি লিখেছে সে মাকে। সব এখানে নেই অবশ্য। কয়েকটা নমুনা নিয়ে এসেছি কেবল। প্রয়োজনে বাকিগুলোও দেখানো যাবে। যদি ইচ্ছে করেন আপনার পছন্দের এক্সপার্ট দিয়ে ওগুলোর হাতের লেখা ভেরিফাই করিয়ে নিতে পারেন। তবে কোন অবস্থাতেই চিঠিগুলো হস্তান্তর করব না আমি। আমার কাছেই থাকবে ওগুলো।'

চোখ নামিয়ে স্তূপটার দিকে তাকাল মাসুদ রানা কোন মন্তব্য করল না। ভেতরে একটু একটু করে আগ্রহ বাড়ছে, টের পাচ্ছে রানা। হাত বাড়িয়ে

চিঠিগুলো কাছে টেনে নিল। খামগুলো আসল রং হারিয়ে বাদামী হয়ে গেছে দেখলেই বোঝা যায় বেশ পুরানো। বিশেষ করে স্ট্যাম্পের ওপরকার পোস্টমার্কগুলো তীক্ষ্ণ চোখে পরখ করল ও। আসলের মতই দেখাচ্ছে মনের বিস্ময় মনেই চেপে রাখল রানা।

'আরও একটা জিনিস আছে।' ব্যাগের ভেতর থেকে কালো চামড়ার মলাট বাঁধানো মোটা একটা বই বের করল লেসলি ম্যাকঅ্যাডাম। তার প্রতিটি পাতার কিনারা সোনালী রং করা দেখা মাত্রই অনুমান করল রানা ওটা কি। মলাটে বড় সোনালী হরফে HOLY BIBLE লেখা।

'ওটা খুলুন,' বলল মেয়েটি। 'সামনের কভারের ভেতর দিকটা দেখুন

চিঠিগুলো এপাশে ঠেলে দিল মাসুদ রানা। বাইবেলটা খুলল সঙ্গে সঙ্গে দৃষ্টি স্থির হয়ে গেল ওর। কোন কারণ নেই, তবু কেন যেন শীত শীত লেগে উঠল। ওর ফ্রন্ট কভারের সঙ্গে বাঁধানো আছে একটা ম্যারেজ সার্টিফিকেট নোটারাইজড। বিয়ের তারিখটা লক্ষ করল মাসুদ রানা। অক্টোবর ২০, ১৯৫৯। বর আর্থার স্যান্ডলার, ঠিকানা নিউ ইয়র্ক। কনে এলিজাবেথ অ্যান চ্যাটসওয়ার্থ, ঠিকানা টিভারটন, এক্সিটার।

উত্তর ফেনউইকের ডেভন টাউনশিপের সেন্ট জর্জে'স চ্যাপেলে এ বিয়ে অনুষ্ঠিত হয় বিয়ের দু'জন সাক্ষীর সই আছে সার্টিফিকেটে। তৃতীয় সইটা রয়েছে একদম নিচে, ডানদিকে। করেছেন জোনাথন ফিলিপ মূর, ডি. ডি। সেন্ট জর্জে'স চ্যাপেলের প্যাসটর পুরো দু'মিনিট ব্যয় করল রানা সার্টিফিকেটটার পিছনে তারপর চোখ বোলাল বাইবেলের টাইটেল পেজে রোমান হরফের ঝকঝকে ছাপা বলছে ANNO DOMINI MCMXLII. প্রিন্টেড ইন গ্রেট ব্রিটেন, ১৯৫৮।

'আর কিছু আছে?' চোখ তুলল রানা।

'আপনি নিশ্চই ভাবছেন এত বছর কোথায় ছিলাম আমি? এখন কোত্থেকে এসে হাজির হলাম, তাই না?'

'তা বলতে পারেন।'

কাঁধ পর্যন্ত দীর্ঘ বাদামী চুলগুলো দুই কানের পিছনে গুঁজল লেসলি ম্যাকঅ্যাডাম। তারপর রানা কিছু বুঝে ওঠার আগেই ব্লাউজের কলার ও তার নিচের বোতামটা খুলে ফেলল টপাটপ স্কার্ফের নট খুলল সে, আলতো টানে গলা থেকে নামিয়ে আনল ওটা। চমৎকার গড়নের ফর্সা গলাসহ বুকের ওপরের অংশ উন্মুক্ত হয়ে পড়ল লেসলির।

'এবার দেখুন, মিস্টার রানা,' গলা উঁচু করল মেয়েটি 'ভাল করে দেখুন। আরেকটু ঝুঁকে, প্লীজ!'

চোখ কোঁচকাল মাসুদ রানা। টেবিলের প্রান্তে বুক বাধিয়ে উবু হয়ে তাকাল মেয়েটির গলার দিকে। গলার ঠিক মাঝখানে সূক্ষ্ম একটা দাগ দেখা গেল। কাটার দাগ, পুরো গলা ঘিরে আছে ওটা লেসলির। ধপধপে সাদা চামড়ার ওপর বেখাপপা লাগছে ফ্যাকাসে লাল দাগটা।

'কিসের দাগ ওটা?'

'পিয়ানোর তার, মিস্টার রানা।' ঠিকঠাক হয়ে নিল লেসলি ম্যাকঅ্যাডাম

'বুঝলাম না

'কন্যাকে দেয়া আর্থার স্যান্ডলারের উপহার এটা! ১৯৬৯ সালের শেষ দিকে, আমার বয়স যখন নয়, তখন এই উপহারটা দিয়েছিল সে আমাকে। কল্পনা করুন, নয় বছরের একটি শিশুকে তারই জন্মদাতা গলায় পিয়ানোর তার পেঁচিয়ে হত্যা করতে উদ্যত। একটু কল্পনা করুন শিশুটির তখনকার মানসিক অবস্থা।'

চুপ করে চেয়ে আছে রানা মেয়েটির দিকে; মুখে কথা নেই। কল্পনা করছে পূর্ণ বয়স্ক এক পুরুষের হাতের প্রচণ্ড টানে একটু একটু করে শিশুটির গলার নরম মাংসের মধ্যে দেবে যাচ্ছে ক্ষুরধার পিয়ানোর তার, ছটফট করছে সে বিস্ফারিত চোখে, অসহায়ের মত তাকিয়ে আছে খুনীর দিকে। নীরবে কেটে গেল কিছু সময়।

লেসলি বলে উঠল হঠাৎ, 'আপনার রুমে আমি আরসনের গন্ধ পাচ্ছি!'

'কি বললেন?'

'আগুন লেগেছিল আপনার অফিসে?'

উত্তর দিল না মাসুদ রানা।

'জানি।' আপনমনে মাথা দোলাল লেসলি ম্যাকঅ্যাডাম 'যেখানেই আর্থার স্যান্ডলার, সেখানেই ধ্বংসের গন্ধ পাওয়া যায়।'

'অর্থাৎ?'

ড্যানিয়েলসের রেখে যাওয়া ডকুমেন্টসগুলোর জন্যেই আগুন আপনাকে খুঁজে নিয়েছে, মিস্টার রানা। আমি নিশ্চিত জানি।'

'দেখুন, মিস্...'

'আমাকে লেসলি ডাকবেন।'

'ধন্যবাদ আপনাকেও তাহলে আমার নামের আগে "মিস্টার" বাদ দিতে হবে।'

অদ্ভুত সুন্দর হাসি ফুটল মেয়েটির মুখে 'ডান।' সামান্য বিরতি দিয়ে আবার মুখ খুলল লেসলি। 'আমি উচ্চ শিক্ষিত, প্রায় পণ্ডিত বলা চলে আমাকে এবং ভাল আর্টিস্টও বটে তারপরও আমার দেহে রয়েছে ভয়ঙ্কর এক ক্রিমিনালের রক্ত, মাসুদ রানা। কেন কি হয় আন্দাজ করে নেয়ার অদ্ভুত এক ক্ষমতা আছে আমার; ওটা আছে বলেই আজও দম নেই আমি চোখ মেলে দেখতে পাই সুন্দর এই গ্রহটিকে। নইলে সেই নয় বছর বয়সেই মৃত্যু হতো আমার। আপনি লক্ষ করেছেন নিশ্চই, আমি বলেছি ১৯৬৯ সালে আমাকে হত্যা করতে চেয়েছিল আর্থার স্যান্ডলার?'

মাথা দোলাল মাসুদ রানা

'অথচ সবাই, আপনিও জানেন ১৯৬৪ সালে খুন হয়েছে সে

'এখনও তাই জেনে বসে আছি আমি, লেসলি। যতক্ষণ না আপনি প্রমাণ করতে পারছেন আপনার কথা সঠিক '

'সে জন্যে খানিকটা সময় ব্যয় করতে হবে আপনাকে। আমার লম্বা কাহিনীটা শুনতে হবে একদম প্রথম থেকে শুনতে হবে সব।'

'আমি প্রস্তুত। আপনি শুরু করতে পারেন '

'বেশ।' সশব্দে দম ছাড়ল লেসলি ম্যাকঅ্যাডাম। মুখ নামিয়ে কিছু সময় দুই হাতের তালু পরীক্ষা করল। কথা গোছাচ্ছে 'আর্থার স্যান্ডলার ছিল এক পেশাদার স্পাই।'

'কি?' বিস্মিত হলো রানা।

'স্পাই। গুপ্তচর। তবে পুব না পশ্চিম, কোন ব্লকের কোন দেশের হয়ে কাজ করত বলতে পারব না।'

'আর্থার স্যান্ডলার গুপ্তচর ছিলেন?' দ্রুত স্মৃতির পাতা ওল্টাতে লাগল মাসুদ রানা। কিন্তু এ লাইনে এমন কোন নাম মনে পড়ল না।

'হ্যাঁ।'

'আপনি কি করে জানলেন?'

'মার মুখে তার কর্মপদ্ধতি সম্পর্কে ছাড়া ছাড়া যেটুকু শুনেছি, তার সাথে নিজের কল্পনা শক্তি মিলিয়ে অনুমান করে নিয়েছি।'

'বুঝলাম।'

'আমার মা খুব ভাল মানুষ ছিলেন। খুব সহজ-সরল গ্রাম্য মেয়ে। লেখাপড়া খুব একটা জানতেন না। যাকে ভালবাসতেন, তার জন্যে প্রাণ দিতে পারতেন, এমন এক মহিলা ছিলেন তিনি। আর তাঁর স্বামী?' করুণ হাসি ফুটল লেসলির মুখে 'প্রাণ কেড়ে নিতে ওস্তাদ ছিল সে, কসাই ছিল আস্ত একটা! আমার মার মত একটা মেয়েকে ত্যাগ করেছিল মানুষটা, ভাবতেও অবাক লাগে অথচ এই মানুষটির সাথে মার পরিচয় হয় ১৯৪৪ সালে। পরিচয় থেকে প্রেম। তারপর তাকে পাওয়ার আশায় দীর্ঘ পনেরোটি বছর অপেক্ষা করেছে আমার দুঃখিনী মা।

'যুদ্ধের সেই সময়টায় এক্সিটারে প্রচুর দেশী-বিদেশী সৈন্য ছিল। ব্রিটিশ, মার্কিন, ক্যানাডিয়ান, ফরাসী ইত্যাদি ছাড়া আরও কয়েক দেশের সৈন্য ছিল আর ছিল নানা দেশের স্পাই। ইউনিফর্মধারী ট্রুপস আর সাদা পোশাকের স্পাইয়ে গিজগিজ করত তখন এক্সিটার।' অন্যমনস্ক হয়ে পড়ল লেসলি ম্যাকঅ্যাডাম অতীতে হারিয়ে গেছে।

১৯৪৪। এক্সিটারের এক রেস্তোরাঁ মালিকের অল্পবয়সী সুন্দরী মেয়ে, এলিজাবেথ অ্যান চ্যাটসওয়ার্থ। মেয়েটি এতিম। জার্মান বিমান হামলায় বছর দু'য়েক আগে বাবা-মা এবং ছোট এক ভাই, সবাইকে হারিয়েছে চোদ্দ বছর বয়স তার বাধ্য হয়ে নিজেকেই রেস্তোরাঁ চালাতে হয় তার এখানে সাধারণত সৈনিকরাই আসে। সাদা পোশাকের কিছু কিছু বিদেশীও আসে। তাদের পরিচয় জানে না এলিজাবেথ, জানার উপায়ও নেই। তবে অনুমান করতে পারে সে সাদা পোশাকের দলে আছে এক যুবক, আমেরিকান। যুবক দীর্ঘদেহী, চমৎকার চেহারা। ছয় মাস নয় মাস পর হঠাৎ একদিন উদয় হয়, কয়েকদিন থাকে এক্সিটারে, তারপর আবার একদিন গায়েব হয়ে যায় হঠাৎ করে। কোন খবর থাকে না দীর্ঘ দিন পর্যন্ত। খেয়াল করেছে অ্যান, সব সময় একাই রেস্তোরাঁয় আসে যুবক, এবং একাই বেরিয়ে যায় কারও সঙ্গে কথা বলে না। যতক্ষণ থাকে, একাই একটা টেবিল দখল করে বসে থাকে দোকান বন্ধ না হওয়া পর্যন্ত বসেই থাকে যুবক, ক্যানের পর ক্যান বীয়ার পান করে আর সারাক্ষণ গভীর চিন্তায়

ডুবে থাকে।

একে প্রথম ওদের ইনে দেখে অ্যান দু'বছর আগে, ১৯৪২ সালে। তখন সে ছোট ছিল, তাই বিশেষ কোন দৃষ্টিতে দেখেনি যুবককে। সে-ও লক্ষ করেনি মেয়েটিকে। কিন্তু দুই-আড়াই বছরে গায়ে-গতরে যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছে অ্যান, তেমনি বেড়েছে চেহারার জৌলুস। ও বুঝতে পারে, যুবকটিও ওর মত নিঃসঙ্গ। ঘন ঘন চার চোখের মিলন হতে থাকে ওদের এই সময়। তারপর একটু হাসি, একটা দুটো কথা। পরিচিত হলো ওরা পরস্পরের সাথে। জানা গেল যুবকের নাম আর্থার স্যান্ডলার।

১৯৪৪ সালের মাঝামাঝি সময়ের কথা। ইউরোপের যুদ্ধের পরিণতি প্রায় নিশ্চিত, এমন সময়, প্রায় তিন মাস পর আচমকা এক্সিটারে এসে উপস্থিত স্যান্ডলার। রাত একটায় দোকান বন্ধ করে বাসায় যাওয়ার জন্যে প্রস্তুত হলো এলিজাবেথ। স্যান্ডলার জানতে চাইল সে তাকে তার বাসায় পৌঁছে দিতে যেতে পারে কি না? খুশি মনে রাজি হলো এলিজাবেথ। দোকানের কাছেই তার বাসা, চার ব্লক দূরে। এলিজাবেথের মনে হলো দেখতে দেখতে ফুরিয়ে গেল পথ। ভদ্রতা করে যুবককে বাসায় আমন্ত্রণ জানাল সে। রাতটা তার আশ্রয়ে থেকে গেল আর্থার স্যান্ডলার।

এক যুবক আর এক কিশোরী, দু'জন সম্পূর্ণ দুই জগতের বাসিন্দা, অথচ বিশ্বের রাজনীতি এক করে দিল ওদের। পরস্পরের প্রেমে হাবুডুবু খেতে লাগল আর্থার ও অ্যান। একে অন্যের সান্নিধ্য পাওয়ার জন্যে উন্মাদ-প্রায় হয়ে উঠল। এক সঙ্গে কাটাতে লাগল দিনের পর দিন, রাতের পর রাত। এলিজাবেথ লক্ষ করল, তাকে নিয়ে যুবকের কোন ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা আছে কি না জানতে চাইলেই গম্ভীর হয়ে যায় আর্থার। আচমকা গভীর চিন্তার আবর্তে ডুবে যায় যেন

কেন অমন হয়ে যায় যুবক, বুঝতে পারে না এলিজাবেথ। এক সময় ওই জাতীয় প্রশ্ন করা বন্ধ করে দেয় সে। যে ভাবে চলছে চলুক, ভাবে সে। ক্ষতি কি? সেবার পুরো এক মাস এক্সিটারে কাটায় আর্থার স্যান্ডলার। দিনগুলো যেন স্বপ্নের ঘোরে কেটে যায় ওদের দু'জনের। দেখতে দেখতে ফুরিয়ে যায় দীর্ঘ একটা মাস। এরপর একদিন এলিজাবেথের কাছ থেকে বিদায় নেয় আর্থার। কথা দিয়ে যায় আবার আসবে সে। তবে কখন তা বলা সম্ভব নয়। সে নিজেই জানে না তা। চলে গেল আর্থার স্যান্ডলার।

দিন কাটে এক এক করে। কিন্তু এলিজাবেথের সময় কাটে না। কিছুই তার ভাল লাগে না। যন্ত্রের মত কাজ করে যায় কেবল। এক একটা দিন যায় আর ক্যালেণ্ডারের পাতায় দাগ কাটে সে। আশার বাতি ক্রমেই নিবু নিবু হয়ে আসে। রেডিওর খবর একটাও মিস করে না সে। মন দিয়ে শোনে সমস্ত সেন্সরড খবর রাতে ক্লান্ত দেহ বিছানায় এলিয়ে দিয়ে নিঃসাড় পড়ে থাকে অ্যান, ঘুম আসে না এক এক করে পাঁচ মাস কেটে যায় এমনি করে।

তারপর একদিন, এক বর্ষণমুখর রাতে, চোখ তুলতেই ভীষণরকম চমকে উঠল এলিজাবেথ দোকানের ভেতর, দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আছে আর্থার স্যান্ডলার। ওর দিকে তাকিয়ে হাসছে মিটিমিটি অন্তর থেকে বুক ঠেলে উঠে

আসা আনন্দ-চিৎকারটা ঠেকানোর কোন চেষ্টাই করল না এলিজাবেথ. হাতে ধরা দামী কফি সেট সাজানো ট্রে-টা খসে গেল। পাগলের মত ছুটে গিয়ে আর্থারের প্রশস্ত বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ল মেয়েটি।

সেবার তিন সপ্তাহ এক্সিটারে ছিল স্যান্ডলার। রাত কাটাত এলিজাবেথের উষ্ণ আলিঙ্গনে। ভোর হলেই উধাও হয়ে যেত কোথায় যেন। সারাদিনে তার দেখা মিলত না। তারপর একদিন চলে গেল সে আবার আসবে বলে এভাবেই চলল দুই বছর। যুদ্ধ শেষ হয়ে গেছে কবেই, অথচ আর্থার স্যান্ডলারের ব্যস্ততা কমে না। কেবলই যায় আর আসে সে, কেবলই যায় আর আসে।

একদিন আর নিজেকে সামাল দিতে পারল না এলিজাবেথ; ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করেই বসল, 'এই যে ঘন ঘন গায়েব হয়ে যাও তুমি, কোথায় যাও?' যদিও প্রশ্ন করার আগেই বুঝে নিয়েছে সে উত্তর পাওয়া যাবে না।

কিন্তু আশ্চর্য! এলিজাবেথকে চমকে দিয়ে বলে উঠল আর্থার, 'অস্ট্রিয়া।'

তার মুখের দিকে বেকুবের মত চেয়ে থাকল মেয়েটি। বুঝতে পেরেছে, সত্যি কথাই বলেছে তার আমেরিকান প্রেমিক। সন্দেহ আগেই করেছিল, উত্তরটা শুনে তা আরও দৃঢ় হলো। তার প্রেমিক একজন স্পাই, বুঝে ফেলল এলিজাবেথ। কিন্তু এ নিয়ে আর কোন প্রশ্ন করল না।

'তুমি বিয়ে করেছ?'

'না,' মাথা দোলাল আর্থার। 'তোমাকেই বিয়ে করব ঠিক করেছি।' পরক্ষণেই অন্যমনস্ক হয়ে পড়ল সে। নিচু কণ্ঠে বিড় বিড় করে বলল, 'কিন্তু আমার প্রাণের কোন নিরাপত্তা নেই, অ্যান।'

সজোরে আর্থারকে আঁকড়ে ধরল এলিজাবেথ। চোখ দিয়ে পানি পড়ছে দরদর করে। এমনি অনিশ্চয়তার মধ্যে কেটে গেল আরও কিছুদিন। তারপর ১৯৪৭ সালে সেই যে গেল স্যান্ডলার, পুরো চার বছর কোন খবর নেই; প্রতীক্ষা করতে করতে পাগল হওয়ার দশা এলিজাবেথের। দুই-চার মাস পর পর এক-আধটা চিঠি আসে স্যান্ডলারের। প্রতিটিতেই থাকে 'খুব শীঘ্রি' আসছি ধরনের আশ্বাস বাণী। অতঃপর ১৯৫১ সালে এল আর্থার।

এলিজাবেথ জানতে চাইল, কেন এত দেরি হলো তার ফিরতে। প্রথমে কিছু জানাতে অস্বীকার করল স্যান্ডলার। পরে অবশ্য বলেছে। 'ভয়ঙ্কর এক বিপদে জড়িয়ে পড়েছি আমি, অ্যান,' তাকে বুকে জড়িয়ে ধরে আদর করতে করতে বলল আর্থার। 'সাঙ্ঘাতিক এক বিপদে পড়েছি। এ থেকে কোনদিন বেরুতে পারব কি না জানি না।'

পরস্পরের আলিঙ্গনে আবদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকল ওরা ঘরের মাঝে। মুখ ফিরিয়ে রেখেছে আর্থার, যাতে তার চোখের পানি দেখতে না পায় এলিজাবেথ এলিজাবেথ টের পেল ঠিকই, তবে তা বুঝতে দিল না আর্থারকে।

সেবার বিদায়ের দিন আর্থার আদর করে বুকে টেনে নিল প্রেমিকাকে বলল, 'যদি ভাগ্য ভাল হয়, বিপদ থেকে উদ্ধার পাই, তাহলে আবার আমাদের দেখা হবে। বিয়ে করে আমেরিকায় নিয়ে যাব আমি তোমাকে।'

ফের চলে গেল আর্থার স্যান্ডলার। এলিজাবেথের কাছে মাঝে মধ্যে চিঠি পাঠাত। তার প্রতিটিতে থাকত, 'আর কয়েক দিনের মধ্যেই আসব', 'খুব তাড়াতাড়ি আসছি' ধরনের পুরানো আশ্বাস। তার আসার আশায় থেকে থেকে চোখে ছানি পড়ে যাওয়ার দশা এলিজাবেথের। অবশেষে এল সে। প্রায় নয় বছর পর। ১৯৫৯ সালের ১৯ অক্টোবর গভীর রাতে। পরদিন ২০ অক্টোবর, এলিজাবেথকে নিয়ে উত্তর ফেনউইকের এক চার্চইয়ার্ডে গেল সে। বিয়ে হলো ওদের সেখানে। আঠারো দিন পর নববধূকে রেখে শেষবারের মত এক্সিটার ত্যাগ করল আর্থার স্যাণ্ডলার আবার উধাও হয়ে গেল। মাসের পর মাস কাটে, কোন খবর নেই তার। দশ মাস পর এক মেয়ের জন্ম দেয় এলিজাবেথ। নাম রাখে তার লেসলি। লেসলি স্যান্ডলার।

আশায় বুক বেঁধে অপেক্ষায় থাকে এলিজাবেথ। বছরের পর বছর কাটে, কোন খবর আসে না আর্থারের। যোগাযোগ করে না সে, চিঠি লেখে না, টেলিফোন করে না। নিজেও আসার নাম করে না।

'তাঁকে ট্রেস করার চেষ্টা করেননি আপনার মা?' মৃদু কণ্ঠে প্রশ্ন করল মাসুদ রানা।

'নিশ্চই!' বলল লেসলি ম্যাকঅ্যাডাম। 'কিন্তু দুই দুর্ভেদ্য দেয়াল পথ রোধ করে দাঁড়ায় তাঁর। একটা ব্রিটিশ দেয়াল, অন্যটা আমেরিকান। আর্থারকে খোঁজাখুঁজি করতে গিয়ে ব্রিটিশ ফরেন অফিসের অনেকের যা-তা মন্তব্য শুনতে হয়েছে আমার মাকে। অনেক নোংরা কথা হজম করতে হয়েছে। কিন্তু মা নাছোড়বান্দা। দিনের পর দিন ধরনা দিতে লাগলেন সেখানে। শেষে হয়তো বোধোদয় হলো ফরেন অফিসের, বুঝল ওরা, মহিলা সহজে ফিরে যাবে না।

'একদিন বড় কর্তার রুমে ডাকিয়ে দীর্ঘ সময় ধরে ধমক-ধামক মারা হলো মাকে। জানিয়ে দেয়া হলো আর্থার স্যান্ডলার নামে কোন আমেরিকানের অস্তিত্ব নেই ব্রিটেনে। ছিলও না কোনদিন। এ নিয়ে আবার সেখানে দেন-দরবার করার চেষ্টা করা হলে সোজা ঘাড় ধরে জেলে পুরে দেয়া হবে মাকে। হতাশ হয়ে ফিরে এলেন তিনি। এবার চেষ্টা করলেন লণ্ডনের আমেরিকান এম্বাসি ও ইউএস আর্মি হেডকোয়ার্টার্সের বড় কর্তাদের ধরে কিছু একটা বিহিত করতে। কিন্তু সেখানেও হলো না কিছু।'

'ওদের আর্থার স্যান্ডলারের সাথে তাঁর বিয়ের সার্টিফিকেটটা দেখাননি তিনি?'

'হ্যাঁ, দেখিয়েছেন। লাভ হয়নি। ওরা বরং ওটা দেখে আরও বেশি দুর্ব্যবহার করেছে মার সঙ্গে। মাকে জানানো হয় এ নামে কোন মানুষ সারা আমেরিকাতেই নাকি নেই। তাঁর মত এক সস্তা বারমেইড যদি আমেরিকান এক মিলিয়নেয়ারকে বিয়ে করার অলীক স্বপ্নের কথা ছড়িয়ে বেড়ায় এভাবে যেখানে-সেখানে, তারা বাধ্য হবে তাঁকে পুলিসে অথবা লণ্ডনের কোন মেন্টাল হাসপাতালের হাতে তুলে দিতে

'তারপর যা হওয়ার তাই হলো। আর্থার স্যান্ডলারের আশা ছেড়ে দিলেন আমার মা। হয়তো তার মৃত্যু হয়েছে, যে আশঙ্কা সে নিজের মুখেই প্রকাশ করেছিল একদিন, এই ভেবে নিজেকে সান্ত্বনা দিতে লাগলেন মা। আমাকে নিজের মত করে বড় করার কাজে মন দিলেন পুরোপুরি। বাসায় আমি, আর

বাইরে ব্যবসা, এর মধ্যে নিজেকে পুরোপুরি গুটিয়ে নিলেন তিনি।'

'আর বিয়ে করেননি?'

'না। করেননি।'

উঠে ঘরের আলো জ্বেলে দিল মাসুদ রানা। সন্ধে হয়ে আসছে ফিরে এসে আসনে বসতে বসতে বলল, 'কফি দিতে বলি?'

'হ্যাঁ, প্লীজ! গলা শুকিয়ে গেছে।'

পাঁচ মিনিট পর আবার শুরু করল লেসলি ম্যাকঅ্যাডাম। 'আমার বয়স চার বছর পুরো হওয়ার আগেই নিউ ইয়র্কে সো-কলড মৃত্যু হলো আর্থার স্যান্ডলারের। ১৯৬৪ সালের এক সকালে, বাসা থেকে বেরিয়ে গাড়িতে ওঠার সময় তিন অস্ত্রধারী গুলি করে ঝাঁঝরা বানিয়ে দিল তার বুক। আর্থারের সঙ্গে ভিক্টোরিয়া স্যান্ডলারও ছিল। ঘটনার আকস্মিকতায় হতচকিত হয়ে গেল সে, তারপরই চিৎকার করে আছড়ে পড়ল জ্ঞান হারিয়ে। তার হাতে ধরা একটা শপিং ব্যাগে ছিল কয়েক হাজার ডলার, সব কড়কড়ে এক ডলারের নোট। রাস্তায় ছড়িয়ে পড়ল টাকাগুলো। কিন্তু সেদিকে তাকালও না হত্যাকারীরা, কাজ সেরেই অপেক্ষমাণ একটা গাড়িতে উঠে চলে গেল তারা।

'এত বড় এক ধনী আমেরিকানের হত্যাকাণ্ড ব্রিটিশ পত্র-পত্রিকায়ও ভালই কভারেজ পেল। সবাই গুরুত্ব দিয়ে ছাপাল খবরটা মার চোখেও পড়ল সে খবর। নিহতের ছবি দেখেই চিনলেন মা আর্থার স্যান্ডলারকে অবাক হয়ে ভাবলেন, বেঁচে ছিল, তবুও কেন সে আসেনি তাঁর কাছে? কেন যোগাযোগ করেনি?'

'তারপর?'

'তারপর ডজনখানেক সলিসিটারের সঙ্গে দেখা করলেন মা। বিয়ের দলিল, আর্থারের লেখা চিঠিপত্র ইত্যাদির সাহায্যে তার স্ত্রী হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে চাইলেন। কিন্তু সবাই হাঁকিয়ে দিল তাঁকে ভুয়া দাবিদার অপবাদ দিয়ে। ফরচুন হান্টার বলে। তাদের কাছে ব্যর্থ হয়ে স্থানীয় এক পিটিশনারের কাছে গেলেন মা। লোকটা আশ্বাস দিল তার পক্ষে যতদূর সম্ভব করবে সে কিন্তু করেনি লোকটা। অথবা হয়তো করতে পারেনি শেষে আবার মার্কিন কনস্যুলেটে যোগাযোগ করলেন আমার মা। ওরা কয়েকদিন ধরে 'ইনভেস্টিগেশন' চালাল তারপর জানিয়ে দিল তাঁর বিয়ের দলিল ইত্যাদি সব জাল। মাকে জালিয়াত বলতেও কসুর করল না ওরা। এই করতে করতে পাঁচ বছর চলে গেল দুয়ারে দুয়ারে ধরনা দিয়ে ক্লান্ত হয়ে পড়লেন মা।

'শেষে আর মাত্র একটাই অস্ত্র ছিল তাঁর, উপায় না পেয়ে তাই ছুঁড়লেন তিনি। পর পর কয়েকটা চিঠি ছাড়লেন স্যান্ডলারদের নিউ ইয়র্কের ঠিকানায়।'

'কোন জবাব এসেছিল?'

করুণ হাসি ফুটল লেসলির ঠোঁটের কোণে। 'হ্যাঁ,' আনমনে বলল সে 'তবে ডাকে নয়। সশরীরে।'

টেবিলের ওপর ঝুঁকে বসল মাসুদ রানা। 'তার মানে?'

'হাতে হাতে জবাবটা নিয়ে এসেছিল আর্থার স্যান্ডলার

'কি বললেন!'

'হ্যাঁ, আর্থার স্যান্ডলার স্বয়ং।'

চুপ করে থাকল রানা। অনুসন্ধানী দৃষ্টিতে দেখছে মেয়েটিকে।

'অবাক হলেন? আমি তো বলেইছি, ১৯৬৪ সালে আর যে-ই হোক, আর্থার স্যান্ডলার নিহত হয়নি। আর্থারকে শেষবার দেখেছি আমি ১৯৭৬ সালে। সবচে' মজা কি জানেন? জীবনে মাত্র দু'বারই দেখেছি আমি আমার জন্মদাতাকে প্রথমবার ১৯৬৯ সালে এক্সিটারে, এবং দ্বিতীয়বার ১৯৭৬ সালে, সুইটজারল্যাণ্ডে আর প্রথম যেদিন দেখলাম মানুষটিকে, সেদিনই লেসলি স্যান্ডলার মরে গেল কিছুদিন পর আবার জন্ম নিল সে, তবে স্যান্ডলার নয়, ম্যাকঅ্যাডাম হয়ে।'

তাকিয়েই থাকল মাসুদ রানা। ভুল দেখল কি না বলতে পারবে না, মনে হলো কাঁদছে মেয়েটি। দু'চোখ চিক চিক করছে লেসলির।

চার

নীরবে কেটে গেল কয়েক মিনিট। মুখ তুলছে না লেসলি ম্যাকঅ্যাডাম। চুপ করে বসে আছে মাসুদ রানা। অস্বস্তি বোধ করছে। ভাবছে, যদি পাকা অভিনেত্রী হয়ে না থাকে এ মেয়ে তাহলে পিতার প্রতি অভিমান, ক্রোধ আর ক্ষোভের কতবড় এক পাহাড় বুকে নিয়ে এতগুলো বছর পেরিয়ে এসেছে লেসলি, কে জানে!

বিশ্বাস করতে শুরু করেছে ও মেয়েটিকে। নিজের সহজাত প্রবৃত্তি আরও আগে থেকেই জানান দিতে শুরু করেছে রানাকে, এ মেয়ে ভুয়া নয়, মাসুদ রানা। খাঁটি। বিশ্বাস করতে পারো তুমি একে।

ব্যাগ থেকে রুমাল বের করে চোখ মুছতে লাগল লেসলি। মুখ তুলতে পারছে না লজ্জায়। তাকে সহজ হতে সাহায্য করল মাসুদ রানা। হাত বাড়াল এলোমেলো চিঠিগুলোর দিকে। 'আপনাকে একটু সাহায্য করি। বেঁধে দিই চিঠিগুলো।' কাজটা শেষ হতে বাণ্ডিলটা বাইবেলের ওপর রাখল রানা, আস্তে করে ঠেলে দিল টেবিলের ও মাথায়। 'নিন। ভরে ফেলুন ব্যাগে।'

কাজ হলো। চোখ তুলে মুহূর্তের জন্যে তাকাল লেসলি, মুখে লাজুক হাসি। নাকের ডগা গোলাপী হয়ে উঠেছে তার। 'দুঃখিত। আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েছিলাম।'

মাথা ঝাঁকাল রানা। 'খুব স্বাভাবিক।'

জিজ্ঞেস করতে হলো না। এক মিনিট পর আপনা থেকেই মুখ খুলল মেয়েটি। 'সে দিন...বড়দিনের দু'সপ্তা বাকি। ১৯৬৯ সাল। খুব শীত পড়েছিল...'

স্কুল থেকে বাসায় ফিরল লেসলি। দুপুর গড়িয়ে গেছে তখন। বিচ্ছিরি আবহাওয়া। প্রচণ্ড ঠাণ্ডা, টিপ টিপ বৃষ্টিও আছে তার সঙ্গে। ছাতাটা ভাঁজ করে বাইরে, দরজার পাশে খাড়া করে রাখল লেসলি পানি ঝরাবার জন্যে। তারপর দরজা খুলে ছোট্ট একটা লাফ দিয়ে ঢুকে পড়ল ওদের চার রুমের ডুপ্লেক্স ফ্ল্যাটে। রোজকার মত হাঁক ছাড়ল সে, 'মা! আমি এসে গেছি।'

জবাব দিল না এলিজাবেথ।

'মা-আ! আমি এসে গেছি!'

উত্তর নেই।

ব্যাপার কি! ভাবল লেসলি। এমন তো কখনও হয় না! বাসায় নেই নাকি মা? কিন্তু সামনের দরজা খোলা কেন তাহলে? তাছাড়া ওর স্কুল থেকে ফেরার সময়টায় চিরকাল বাসাতেই থাকেন মা। ছেলেমানুষ, খুব একটা গুরুত্ব দিল না সে ব্যাপারটাকে। খিদে লেগেছে খুব। তাড়াতাড়ি কিচেনে ঢুকে ওর জন্যে ডাইনিং টেবিলে ঢাকা দিয়ে রাখা এক টুকরো পাউরুটি খেলো লেসলি মাখন দিয়ে। তারপর এক গ্লাস কমলার রস।

পেট ঠাণ্ডা হতে কাঠের সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় উঠে এল লেসলি। 'মা!'

এলিজাবেথের বেডরুমের খোলা দরজার সামনে দাঁড়াল এসে মেয়ে। চমকে উঠল ভেতরে চোখ পড়তে। প্রচণ্ড সাইক্লোন বয়ে গেছে যেন ঘরটার মধ্যে। সারা মেঝেতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে আছে মায়ের এলোমেলো কাপড়-চোপড়। ড্রেসারের ড্রয়ারগুলো একটা এখানে, একটা ওখানে। কোনটা চিত হয়ে আছে, কোনটা উপুড় হয়ে। বিছানার গদি উল্টে পড়ে আছে মেঝেতে। কার্পেট গোটানো লণ্ডভণ্ড অবস্থা।

'মা!' গলা ভেঙে গেল লেসলির। আতঙ্কিত হয়ে পড়েছে। কি করবে বুঝে উঠতে পারছে না। 'মা!'

উত্তর নেই।

ভয়ে ভয়ে ভেতরে ঢুকল লেসলি। কয়েক পা এগিয়ে থেমে পড়ল। এদিক ওদিক তাকাতে লাগল হতভম্ব দৃষ্টিতে। এই সময় জিনিসটার ওপর চোখ পড়ল তার। বেড কভারটা খাটের ওপাশে দলা হয়ে পড়ে আছে মেঝেতে, রক্তে লালে লাল হয়ে আছে ওটা। ঠক্ ঠক্ করে কাঁপতে শুরু করল লেসলি। ঘেমে উঠেছে। অ্যাটাচড বাথরুমের দরজা খোলা দেখা গেল, কোন রকমে সেদিকে দু'পা এগোল মেয়েটি। এবং জমে গেল জায়গায়।

বাথরুমের মেঝেতে চিত হয়ে পড়ে আছে তার মা। এলিজাবেথ অ্যান চ্যাটসওয়ার্থ স্যান্ডলার। কিচেন অ্যাপ্রন পরা। চেহারায় আতঙ্কের পাশাপাশি প্রচণ্ড অবিশ্বাস মাখা অভিব্যক্তি। চিবুকের খানিকটা নিচে গলা হাঁ হয়ে আছে তার। খুব ধারাল কিছু দিয়ে জবাই করা হয়েছে। মরে পড়ে আছে এলিজাবেথ—লেসলি স্যান্ডলারের দুঃখিনী জননী।

মাথা খারাপ হয়ে গেল লেসলির। চিৎকার করে কেঁদে উঠল। ছুটে ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে চাইল সে, কিন্তু এক পা গিয়েই আবার জমে গেল আঁতকে উঠল সশব্দে। ঘরের ভেতরে এসে দাঁড়িয়েছে দীর্ঘদেহী এক লোক। তার হিলের ধাক্কায় দড়াম করে লেগে গেল বেডরুমের দরজা। হাঁ করে ঝাপসা চোখে আগন্তুকের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকল লেসলি। ঠক্ ঠক্ করে কাঁপছে হাত-পা, সারা দেহ।

এক মুহূর্ত, তারপরই মানুষটিকে চিনতে পারল লেসলি। ওই চেহারা বহু বহুবার ছবিতে দেখেছে সে। মার অ্যালবামে আছে ছবিটা। আর্থার স্যান্ডলার।

লেসলির বাবা ওই লোক, জন্মদাতা। এলিজাবেথের প্রাণপ্রিয় স্বামী।

কালো সুট, কালো টাই পরে আছে আর্থার স্যান্ডলার। হাতে কালো রাবার গ্লাভস। লেসলিকে দেখল সে কয়েক মুহূর্ত। তারপর হাসির ভঙ্গি করে এক পা এগিয়ে এল। 'তুমি লেসলি না?' আমেরিকান অ্যাকসেন্টে বলল আর্থার। 'তোমার কথা তোমার মার চিঠিতে পড়েছি আমি।'

উত্তর দিল না লেসলি। ফাঁদে পড়া সন্ত্রস্ত ইঁদুরের মত পালাবার উপায় খুঁজছে। আড়চোখে ঘন ঘন তাকাচ্ছে আর্থারের হাতের দিকে। দেহের পিছনে রয়েছে তার দুই হাত, কি আড়াল করে রেখেছে লোকটা বুঝে উঠতে পারছে না লেসলি। তবে কিছু একটা যে আছে তার হাতে, সে ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই ওর।

'ভয় পাচ্ছ কেন?' বলল আর্থার স্যাণ্ডলার। 'কাছে এসো। আমি তোমার বাবা। এসো এসো!' আরও এক পা এগোল লোকটা।

লেসলি বুঝল এই মুহূর্তে তার পালানো উচিত। মানুষটা সম্ভবত তাকেও খুন করতে যাচ্ছে। কিন্তু জেনে-বুঝেও নিজেকে এক চুল নড়াতে পারল না লেসলি। মনে হলো যেন দু'পা তার মেঝেতে আটকে দিয়েছে কেউ পেরেক মেরে। একেবারে ওর সামনে এসে দাঁড়াল আর্থার স্যাণ্ডলার, দু'হাত সামনে চলে এসেছে দেহের আড়াল ছেড়ে।

এইবার জিনিসটা চোখে পড়ল লেসলির। দুই পিতলের আংটায় মজবুত করে পেঁচিয়ে বাঁধা দেড় ফুট আন্দাজ সরু পিয়ানোর তার। কিছু করার সুযোগ পেল না লেসলি, চট্ করে তারটা ওর গলায় ফাঁসের মত পরিয়ে দিল আর্থার, দুই আংটায় আঙুল ভরে টান দিল গায়ের জোরে।

গলায় চাপ পড়তেই হুঁশ হলো লেসলির। ভাগ্য ভাল, স্কুলের চামড়ার শক্ত সোলের জুতো তখনও পরে ছিল সে। আরও আগেই খুলে ফেলত সে ওগুলো, যদি ঘরের পরিবেশ আর সব দিনের মত স্বাভাবিক থাকত। গলায় ততক্ষণে শক্ত হয়ে চেপে বসেছে তারের ফাঁস, আর্থারের প্রচণ্ড টানে মাংস কেটে ক্রমেই দেবে যাচ্ছে ভেতর দিকে। জুগুলার ভেইন পর্যন্ত পৌঁছে গেছে। রক্তে ভিজে গেছে তার জামার কলার। মরিয়া হয়ে জুতোর পুরু, শক্ত মাথা দিয়ে আর্থারের হাঁটুতে গায়ের জোরে লাথি হাঁকাল লেসলি। ছোট ছোট দু'হাতে খামচে ধরে আছে সে আর্থারের চওড়া কব্জি।

জায়গামতই পড়ল লাথিটা, ঠিক তার বাঁ হাঁটুর বাটির মাঝামাঝি জায়গায় বেমক্কা লাথিটা খেয়ে চেঁচিয়ে উঠল আর্থার ব্যথায়, ভাঁজ হয়ে গেল বাঁ পা, দেহের ভারসাম্য হারিয়ে ফেলল লোকটা। আবার লাথি চালাল লেসলি, সেই সঙ্গে দুই হাতের একের পর এক হ্যাঁচকা টানে তারের ফাঁস থেকে মুক্ত করে নিল নিজের প্রায় অর্ধেক বিচ্ছিন্ন গলা। লাফিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে আসার আগে পলকের জন্যে ঘুরে তাকিয়েছিল রক্তাক্ত, আধমরা লেসলি। দেখল, তাকে ধরার জন্যে খোঁড়াতে খোঁড়াতে ছুটে আসছে খুনীটা। ব্যথায় চেহারা বিকৃত হয়ে আছে তার।

এক দৌড়ে রাস্তায় চলে এল লেসলি। জামায়, কোটে নিজের রক্তের নহর বইতে দেখে ভয়ে মাথা ঘুরে গেল তার। পথের ওপরই পড়ে গেল সে জ্ঞান

হারিয়ে। প্রতিবেশীরা এসে পড়ায় সে-যাত্রা বেঁচে যায় লেসলি। পুলিসে, হাসপাতালে টেলিফোন করে তারা। একটা মার্ডার, আরেকটা ব্যর্থ মার্ডার কেস-পুলিস, সাংবাদিক আর টিভি ক্যামেরায় সরগরম হয়ে উঠল সমগ্র এলাকা।

তবে আশ্চর্য ব্যাপার হচ্ছে, পুলিস কতদূর কি করেছে জানে না লেসলি। চোখে দেখেনি। আর ছেলেমানুষ, দেখলেই বা কতটা বুঝত কে জানে? কিন্তু ডজন ডজন সাংবাদিক আর টিভি ক্যামেরা এল, তবু এলিজাবেথ আর লেসলির খবর তেমন প্রচার পেল না। টিভি খবরে আর্থার স্যাণ্ডার প্রসঙ্গে একটা শব্দও উচ্চারিত হলো না, পত্রিকায় ছাপা হলো না তার নাম। অথচ জ্ঞান ফেরার পর ওই নামটা সম্ভবত কয়েক হাজারবার ঘোরের মধ্যে উচ্চারণ করেছে লেসলি উপস্থিত সবার সামনে। কেউ একবার জানতেও চাইল না, কেন একজন মৃত ব্যক্তির নাম বারবার উচ্চারণ করছে সে। সংবাদটা নিতান্তই গুরুত্বহীনভাবে প্রকাশ পেল, এবং খুনীকে 'অজ্ঞাতপরিচয়' বলে উল্লেখ করা হলো।

ওদিকে আর্থার স্যান্ডলার পালিয়ে গেল। পিছনে কোন সূত্র রেখে যায়নি লোকটা। কোনদিক দিয়ে পালাল সে, কেউ দেখেনি। এ ঘটনা নিয়ে একটা লোক দেখানো মামলা দায়ের করা হয়েছিল বটে, তবে তার ফল কি হয়েছে জানে না লেসলি। খোঁজ রাখেনি।

'সেদিন থেকেই আত্মরক্ষার স্বার্থে প্রতিটি মুহূর্তের জন্যে প্রস্তুত হয়ে থাকতে শিখেছি আমি, মিস্টার···ইয়ে, মাসুদ রানা। নয় বছরের একটি শিশু, সেদিনই প্রথম বুঝতে পেরেছে পৃথিবী কত নিষ্ঠুর। কতবড় পাষণ্ড। অসতর্ক থাকলে মুহূর্তের জন্যেও তাকে বাঁচতে দেবে না সে। সেদিনের খুনী আর্থার স্যান্ডলারের চেহারা চোখ বুজলে এখনও দেখতে পাই আমি মৃত্যুর আগমুহূর্ত পর্যন্ত আমার মনে থাকবে তার সেই অভিব্যক্তি।'

একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করল লেসলি। ডান হাতের তর্জনী দিয়ে আনমনে মাথার এক গোছা চুল পেঁচাচ্ছে সে। হঠাৎ খেয়াল হলো, মাসুদ রানা তাকিয়ে আছে তার হাতের দিকে। নামিয়ে নিল সে হাতটা কি ভেবে ব্যাগ খুলল। 'আরেকটা জিনিস আছে আমার কাছে। এটা আপনি রেখে দিতে পারেন।'

একটা পাসপোর্ট সাইজ ছবি বের করল লেসলি, এগিয়ে দিল মাসুদ রানার দিকে। 'ইনি-ই তিনি,' ব্যঙ্গের সুরে বলল সে। 'আর্থার স্যান্ডলার।'

আলতো করে ধরল রানা ছবিটা। চোখের সামনে নিয়ে হাতের তালুতে রেখে দেখল কিছুক্ষণ। কিন্তু না, নামের মত চেহারাটাও অজানা ওর। লোকটিকে চেনে না মাসুদ রানা।

'কবে তোলা হয় এটা?' প্রশ্ন করল ও।

'১৯৫৯ সালে। মার সঙ্গে লোকটার বিয়ের পরদিন। নিজের ক্যামেরায় নিজেই ও ছবি তোলেন আমার মা।'

'এটা আমাকে রাখতে দিচ্ছেন আপনি?'

'হ্যাঁ, রাখুন।'

ড্রয়ার খুলে আগের মতই আলতো করে ওটা রেখে দিল মাসুদ রানা। 'পরের ঘটনা বলুন এবার।'

'মায়ের তরফের কোন আত্মীয় ছিল না আমার, কাজেই সেদিনই ডেভনের এক এতিমখানায় ঠাঁই করে দেয়া হলো আমার জন্যে। ওখানেই ঘটল আমার জীবনের আরেক স্মরণীয় ঘটনা। লণ্ডন থেকে স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের দু'জন এল আমার সঙ্গে কথা বলতে। তারা ফিরে গিয়ে খুব সম্ভব গোয়েন্দা সংস্থা এম আই-সিক্সকে জানাল আমার রেকর্ড করে নিয়ে যাওয়া বক্তব্য।'

চোখ কোঁচকাল মাসুদ রানা। 'এম আই-সিক্স?'

'হ্যাঁ।'

'এমন ধারণা কেন হলো আপনার?'

'বলছি। একদিন পর আরও দু'জন এল, সাদা পোশাকের দুই পুলিস অফিসার। গাড়িতে করে লণ্ডন নিয়ে গেল আমাকে তারা। বড় একটা সরকারী অফিসে নেয়া হলো। ওটার প্রতিটি রুমে ইংল্যাণ্ডের রানীর ছবি ঝোলানো। আর প্রধানমন্ত্রীর ছবি। আমি ছোট ছিলাম ঠিকই, কিন্তু আমার চারদিকে আমাকে ঘিরেই যে সমস্ত কর্মকাণ্ড চলছে, তার কিছু কিছু আমি টের পেয়েছি। অনেকে মনে করে ছোটরা কিছু বোঝে না। আসলে ভুল। অনেক কিছুই বোঝে তারা; কেবল গুছিয়ে বলতে পারে না, এই যা। আমিও বুঝেছি কেন কি হচ্ছে। বুঝেছি ওরা সবাই আমাকে লুকিয়ে রাখার জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠেছে। কোথায় রাখবে, তাই নিয়ে ভীষণ চিন্তায় পড়ে গেছে। অফিশিয়ালি মৃত আমেরিকান মিলিয়নেয়ার আর্থার স্যাভলারের 'বেঁচে ওঠার' খবরে যথেষ্ট বিচলিত দেখেছি আমি তাদের প্রত্যেককে। তার হাত থেকে আমাকে কি উপায়ে বাঁচানো যায় তাই নিয়ে মাথা ঘামাতে দেখেছি আমি মানুষগুলোকে। তারা এমনকি আমার মায়ের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়াতেও যেতে দেয়নি আমাকে।'

'এদের কারও নাম বলতে পারেন?'

'যিনি ইন-চার্জ, তাঁর নাম ছিল পিটার হোয়াইটসাইড। ভদ্রলোককে ভালই লাগত আমার। লম্বা, হালকা-পাতলা, খুব হ্যাণ্ডসাম। ভাল মানুষ। আমার ধারণা এই মানুষটিই প্রথম আমার কথা, সব কথা, বিশ্বাস করেছিলেন। অনুধাবন করতে পেরেছিলেন আমার বেদনা। আমার কষ্ট।'

'পিটার হোয়াইটসাইড, না?' নামটা পরিচিত মনে হলো রানার। সমসাময়িক নয় অবশ্য, ওর চাইতে বেশ সিনিয়র এ লাইনে। তবে নামটা শুনেছে, এ বিষয়ে রানা নিশ্চিত।

'হ্যাঁ। এই ঘটনার অনেক আগেই অবসর নিয়েছেন তিনি সরকারী চাকরি থেকে। কিন্তু তাঁর চাল-চলন, স্বাস্থ্য দেখলে খুব একটা বয়সী মনে হত না। বেশ চটপটে মানুষ। আমার জীবনে এই লোকটির অবদানের কথা ভুলব না আমি। আসলে তাঁর হস্তক্ষেপের জন্যেই এখনও আমি বেঁচে আছি, অন্তত ভদ্রভাবে বলতে গেলে নতুন জীবন দান করেছেন আমাকে পিটার হোয়াইটসাইড।'

'যেমন?'

'তাঁর বাসায় কিছুদিন রাখেন তিনি আমাকে। বাসার চারদিক চব্বিশ ঘণ্টা পাহারা দিত কয়েকজন সাদা পোশাকের পুলিস। কুকুর থাকত তাদের সাথে। সেখান থেকে সুইটজারল্যাণ্ডের ভিডি পাঠিয়ে দেন আমাকে তিনি। বয়স্ক এক

ব্রিটিশ দম্পতির কাছে। নিঃসন্তান ছিলেন বুড়ো-বুড়ি। তাঁরা আমাকে 'দত্তক' নেন। ভদ্রলোকের নাম জর্জ ম্যাকঅ্যাডাম। লেসলি স্যান্ডলার আগেই মরেছে বলেছি আপনাকে। যেদিন ভিভি পা রাখলাম, সেদিন নতুন টাইটেল গ্রহণ করলাম আমি। হয়ে গেলাম লেসলি ম্যাকঅ্যাডাম।'

'ভদ্রলোক সাধারণ ব্রিটিশ নাগরিক?'

নীরবে কয়েক মুহূর্ত মাসুদ রানাকে দেখল মেয়েটি। মাথা দোলাল। 'না, রানা। আমার জীবনে কেউই সাধারণ নয়। তারা সবাই একেকজন অসাধারণ। আমি নিজেকেও তাই ভাবি। যদি সাধারণ-ই হব, আমার চারপাশে কেন তাহলে এত অসাধারণ ঘটনা-দুর্ঘটনার মেলা? কেন এত অসাধারণ সব মানুষজনের আনাগোনা? সে যাক, ম্যাকঅ্যাডামও তেমনি ছিলেন।

'প্রথমে শুনলাম, "সড়ক দুর্ঘটনায়" আহত, পঙ্গু হয়ে গেছেন বলে সরকারী চাকরি থেকে "অবসর" দিয়েছে তাঁকে ব্রিটিশ সরকার। কিন্তু আমার সন্দেহ হয় কেন জানি। আমি বিশ্বাস করিনি। কয়েক বছর পর জানলাম আসল খবর। এম আই-সিক্সের এক শীর্ষস্থানীয় অপারেটিভ ছিলেন তিনি। সোজা কথায় স্পাই মধ্যপ্রাচ্যে কর্মরত ছিলেন, সুয়েজে। ১৯৫৫ সালে অজ্ঞাত পরিচয় এক আরবের গুলিতে আহত হন ম্যাকঅ্যাডাম। গুলিটা লেগেছিল তাঁর নিতম্বে, ঠিক মেরুদণ্ডের শেষ মাথায়। ফলে দু'পায়ের কিছু কিছু নার্ভ শুকিয়ে যায় ভদ্রলোকের, প্রায় পঙ্গু হয়ে যান। তাই "অবসর" নিতে বাধ্য হন।'

'তারপর?'

'যে কয় বছর ওঁদের সঙ্গে ছিলাম, ভালই ছিলাম আমি। সুখে ছিলাম। জীবনের ওই সময়টাই সবচে' আনন্দে কেটেছে আমার। ভিভির এক প্রাইভেট স্কুলে ভর্তি করে দেয়া হয় আমাকে। স্কুলের লোকেশনটা ছিল দারুণ। জেনেভা লেক, ফরাসী আলপস্ দেখা যেত আমাদের ক্লাসরুম থেকে। পিটার হোয়াইটসাইডের দয়ায় ভাল ভাল পোশাক কিনতে পারতাম আমি, দামী খাবার খেতাম। আমার জন্যে নিয়মিত টাকা পাঠাতেন তিনি জর্জ ম্যাকঅ্যাডামের নামে অনেক বন্ধু জুটে গেল আমার ওখানে, মেয়ে বন্ধু, ছেলে বন্ধু। ও দেশে থেকে ফ্রেঞ্চ আর জার্মান শিখলাম। ইংরেজির মত সচ্ছন্দে কথা বলতে পারি আমি ওই দুই ভাষায়।'

আপনমনে মাথা দোলাল মাসুদ রানা।

'সাত বছর কেটে গেল দেখতে দেখতে। আসলে এমনিই হয়, সুখের সময় খুব দ্রুত কেটে যায় মানুষের। ১৯৭৬ সালে আবার আমাকে খুঁজে বের করল আর্থার স্যান্ডলার। জীবনের দ্বিতীয় এবং শেষবারের মত তাকে পলকের জন্যে দেখতে পেলাম আমি আবছা আঁধারে দাঁড়ানো অবস্থায়।'

বলে চলল লেসলি।

১৯৭৬ সাল। সময়টা গ্রীষ্মে। স্কুলের পাট চুকিয়ে ফেলেছে লেসলি। দেখতে মায়ের মতই সুন্দরী, ডাগরডোগর হয়ে উঠেছে। অনেকেরই চোখ পড়েছে তার ওপর, কিন্তু তাদের কাউকে মনে ধরে না তার। লুর্টারির এক বোট বেসিনে চাকরি নিল লেসলি সে বছর জুলাই মাসে। সেখানে রবার্টো জিসারেল্লি নামে এক

ইটালিয়ান সুঠামদেহী যুবকের সঙ্গে পরিচয় হয় লেসলির। অত্যন্ত হ্যান্ডসাম ছেলে জিসারেল্লি। কি যেন এক সুইস-ইটালিয়ান কোম্পানিতে বড় পদে চাকরি করে খরচের বেলায় দরাজ হাত।

ছেলেটির প্রেমে পড়ল লেসলি। পড়ল ইটালিয়ানও। রোজ বিকেলে এসে লেসলির ছুটি হওয়ার অপেক্ষায় বসে থাকত সে। তারপর সন্ধে পর্যন্ত ঘুরে বেড়াত দু'জনে মিলে, গল্প করত, পার্কে বসে সময় কাটাত। এভাবে দু'সপ্তাহ কাটল। তারপর একদিন তার সঙ্গে শোয়ার জন্যে বলল যুবক লেসলিকে। প্রথমে আপত্তি জানাল ও; কিন্তু পিছু ছাড়ল না যুবক, লেগেই থাকল। অবশেষে সম্মত হলো লেসলি।

নিজেই যেচে আহ্বান জানাল জিসারেল্লিকে। 'আমার বাবা-মা শহরের বাইরে গেছেন কয়েকদিনের জন্যে। আমাদের ফ্ল্যাট খালি।'

প্রেমিককে সঙ্গে নিয়ে নিজেদের দোতলার ফ্ল্যাটে এল লেসলি। ভীষণ উত্তেজিত সে, তেমনি ভয় ভয়ও করছে। জীবনে এই প্রথম কোন পুরুষের সঙ্গে শুতে যাচ্ছে, ভয় করাই স্বাভাবিক। নিজের বেডরুমে জিসারেল্লিকে নিয়ে এল সে আলো নিভিয়ে বাতাস চলাচলের জন্যে ফ্ল্যাটের পিছনের একটা জানালা খুলে দিল যুবক; মৃদু আপত্তি জানিয়েছিল বটে লেসলি, কিন্তু কানে তুলল না ইটালিয়ান বলল, গরম লাগছে। মিথ্যে বলেনি অবশ্য সে। বেশ গরম পড়েছিল সেবার গ্রীষ্মে

যা হোক, কাঁপা হাতে নিজের কাপড়-চোপড় খুলল লেসলি, কিন্তু জিসারেল্লির মধ্যে তেমন ব্যগ্রতা দেখা গেল না। ব্যাপারটা যখন খেয়াল হলো, সে তখন সম্পূর্ণ নগ্ন। 'কি হলো?' জানতে চাইল লেসলি 'তুমি খুলছ না কেন?'

'আমি খুব দুঃখিত, লেসলি,' গম্ভীর গলায় বলল যুবক।

'কেন?' অবাক হলো ও খুব।

হাত ইশারায় খোলা জানালাটা দেখাল জিসারেল্লি। 'তাকাও ওদিকে। বাইরে দেখো।'

ইতস্তত ভঙ্গিতে জানালার দিকে এগিয়ে গেল লেসলি। চাঁদের আলোয় পিছনের বাগান মোটামুটি দেখা যায়। শুধু বাগানটাই দেখল লেসলি, আর কিছু চোখে পড়ল না। ঘুরে তাকাল ও, ঠিক ওর পিছনে এসে দাঁড়িয়েছে তখন যুবক 'কই! কিছুই তো চোখে পড়ছে না! কিসের কথা বললে তুমি?'

কড়া গলায় প্রায় ধমকেই উঠল ইটালিয়ান। 'ভাল করে তাকিয়ে দেখো!'

তাকাল হতভম্ব লেসলি। এবং পরমুহূর্তে আঁতকে উঠল সশব্দে। ওর খোলা জানালার সরাসরি নিচে দাঁড়িয়ে আছে দীর্ঘদেহী কে একজন যেন। মুখ তুলে ওপরদিকে তাকিয়ে রয়েছে সে। চাঁদের আলোয় তাকে চিনতে সময় লাগল না লেসলির। আর্থার স্যান্ডলার! ওর সঙ্গে চোখাচোখি হতে ক্রূর এক টুকরো হাসি দিল লোকটা।

চর্কির মত ঘুরে দাঁড়াল লেসলি, দৌড় দেয়ার জন্যে পা তুলল, কিন্তু পেশীবহুল শক্ত হাতে ধরে ফেলল ওকে জিসারেল্লি। মৃদু কণ্ঠে বলল, 'পালাবার চেষ্টা করে কোন লাভ নেই, লেসলি।' দু'হাতের বজ্রমুঠিতে ওর গলা চেপে ধরল সে। 'আমি খুবই দুঃখিত।' দুই বুড়ো আঙুল ওর কণ্ঠমণির ওপর রেখে

সর্বশক্তিতে চাপ দিল জিসারেল্লি।

চোখ কপালে উঠল লেসলির চাপ খেয়ে, প্রথম ধাক্কাতেই জিভ বেরিয়ে পড়ার দশা। ওহ্, ঈশ্বর! ভাবল মেয়েটি, এত বছর পর সত্যিই তাহলে সফল হতে যাচ্ছে আর্থার স্যান্ডলার? সত্যিই তাহলে মরে যাচ্ছে লেসলি? নিজেকে ছাড়াবার জন্যে উন্মাদের মত টানা-হ্যাঁচড়া, লাফঝাঁপ শুরু করে দিল সে। এক মুহূর্তের জন্যেও খুনীটাকে সুস্থির থাকতে দিতে চায় না। ও বেশি ঝামেলা করছে দেখে এক সময় বিরক্ত হয়ে উঠল জিসারেল্লি, ওই অবস্থায়ই ঠেলে নিয়ে চলল তাকে বিছানার দিকে।

কিনারা পর্যন্ত নিয়ে লেসলিকে বিছানায় ফেলে দিল যুবক চিত করে, দু'পা দু'দিকে ছড়িয়ে দিয়ে উঠে বসল তার পেটের ওপর। তারপর নতুন উদ্যমে টিপে ধরল ওর গলা। বিস্ফারিত চোখে খুনী প্রেমিকের দিকে তাকিয়ে আছে লেসলি, নখ দিয়ে তার চওড়া কব্জি আঁচড়ে খামচে রক্তাক্ত করে ফেলেছে সে, কিন্তু কিছুতেই টলানো যাচ্ছে না ইটালিয়ানকে। গায়ের জোরে গলা টিপে ধরে ঘন ঘন ঝাঁকাচ্ছে সে ওকে।

জ্ঞান হারাতে বসেছে প্রায় লেসলি, এই সময় মনে পড়ল ছুরিটার কথা। ওটা তার সার্বক্ষণিক সঙ্গী, সেই ১৯৬৯ সাল থেকে। একটু আগেও সঙ্গে ছিল ওটা, কাপড় ছাড়ার সময় বালিশের নিচে গুঁজে রেখেছে। জিসারেল্লির কব্জি ছেড়ে সেদিকে ডান হাতটা বাড়াল লেসলি, হাতড়ে হাতড়ে বালিশগুলোর স্পর্শ পেল, হাত ভরে দিল সে ওর তলায়। তারপর ছুরিটার বাঁট মুঠোয় চেপে ধরল লেসলি।

এবং দেহের অবশিষ্ট শক্তি ও অন্তরের সমস্ত ঘৃণা এক করে চালাল সে ছুরি। জিসারেল্লির বাঁ শোল্ডার ব্লেডের নিচ দিয়ে ঢুকে গেল তীক্ষ্ণধার ইস্পাতের ফলা। আর্তনাদ করে উঠল যুবক, আচমকা গলার চাপ কমে গেল লেসলির। কিন্তু ছাড়ল না ও, জোর এক ঠেলা দিয়ে ফলাটা আরও ইঞ্চিখানেক ভেতরে সেঁধিয়ে দিল। আবার চেঁচিয়ে উঠল ইটালিয়ান। ওকে ছেড়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ল নিজেকে নিয়ে। পেটের ওপর থেকে যুবক নেমে পড়তেই উঠে বসল লেসলি ভয়ঙ্করভাবে কাশতে কাশতে। হিংস্র বাঘিনী হয়ে উঠেছে।

ছুরি লক্ষ্য করে ঝাঁপ দিল লেসলি, আরেক ঠেলা দিয়ে একেবারে বাঁট পর্যন্ত ঢুকিয়ে দিল যুবকের হাড় মাংসের ভেতরে। পিছন দিকে ধনুকের মত বাঁকা হয়ে গেল জিসারেল্লি। তীব্র যন্ত্রণা ও অবিশ্বাস মাখা দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল লেসলির দিকে। যেন ভেবে পাচ্ছে না, ওর মত দুর্বল আর নগ্ন এক মেয়ে তাকে আঘাত করার মত স্পর্ধা কোথায় পেল। কোমরের ওপরের অংশ বাঁকা করে মুখ ঘোরাবার আপ্রাণ চেষ্টা করল জিসারেল্লি, যেন দেখতে চায় ক্ষতটা। এক মুহূর্ত সংগ্রাম করল যুবক পিছনদিকটা দেখার জন্যে, তারপরই চোখ উল্টে গেল তার। হুড়মুড় করে পড়ে গেল সে মেঝেতে।

'ছেলেটার পরিচয় জানা হলো না আমার। তবে যে-ই হোক, আমার ঘরে, আমারই চোখের সামনে ছটফট করতে করতে মারা গেল সে।' ঠোঁট বাঁকা করে হাসির ভঙ্গি করল লেসলি। 'আমার প্রথম প্রেমিক। কিন্তু তা নিয়ে বিন্দুমাত্র আফসোস হয়নি আমার। আফসোস হয়েছে কেবল আর্থার আবারও পালিয়ে গেল

বলে। জিসারেল্লির পরিবর্তে সেদিন যদি আমি ওই পিশাচটাকে হত্যা করতে পারতাম, জীবন ধন্য হত আমার। সে রাতের পর অনেক বছর কেটে গেল, আর কখনও দেখিনি তাকে। কোথায় আছে সে ঘাপটি মেরে, কে জানে!'

'মরে গিয়েও তো থাকতে পারে।' বলল মাসুদ রানা।

'ওরা মরে না, মাসুদ রানা,' ধীর, অথচ দৃঢ় কণ্ঠে ওর ধারণা প্রত্যাখ্যান করল লেসলি ম্যাকঅ্যাডাম। 'আর্থার স্যাণ্ডলাররা কখনও মরে না। ও বেঁচে আছে, আমি গ্যারান্টি দিয়ে বলতে পারি। এবং ওর-ই জন্যে আগুন খুঁজে নিয়েছে আপনাকে, বুঝতে পারছেন না এখনও? আমি বলছি, আজ হোক, কাল হোক, আমার কথার সত্যতা আপনি নিজেই টের পাবেন।'

চুপ করে থাকল মাসুদ রানা। নিবিষ্ট মনে তাকিয়ে আছে মেয়েটির দিকে। ভাবছে। তাই কি? আজই সকালে নিজস্ব চ্যানেলে মার্ক রাইডারের ময়না তদন্তের একটা রিপোর্ট কপি হস্তগত করেছে রানা। ওতে তার মৃত্যুর সময় পরিষ্কার উল্লেখ আছে। সে রাতে যে সময়ে অ্যাপার্টমেন্ট ত্যাগ করে মাসুদ রানা, ঠিক সেই সময়ই নিহত হয় মার্ক রাইডার। কি অর্থ হতে পারে এর?

লম্বায়, পাশে প্রায় মাসুদ রানারই মত ছিল হতভাগ্য যুবক। কেউ কি ভুলে রানা ভেবে আক্রমণ করেছিল রাইডারকে? পিছন দিয়ে না বেরিয়ে যদি সামনে দিয়ে বের হত মাসুদ রানা, তাহলে কি···অফিসে আগুন ধরিয়ে অসময়ে ওকে ঘর থেকে বের করে আনতে চাইছিল কেউ? কে, আর্থার স্যান্ডলার? সচকিত হলো রানা লেসলির গলা কানে যেতে।

'খবর পেয়ে পরদিনই আমার পালক মা-বাবা ফিরে এলেন ভিভি। এসেই লণ্ডনে যোগাযোগ করেন জর্জ, পিটার হোয়াইটসাইডের সঙ্গে কথা বলেন টেলিফোনে। ঘটনা শুনে জেনেভার ব্রিটিশ কনস্যুলেটের সাথে কথা বলেন পিটার। এরপর সুইস কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনা করে ফয়সালা করা হয় বিষয়টার। ঘটনাটা চেপে যায় ওরা। তবে আমি সুইটজারল্যাণ্ড ত্যাগ করতে বাধ্য হই। কারণ সুইসরা ঝামেলা আমদানীকারীদের পছন্দ করে না।

'আবারও ঝামেলা থেকে রক্ষা করলেন আমাকে পিটার হোয়াইটসাইড। খেটেপিটে কানাডায় আমার থাকার ব্যবস্থা করে দিলেন। চলে গেলাম আমি। যাওয়ার আগে আমার পালক বাবা এই চিঠিপত্র আর বাইবেলটা আমাকে দিয়ে বললেন, "সব সময় সঙ্গে রেখো। কখন কাজে লাগবে বলা যায় না।" ' নিয়ে নিলাম। ব্যাগ থেকে একটা নোটবই বের করে ভেতরে চোখ বোলাল লেসলি ম্যাক্অ্যাডাম।

মুখ তুলল। 'আজ থেকে ছয় বছর পাঁচ মাস আঠারো দিন আগে আমাকে কানাডায় টেলিফোন করেছিলেন উইলিয়াম ওয়ার্ড ড্যানিয়েলস। জানালেন, স্যান্ডলার পরিবারের যাবতীয় সহায় সম্পত্তির দলিল সব আমার নামে নতুন করে তৈরি করে রেখে যাচ্ছেন তিনি। ভিক্টোরিয়া স্যান্ডলারের মৃত্যুর পর কার্যকর হবে সে সব। ইউ সী? মহিলার মৃত্যু হয়েছে। এখন আমি আমার ন্যায্য পাওনা বুঝে নিতে চাই। আমি আশা করব, এ ব্যাপারে আপনি সাহায্য করবেন আমাকে আপনার যেভাবে খুশি, আমার পরিচয় সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে নিতে পারেন আপনি

'আপনি নিজেই বললেন আর্থার স্যান্ডলার এখনও বেঁচে আছে,' নড়েচড়ে বসল মাসুদ রানা। 'তাকে আপনি ভয়ও করেন। এমন এক মুহূর্তে আত্মপ্রকাশ করা কি ঠিক হবে আপনার?'

হাসল লেসলি ম্যাকঅ্যাডাম। 'মাসুদ রানা, ড্যানিয়েলসের মুখে আপনার নাম শোনার পর আপনার ব্যাপারে যতদূর সম্ভব খোঁজ-খবর নিয়েছি আমি। আমি জানি আপনার পেশা কি। এ-ও জানি সব সময় অত্যাচারিতের, শোষিতের পক্ষে কাজ করে থাকেন আপনি। আমিও পড়ি অত্যাচারিতের দলে, শোষিতের দলে। বিপদে যদি পড়ি, আপনি কি সাহায্য করবেন না আমাকে? আমার জীবন-কাহিনী শোনার পরও? ভেবে দেখুন, ড্যানিয়েলস আমার নিরাপত্তার ভার প্রকারান্তরে আপনার হাতেই তুলে দিয়ে গেছেন।'

কথার মারপ্যাঁচে পড়ে আমতা আমতা করতে লাগল মাসুদ রানা। 'ড্যানিয়েলসকে আপনি চেনেন কি ভাবে?'

'না। তাঁকে আমি চিনি না।'

'সে কি!'

'এমনকি তাঁর ফোন পাওয়ার আগ পর্যন্ত তাঁর নামটাও কোনদিন শুনিনি। তবে...বোঝাই যায়, আমাকে তিনি খুব ভালই চিনতেন। খোঁজ-খবর রাখতেন আমার।'

'একটা বিষয় পরিষ্কার হচ্ছে না আমার কাছে।'

'কি?'

'কাহিনী শুনে পরিষ্কার বোঝা যায় আপনার মাকে খুব ভালবাসত আর্থার স্যান্ডলার। হঠাৎ কী এমন হলো তার যে স্ত্রীকে হত্যা করল সে? নিজের মেয়েকে হত্যা করার জন্যে উঠেপড়ে লেগেছিল?'

একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল লেসলি। 'জানি না।' একটু চুপ করে থাকল সে। 'আপনি কিন্তু আমার প্রশ্নের উত্তর দেননি এখনও।'

'কোন্ প্রশ্ন?'

'যদি কোন বিপদে পড়ি এ দেশে, সাহায্য করবেন না আপনি আমাকে?'

'আপনি কি আমাকে আর্থার স্যান্ডলারের পিছু লাগতে বলছেন পরোক্ষে?'

'না। তবে সে যদি লাগে আপনার পিছনে, আপনি কি ছেড়ে দেবেন তাকে?'

চুপ করে থাকল মাসুদ রানা।

আসন ছাড়ল লেসলি ম্যাকঅ্যাডাম। 'আপনাকে বোধহয় চিন্তায় ফেলে দিলাম। আপনি ভেবে দেখুন বিষয়টা নিয়ে। দু'দিন পর আবার যোগাযোগ করব আমি।'

চলে গেল মেয়েটি। অনেকক্ষণ পর খেয়াল হলো মাসুদ রানার, লেসলি কোথায় আছে জানিয়ে যায়নি ওকে।

পাঁচ

সকাল সাড়ে ন'টায় নিউ ইয়র্কের মেরিন এয়ার টার্মিনাল ছেড়ে আকাশে উঠল

এয়ার নিউ ইংল্যাণ্ডের খুদে ডি হেভিল্যাণ্ড স্টল বিমানটি। মাত্র নয়জন যাত্রী, তার মধ্যে মাসুদ রানা একজন। নানটুকেট চলেছে রানা ড্যানিয়েলসের এককালের সহকর্মী, অ্যাডলফ জেঙ্গারের সঙ্গে দেখা করতে।

ভদ্রলোককে চেনে না মাসুদ রানা, দেখেওনি কোনদিন। ও যখন একটা জটিল মামলা সংক্রান্ত বিষয়ে উইলিয়াম ড্যানিয়েলসের সঙ্গে বেশ কয়েক বছর আগে দেখা করতে গিয়েছিল, তার বছর পাঁচেক আগেই আইন ব্যবসা ছেড়ে দেন ভদ্রলোক। যদিও ড্যানিয়েলসের তুলনায় বয়স যথেষ্ট কম ছিল তাঁর। কেন যেন হঠাৎ করেই ব্যবসার প্রতি বিতৃষ্ণা জন্মে জেঙ্গারের, সব ছেড়েছুড়ে ম্যাসাচুসেটস চলে যান তিনি স্বেচ্ছা অবসর নিয়ে। এ সবের কিছু কিছু ড্যানিয়েলসের মুখে শুনেছে মাসুদ রানা, বাকিটা ম্যানহাটনে প্র্যাকটিসরত ওর নিজের এক কাউন্সেলর বন্ধুর কাছ থেকে জেনে এসেছে নিজের গরজে। তার মুখে শুনেছে মাসুদ রানা, এক সময় স্যান্ডলার এস্টেট জেঙ্গারও দেখাশোনা করতেন ড্যানিয়েলসের মত।

গতকাল দুপুরে অ্যাপয়েন্টমেন্টের জন্যে টেলিফোন করেছিল রানা জেঙ্গারকে। প্রথমে দেখা করতে অস্বীকার করেন বৃদ্ধ। কিন্তু যখন জানতে পারলেন এর সঙ্গে স্যান্ডলারদের সম্পর্ক আছে, আর দ্বিমত করেননি।

ঠিক বারোটায় নানটুকেট অবতরণ করল স্টল। এয়ারপোর্ট থেকে বেরিয়ে একটা ক্রাইসলার ট্যাক্সি নিল মাসুদ রানা। ড্রাইভারকে প্রাক্তন অ্যাটর্নির বাসার ঠিকানা জানিয়ে আরাম করে বসল। খুদে বিমানের অপরিসর সীটে সোজা হয়ে বসে থেকে খিল ধরে গেছে হাত-পায়ে।

সাগরের খুব কাছে বাস জেঙ্গারের। বাড়িটা পুরানো, সাদা রং করা। সামনে পিছনে প্রচুর জায়গা আছে ওটার। সামনে ঘন সবুজ ঘাসের লন, বাউণ্ডারি ঘেঁষে চমৎকার ফুলের বাগান নিরিবিলি পরিবেশ, অবসর যাপনের জন্যে একেবারে আদর্শ জায়গা। বাড়িটার কয়েকশো গজ পিছনে সাগর। কাঠের একটা জেটি দেখা যাচ্ছে তীরে। গভীর সমুদ্রে প্লেজার ট্রিপে যাওয়ার উপযুক্ত বড়সড় দুটো, অত্যাধুনিক ট্রলার বাঁধা আছে জেটিতে। ক্রিস-ক্র্যাফট বলে এগুলোকে। নিশ্চয়ই গভীর সাগরে ঘুরে বেড়াতে ভালবাসে ভদ্রলোক, ভাবল মাসুদ রানা। সামনে দাঁড়িয়েই দেখতে পেল ও, ইঁট বাঁধানো একটা সরু রাস্তা জেটি আর জেঙ্গারের বাড়ির পিছনটা যুক্ত করে রেখেছে।

বেল বাজাল মাসুদ রানা। সঙ্গে সঙ্গে খুলে গেল ওক কাঠের তৈরি ভারি, নিরেট দরজা। অ্যাপ্রন পরা এক বৃদ্ধাকে দেখা গেল সামনে। 'মিস্টার মাসুদ রানা?' ফ্যাসফেঁসে কণ্ঠে জানতে চাইল মহিলা।

'হ্যাঁ।'

'আসুন, স্যার।'

পথ দেখিয়ে সীটিংরূমে নিয়ে এল সে রানাকে। রুমটা দামী, কিন্তু পুরানো সব ফার্নিচারে ঠাসা। ঠিক মাঝখানে বড় একটা গদি মোড়া আর্ম চেয়ারে বসে আছেন এক বৃদ্ধ। পঁচাত্তরের কম হবে না তাঁর বয়স, অনুমান করল মাসুদ রানা। তবে দেহ এখনও বেশ শক্তপোক্ত, দেখে মনে হয় নিয়মিত ব্যায়াম করেন। একটা জানালার সামনে বসে আছেন তিনি। সাগর, নানটুকেট সাউণ্ড দেখা যায় ওখান

থেকে।

অপলক চোখে কিছু সময় ওকে দেখলেন বৃদ্ধ। হাত ইশারায় মুখোমুখি একটা সোফা দেখালেন। 'বসুন। আমি অ্যাডলফ জেঙ্গার।'

'ধন্যবাদ।' বসল মাসুদ রানা।

'প্রাইভেট একটা ইনভেস্টিগেটিং ফার্ম পরিচালনা করেন আপনি, সেরকমই কিছু একটা সম্ভবত বলছিলেন কাল টেলিফোনে, তাই না?'

'হ্যাঁ।'

কি ভেবে হাসল বৃদ্ধ। 'অনেক বছর হলো নিউ ইয়র্ক ছেড়েছি। মাঝেমধ্যে যেতে মন চায়, ইচ্ছে হয় দেখে আসি কেমন হয়েছে এখন শহরটা। কিন্তু ভয় লাগে যেতে। সাহস হয় না।'

'ভয় কেন?'

'ভীষণ ব্যস্ত শহর, আমাদের মত বুড়ো-হাবড়াদের একেবারেই বেমানান মনে হয় নিউ ইয়র্কে। নিউ ইয়র্ক হচ্ছে আপনাদের মত ইয়ংম্যানদের জন্যে। প্রাণ আছে যাদের, যৌবন আছে, উচ্ছলতা আছে, তাদেরই মানায় নিউ ইয়র্কে। আমরা হাঁটতে গেলে হয়তো বাসের ধাক্কা খাব, ট্যাক্সির গুঁতো খাব, সেই ভয়ে যাই না।'

অন্যমনস্ক হয়ে গেলেন বৃদ্ধ। মুখ ঘুরিয়ে সাগরের দিকে তাকালেন। একভাবে তাকিয়ে থাকলেন। 'দেখেছেন?' বিড় বিড় করে প্রশ্ন করলেন তিনি।

'কি?' সামান্য ঝুঁকল মাসুদ রানা।

'সাগর। মহাসাগর,' আবেগ কাঁপা কণ্ঠে বললেন জেঙ্গার। 'দেখুন, যতদূর দেখা যায় শুধু পানি আর পানি। ঢেউ আর ঢেউ।' ফোঁস করে দম ছাড়লেন বৃদ্ধ। আপনমনে মাথা দোলালেন। 'সময় হয়ে এসেছে। আর বেশি দেরি নেই। একদিন হঠাৎ করেই হারিয়ে যাব আমি, চলে যাব দীর্ঘ সাগর যাত্রায়। ডুব দিয়ে আর কোনদিন ফিরব না।'

বুঝল মাসুদ রানা, মৃত্যুর কথা বোঝাতে চাইছেন প্রাক্তন কাউন্সেলর। 'আপনাকে আমার যথেষ্ট সবল মনে হচ্ছে, মিস্টার জেঙ্গার।'

নেতিবাচক ভঙ্গিতে মাথা দোলালেন তিনি। 'ডাক এসে গেছে, বুঝতে পারছি আমি। সময় হলে সবাইকেই যেতে হবে, মিস্টার রানা। আমার সময় হয়ে গেছে। অনেক তো হলো, আর কত?' হঠাৎ করেই যেন সচকিত হলেন জেঙ্গার। 'সে যাক। আপনি আমার দর্শন শুনতে এতদূর ছুটে আসেননি। সরি। বলুন, কেন দেখা করতে চেয়েছিলেন আপনি আমার সঙ্গে?'

'আমি স্যান্ডলার পরিবার সম্পর্কে জানতে আগ্রহী।'

কোঁচকানো কপাল আরও কুঁচকে উঠল অ্যাটর্নির। 'স্যান্ডলার পরিবারের কোন বিষয়ে জানতে চান?'

'যাবতীয় কিছু। আপনি যা জানেন।'

'কেন? তাদের সম্পর্কে আপনার এ আগ্রহের কারণ কি?'

'ভিক্টোরিয়া স্যান্ডলার মারা গেছেন ক'দিন আগে।'

'জানি। খবরের কাগজ পড়ি আমি নিয়মিত। টিভিও দেখি।'

'মৃত্যুর কিছুদিন আগে ওই পরিবারের যাবতীয় দলিলপত্র আমার জিম্মায়

রেখে যান উইলিয়াম ওয়ার্ড ড্যানিয়েলস।'

'হোয়াট!' বসা থেকে প্রায় লাফিয়ে উঠলেন বৃদ্ধ। ভুরু কপালে চড়ে বসেছে 'আ-আপনার কাছে! কেন, আপনার কাছে কেন রেখে যাবে সে ওসব?'

ড্যানিয়েলসের সন্দেহের, আশঙ্কার বিষয়টা ব্যাখ্যা করল মাসুদ রানা।

শুনে চুপসে গেলেন অ্যাডলফ জেঙ্গার। 'আই সী! এতদূর গড়িয়েছিল? আশ্চর্য!'

'আপনি নিজেও এক সময়ে স্যান্ডলার এস্টেট দেখাশোনা করেছেন ড্যানিয়েলসের সাথে। নিশ্চয়ই অনেক কিছু জানেন আপনি ওদের ব্যাপারে।'

মাথা দোলালেন বৃদ্ধ। 'জানি। কিন্তু জানলেই আপনাকে বলব এমন মনে হলো কেন আপনার? অ্যাট এনি কস্ট, মক্কেলের গোপনীয়তা রক্ষা করা একজন উকিলের পবিত্র দায়িত্ব, জানেন না আপনি?'

'জানি।'

'তাহলে?' মাসুদ রানাকে চুপ থাকতে দেখে আবার বলে উঠলেন জেঙ্গার, 'ওসব দলিল সম্পর্কে আপনার ওপর কি নির্দেশ ছিল ড্যানিয়েলসের?'

'একটা সীলগালা করা খামে ছিল সব কাগজপত্র। ভদ্রলোক বলেছিলেন ভিক্টোরিয়ার মৃত্যুর পর যেন খামটা আমি খুলি। ওর মধ্যে একটা চিঠি আছে আমার জন্যে, ওতে বিস্তারিত লেখা আছে ওগুলো নিয়ে কি করতে হবে আমাকে।'

'তো?' চোখ কুঁচকে পলকহীন দৃষ্টিতে দেখছেন ওকে প্রাক্তন কাউন্সেলর। 'খুলেছেন ওটা আপনি?'

কি বলবে ভাবছে মাসুদ রানা। একটা মিথ্যে বললে তাকে ঢাকতে আরও দশটা মিথ্যে বলতে হবে। সে ঝুঁকি নেয়া ঠিক হবে কিনা বুঝে উঠতে পারছে না।

'ওয়েল?'

'ওটা এখনও খোলার সুযোগ হয়নি, মিস্টার জেঙ্গার। তবে…'

'তবে নিউ ইয়র্ক থেকে নানটুকেট পর্যন্ত ছুটে আসার সুযোগ ঠিকই হয়েছে। সত্যি কথাটা কেন স্বীকার করছেন না যে ওগুলো হাতছাড়া হয়ে গেছে, ইয়াংম্যান? বলছেন না কেন যে ওসব পুড়ে গেছে, আগুন লেগেছিল আপনার অফিসে? বলেছি তো, নিয়মিত খবরের কাগজ পড়ি আমি, টিভি দেখি! একটু আগে পর্যন্ত ওই অগ্নিকাণ্ডের বিষয়টাকে একটা বিচ্ছিন্ন ঘটনা জানতাম আমি। কিন্তু এখন বুঝলাম, সে ধারণা ভুল। ওই দলিলপত্রই অগ্নিকাণ্ডের কারণ। ভিক্টোরিয়া মরেছে, আপনার অফিস পুড়েছে, ওগুলো সব গেছে। ঘটনাগুলো একটার সঙ্গে আরেকটা যুক্ত, মিস্টার মাসুদ রানা। এই সামান্য বিষয়টা বুঝে… সে যাক। ওগুলো গেছে, ভাল হয়েছে। শাপে বর হয়েছে আপনার জন্যে, ইয়াংম্যান। আপনি জানেন না, স্যান্ডলার মানে বিপদ, স্যান্ডলার মানে মৃত্যু, স্যান্ডলার মানে বিষাক্ত কোবরা। ব্যাপারটা ভুলে যান, মিস্টার। আপনার ভাগ্য ভাল, বড় বাঁচা বেঁচে গেছেন আপনি। আমার মনে হয় ঈশ্বরের ইচ্ছে আরও কিছুদিন বেঁচে থাকুন আপনি। তাই আগুনের ছলে এর সঙ্গে জড়িয়ে পড়ার হাত থেকে রক্ষা করেছেন তিনি আপনাকে। বুঝেছেন? ওসব ভুলে যান। একেবারে ভুলে যান।'

বৃদ্ধের সতর্ক বাণীগুলো মনে মনে নাড়াচাড়া করে দেখল মাসুদ রানা। বোঝা

গেল আর্থার সম্পর্কে ভালই জ্ঞান রাখেন বৃদ্ধ। মৃদু, অথচ দৃঢ় কণ্ঠে বলল ও, 'আগুনটা যদি না লাগত, তাহলে এ বিষয়ে বিন্দুমাত্র আগ্রহ জন্মাত না আমার, মিস্টার জেঙ্গার। নিজের ঝামেলা নিয়েই অস্থির আমি, এ নিয়ে মোটেই মাথা ঘামাতাম না। কিন্তু এখন ঘামাতে বাধ্য হচ্ছি। কারণ আমার ধারণা, শুধু অফিসে আগুন লাগানোই নয়, আমাকে হত্যা করার চেষ্টাও নেয়া হয়েছিল ভিক্টোরিয়া যেদিন মারা যান, সেদিন রাতে।'

'কি বললেন?' গলা খাদে নেমে গেল অ্যাডলফ জেঙ্গারের।

'ঠিকই শুনেছেন। অল্পের জন্যে মিস করেছে হত্যাকারী।'

'মা-ই গড!' খানিক বিরতি। 'বুঝুন তাহলে!'

মাথা দোলাল মাসুদ রানা 'বুঝি। কিন্তু এই বোঝায় সন্তুষ্ট নই আমি, মিস্টার জেঙ্গার। আরও পরিষ্কার করে বুঝতে হবে সব আমাকে।'

'দুঃখিত। আমি কোন সাহায্য করতে পারব না আপনাকে। এত কিছু জেনে-বুঝেও আপনি সতর্ক হচ্ছেন না, আশ্চর্য! আসলে স্যান্ডলারদের সম্পর্কে এত আগ্রহের কারণ কি আপনার, বলুন তো!'

'আমার জায়গায় আপনি হলে আগ্রহী হতেন না?'

'না!' দ্রুত কয়েকবার মাথা ঝাঁকালেন বৃদ্ধ। 'মোটেই না। আইন ব্যবসায়ে পঞ্চাশ বছরের অভিজ্ঞ কেউ যদি আপনাকে যা বললাম, তার দশ ভাগের এক ভাগ আভাসও দিত আমাকে, সতর্ক হওয়ার তাগিদ অনুভব করতাম আমি অবশ্যই। নিজের পথ দেখতাম।'

'আমিও ঠিক তাই চাইছি।'

'বুঝলাম না।'

'একজনকে সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছি আমি। স্যান্ডলার পরিবারের সঙ্গে খুব সম্ভব সম্পর্ক আছে তার।'

নীরবে কিছু সময় ওকে পর্যবেক্ষণ করলেন বৃদ্ধ। 'কে সে?'

'একটা মেয়ে।'

'বুঝলাম। কিন্তু স্যান্ডলারদের সঙ্গে তার কি সম্পর্ক?'

'ভাবছি আপনাকে বলব কি না।'

অবাক হলেন বৃদ্ধ। 'কেন? বলবেন না কেন?'

'আপনি তো কিছুই বলছেন না আমাকে।'

এক মুহূর্ত ভাবলেন বৃদ্ধ। 'আচ্ছা, বেশ। আসুন তাহলে, কিছু তথ্য বিনিময় করি বরং আমরা। আপনি কিছু বলুন, আমি কিছু বলি। অল রাইট?'

'অল রাইট।' মনে মনে হাসল মাসুদ রানা।

'এবার বলুন মেয়েটি কে।'

'লেসলি ম্যাকঅ্যাডাম,' বৃদ্ধের চোখে চোখ রেখে বলল ও। 'আর্থার স্যান্ডলারের মেয়ে বলে দাবি করছে সে নিজেকে।'

হাঁ হয়ে গেলেন জেঙ্গার ধীরে ধীরে। অনেকক্ষণ পর হাসির ভঙ্গি করলেন তিনি, কিন্তু মনে হলো যেন কাঁদছেন। 'ওহ্, ক্রাইস্ট!' ফ্যাঁস ফ্যাঁস করে বলে উঠলেন বৃদ্ধ। 'অসম্ভব! এ হতে পারে না।'

'কেন হতে পারে না?'

'বৈধ বা অবৈধ, কোন সন্তান নেই স্যান্ডলারের। আমি খুব ভাল করেই জানি। বিয়ে করেনি লোকটা।'

'কিন্তু মেয়েটি যে-সব প্রমাণপত্র হাজির করেছে, তা পরীক্ষা করে প্রভাবিত হয়েছি আমি, মিস্টার জেঙ্গার।'

ঘন ঘন মাথা দোলাতে লাগলেন বৃদ্ধ। চোখ বুজে আছে। 'হতে পারে না। কোনমতেই হতে পারে না। আর্থার স্যান্ডলার অন্য চরিত্রের ছিল। পথে-ঘাটে জারজ সন্তান জন্ম দেয়ার জন্যে নিজের ঔরস খরচ করে বেড়াবার মত মানুষ ছিল না সে কোন কালেই। অসম্ভব!'

'মেয়েটি অবৈধ নয়।'

'আর বলতে হবে না। বৈধ সন্তানের তো প্রশ্নই আসে না, কারণ বিয়েই করেনি লোকটা।'

'সম্ভবত করেছিল, আপনাদের অজান্তে। হতে পারে না?'

'কোথায়!' চোখ গরম করে তাকালেন জেঙ্গার। 'কখন?'

'ব্রিটেনে। ১৯৫৯ সালে। ভালবেসে এলিজাবেথ নামে এক মেয়েকে বিয়ে করে সে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় পরিচয় হয় দু'জনের, এক্সিটারে।'

মুহূর্তের জন্যে ওর মনে হলো, থতমত খেয়ে গেলেন যেন অ্যাডলফ জেঙ্গার সন্দেহের কালি ঘনীভূত হলো তাঁর বাদামী দুই চোখে। অবশ্য সঙ্গে সঙ্গে সামলে নিলেন তিনি। মৃদু হাসলেন। 'ইংল্যাণ্ডে পরিচয়, না? দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়? একদম ডাহা মিথ্যে, মিস্টার রানা। শুধু ওই সময় কেন, জীবনে কোনদিন ওদেশে যায়নি আর্থার।'

'আপনি ঠিক জানেন?'

'অবশ্যই ঠিক জানি! যুদ্ধের সময় দেশত্যাগের কোন প্রশ্নই আসে না। কারণ স্যান্ডলাররা আসলে ছিল জার্মান, কেবল তিন পুরুষ ধরে আমেরিকান। সে সময়ে অভিবাসী জাপানী ও জার্মানদের ব্যাপারে যুক্তরাষ্ট্রের মনোভাব ছিল খুবই কঠোর। যে-ই সে সময়ে এ দেশ ত্যাগ করেছে, সে যে দেশের উদ্দেশেই হোক, তাকে আর ঢুকতে দেয়া হয়নি। স্পাই বলে সন্দেহ করা হত তাদের। নাগরিকত্ব বাতিল করে দেয়া হত। এমন অনেক পরিচিত মানুষের কথা জানি আমি, যারা যুদ্ধের সময় এ দেশ ত্যাগ করে আর ফিরে আসতে পারেনি। এ দেশে রক্ত পানি করে গড়ে তোলা বাড়ি-গাড়ি, সম্পদ হারিয়ে পথের ভিখিরিতে পরিণত হয়েছে তারা প্রত্যেকে। ইউ সী, আর্থার স্যান্ডলার ছিল এ দেশের প্রথম সারির ধনীদের একজন। তার দ্বারা সে সময়ে দেশ ত্যাগ করা কি সম্ভব মনে করেন আপনি? গেলে কি আর ফিরে আসতে পারত সে? স্যান্ডলার এস্টেটে মালিকানা বহাল থাকত তার?'

কি যেন ভাবল মাসুদ রানা। 'সত্যি কি তাই?'

'আমি তো তাই মনে করি।'

'কিন্তু দুঃখিত। আমি করি না।'

'না করার কোন বিশেষ কারণ আছে কি?'

'আছে।'
'যেমন?'
'আগ্রহের বসে দু'য়েকটা টেলিফোন করার লোভ সামলাতে পারিনি আমি।'
'টেলিফোন! কোথায় করেছেন?' কপাল বিশ্রীরকম কুঁচকে উঠল জেঙ্গারের।
'ব্রিটেনে। এক্সিটারে।'
কপাল সমান হয়ে গেল তাঁর। শীতল গলায় প্রশ্ন করলেন, 'কাকে? কেন?'
'আর্থার-এলিজাবেথের বিয়ে আর লেসলির বার্থ সার্টিফিকেট সম্পর্কে খোঁজ নেয়ার জন্যে।'
'ফলাফল?'
'ইতিবাচক। আর্থারের এলিজাবেথকে লেখা কিছু চিঠি আমাকে দিয়েছে লেসলি, ওগুলোর হাতের লেখা ভেরিফাই করব ভাবছি। প্রয়োজনে ব্রিটেনেও যাব আমি, ওই বিয়ের দুই সাক্ষী আর বিয়ে যিনি পড়িয়েছেন, সেই প্যাসটরের খোঁজে।'
'হোলি ক্রাইস্ট!' প্রায় গুঙিয়ে উঠলেন অ্যাডলফ জেঙ্গার। চোখ কপালে তুলে চেয়ে আছেন মাসুদ রানার নিরুদ্বিগ্ন মুখের দিকে। 'হোলি, হোলি ক্রাইস্ট!!'
লোকটির প্রতিক্রিয়া দেখে মনে মনে বিস্মিত হলো রানা। মুখের সমস্ত রক্ত গড়িয়ে নেমে গেছে বৃদ্ধের, কাগজের মত সাদা হয়ে গেছে চেহারা। চেয়ারের হাতলে পড়ে থাকা দু'হাত কাঁপছে মৃদু মৃদু। 'মাসুদ রানা, সাবধান! যদি প্রাণের মায়া থেকে থাকে, সাবধান হোন, প্লীজ!' মৃদু কাঁপা গলায় বলে চলেছেন জেঙ্গার। 'বোকামি করবেন না। সরে পড়ুন। জড়াবেন না এর সঙ্গে। কেউ প্রাণে বাঁচবে না, সবাই মরবে। সবাই মরবে!'
'সবাই কে?'
'আপনি!' তীক্ষ্ণ কণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠল সে। 'আমি! ওই মেয়েটি। ভুয়া বলে রেহাই পাবে না সে-ও।'
কিছু সময় চুপ করে থাকল রানা। 'তাই যদি হয়, তাহলে আর্থার স্যান্ডলার সম্পর্কে যা যা জানেন আপনি, সব বলতে হবে আমাকে। সব বলতে হবে। কোন কিছু গোপন করতে পারবেন না।'
ঋষির মত ধ্যানে বসলেন যেন অ্যাডলফ জেঙ্গার। মুখ ঘুরিয়ে নানটুকেট সাউণ্ডের দিকে চেয়ে থাকলেন একভাবে পলক পড়ছে না। রুগ্ন মানুষের মত অনিয়মিত ওঠানামা করছে বুক। নীরবতা পাথরের মত চেপে বসেছে ঘরের মধ্যে। 'সব শুনতেই হবে?' ফিস ফিস করে বললেন বৃদ্ধ এক সময়, যেন আর কেউ শুনে ফেলার ভয় আছে।
'হ্যাঁ। প্রথম কারণ, আমাকে হত্যা করার চেষ্টা নেয়া হয়েছে, আমার অফিস জ্বালিয়ে দেয়া হয়েছে। এবং দ্বিতীয় কারণ, এখন আমি বুঝতে পারছি কেন ওই পরিবারের দলিলপত্র আমাকে দিয়ে গেছেন ড্যানিয়েলস। কেন বলে গেছেন, ভিক্টোরিয়া স্যান্ডলারের মৃত্যুর পর প্যাকেটটা খুলতে।'
'কেন!'
'তিনি জানতেন, স্যান্ডলার সম্পত্তির আরেকজন উত্তরাধি-কারিণী আছে ভিক্টোরিয়ার মৃত্যুর পর সে যাতে তার ন্যায্য পাওনা বুঝে পায়, সেই জন্যে।'

'তাই যদি হয়, সে বেঁচে থাকতেই বা কেন আসেনি মেয়েটি? কে বাধা দিয়েছিল তাকে?'

'এর উত্তর আশা করছি আপনার কাছে পাব আমি। ওই প্যাকেটে ড্যানিয়েলসের আপনাকে লেখা একটা চিঠিও ছিল। তিনি মুখে বলে গেছেন, সময় মত প্রয়োজন হলে যেন আপনার সঙ্গে দেখা করি আমি। সো,' কাঁধ ঝাঁকাল মাসুদ রানা। 'বুঝতেই পারছেন!'

'না, পারছি না। সত্যিই পারছি না। আমি যেমন জানি, ড্যানিয়েলসও তেমনি জানত আর্থারের কোন সন্তান নেই। ভিক্টোরিয়াই ছিল ওই পরিবারের শেষ ওয়ারিশ আমার চেয়ে বরং বেশি জানত সে ওদের সম্পর্কে। তারপরও কেন...'

নীরবে বৃদ্ধকে পর্যবেক্ষণ করতে থাকল রানা।

'ঠিক আছে,' একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন জেঙ্গার। 'যা জানি আর্থার স্যান্ডলার সম্পর্কে সব বলছি আমি। কিন্তু তার আগে কথা দিন, এখান থেকে বেরিয়ে যাওয়ার পর এ নিয়ে আর খোঁচাখুঁচি করবেন না আপনি ভুলে যাবেন বিষয়টা।'

মাথা দোলাল ও। 'দুঃখিত। সব না শোনা পর্যন্ত কোন প্রতিজ্ঞা করতে পারব না আমি।'

হতাশ হলেন যেন বৃদ্ধ। 'গড হেলপ ইউ, ইয়াংম্যান! গড হেলপ ইউ!'

দরজায় এসে দাঁড়াল অ্যাপ্রন পরা বৃদ্ধা। 'আপনাদের লাঞ্চ তৈরি, স্যার।'

'চলুন,' রানার দিকে তাকিয়ে মাথা ঝাঁকাল জেঙ্গার 'খিদে পেয়েছে খুব রানাকে ইতস্তত করতে দেখে বলল, 'আপনি আসছেন জেনে আজ দু'জনের লাঞ্চ তৈরি করেছে মিসেস ক্ল্যানসি। আসুন, সঙ্কোচের কিছু নেই।'

'সব কিছুতেই অসাধারণ ছিল আর্থার স্যান্ডলার। কথাটা স্মরণ রাখবেন, জিনিয়াস ছিল সে একটা। শুধু অসাধারণ না, আরও কিছু বেশি ছিল আর্থার।'

খাওয়ার পাট চুকিয়ে সীটিং রুমে ফিরে এসেছে রানা ও অ্যাডলফ জেঙ্গার। আগের মত বসেছে মুখোমুখি। পায়ে শীত লাগছে, তাই দুই উরুর ওপর একটা ছোট আফগান কম্বল মেলে রেখেছেন বৃদ্ধ।

বলে চলেছেন তিনি, 'তার মত চতুর, ধূর্ত, হারামজাদা জীবনে দ্বিতীয়টি দেখিনি আমি। জিনিয়াস ছিল সে অসাধারণ জিনিয়াস।'

'কোন লাইনের জিনিয়াস?' জানতে চাইল মাসুদ রানা।

'বিশেষ কোন লাইনের না, সব লাইনের সব বড় বড় দাঁও মারত, ব্যবসার কথা বোঝাচ্ছি আমি কেমিক্যালস, ফিনান্স আর এনগ্রেভিঙের প্রতি আগ্রহ ছিল তার প্রচণ্ড। তিনটি ক্ষেত্রেই প্রায় বিপ্লবী জিনিয়াস ছিল আর্থার স্যান্ডলার।'

১৮৫০ সালে আর্থার ও ভিক্টোরিয়ার দাদা, ভিলহেলম ফন ড্রেইসেন স্যান্ডলার ভাগ্যের খোঁজে জার্মানি ত্যাগ করে নিউ ইয়র্ক আসেন হামবুর্গ ছিল তার জন্মস্থান। এদেশে এসেই ফ্যাব্রিক্সের ব্যবসা শুরু করেন ড্রেইসেন। ইউরোপ থেকে আমদানী করে আমেরিকান পাইকারদের কাছে বিক্রি করতেন তিনি ফ্যাব্রিক্স, পাঁচশো পার্সেন্ট মার্ক আপে। কিছুদিনের মধ্যেই বিস্তর পয়সার মালিক হয়ে যান ভদ্রলোক।

নিউ ইয়র্ক শহর তখন ক্রমেই বিস্তার লাভ করছে। মানুষ বাড়ছে, দালান-কোঠা বাড়ছে সুযোগের জন্যে অপেক্ষাকারীদের দলে নয়, ড্রেইসেন পড়েন সুযোগ সৃষ্টি করে নেয় যারা, তাদের দলে। বুঝে ফেললেন, ফেব্রিক্সের থেকেও অনেক বড় ব্যবসা তাঁর আশেপাশেই আছে। শহরের যেখানেই জমি বিক্রির খবর হয়, সেখানেই গিয়ে উপস্থিত হতে লাগলেন ড্রেইসেন। চোখ-কান বুজে জমি, বিল্ডিং কিনতে থাকেন। হাড় কিপটের মত জীবন ধারণ করতেন তিনি সে সময়ে।

মাত্র দশ বছরে মার্কিন মিলিয়নেয়ারদের মাঝে স্থান করে নেন ড্রেইসেন স্যান্ডলার। জীবনে দু'বার প্রেমে পড়েন তিনি, একবার এক নারীর, আরেকবার এক বিল্ডিঙের। ১৮৬৪ সালে বিয়ে হয় তার সুন্দরী এক মার্কিন মেয়ের সঙ্গে। নববধূকে নিয়ে হানিমুনে যান ভদ্রলোক ইউরোপের কয়েকটি দেশে। ফ্রান্সে বেড়ানোর সময় ওদের এক বিশাল শ্যাতো খুব পছন্দ হয় তাঁর, রীতিমত ওটার প্রেমে পড়ে যান ভদ্রলোক।

খোঁজ নিয়ে জানতে পারেন, ১৭৩০ সালে নির্মিত শ্যাতোটির বর্তমান মালিক ব্যারন আলেক্সেই ডি আর্টেনিস। তাঁর দাদার তৈরি এই শ্যাতো। যেচে পড়ে ব্যারনের আমন্ত্রণ আদায় করলেন ড্রেইসেন স্যান্ডলার, সস্ত্রীক ঘুরে দেখলেন ভেতরটা। দেখে মাথা খারাপ হওয়ার দশা। পরে দূত মারফত শ্যাতোটা কেনার প্রস্তাব পাঠালেন তিনি। ব্যারন অপমানিত হলেন, কোন জবাবই দিলেন না। আঁতে ঘা লাগল ড্রেইসেন স্যাণ্ডলারের। ফিরে এলেন তিনি নিউ ইয়র্ক।

ম্যানহাটন তখন ছিল শহরতলি, প্রায় গ্রামই বলা চলে। এর বর্তমান এইটি নাইনথ স্ট্রীটে বেশ বড় একটা প্লট ছিল তাঁর। প্রকাণ্ড সব পাইন-আখরোট ইত্যাদির ছায়াঢাকা প্লট। সেখানে নিজের শ্যাতো তৈরি করলেন ড্রেইসেন, অবিকল আর্টেনিসের শ্যাতোর মত করে। ১৮৭৭ সালে শেষ হয় ওটার নির্মাণ কাজ। এইটি নাইনথ স্ট্রীটের ব্যারন বনে যান ভিলহেলম ফন ড্রেইসেন স্যান্ডলার। ১৮৮০ সালে হার্ট ফেইলিওরে মৃত্যু হয় তাঁর।

দুই ছেলে এক মেয়ে ছিল তাঁর। বড় ছেলে সৈনিক, অবিবাহিত। ১৮৯৮ সালের উনিশ দিনের আমেরিকা-স্পেন যুদ্ধে মারা যান তিনি। দ্বিতীয়টি মেয়ে, থেরেসিয়া। বিকট চেহারা ছিল মহিলার, নিউ ইয়র্কে সবচেয়ে কুৎসিত ছিলেন তিনি। মুখমণ্ডল ছিল প্রায় ঘোড়ার মত। পয়সাওয়ালার মেয়ে হলেও কেউ তাঁকে বিয়ে করতে এগিয়ে আসেনি। ১৯৩২ সালে মৃত্যু হয় থেরেসিয়ার।

শেষেরজন ছিল ছেলে, জোসেফ। তাঁরই সন্তান ভিক্টোরিয়া ও আর্থার প্রথমজনের জন্ম ১৯১০, দ্বিতীয়জন, অর্থাৎ আর্থারের ১৯১৬ সালে। প্রথমটি আধা মানসিক প্রতিবন্ধী ছিল। আর্থার স্যান্ডলার? সে ছিল তীক্ষ্ণ বুদ্ধির মানুষ। শঠ, ধূর্ত, চতুর, সান অভ আ বিচ ধরনের। দাদার রেখে যাওয়া সম্পদ খুব একটা বাড়াতে পারেননি জোসেফ, তাই স্যাণ্ডলারদের অর্থ সঙ্কট দেখা দেয় ১৯৩৫ সালের শেষ দিকে। অতএব কাজে নেমে পড়ল আর্থার।

'কি কাজ?' প্রশ্ন করল মাসুদ রানা।

'কেমিক্যালস আমদানী। ছোটবেলা থেকেই কেমিস্ট্রির প্রতি ঝোঁক ছিল তার

খুব। বিশ বছর বয়সে এ ক্ষেত্রে জিনিয়াস হয়ে ওঠে আর্থার। ইউরোপ থেকে নানান কেমিক্যালস আমদানী করতে শুরু করে সে। দাদার মতই কয়েকশো পার্সেন্ট করে মুনাফা অর্জন করতে থাকে আর্থার প্রতিটি আইটেমে। ইউরোপের কোন কোন দেশ থেকে আমদানী করছিল জানতে চাইবেন না যেন।'

মাথা দোলাল রানা। 'ঠিক আছে। কোন কোন দেশ থেকে?'

মৃদু হাসি ফুটল জেঙ্গারের মুখে 'স্পেন, ইটালি, জার্মানি, পর্তুগাল।'

'সবগুলো ফ্যাসিস্ট শাসিত দেশ,' মৃদু কণ্ঠে বলল মাসুদ রানা। বাইরে পড়ন্ত সূর্যের আলো কয়েক মুহূর্তের জন্যে ঢাকা পড়ে গেল মেঘে। আবছা আঁধার হয়ে গেল বসার ঘর।

'আমেরিকা কোন আপত্তি তোলেনি তা নিয়ে, কারণ সরকার ফ্যাসিস্ট হলেও ওদের কেমিক্যালস ফ্যাসিস্ট ছিল না! ওগুলো আমেরিকানদের খুব প্রয়োজনে লেগেছে তখন। মাত্র কয়েক বছরে দাদার দশগুণ টাকা বানিয়ে ফেলল আর্থার স্যান্ডলার এই সময়, হঠাৎ করেই তার বিরুদ্ধে তদন্ত শুরু করে ফেডারেল সরকার। অভিযোগ তোলা হয়, লক্ষ করুন, অভিযোগ তোলা হয় যে আর্থার স্যান্ডলার, ইটালিয়ান লিরার আকস্মিক মূল্যবৃদ্ধির সাথে যে ভাবেই হোক, জড়িত। এটা অবশ্য ঠিক, যখনকার কথা, তখন বেশ বৃদ্ধি পেয়েছিল লিরার দাম।

'১৯৩৯ সালে কারেন্সি ম্যানিপুলেশনের ব্যাপারে তাকে সরাসরি অভিযুক্ত করে মার্কিন সরকার, মারাত্মক ধরনের মামলায় ফেঁসে যায় আর্থার স্যান্ডলার কয়েকটা ফ্রড চার্জ, একটা-দুটো নয়। মরীয়া হয়ে অবশ্যম্ভাবী জেল এড়ানোর জন্যে আইনের ফাঁক-ফোকর খুঁজতে থাকে সে, কিন্তু স্যান্ডলার পরিবারের তখনকার আইন-জীবীরা এ ব্যাপারে তাকে সাহায্য করতে পুরোপুরি ব্যর্থ হয়।

'আর্থারও লাগে উঠে-পড়ে। জেলে যাবে না সে। ওই দণ্ড ঠেকাতেই হবে। এবং শুধু ঠেকালেই চলবে না, মামলায় তাকে বিজয়ী করে দিতে হবে, তেমন এক যোগ্য উকিল চাই তার। ওয়েল,' হাসি ফুটল জেঙ্গারের মুখে। 'অবশেষে খুঁজে পেল সে তেমন এক উকিল। কয়েক মাস পর কোর্টে উঠল আর্থারের মামলা জিতে গেল সে। এক মামলা ছিল বটে সেটা। ওফ্! ভাবলে এখনও গায়ে কাঁটা দেয় আমার। একের পর এক অকাট্য যুক্তি, তথ্য প্রমাণ ইত্যাদি দেখিয়ে সরকারি উকিলকে প্রায় মেঝেতে শুইয়ে ফেলেছিল আর্থারের উকিল।'

'ড্যানিয়েলস?'

'অফকোর্স ড্যানিয়েলস! সে ছাড়া আর কে হতে পারে?'

'তারপর?'

'পরের বছর, ১৯৪০ সাল। ইউরোপের প্রায় দেশই জড়িয়ে পড়েছে যুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রও জড়িয়ে যায়-যায় অবস্থা, এই সময় আবার স্যান্ডলারের বিরুদ্ধে নতুন তিনটে অভিযোগ তোলে ফেডারেল সরকার। সবগুলো কারেন্সি ফ্রড কেস। তবে এবার সরকার কেসগুলো কোর্টে তুলতে আগ্রহ বোধ করল না। নভেম্বর মাসে, এক সকালে অফিসে রওনা হলো আর্থার। তার অফিস ছিল লোয়ার ম্যানহাটনে অফিস বিল্ডিঙের সামনে এসে থামল তার গাড়ি।

'গাড়ি থেকে নেমে সবে দু'পা এগিয়েছে সে, এমন সময় সিভিল ড্রেস পর

চার এফ.বি.আই ঘিরে ধরল তাকে। দু'জন দু'দিক থেকে আর্থারের কোটের আস্তিন টেনে ধরল। ঘটনা দেখে থমকে গেল পথচারীরা, তাকিয়ে থাকল অবাক চোখে। থতমত খেয়ে গেল আর্থার স্যান্ডলার। তৃতীয় এজেন্ট, গণ্ডারের মত স্বাস্থ্য লোকটার, এগিয়ে এসে তার কোটের ল্যাপেল দু'হাতে মুঠো করে ধরে শূন্যে তুলে ফেলল আর্থারকে। ফুটপাথ ঘেঁষে দাঁড়িয়ে ছিল তাদের গাড়ি, একটা ১৯৩৯ মডেলের প্যাকার্ড, ওটার পিছনের জানালার ওপর দড়াম করে আছড়ে ফেলল তাকে লোকটা।

'এত জোরে ফেলল যে গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে গেল জানালার কাঁচ। ভয় পেয়ে গেল আর্থার স্যান্ডলার, মুখ শুকিয়ে আমসি হয়ে গেল তার। হাত থেকে কখন ব্রিফকেসটা খসে গেছে টেরই পায়নি। চার নম্বর এফ.বি.আই দরজা খুলে দিল প্যাকার্ডের, ভেতরে ছুঁড়ে ফেলা হলো আর্থারকে। দু'জন বসল তার দু'পাশে, বাকি দু'জন সামনে। মুহূর্তে হাওয়া হয়ে গেল প্যাকার্ড। পথচারী, মানে ঘটনার প্রত্যক্ষ-দর্শীরা হাঁ করে চেয়ে থাকল ওটার গমনপথের দিকে। আর্থারকে তারা অনেকেই চেনে। তাকে কারা ধরে নিয়ে গেল তাই নিয়ে গবেষণায় মেতে উঠল সবাই।

'ওদিকে প্রমাদ গুনল অজানা শত্রু পরিবেষ্টিত আর্থার স্যান্ডলার। এরা কারা জানে না সে। কোথায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে তাকে সে ব্যাপারেও কোন ধারণা নেই। জিজ্ঞেস করবে কিনা ব্যাপারটা ভাবছে সে, এই সময় তাকে সতর্ক করে দিল বিশালদেহী এজেন্ট, "মুখ খুললে বিপদ হবে।" অতএব চুপ করেই থাকল আর্থার স্যান্ডলার। এফ.বি.আই-এর হেড অফিস, ডুয়েন স্ট্রীটের দিকে গেল না প্যাকার্ড, সোজা কার্ডিনাল হেইস প্লেসের ইউ.এস. কোর্টহাউসে গিয়ে ঢুকল। গাড়ি থেকে নামিয়ে এলিভেটরে করে নিয়ে আসা হলো তাকে ছয়তলায়। একটা বড় ঘরে ঢোকানো হলো।

'ভিতরে বিশাল এক স্টীলের ডেস্কের পিছনে বসা দেখল আর্থার লালমুখো একজনকে। লোকটা চেইন স্মোকার; নাম আর্চিবল্ড ম্যাকফেড্রিস "আমার ধারণা, আমাকে তোমার ধন্যবাদ দেয়া উচিত," বলল লোকটা আর্থারকে "কারণ আমি তোমাকে তোমার অ্যাটর্নিকে ফোন করার ঝামেলা থেকে বাঁচিয়ে দিয়েছি।"

'হাঁ করে তাকিয়ে থাকল আর্থার স্যান্ডলার। ঘরের আরেকজনের ওপর চোখ পড়েছে তার। এক কোণে চুপ করে বসে আছে লোকটা। এদিকে তাকাচ্ছে না। তার নাম উইলিয়াম ওয়ার্ড ড্যানিয়েলস—তারই পারিবারিক অ্যাটর্নি। নার্ভাস বোধ করল আর্থার, ওই লোক এখানে কেন? অমন চুপচাপ কেন বসে আছে সে? ম্যাকফেড্রিসের দিকে তাকাল আবার আর্থার স্যান্ডলার। এইবার তার চোখে পড়ল, লোকটার সামনে চারটে ডোশিয়ে আছে, একটার ওপর আরেকটা সাজানো

' "ড্যানিয়েলস!" খ্যাঁক করে উঠল লালমুখো। "ওকে বলো, কেন এখানে নিয়ে আসা হয়েছে ওকে।"

'বলল ড্যানিয়েলস। এটা ইউ.এস. স্পেশাল অ্যাসিসটেন্ট অ্যাটর্নির অফিস অ্যাটর্নি স্বয়ং অর্গানাইজড ক্রাইম ও র‍্যাকেট কেসগুলো ডীল করেন, আর অ্যাসিসটেন্ট অ্যাটর্নি, আর্চিবল্ড ম্যাকফেড্রিস পরিচালনা করেন অন্য কিছু—এসপিওনাজ। তাঁর জানামতে বেশ কিছু জাপানী ও জার্মান স্পাই আছে নিউ ইয়র্ক

ও ওয়াশিংটনে। তথ্য চালাচালি করে ওরা। তাদের চিহ্নিত করা গেছে, কিন্তু তাদের র‍্যাকেটে ইনফিলট্রেট করা যাচ্ছে না—র‍্যাকেটের উঁচু পর্যায়ে আর কি।

'আর্থার স্যান্ডলার যে লেভেলের মানুষ, সে যদি ইচ্ছে করে খুব সহজেই এ ব্যাপারে সাহায্য করতে পারে সে মার্কিন সরকারকে। আফটার অল সে আমেরিকার প্রথম শ্রেণীর মর্যাদাসম্পন্ন এক নাগরিক। আমেরিকার শত্রু নিধনে আর্থার যদি এই সামান্য সহযোগিতা করে, মার্কিন জাতি চিরদিন কৃতজ্ঞ থাকবে তার কাছে।

'অভাবনীয় প্রস্তাবটা শুনে চক্ষু চড়কগাছ হয়ে গেল আর্থার স্যাণ্ডলারের। আক্ষরিক অর্থেই হাঁ করে চেয়ে থাকল সে ড্যানিয়েলসের দিকে। কিন্তু তার দিকে চেয়ে নেই তখন আইনজীবী। বক্তব্য শেষ করেই মুখ নামিয়ে নিয়েছে সে, যেন লজ্জা পাচ্ছে।

' "এগুলো কি জানেন আপনি?" ইঙ্গিতে ডোশিয়েগুলো আর্থারকে দেখাল ম্যাকফেড্রিস। "জানেন?" দুম করে প্রচণ্ড এক ঘুসি বসাল সে ডোশিয়েগুলোর ওপর।

'কথা বলল না আর্থার। বসে থাকল মূর্তির মত।'

' "আপনার বিরুদ্ধে তিন-তিনটা কারেন্সি ভায়োলেশন কেস, স্যান্ডলার!" খুব যেন তৃপ্তি পাচ্ছে, এমন মুখভঙ্গি করল আর্চিবল্ড। "এবং একটা অ্যাডিশনাল রাষ্ট্রদ্রোহিতার কেস।"

'চেহারা ফ্যাকাসে হয়ে গেল আর্থারের। ঘন ঘন নিজের আইনজীবী ও ম্যাকফেড্রিসকে দেখছে সে। বুঝে উঠতে পারছে না কি বলবে, বা কি করবে।

' "জার্মানির সঙ্গে ট্রেডিং ১৯৩৮ সালেই বেআইনী ঘোষণা করা হয়েছে, স্যান্ডলার," চুরুটের ঘন ধোঁয়ার মেঘের আড়াল থেকে বলল ম্যাকফেড্রিস। "কোনও এক সুইস কর্পোরেশনের মাধ্যমে জার্মানির সঙ্গে ব্যবসা করেছেন বলে ভেবে বসবেন না যে পার পেয়ে যাবেন আপনি।"

' "অসম্ভব!" ফিস ফিস করে যেন নিজেকেই শোনাল আর্থার। "আপনাদের একটা মামলাও ধোপে টিকবে না।"

' "তাই ভাবছেন?" মুখ বেঁকে গেল চুরুটখেকোর। "আমরা এ-ও জানি, আপনার অ্যাটর্নি বন্ধু কি উপায়ে আপনার বিরুদ্ধে আনীত প্রথম ফ্রড কেস থেকে বাঁচিয়ে দিয়েছেন আপনাকে।"

'ড্যানিয়েলসের দিকে তাকাল স্যাণ্ডলার।

' "হ্যাঁ," মুখ কালো করে বলল অ্যাটর্নি। "এরা জেনে গেছে ওই কেসে আমি জুরি ট্যাম্পার করেছি।"

' "আপনারা যখন জুরি ট্যাম্পার করতে পারেন, আমরাও পারি," বলল ম্যাকফেড্রিস "ইচ্ছে করলেই বছর ত্রিশেক জেলের ভাত খাওয়াতে পারি আপনাকে, স্যান্ডলার। চল্লিশ বছরও সম্ভব। আর আপনার চোপা-সর্বস্ব অ্যাটর্নি বন্ধু, এর জন্যেও অন্তত দশ বছরের আয়োজন করতে পারি। ফল কি হবে তাতে? সব খোয়াবেন আপনি, জমি-জমা, ব্যাংক ব্যালান্স, সব। আধ-পাগল বোনটা ভাইয়ের শোকে মরবে ভেবে দেখুন।"

'ড্যানিয়েলসের দিকে ফিরল আবার আর্থার।

' "এরা নেগোশিয়েট করতে চায়," নিচু গলায় বলল অ্যাটর্নি। "আমার মনে হয় আপনার রাজি হয়ে যাওয়াই ভাল।"

' "কি করতে হবে আমাকে?"

' "জার্মানিকে অনেকের চেয়ে ভাল চেনেন আপনি," বলল চেইন স্মোকার। "জার্মান বলতে পারেন অনর্গল। ওদের সমাজ, ব্যবসা-বাণিজ্য এমনকি মিলিটারির উঁচু পদের অফিসারদের সঙ্গেও সহজেই সখ্যতা গড়ে তুলতে পারবেন। এদেশে যেসব জার্মান স্পাই আছে তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারবেন। ওরা জানে আপনি কে; আপনি ওদের হয়ে ওদের সাহায্য করার ভান করবেন। যদি আমরা ইউরোপের যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ি, জার্মানি পালিয়ে যাবেন আপনি। যুদ্ধের সময়টা থাকবেন ও দেশে, আমাদের তথ্য সরবরাহ করবেন। যুদ্ধ শেষ হলে ফিরে আসবেন, আপনার যাবতীয় সম্পত্তি ফিরিয়ে দেয়া হবে আপনাকে। প্লাস, আপনার সহযোগিতার বিনিময়ে যখন প্রয়োজন হবে, আঙ্কেল স্যামও সাহায্য করবে আপনাকে একবার কি দু'বার।"

'ঝাড়া দুই মিনিট লালমুখোর দিকে তাকিয়ে থাকল স্যান্ডলার। তারপর দাঁতে দাঁত পিষে বলল, "ইউ বাস্টার্ডস!" '

'তাহলে?' আপনমনে বলল মাসুদ রানা। জুরি ট্যাম্পারিঙের মাধ্যমে আর্থারকে জিতিয়েছিলেন ড্যানিয়েলস?'

'অবশ্যই!'

'আর্থার স্যান্ডলার কি করল তারপর?'

'শুরু করে দিল স্পাইং। মাত্র এক বছরের মধ্যে প্রমাণ করে দিল সে কত বড় এক জিনিয়াস। ১৯৪১ সালের নভেম্বরে সে নিজেকে নিউ ইয়র্ক জার্মান স্পাই নেটওয়র্কের দু'নম্বর ব্যক্তিত্বে পরিণত করল। তারপর লাগল এক নম্বর হওয়ার প্রচেষ্টায়। এক নম্বর ছিল কার্ল হানসিকার। খুব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকত লোকটা সব সময়, রোজ দু'বার গোসল করত। একদিন তার বাসায় গেল স্যান্ডলার, হানসিকারের সঙ্গে "গোপন পরামর্শ" করতে। সে রাতেই নিজের বাথটাবে মারা গেল এক নম্বর। টাবের পানি গরম করার হিটারের তার-টার কি করে রেখে এসেছিল স্যান্ডলার কে জানে! গোসল করতে নেমেই বিদ্যুৎপৃষ্ট হয়ে মারা গেল কার্ল হানসিকার

'এক নম্বর এজেন্ট বনে গেল স্যান্ডলার এরপর। ১৯৪২ সালে তাকে এবং আরও কয়েক শত্রুদেশের জার্মান এজেন্টকে "স্বদেশে" ডেকে পাঠাল বার্লিন। মেক্সিকো থেকে সাবমেরিনে চড়ে চলে গেল সে "স্বদেশে"।'

'কি করল সে জার্মানিতে?'

'জানি না। এই সব সাবমেরিন, বড় আজব জিনিস। এই সাউণ্ডে,' মুখ ঘুরিয়ে সাগর দেখালেন জেঙ্গার, 'ঘুর ঘুর করত ওরা। জার্মানরা। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়। সে সময়ে অনেক দিন পর্যন্ত এই এলাকা কর্ডন করে রেখেছিল ওদের ইউ-বোট দিয়ে।'

'ভিক্টোরিয়ার কি হলো?'

'সে একাই পড়ে রইল স্যান্ডলার ম্যানসনে।'

'এস্টেটের খরচ চলত কি ভাবে? এত টাকা আসত কোথেকে? ওদের অ্যাকাউন্ট নিশ্চয়ই ভিক্টোরিয়া পরিচালনা করতেন না?'

'কোন টাকাই ছিল না ওদের। খরচ চালাতাম আমরা দু'জন, আমি আর ড্যানিয়েলস। সমস্ত খরচ।'

'টাকা ছিল না মানে?' তাজ্জব হয়ে গেল মাসুদ রানা। 'তখন না বললেন...'

'হ্যাঁ, মনে আছে কি বলেছি। তবে আর্থারের অ্যাকাউন্ট তখন সত্যিই প্রায় শূন্য ছিল। শুনেছি জমির খাজনা দিতে দিতে ফোকলা হয়ে গিয়েছিল আর্থার। সে যত রোজগার করে, সব খেয়ে ফেলে রিয়েল-এস্টেট অ্যাসেসমেন্ট অথরিটি। অবশ্য যুদ্ধের পরে যখন দেশে ফিরে আসে আর্থার স্যান্ডলার, তখন মনে হয় এক জাহাজ ডলার নিয়ে আসে সে সঙ্গে করে। ডলার প্রায় উপচে পড়ছিল তার অ্যাকাউন্ট থেকে।'

'কে দিল তাকে এত টাকা! মার্কিন সরকার?'

'সঠিক জানি না। তবে শুনেছি যুদ্ধের সময় কোন অজ্ঞাত সূত্র থেকে মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার উপার্জন করে সে। আসল ব্যাপারটা ড্যানিয়েলস জানত। কিন্তু আমাকে কিছু বলেনি কখনও।'

আনমনে গালে হাত বোলাতে লাগল মাসুদ রানা। উঠে পায়ে পায়ে জানালার কাছে গিয়ে সাগর দেখতে লাগল। আর কি কি প্রশ্ন বাকি আছে, ভাবছে। '১৯৬৪ সালে যা'কে রাস্তায় হত্যা করা হলো, সে আসলে কে? স্যান্ডলার নয় নিশ্চই?'

চেহারা করুণ করে মাথা দোলালেন অ্যাডলফ জেঙ্গার, যেন দুঃখ পেয়েছেন খুব। 'না। আর্থারের "ডবল" ছিল লোকটা। ওই বছরের মাঝামাঝি সময়ে কি ভাবে যেন ফাঁস হয়ে যায় যে, যুদ্ধের সময় অস্ট্রিয়ায় বড় ধরনের এক স্যাবোটাজ ঘটিয়েছিল আর্থার স্যান্ডলার, যার ফলে মিত্র বাহিনীর হাতে চরম মার খেতে হয় একবার অক্ষ বাহিনীকে এ খবর জানাজানি হয়ে গেলে বার্লিনের নির্দেশে উত্তর আমেরিকা থেকে কয়েকজন জার্মান স্পাই নিউ ইয়র্ক আসে আর্থারকে হত্যা করার জন্যে। দু'বার তারা খুব অল্পের জন্যে ব্যর্থ হয় আর্থারের সতর্কতার কারণে। ব্যাপার টের পেয়ে আর্থার ম্যাকফেড্রিসের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করে। ওয়াদা অনুযায়ী সাহায্য করে সে। অবিকল আর্থারের মতই দেখতে আরেকজনকে স্থাপন করা হয় তার জায়গায়, আর আর্থার চলে যায় অসলো। তারপর একদিন রাস্তায় আর্থার ভেবে তার "ডবল"কে হত্যা করে জার্মান স্পাইরা। অসলোয় কয়েক মাস কাটিয়ে ফিরে আসে আর্থার স্যান্ডলার, নতুন নাম-পরিচয়, এবং নতুন চেহারা নিয়ে। প্লাস্টিক সার্জারি করিয়ে নিজেকে আমূল বদলে ফেলেছিল আর্থার স্যান্ডলার।'

'লোকটা বেঁচে আছে এখনও?' ফিরে এসে বসল রানা।

শীতল চোখে তাকালেন প্রাক্তন কাউন্সেলর। 'আপনার অফিসে আগুন এমনি এমনি লেগেছে বলে ভাবছেন আপনি?' কয়েক মুহূর্ত রানাকে দেখলেন তিনি। 'লেসলি ম্যাকঅ্যাডাম কে আমি জানি না, মিস্টার রানা। তবে এটুকু জানি, সে যা

দাবি করছে তা সম্পূর্ণ মিথ্যে। তাকে সিরিয়াসলি নিলে মারাত্মক ভুল করবেন আপনি। আর যতই চেষ্টা করুন, বহু বছর আগে যে মানুষ "অফিশিয়ালি" মরে গেছে, সে বেঁচে আছে এমনটা আপনি প্রমাণ করতে পারবেন না কিছুতেই।'

'চেষ্টা করলে হয়তো পারব,' চিন্তিত গলায় বলল মাসুদ রানা।

'বোকার মত কথা বলছেন আপনি, মাসুদ রানা!' খেপে উঠলেন বৃদ্ধ। 'ইচ্ছে করেই মরণ ডেকে আনছেন নিজের! আপনি কি ভেবেছেন, এত বছর পর আপনি আর কোথাকার কোন এক মেয়ে মিলে "মৃত" আর্থারকে "বাঁচিয়ে" তোলার চেষ্টা করবেন, আর সে বসে বসে দেখবে? নিজের নতুন পরিচয় ফাঁস হওয়ার ঝুঁকি নেবে?'

'কি করে ঠেকাবে সে আমাকে?'

'শুনুন তাহলে। এ ঘটনা ড্যানিয়েলসের মুখে শুনেছি আমি। নতুন পরিচয়, চেহারা নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রে ফিরে আসার পর সরকারের খুব উঁচু এক পদে যোগ দেয় সে। খুব উঁচু পদ। খুবই উঁচু, বুঝতে পারছেন? এতই উঁচুতে যে সারা দেশে মাত্র দু'জন জানত সে কে, কি তার আসল পরিচয়। জানত। বুঝলেন, সাহেব? জানত। তারা দু'জনেই খুন হয়ে গেছে যার যার বাড়িতে, একই রাতে। আর্থার দেশে ফেরার সাতদিনের মধ্যে। দু'জনকেই প্রায় জবাই অবস্থায় পাওয়া গেছে।'

'প্রায়?'

'হ্যাঁ। পিয়ানো তারের ফাঁস গলায় পেঁচিয়ে হত্যা করা হয়েছে তাদের

'কি বললেন?'

'ঠিকই শুনেছেন। জুতোর হিলের গোপন কুঠুরিতে ওই অস্ত্র নিয়ে প্রেতের মত নিঃশব্দে ঘুরে বেড়ায় আর্থার স্যান্ডলার। ফুট দেড়েক চিকন পিয়ানোর তার, দুটো পিতলের আংটায় জোড়া সে তারের দুই প্রান্ত। ওটা তার প্রিয় অস্ত্র। অবশ্য মানুষ হত্যার আরও বহু কায়দা জানা আছে আর্থারের। বহু কায়দা। এত কায়দা, আপনি কল্পনাও করতে পারবেন না হয়তো।'

মাসুদ রানাকে নীরবে হাসতে দেখে চোখ কোঁচকালেন অ্যাডলফ জেঙ্গার। 'কি ব্যাপার? হাসির কিছু বলেছি নাকি আমি?'

'না। তবে এইমাত্র আপনি প্রমাণ করলেন লেসলি ম্যাকঅ্যাডাম জেনুইন। অন্তত উল্টোটা প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত সে জেনুইনই থাকবে আমার কাছে। দুঃখিত, কাউন্সেলর। আপনার অনুরোধ রক্ষা করা সম্ভব হবে না আমার পক্ষে।'

'কি বলতে চান?' থমথমে কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন বৃদ্ধ।

'অসহায় মেয়েটিকে সাহায্য করা ছাড়া কোন উপায় দেখছি না আমি সামনে।'

ছয়

নিউ ইয়র্ক ফিরতে বেশ রাত হয়ে গেল। অ্যাপার্টমেন্টের দরজা খুলতে একটা সাদা খাম চোখে পড়ল মাসুদ রানার, পড়ে আছে মেঝেতে। ট্রাভেল ব্যাগ রেখে ওটা তুলল রানা। ছিঁড়ে ফেলল এক প্রান্ত। ভেতর থেকে বেরোল একটা হলুদ

টিকেট- ম্যাডিসন স্কয়্যার গার্ডেনে আগামী পরশুর রেঞ্জার্স বনাম বোস্টন ব্রুইনস-এর মধ্যেকার আইস হকি ফাইনাল খেলার। একটা চিরকুটও আছে সাথে। ওতে লেখা

প্রিয় মাসুদ রানা,

ওখানে থাকবেন দয়া করে। আমি আসব।
লেসলি ম্যাকঅ্যাডাম

টিকেটটা ওয়ালেটে রেখে দিল রানা। কিচেনে এসে কফির পানি চড়িয়ে অ্যাডলফ জেঙ্গারের কথা ভাবতে লাগল। আর্থার স্যান্ডলার সম্পর্কে ভাবতে লাগল। পরদিন সকালে হাঁটতে হাঁটতে থার্ড অ্যাভিনিউ এল রানা, নাইনটিনথ প্রিসিঙ্কট ভবনে মার্ক রাইডারের হত্যার তদন্তভার কার ওপর পড়েছে জেনে নিয়ে নক করল ডিটেকটিভ অ্যারাম সাশাদের বন্ধ কাঁচের দরজায়।

'কাম ইন!' মুখ তুলে রানাকে দেখল সাশাদ, তারপর মাথা ঝাঁকিয়ে ভেতরে আসার ইঙ্গিত করল।

'আমি মাসুদ রানা,' ডান হাত বাড়িয়ে দিয়ে বলল ও। 'থাকি দু'শো ছেচল্লিশ, সেভেনটি থার্ড স্ট্রীট। সিক্সথ ফ্লোর।'

এক মুহূর্ত সময় লাগল সাশাদের আগন্তুকের উল্লেখ করা নম্বর এবং স্ট্রীটের অবস্থান অনুধাবন করতে। 'বসুন, প্লীজ!' ডান দিকে বসা তার সহকর্মীকে দেখাল সে ইঙ্গিতে। 'প্যাটি হেরেন। ডিক। আমরা দু'জনে তদন্ত করছি আপনার বাসার সামনের মার্ডার কেস।'

হাত মেলাল রানা হেরেনের সঙ্গে। তারপর বসল। 'আপনি এসে ভালই করেছেন,' বলল সাশাদ। 'এইমাত্র আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি ওই বিল্ডিঙের সবার সঙ্গে দেখা করে বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করব। জাস্ট রুটিন ওঅর্ক।'

লোকটাকে দেখল মাসুদ রানা। ওর থেকে কম করেও আধ ফুট লম্বা হবে সাশাদ। পাশেও তেমনি। মুখটা প্রায় চাঁদের মত গোল, থ্যাবড়া। চেহারা দেখে মনে হয় গোঁয়ার প্রকৃতির। হেরেন তার চাইতে ইঞ্চি তিনেক খাটো। গোবেচারা চেহারা। হালকা পাতলা গড়ন। মাসুদ রানাকেও মাপল দুই ডিটেকটিভ।

'ঘটনার সময় বাসায় ছিলাম না আমি,' বলল রানা। 'পত্রিকার সব কথায় সব সময় আস্থা রাখতে পারি না, তাই ভাবলাম, দায়িত্বশীল ডিটেকটিভদের সঙ্গে দেখা করাই ভাল।'

'একা থাকেন?' প্রশ্ন করল হেরেন। 'না সস্ত্রীক?'

'আমি অবিবাহিত।'

'বান্ধবী?'

'আছে কি না জানতে চাইছেন?'

মাথা দোলাল সাশাদ। 'সাথে কেউ থাকে কি না।'

'না। একাই থাকি।'

'স্থায়ী বাসিন্দা?'

'অস্থায়ী।'

'আপনার পেশা?'

'এক প্রাইভেট ইনভেস্টিগেটিং কোম্পানির পরিচালক আমি। ব্যবসার খাতিরে প্রায়ই এ দেশে আসতে হয় আমাকে।'

'আপনি কোন্ দেশী?' জানতে চাইল হেরেন।

'বাংলাদেশী।'

'সে রাতে ঘটনার সময় বাসায় ছিলেন না আপনি?' প্রশ্ন করল সাশাদ।

'না।'

'অত রাতে কেন বেরিয়েছিলেন?'

'আমার অফিসে আগুন লাগার খবর পেয়ে।'

'রিয়েলি! কোথায় আপনার অফিস?'

'পার্ক অ্যাভিনিউ সাউথ।'

'ঠিক ক'টায় বাসা থেকে বেরিয়েছেন মনে আছে আপনার?'

'পরিষ্কার মনে আছে। ঠিক তিনটা পঁয়তাল্লিশে।'

বিস্মিত হলো দুই গোয়েন্দা। ঠিক হত্যাকাণ্ডের সময়ই ঘর ছেড়েছে লোকটা!

'আপনি শিওর?'

'একদম শিওর।'

'কি করে এত নিশ্চিত হচ্ছেন?'

'টেলিফোনের বেল শুনে ঘুম ভাঙে আমার। আমার অফিসের কাস্টডিয়ান অফিসে আগুন লাগার খবর দেয়ার জন্যে করেছিল ফোন। ঘুম ভাঙামাত্র ঘড়ি দেখি আমি, তিনটে চল্লিশ বাজে তখন। তৈরি হয়ে বেরোতে পাঁচ মিনিট মত লাগে আমার।'

'তাহলে সময়টার ব্যাপারে···আপনি শিওর, তাই না?' বলল হেরেন।

'হ্যাঁ।'

'বিল্ডিঙের সামনে কাউকে দেখেছেন তখন?'

'আমি সামনে দিয়ে বের হইনি। পিছন দিয়ে বের হয়েছি।'

'কেন?'

'ওই বিল্ডিঙের গ্যারেজ পিছনদিকে, সেভেনটি ফোর্থ স্ট্রীটে। গ্যারেজে ছিল আমার গাড়ি, তাই।'

'আই সী!' কলমের গোড়া দিয়ে দাঁতে তবলা বাজাল চিন্তিত সাশাদ। 'কোন শব্দ-টব্দও পাননি? কারও গলা অথবা পায়ের আওয়াজ?'

মুহূর্তের জন্যে চিন্তিত মনে হলো মাসুদ রানাকে।

'ইয়েস?

'হ্যাঁ, শুনেছি। আমার নিচতলার ভাড়াটে, এক মেয়ের গলা শুনেছি। কারও সাথে কথা বলছিল মেয়েটি।'

'কোন পুরুষের সঙ্গে?'

'হ্যাঁ।'

'কি বিষয়ে কথা বলছিল ওরা?'

'জানি না। শুনিনি। খুব তাড়ার ভেতর ছিলাম আমি।'

'মেয়েটি অল্প বয়সী?'

মাথা দোলাল মাসুদ রানা। 'হ্যাঁ।'

'পরিচয় আছে আপনার সঙ্গে?'

'দেখা হলে "হাই" বা "হ্যালো" বিনিময় হয়, এই পর্যন্ত।'

নোট বই বন্ধ করে হাসল সাশাদ। 'অনেক ধন্যবাদ আপনাকে। আমাদের পালা শেষ, এবার আপনি যদি কিছু জানতে চান, প্রশ্ন করুন। আফটার অল আপনি নিজেও একজন ডিক।'

পাঁচ মিনিট পর সন্তুষ্ট হয়ে বিদায় নিল মাসুদ রানা। কাঁচের দেয়ালের ওপাশে প্রস্থানরত মাসুদ রানার পিঠের দিকে তাকিয়ে ফোঁস করে দম ছাড়ল সাশাদ। 'কি বুঝলে?'

'লোকটার কথাবার্তায় গণ্ডগোল আছে।'

'অর্থাৎ ওর ওপর নজর রাখতে হবে?'

'হ্যাঁ। অবশ্যই! ব্যাটা আগ বাড়িয়ে সাধু সাজতে এসেছে!'

'আমার কি মনে হয় জানো?' বলল হেরেন।

'কি?'

'মাসুদ রানার কোন বান্ধবী হবে আসলে মেয়েটা, নিচ তলার মেয়ের কথা বানোয়াট। লোকটা ছিল না বাসায়, একা বান্ধবী ছিল। মার্ক রাইডার ওরই বাসায় ওরই বান্ধবীর সাথে কুকাজ করতে গিয়েছিল। সম্ভবত প্রি-প্ল্যানড ছিল ব্যাপারটা নিচে লোক রেখে উপরে উঠে আসে মাসুদ রানা, ভয় পেয়ে পালাবার চেষ্টা করে নিহত যুবক, এবং তারপর···বুঝতেই পারছ!'

হেরেনের প্লটটা মনে মনে খানিক নাড়াচাড়া করল সাশাদ। চেহারা উজ্জ্বল হয়ে উঠল তার। 'দি আইডিয়া!'

সোয়া সাতটায় ম্যাডিসন স্কয়্যার গার্ডেন পৌঁছল মাসুদ রানা। খেলা শুরু হতে আরও পনেরো মিনিট বাকি। গ্যালারি উপচে পড়ছে দর্শক। দুই পক্ষের নর্তন-কুর্দনরত টিনএজ ফ্যানদের চিৎকারে কান পাতা দায়। নিজের আসন খুঁজে বের করতে পাঁচ মিনিট লাগল রানার। এখনও পৌঁছায়নি লেসলি ম্যাকঅ্যাডাম। ওর পাশের আসন শূন্য।

গ্যালারি ঘিরে থাকা কাঁচের দেয়ালের ওপাশে মাঠের বরফ মসৃণ করার কাজে ব্যস্ত কয়েকটা হালকা রোলার। ওদিকে গোল পোস্ট ঠিক করার কাজ প্রায় শেষ। রিঙ্কের দুই মাথায় দুটো বড় ইলেক্ট্রোনিক ঘড়ি সময় নির্দেশ করে চলেছে ঘড়ি দেখছে রানা, মাঠের দিকে খেয়াল নেই এ খেলার 'খ'-ও বোঝে না সে।

আচমকা আকাশ ফাটিয়ে চেঁচিয়ে উঠল মাঠের দর্শক-সমর্থক। মাঠে ঢুকে পড়েছে প্রতিযোগী দুই দল। কয়েকটা মাইক্রোফোনে একসঙ্গে বেজে উঠল রবার্ট মেরিলের 'আমেরিকা দ্য বিউটিফুল' গানটা। কে যে চালু করেছিল 'হুজুগে বাঙ্গাল' কথাটা বিরক্ত হয়ে ভাবল মাসুদ রানা। দুনিয়ার সবচেয়ে হুজুগে জাতি হচ্ছে এরা,

আমেরিকানরা। কি সমস্ত আজেবাজে জিনিস নিয়ে এরা নাচে, দেখে অবাক লাগে। কিম্ভূত দেখতে লাগছে খেলোয়াড়দের, শিম্পাঞ্জির মত। স্টিক মাথার ওপর তুলে ধেই ধেই করে নাচছে প্রত্যেকে—ওয়ার্ম আপ করছে। বিরক্ত হয়ে মুখ ফেরাল রানা।

একটু পর বাঁশি বাজল, শুরু হয়ে গেল খেলা। অসহ্য লাগল ওর এক সময়; চলে যাবে কি না ভাবছে, এই সময় ওর উল্টোদিকের গ্যালারিতে মনে হলো যেন একটা পরিচিত মুখ দেখা গেল পলকের জন্যে। চোখ কুঁচকে ভাল করে তাকাল মাসুদ রানা। কে হতে পারে? আর দেখা গেল না তাকে। সাবধানে চোখের মণি ডানে-বাঁয়ে ঘোরাতে লাগল ও। দু'মিনিট পর আবার দেখা গেল মুখটা।

এবার তাকে চিনল মাসুদ রানা। প্যাটি হেরেন। ডিটেকটিভ। ওপাশের একটা আসনে বসে পড়েছে সে ততক্ষণে। মাঠ ছাড়া আর কোনদিকে খেয়াল নেই ঘড়ি দেখল রানা। এরই মধ্যে দশ মিনিট পেরিয়ে গেছে। ব্যাপারটা কি? আসবে না নাকি মেয়েটা? হেরেনের দিকে তাকাল মাসুদ রানা চোখাচোখি হলো। কেমন যেন থতমত খেয়ে গেল ডিটেকটিভ। ভুরু কুঁচকে ভাবল ও, এই মিয়ার ব্যাপারটাই বা কি? খেলা দেখতেই এসেছে, না ওকে দেখতে? পিছনে তাকায়নি মাসুদ রানা। তাহলে দেখতে পেত, ওর কয়েক সারি পিছনে বসে আছে আরও একজন, অ্যারাম সাশাদ।

পাশের সীট দুলে উঠতে ঘুরে তাকাল মাসুদ রানা। লেসলি ম্যাকঅ্যাডাম। 'দুঃখিত,' অপ্রতিভ চেহারা করে হাসল মেয়েটি। 'দেরি করে ফেললাম।'

স্বস্তি পেল রানা। বলল, 'দ্যাট'স অল রাইট। বসুন।'

পিছনে এক হাত নিয়ে স্কার্ট সোজা রেখে বসল লেসলি ফর্সা দুই হাঁটু যুক্ত করে। 'কেমন দেখছেন খেলা?'

'খেলা দেখছি না। দেখছি লাফালাফি। এ খেলার কিছুই বুঝি না আমি।'

'আমিও না।'

অবাক হলো মাসুদ রানা 'তাহলে…?'

'এত ভিড়ের মধ্যে কেউ অনুসরণ করতে পারবে না আমাদের, তাই। মনে হয়েছে এরকম জায়গাই উপযুক্ত হবে…।'

চ্যাপ্টা বলটা রেঞ্জারের বার পোস্টে লেগে ফিরে আসায় সমর্থকদের হতাশা মাখা হুঙ্কারে পরের শব্দগুলো চাপা পড়ে গেল লেসলির।

কিছু সময় চুপ থেকে আবার মুখ খুলল সে 'আপনার ভ্রমণ সফল হয়েছে নিশ্চই?'

চোখ কোঁচকাল রানা। 'কিসের কথা বলছেন?'

'নানটুকেট ভ্রমণের কথা।'

'মোটামুটি।' এ মেয়ে সে খবর জানল কি করে ভাবল ও।

'অর্থাৎ আমার ব্যাপারে এখনও পুরোপুরি নিশ্চিত হতে পারেননি আপনি?'

'দুঃখিত, না। আরও কিছু তথ্য জানতে হবে আমাকে

'সেদিন একটা কথা জিজ্ঞেস করব ভেবেও ভুলে গিয়েছিলাম

'কি কথা?'

'আমার বিশ্বাস ড্যানিয়েলসের রেখে যাওয়া কাগজপত্র আপনার হাতছাড়া

হয়ে গেছে ওগুলো পাওয়া না গেলে…'

'ওটা কোন সমস্যা হবে না।' প্রতিটা দলিলের রেকর্ড আছে, জানে মাসুদ রানা। একটু কষ্ট করলেই আরেক সেট জোগাড় করে নেয়া যাবে নির্ধারিত ফী দিয়ে

আমতা আমতা করতে লাগল লেসলি ম্যাকঅ্যাডাম। 'মাত্র দু'সপ্তার ছুটি নিয়ে এসেছি আমি। ফিরে গিয়েই থিসিস জমা দিতে হবে এদিকে শেষ সেমিস্টার মার যাচ্ছে। কি যে করি!'

'আশা করছি এর মধ্যেই একটা যা হোক মীমাংসা করে ফেলতে পারব। কোন চিন্তা করবেন না।' চাউনি তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল মাসুদ রানার। গ্যালারির একেবারে নিচের ওয়াকওয়েতে দাঁড়ানো এক লোকের দিকে তাকাল। সরাসরি ওদের দিকে তাকিয়ে আছে লোকটা।

লেসলিও লক্ষ করেছে ব্যাপারটা। মুহূর্তে তটস্থ হয়ে উঠল সে। 'ওই লোকটা…ওই লোকটা…!'

'অস্থির হবেন না,' মৃদু কণ্ঠে বলল রানা। 'এখানে ভয়ে…।' থেমে গেল ও। তড়াক করে উঠে দাঁড়িয়েছে লেসলি। ফ্যাকাসে হয়ে গেছে চেহারা। রানার কথা কানেই গেল না তার, ত্রস্ত পায়ে গেটের দিকে এগিয়ে চলেছে।

'শুনুন! দাঁড়ান!'

আমলই দিল না লেসলি। কয়েক পা গিয়েই ছুটতে শুরু করে দিয়েছে। রানাও উঠে দাঁড়াল। পিছু নিল তার। আবার গর্জে উঠল দর্শক, প্রতিদ্বন্দ্বীর গোলসীমার মধ্যে ঢুকে পড়েছে রেঞ্জার্স। এর মধ্যেও কিছু কিছু দর্শক খেয়াল করল ওদের ব্যাপারটা। করুণার হাসি ফুটল কয়েকজন পুরুষের মুখে। যে জন্যেই হোক, ভাবছে তারা, রেগেমেগে চলে যাচ্ছে বান্ধবী। মাসুদ রানা তাকে ফিরিয়ে আনতে বা শান্ত করতে ছুটছে।

পাত্তা দিল না ও, সরু ওয়াকওয়ে ধরে দ্রুত পায়ে এগোল। রানাকে বেশ খানিকটা পিছনে ফেলে দিয়েছে মেয়েটি, প্রায় পৌঁছে গেছে গেটের কাছে। চলতে চলতে ঘুরে তাকাল মাসুদ রানা। নিচের লোকটিও এগোচ্ছে গেটের দিকে। অবশ্য লেসলির অনেক পিছনে পড়ে আছে সে। বেশ অনেকগুলো ধাপ উঠতে হবে তাকে, তারপর নামতে হবে, তবেই পৌঁছতে পারবে গেটে। তারপর ঠিকমত এগোতেও পারছে না লোকটা। স্টেয়ারকেসেও প্রচুর দর্শক আছে। স্বেচ্ছাসেবী, গার্ডেন কর্তৃপক্ষের লোক, পুলিস। তাদের ফাঁক গলে এগোতে গিয়ে প্রতি পদে বাধা পাচ্ছে সে। শেষ সময়ে ওপাশে হেরেনকেও আসন ছাড়তে দেখল মাসুদ রানা।

বাঁক নিল মাসুদ রানা। দৌড়ে কয়েক ধাপ ওপরে উঠল, তারপর নামতে আরম্ভ করল। লেসলি আরও আগেই বেরিয়ে গেছে স্টেডিয়াম থেকে। বাইরে পা রেখেই মেয়েটিকে দেখতে পেল মাসুদ রানা। উর্ধ্বশ্বাসে ছুটছে। আবার ডাকল রানা। শুনলই না সে। রানাও দৌড় লাগাল এবার। কয়েক সেকেণ্ড পর পিছনে তিন জোড়া পায়ের আওয়াজ শুনতে পেল ও। কিন্তু তাকাল না।

এক ছুটে এইটথ্ অ্যাভিনিউ পৌঁছল লেসলি ম্যাকঅ্যাডাম, ব্যস্ত ট্রাফিকের

মধ্যে ঢুকে পড়ল পাগলের মত। সংঘর্ষ এড়াতে লাফিয়ে লাফিয়ে ওপারে যাওয়ার চেষ্টা করছে। ক্রমাগত ব্রেক আর হর্নের আওয়াজে সচকিত হয়ে উঠল অ্যাভিনিউ। পথচারীরা অবাক চোখে তাকিয়ে থাকল উন্মাদ মেয়েটির দিকে। আঁতকে উঠেছিল রানা দৃশ্যটা দেখে, তবে শেষ পর্যন্ত লেসলিকে আস্ত হাত-পা নিয়ে ওপারের সাইডওয়াকে উঠতে দেখে স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়ল।

সাইডওয়াকে এক ঝলক দেখা গেল তাকে, পরমুহূর্তে একটা পাঁচতলা হলুদ আর নীল সাইনবোর্ডে PARK লেখা বিল্ডিঙে ঢুকে পড়ল লেসলি। পাঁচতলা এক সেলফ সার্ভিস পার্কিং লট ওটা। এক মিনিট পর মাসুদ রানা ঢুকল লটে। সামনে একটা কাঁচের ঘরে বসে আছে বয়স্ক, মোটা এক লোক। পার্কের ম্যানেজার।

'একটা মেয়েকে ভেতরে ঢুকতে দেখেছেন?' জানতে চাইল মাসুদ রানা।

দাঁত বের করে হাসল লোকটা। 'অনেক মেয়েকে ঢুকতে দেখেছি, মন,' জ্যামাইকান অ্যাকসেন্টে বলল সে। 'এটা এইটথ্ অ্যাভিনিউ!' যেন এই থেকেই উত্তরটা পেয়ে যাবে প্রশ্নকারী, এমন এক ভঙ্গি করল সে।

'এইমাত্র ঢুকেছে মেয়েটা দৌড়ে। গলায় স্কার্ফ আছে।'

আবার হাসল সে হাত তুলে সিঁড়ি দেখাল। 'ওপরে গেছে। হ্যাপি ইভনিং, মন! হ্যাপি ইভনিং।'

এগোতে গিয়েও থেমে গেল মাসুদ রানা। পিছনের আওয়াজগুলো এসে পড়েছে। ঘুরে দাঁড়াল ও, একই মুহূর্তে ঝড়ের বেগে ভেতরে ঢুকল তিন ধাওয়াকারী। প্যাটি হেরেন এবং আরও দুই সাদা পোশাকধারী ওদের একজনকে সন্দেহ করেই পালিয়েছে লেসলি। দলটা ভেতরে ঢোকামাত্র পৌঁছল অ্যারাম সাশাদ। রানাকে সামনেই দেখে দাঁড়িয়ে গেল সে তারপর রাজকীয় ভঙ্গিমায় হেলেদুলে এগোল। হাতে ওয়াকি-টকি।

সাদা পোশাকের দু'জন ম্যানেজারের সঙ্গে কথা বলল নিচু গলায়। ঘুরে দাঁড়িয়ে সিঁড়ির দিকে চলল তারা, উঠতে শুরু করল ওপরে।

রানার সামনে এসে দাঁড়াল সাশাদ 'কোথায় গেল মেয়েটা?'

'কোন মেয়েটা?' পাল্টা প্রশ্ন করল ও।

'অ!' গম্ভীর হয়ে গেল ডিটেকটিভ। 'চিনতে পারছেন না?'

'আপনার পাশের সীটে খেলা দেখছিল যে মেয়ে,' বলল হেরেন। 'একটু আগেই এর ভেতর ঢুকতে দেখেছি তাকে আমরা। কোথায় সে?'

'আমার কাছে নেই। বিশ্বাস না হলে সার্চ করে দেখতে পারেন।'

'কথার মারপ্যাঁচ কষবেন না দয়া করে! বলুন, কোথায় সে?'

'জানি না। পালিয়ে গেছে আপনাদের ভয়ে। আপনারা ঘাবড়ে দিয়েছেন ওকে।'

কিছু বলতে যাচ্ছিল সাশাদ, যান্ত্রিক কণ্ঠে কথা বলে উঠল তার ওয়াকি-টকি।

'সার্জেন্ট, ওপরে আসুন,' বলল কণ্ঠটা। 'বোধহয় পেয়েছি আমরা ওকে।'

রানার দিকে তাকিয়ে মধুর হাসি দিল সাশাদ। ঘুরে সিঁড়ির দিকে চলল। পিছনে হেরেন। নীরবে তাদের অনুসরণ করল রানা। দোতলার এক্সিট র‍্যাম্পে দাঁড়িয়ে আছে নীল একটা পন্টিয়াক। গাড়িটাকে যেতে দিচ্ছে না প্রথম দুই

ডিটেকটিভ, পথ আগলে রেখেছে। এক পা ভেতরে, আরেক পা বাইরে রেখে দাঁড়িয়ে ওটার চালক। দীর্ঘদেহী, দামী ওভারকোট পরা বয়স্ক এক লোক। ভেতরের গ্রে-সুটটাও দামী তার। অপ্রস্তুত হয়ে দাঁড়িয়ে আছে লোকটা। আরও কয়েক জোড়া পায়ের শব্দে ঘুরে তাকাল সে।

'কি হয়েছে?' জানতে চাইল সাশাদ।

'সব ফ্লোর খুঁজে দেখেছি আমরা,' এক ডিটেকটিভ বলল। 'কোথাও নেই মেয়েটা।'

'তো?'

'ইনি চলে যাচ্ছেন। বললাম বুটটা খুলে দেখাতে আমাদের, কিন্তু ভদ্রলোক রাজি হচ্ছেন না।'

তার দিকে ফিরল সাশাদ। 'কেন খুলছেন না ওটা?'

'দেখুন, পেট্রোলম্যান...'

'ডি-টেক-টিভ!' ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে উঠল সাশাদ।

'সরি, ডিটেকটিভ,' সংশোধন করল লোকটা। 'দেখুন, আমি কোনও ক্রিমিনাল নই। তবু কেন আমার সঙ্গে এমন আচরণ করা হচ্ছে কিছুই বুঝতে পারছি না আমি।'

'আপনাকে বেশ অসন্তুষ্ট মনে হচ্ছে,' নরম গলায় মন্তব্য করল সাশাদ।

'অসন্তুষ্ট হওয়ারই কথা! আমি একজন ভদ্রলোক। আমি বলছি আমার বুট খালি, কিছু নেই ওতে। আপনাদের বিশ্বাস করা উচিত!'

'অবশ্যই বিশ্বাস করা উচিত,' মাথা ঝাঁকাল অ্যারাম সাশাদ। 'এবং আমি মোটেও অবিশ্বাস করছি না! কিন্তু তারপরও, যদি আমি ইনসিস্ট করি, আপনি কি ভদ্রতার খাতিরে হলেও বুটটা খুলে দেখাবেন না আমাদের?'

'ওহ্! দারুণ এক দৃশ্য!' পিছন থেকে বলে উঠল মাসুদ রানা, কণ্ঠে পরিষ্কার ব্যঙ্গ। 'কী অভিনয়! হাত তালি দিতে ইচ্ছে করছে আমার।'

এক যোগে ঘুরে তাকাল সবাই। 'কি?' হুঙ্কার ছাড়ল সাশাদ। 'মানে?'

'একজন ডেটেকটিভ নিরীহ এক নাগরিককে তার গাড়ির বুট খুলতে ইনসিস্ট করছেন, ওয়ারেন্ট ছাড়া,' চোখ মটকাল ও। 'তা-ও একজনকে সাক্ষী রেখে দারুণ নয়?'

খাই-খাই চোখে মাসুদ রানাকে দেখল কিছুক্ষণ সাশাদ তারপর হতাশ ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকাল। চোখ ইশারায় ডিটেকটিভ দু'জনকে সরে যেতে বলল সে এক মুহূর্ত পর রওনা হয়ে গেল পন্টিয়াক। হাসি মুখে রানাও ঘুরে দাঁড়াল, সিঁড়ির দিকে পা বাড়াল মাসুদ রানা চোখের আড়ালে চলে যেতে হাউমাউ করে উঠল হেরেন, 'তোমাকে বলিনি আমি? এই সেই মেয়ে, যার সঙ্গে সে-রাতে লটর পটর করছিল মার্ক রাইডার। এরা দুটোই দায়ী ওই খুনের জন্যে। অপরাধী না হলে শুধু শুধু কেন পালাল মেয়েটা? আমরা বাঘ না ভাল্লুক? খেয়ে ফেলতাম নাকি ওকে?'

সাশাদ কোন মন্তব্য করল না।

অ্যাপার্টমেন্টের দরজা খুলে ভেতরে ঢুকল মাসুদ রানা সুইচের দিকে ডান হাত

বাড়িয়ে অন্য হাতে দরজাটা বন্ধ করতে গিয়েও থেমে গেল। শির শির করে উঠল ওর সারা শরীর। কেউ আছে ঘরের মধ্যে। কে! কেমন একটা মিষ্টি গন্ধ পেল রানা নাকে।

দপ্ করে জ্বলে উঠল ঘরের আলো। ওর এক হাতের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে লেসলি ম্যাকঅ্যাডাম। অবাক হওয়ারও সময় পেল না মাসুদ রানা। বলে উঠল মেয়েটি, 'দরজাটা বন্ধ করে দিন প্লীজ!'

'ওয়েল!' দরজা লাগিয়ে ঘুরে দাঁড়াল ও। 'কে কার বাড়িতে অনধিকার প্রবেশের জন্যে দায়ী? আমি আপনার, না আপনি আমার?'

কথা হাতড়াতে লাগল মেয়েটি। 'আমি···মানে, দুঃখিত, রানা। আমি···।'

'ওভাবে পালিয়ে আসার কোন প্রয়োজন ছিল কি?'

'কি বলছেন আপনি!' চোখ বড় বড় করে বলল সে। 'ওই লোকটা নজর রাখছিল আমার ওপর, দেখেননি? আমার ধারণা আর্থার স্যান্ডলারের···'

'ওরা পুলিস ছিল।'

'অ্যাঁ? আপনি জানতেন?'

'জানতাম।'

'কিন্তু···?'

'আপনাকে নয়, ওরা আমাকে অনুসরণ করছিল আমার বিশ্বাস।'

'আপনাকে! কেন?'

'সেটা ওদের জিজ্ঞেস করে জানব ভেবেছিলাম, কিন্তু সময় দিলেন কই আপনি?'

কিছু সময় নীরব থাকল মেয়েটি। সন্দিগ্ধ। 'আপনি ঠিক বলছেন?'

'বেঠিক কেন বলতে যাব?'

আশ্বস্ত হলো লেসলি। 'ওহ্, গড! আর আমি কি না···!'

'এতবড় এক উপকার করলাম, অথচ এখনও একটা শুকনো ধন্যবাদও জানাননি কিন্তু আপনি বিনিময়ে।'

'কিসের?' বলেই বুঝল লেসলি, হেসে উঠল নিঃশব্দে। 'ও হ্যাঁ, দুঃখিত। ধন্যবাদ। কিন্তু এখন বুঝলাম কষ্টটা মাঠেই মারা গেল।'

বসল ওরা মুখোমুখি। 'আপনাকে পুলিস কেন অনুসরণ করছে বললেন না তো?' কাঁধের ব্যাগটা কোলের ওপর রেখে তার ওপর দুই হাতের ভর চাপাল মেয়েটি।

'কারণ একটা আছে অবশ্য। কিন্তু সে জন্যে ওরা আমাকে অনুসরণ করবে কেন বুঝে উঠতে পারছি না। সত্যিই বুঝতে পারছি না। সে যাক, আপনি আমার ঘরে ঢুকলেন কি ভাবে?'

'যে কোন তালা খুলতে ওস্তাদ আমি,' যেন কথার কথা, এমনভাবে বলল লেসলি।

'আপনার উদ্ধারকারী বন্ধুটি কে ছিলেন?'

'দুঃখিত, তার পরিচয় ফাঁস করতে পারব না।' একটু বিরতি। 'আসলে খুব ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম আমি। আমার জীবনটাই এমন, মাসুদ রানা, কাকে বিশ্বাস

করব আর কাকে করব না, সব সময় বুঝে উঠতে পারি না।' মাথা দোলাল সে 'ছি, ছি! শুধু শুধুই এত পণ্ডশ্রম করলাম!'

'করেই যখন ফেলেছেন, কি আর করা।'

নীরবতা।

'অ্যাডলফ জেঙ্গার আমার সম্পর্কে কি বলল? পজিটিভ কিছু, না নেগেটিভ?'

'নেগেটিভ।'

'কি?'

'আপনার অস্তিত্ব আছে মানতেই চায় না সে।'

কিছু বলতে যাচ্ছিল লেসলি ম্যাকঅ্যাডাম, টেলিফোন বেজে উঠতে চেপে গেল। 'আমি যখন ভেতরে ঢুকি তখনও বাজছিল ফোনটা। অনেকক্ষণ ধরে বেজেছে।'

কোন মন্তব্য না করে রিসিভার তুলল মাসুদ রানা। 'ইয়েস?'

'শওকত বলছি, মাসুদ ভাই। অনেকক্ষণ থেকেই আপনাকে ধরার চেষ্টা করছি।'

'বাইরে ছিলাম, দুঃখিত। বলো। কি ব্যাপার?'

'ওই ফিঙ্গারপ্রিন্টের ব্যাপারে।'

'হ্যাঁ। কি হয়েছে?' মুখ তুলে মেয়েটিকে দেখল রানা। টেবিল থেকে একটা ম্যাগাজিন তুলে নিয়ে পৃষ্ঠা ওল্টাতে শুরু করেছে সে। কিন্তু রানার মনে হলো কান পেতে আছে এদিকে। যদিও বুঝবে না কিছুই, কারণ বাংলায় কথা বলছে ওরা।

'প্রথমে ওটা নিয়ে স্টেট ডিটেকটিভ ব্যুরোতে গিয়েছিলাম।'

'তারপর?'

'ওখানে কিছু না পেয়ে পরে গেলাম এনওয়াইপিডি-র পুলিস প্লাজা ওয়ানের কম্পিউটারে, সেখানেও নেই কিছু।'

'তার মানে ক্লীন?'

'জ্বি না।'

'আই সী! বলে যাও।'

'ওদের সাহায্যে ওয়াশিংটনের ফেডারেল কম্পিউটরের সাথে পরে যোগাযোগ করতে গিয়ে অন্যরকম সাউণ্ড পেলাম।'

'তাই নাকি?' আবার লেসলির দিকে তাকাল মাসুদ রানা। পত্রিকা দেখছে সে মন দিয়ে। আসলে ভান করছে। হাত নড়ছে না তার। কান খাড়া করে বসে আছে।

'জ্বি। এদিকে বিকেলে এক ভিজিটরও এসেছিল আমার অফিসে। এফ.বি.আই।'

কপাল কুঁচকে উঠল মাসুদ রানার। 'তাই নাকি?'

'হ্যাঁ। লোকটার নাম পিট লেমন। এফ.বি.আই। ফেডারেল কম্পিউটরের সাউণ্ডিং ওয়াশিংটনে চমকে দিয়েছে নাকি সবাইকে। ওটা ক্লাসিফাইড ফিঙ্গারপ্রিন্ট। আমরা ওই ছবি আর ফিঙ্গারপ্রিন্ট কোথায় পেলাম ভেবে লেমনকে খুবই চিন্তিত মনে হয়েছে। আধ ঘণ্টা ধরে রীতিমত জেরা করেছে ব্যাটা আমাকে।'

'তারপর?'

'আমি উত্তর দেইনি বলে ভীষণ চটে গেছে আমার ওপর। আমি বললাম আমার সোর্স আমি তোমাকে জানাতে বাধ্য নই। লেমন হুমকি দিয়ে গেছে আমাকে দিয়ে তথ্যটা সে বের করিয়ে তবে ছাড়বে।'

'কি ভাবে বাধ্য করবে?'

'বলেছে, খুব শিগগিরি ফেডারেল কোর্টের অর্ডার নিয়ে ফেরত আসবে সে। ওতে সোর্স প্রকাশ করার নির্দেশ থাকবে আমার প্রতি।'

'আচ্ছা! এতই চমকে গেছে?'

'তাই তো দেখছি,' চিন্তিত কণ্ঠে বলল শওকত। 'লোকটা চলে যাওয়ার পর এফ.বি.আই-র এখানকার আমার এক বন্ধুর সঙ্গে দেখা করে বিষয়টা নিয়ে আভাসে ইঙ্গিতে কথা বলেছি আমি।'

'কি বলে সে?'

'কেবল দুটো শব্দ উচ্চারণ করল সে, "ড্রপ ইট"।'

'হুঁম! ঠিক আছে। ভাল করেছ। রাখি।' রিসিভার রেখে সিগারেট ধরাল মাসুদ রানা। অন্যমনস্ক।

'কার ফোন?' মুখ তুলল লেসলি।

'আমার এক বন্ধুর।'

উত্তরটা বিশ্বাস করবে কি না ভাবল একটু। 'প্রসঙ্গটা কি আমি?'

'কেন এমন মনে হলো আপনার?'

ঠোঁট উল্টে কাঁধ ঝাঁকাল লেসলি ম্যাকঅ্যাডাম। 'জানি না। তবে মনে হলো।'

'হ্যাঁ। ঠিকই ধরেছেন।'

'সত্যি করে বলুন, আমাকে অবিশ্বাস করেন আপনি?'

'বিশ্বাস বা অবিশ্বাস কোনটাই করতে আরম্ভ করিনি এখনও। আপনার জীবন বৃত্তান্ত শুনেছি আমি। জন্ম এবং আপনার বাবা-মার বিয়ের দলিল দেখেছি, বিশ্বাসযোগ্য মনে হয়েছে আমার ওগুলো। কিন্তু ভাবছি...!'

'কি ভাবছেন?'

'জেঙ্গার কেন বললেন আপনার দাবি ডাহা মিথ্যে? আপনি ভুয়া?'

'মিথ্যে কথা বলেছে লোকটা!' চেহারায় রাগ রাগ ভাব ফুটল লেসলির।

'ফেডারেল কম্পিউটারে আপনার ফিঙ্গারপ্রিন্ট কেন?'

মুহূর্তের জন্যে স্থির হয়ে গেল মেয়েটি। বাতাসে ভেসে বেড়াতে লাগল ওর প্রশ্ন। 'কোথায় পেলেন এ খবর? বন্ধু জানিয়েছেন?'

'হ্যাঁ।'

আবার কয়েক মুহূর্ত ভাবল সে। 'আর্থার স্যান্ডলার।'

'বুঝলাম না।'

'যে কোন মুহূর্তে আবার পিছু নেবে সে আমার।'

'কি করে?'

'সে সি. আই. এ-র ডীপ কভার এজেন্ট, অনেক অনেক উঁচুতে তার স্থান। সে-ই আমার প্রিন্ট সংরক্ষণ করেছে ফেডারেল ফাইলে, যাতে, যদি কখনও

পজিটিভ সাউন্ডিং আসে কোনদিক থেকে, সে আমাকে ধাওয়া করতে পারে। শেষ করে ফেলতে পারে। কারণ পৃথিবীতে আমিই তার এক ও একমাত্র শত্রু। সুযোগ পেলে আর্থারের অস্তিত্ব আমি ফাঁস করে দেব তা আর্থার খুব ভালই জানে। আপনাদের খোঁচাখুঁচির ফলে এটুকু অন্তত সে এখন জানে যে আমি নিউ ইয়র্কে আছি। আমি ভয় পাচ্ছি লোকটা হয়তো নতুন করে পিছু নেবে আমার।'

'এখনই যদি না-ও আসে, আপনি যখন তার সম্পত্তিতে থাবা বসাবেন তখন আর্থার এমনিতেই আসবে। ব্যাপারটা শুধু সময়ের, লেসলি। যদি ভুয়া না হয়ে থাকেন আপনি।'

'আমি ভুয়া নই,' দৃঢ় কণ্ঠে বলল লেসলি ম্যাকঅ্যাডাম।

সাত

লণ্ডন সময় ভোর সাড়ে ছ'টায় হিথ্রো পৌঁছল মাসুদ রানা। এয়ারপোর্টের এক কার রেন্টাল সার্ভিস থেকে একটা পিগট ভাড়া করল, ছুটল সোজা দক্ষিণ-পশ্চিমের নর্থ ফেনউইক, যেখানে সিকি শতাব্দী আগে বিয়ের বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিল আমেরিকান আর্থার স্যান্ডলার ও ব্রিটিশ এলিজাবেথ চ্যাটসওয়ার্থ।

নর্থ ফেনউইক খুদে এক মফস্বল শহর। ভিড়ভাট্টা, হৈ-চৈ একেবারেই নেই। ছবির মত সুন্দর, নিরিবিলি এক শহর। কল-কারখানার ধোঁয়া নেই, নেই ট্রাফিকের ব্যস্ততা। বাতাস এখানকার নির্মল, দূষণমুক্ত। তবে ঠাণ্ডা প্রচণ্ড। সব বাড়ির চিমনি দিয়ে ধোঁয়া উড়ছে। পঞ্চদশ শতাব্দীতে তৈরি বাদামী পাথরের গুরুগম্ভীর চেহারার সেন্ট জর্জে'স চ্যাপেল খুঁজে পেতে বিশেষ বেগ পেতে হলো না রানাকে।

ওটার গেটের বাইরে, বড় রাস্তায় পিগট পার্ক করল ও। সামনের সবুজ লনের মাঝের সুরকি বাঁধানো পথ ধরে হেঁটে এগোল। ভেতরটা তেমন উষ্ণ নয়। প্রায় বাইরের মতই ঠাণ্ডা। মৃদু আলোয় আলোকিত প্রার্থনা হল। কেউ নেই ভেতরে, একদম ফাঁকা। দু'দিকে কুশনমোড়া কাঠের বেঞ্চ, মাঝখানে সরু রাস্তা। পায়ে পায়ে বেদীর দিকে এগিয়ে চলল মাসুদ রানা।

বাঁ দিকের দেয়ালে, উঁচুতে, ধপধপে সাদা পাথরের একটা মূর্তি। সেন্ট জর্জে'স চ্যাপেলের প্রতিষ্ঠাতা জর্জ লরিকের প্রতিকৃতি। তাঁর পায়ের পাথুরে জুতোর ডগায় লেখা আছে তাঁর জন্মমৃত্যুর সময়কাল। ১৪৭০–১৫৪৫। সামনের বেদীটার দিকে নজর দিল মাসুদ রানা। ওখানেই অনুষ্ঠিত হয়েছিল বিয়েটা. লেসলির মা ও বাবার, যদি তার কথা মিথ্যে না হয়ে থাকে।

ডানদিকের দেয়ালে ঝোলানো কাঠের বড় এক নেমপ্লেটের ওপর চোখ বোলাল মাসুদ রানা। এর প্যাসটরদের নাম লেখা আছে ওতে। ব্যগ্র চোখে নজর বোলাল ও প্লেটটার ওপর। নিচের দিকে এসে আটকে গেল রানার দৃষ্টি। নামটা পরিষ্কার লেখা আছে–জোনাথন ফিলিপ মুর, প্যাসটর, ১৯৩৭–১৯৬৩। ওর পর আরও দু'জনের নাম আছে, শেষ নামটা বর্তমান প্যাসটরের।

গির্জা থেকে বেরিয়ে টাউন হলে এল মাসুদ রানা। রেকর্ড কীপার এক বয়স্ক মহিলা। খাটো, মোটা। মুখের চামড়া কোঁচকানো। পুরু দুটো উলের জাম্পার পরে আছে সে। মহিলার অনুমতি নিয়ে টাউন রেকর্ড নিয়ে পড়ল রানা, জন্ম, বিয়ে ইত্যাদির রেকর্ড। লম্বা একটা কাঠের টেবিলে বসল ও, ব্যস্ত হাতে রেজিস্টারের পাতা ওল্টাতে লাগল। দূর থেকে সন্দিগ্ধ চোখে রানাকে লক্ষ করছে বুড়ি কীপার।

ম্যারেজ রেজিস্টারের ১৯৫৯ সালের তালিকা বের করল মাসুদ রানা। তারপর বের করল অক্টোবর মাস। তিনটে বিয়ে অনুষ্ঠিত হয়েছে সে মাসে। শেষেরটি লেসলির বাবা-মার। লেখা আছে গোটা গোটা হস্তাক্ষরে বিবাহিত– আর্থার এডওয়ার্ড স্যান্ডলার, নিউ ইয়র্ক, যুক্তরাষ্ট্র–এলিজাবেথ অ্যান চ্যাটসওয়র্থ, টিভারটন, ডেভন, গ্রেট ব্রিটেন। ২০ অক্টোবর, সকাল ১০টা।

প্রয়োজন নেই, তবু পুরোপুরি সন্দেহমুক্ত হওয়ার জন্যে চামড়া বাঁধানো লেজারটা উল্টেপাল্টে দেখল মাসুদ রানা। ঠিকই আছে। এটা নিঃসন্দেহে আসল। এবং প্রতিটি এন্ট্রিও তাই, ভুয়া হওয়ার সম্ভাবনা একেবারেই নেই। চোখ তুলতেই বৃদ্ধাকে নিবিষ্টমনে ওকে পর্যবেক্ষণ করতে দেখল মাসুদ রানা।

'মৃতদের নামের তালিকা কোথায় পাব?'

'মৃত?' খ্যাঁক করে উঠল বুড়ি তীক্ষ্ণ গলায়। 'ওই লেজারেই।'

'অ্যালফাবেটিক্যাল অর্ডারে?'

'না।'

এবার 'ডেথ সেকশন' খুঁজে বের করল মাসুদ রানা। আর্থার–অ্যান বিয়ের সার্টিফিকেটের একটা ফটোকপি নিয়ে এসেছিল ও সঙ্গে করে। লেসলির মুখে শুনেছে রানা, তখনকার প্যাসটর বা ওদের বিয়ে অন্য দুই সাক্ষীর কেউ বেঁচে নেই। নিশ্চিত হওয়া দরকার। সেকশনের পুরোটাই ঘাঁটতে হলো ওকে। এবং পাওয়াও গেল নামগুলো। সর্বশেষ সাক্ষী, ডেভিড স্কাউলার, চার বছর আগে মারা গেছে। ওর ব্যস্ততার ফাঁকে দুপুর গড়িয়ে গেল।

টাউন হল থেকে বেরিয়ে এক রেস্তোরাঁয় লাঞ্চ খেলো মাসুদ রানা। তারপর হাজির হলো টাউন ক্লার্ক-এর অফিসে। সমস্ত জন্ম এখানেই রেকর্ড করা হয়। যা জানা প্রয়োজন আধ ঘণ্টার মধ্যে জেনে নিল রানা। ১৬ আগস্ট, ১৯৬০ সালে এখানকার আলটিংহ্যাম হসপিটালে এক কন্যা সন্তানের জন্ম দেন এলিজাবেথ অ্যান চ্যাটসওয়ার্থ, আর্থার স্যান্ডলারের স্ত্রী। মেয়ের নাম লেসলি স্যান্ডলার।

খুব ইচ্ছে হলো রানার এক্সিটার থেকে ঘুরে আসে একবার। দেখে আসে লেসলিদের বাসভবন, তার মায়ের সেই পাব। কিন্তু সময় নেই। তাড়াতাড়ি লণ্ডন ফিরে যেতে হবে। সন্ধে সাড়ে সাতটায় হিথ্রো পৌঁছল মাসুদ রানা। পিগট ফেরত দিয়ে একটা পাবলিক ফোন বুদে ঢুকল। লেসলির দেড় দশকের অন্ধকার জীবন ঘুরপাক খাচ্ছে ওর মাথার মধ্যে। সত্যিই কি এতগুলো বছর প্রাণের ভয়ে পালিয়ে পালিয়ে বেড়িয়েছে মেয়েটি? নাকি...।

ইন্টারন্যাশনাল অপারেটরের মাধ্যমে সুইটজারল্যাণ্ডের ডিরেক্টরি অ্যাসিসটেন্সের সাহায্য চাইল মাসুদ রানা। ওর প্রশ্নের উত্তরে দু'মিনিট পর জানানো হলো, ভিভিতে জর্জ ম্যাকঅ্যাডাম নামে কেউ নেই। অনুরোধে এরা

ঠেকিও গেছে কখনও কখনও। মাসুদ রানার আবেদনে খানিক আঁইগুঁই করে কাজে লেগে পড়ল ডিরেক্টরি অ্যাসিসটেন্ট। রিসিভার ধরে প্রতীক্ষা করতে করতে সাহায্যপ্রার্থী মাসুদ রানা বিরক্ত হয়ে উঠলেও সাহায্যকারী হাল ছাড়ল না।

ঝাড়া পনেরো মিনিট পর সাড়া দিল অপর প্রান্ত। হ্যাঁ, জানাল লোকটা, পাওয়া গেছে জর্জ ম্যাকঅ্যাডামকে। লুটরি থাকেন ভদ্রলোক, ১৬, রু ডি পডাক্স-এ। জায়গার নামটা শোনামাত্র চিনল মাসুদ রানা, নামে চিনল আর কি! এই শহরেরই কোন এক বোট বেসিনে চাকরি নিয়েছিল লেসলি। কলটা প্রেস করার অনুরোধ জানাল মাসুদ রানা, তারপর কি কি বলবে, মনে মনে মহড়া দিতে লাগল। ম্যাকঅ্যাডামই একমাত্র জীবিত ব্যক্তি, অন্তত এখন পর্যন্ত, যিনি লেসলির কাহিনী কনফার্ম করতে পারেন।

রিং বাজছে ও প্রান্তে, আওয়াজটা একদম পরিষ্কার। বেজেই চলেছে। তিনবার। চারবার। তারপর আবার। ধরছে না কেউ। অবশেষে সপ্তম রিঙে সাড়া দিল একটা বাজখাঁই কণ্ঠ। ব্রিটিশ অ্যাকসেন্ট, কোন ভুল নেই তাতে। 'জর্জ ম্যাকঅ্যাডাম?' প্রশ্ন করল মাসুদ রানা।

'আপনি কে?'

'আমার নাম মাসুদ রানা। লণ্ডন থেকে বলছি আমি।'

'কি প্রয়োজন আমাকে আপনার?' চাঁছাছোলা প্রশ্ন বৃদ্ধের।

'আমি লেসলির বন্ধু। ওর ব্যাপারে আপনার সঙ্গে কিছু বলতে চাই আমি।'

দীর্ঘ নীরবতা। 'লেসলির বন্ধু? কি করেন আপনি?'

'ব্যবসা করি।'

'কোথায়?'

'নিউ ইয়র্কে।'

'হুঁম! তো কি? লেসলির ব্যাপারে কি বলতে চান আপনি?'

'ওকে আমি সাহায্য করতে চাই। কিন্তু কোন পদক্ষেপ নেয়ার আগে আপনার সঙ্গে আমার দেখা হওয়া জরুরী। লেসলির অতীত জানতে চাই আমি।'

'তাতে আপনার লাভ?'

'আমার লাভের জন্যে ফোন করিনি আমি, মিস্টার ম্যাক, আমি লেসলির লাভের কথা ভেবে ফোন করেছি। এর সঙ্গে লেসলির আইনগত দাবির বিষয় জড়িত।'

আবার কিছু সময় নীরব থাকল লাইন। 'পুওর লেসলি! কিন্তু এ নিয়ে টেলিফোনে কোন কথা বলতে চাই না আমি। কিছু জানতে হলে এখানে আসতে হবে আপনাকে।'

'আমিও সেটাই চাইছি।'

'অল রাইট।'

চারদিকে উঁচু ইটের দেয়ালঘেরা শানদার এক ভিলায় থাকে জর্জ ম্যাকঅ্যাডাম কালো রং করা স্টীলের গেট। ভিলাটা জেনেভা লেকের উত্তরের এক পাহাড়ে গেটে কোন নেম প্লেট দেখতে পেল না মাসুদ রানা মেইল পটেও নাম নেই

বাড়ির মালিকের। এমনকি কোন কলিংবেলও নেই।

উঁচু হয়ে ভেতরে তাকাল ও। নাহ্, দেখা গেল না কাউকে। বাধ্য হয়ে নিজেই গেটের ল্যাচ খুলল রানা, এক পাল্লা সামান্য ফাঁক করে ঢুকে পড়ল ভেতরে। গেট বন্ধ করে ভিলার দিকে এগোল ও। গেট এবং ভিলার মাঝামাঝি পৌঁছেছে, এই সময় আওয়াজটা কানে এল, থমকে দাঁড়িয়ে গেল মাসুদ রানা। বিশাল দুটো জার্মান শেফার্ড কোত্থেকে ছুটে এসে পথ আগলে দাঁড়িয়েছে। আঁতকে উঠল রানা। কি করবে ভেবে পাচ্ছে না।

চাপা গলায় গজরাচ্ছে, ঠোঁট সরে গিয়ে ভয়ঙ্কর দাঁত বেরিয়ে পড়েছে ওদের। ঝাঁপ দিল বলে। এই সময় ভেতর থেকে ভেসে এল একটা ক্রুদ্ধ হুঙ্কার, সঙ্গে সঙ্গে জমে গেল দুই শেফার্ড। ভিলার বন্ধ দরজা খুলে গেল। শব্দ শুনে চোখ তুলল মাসুদ রানা। দোরগোড়ায় হুইল চেয়ারে বসা প্রকাণ্ডদেহী এক বদরাগী চেহারার বৃদ্ধ রানাকে দেখছে অপলক চোখে। এক মুহূর্ত পর আবার এক দুর্বোধ্য হুঙ্কার ছাড়ল সে, গুটি গুটি পায়ে মনিবের কাছে ফিরে গেল কুকুর দুটো।

'মাসুদ রানা?'

'হ্যাঁ।'

'আসুন।'

বৃদ্ধের ওপর চোখ রেখে এগোল মাসুদ রানা। বিরাট মুখ জর্জ ম্যাকঅ্যাডামের। টকটকে লাল চেহারা। চাউনি কঠোর, নির্দয়। বাদামী রঙের হেরিংবোন জ্যাকেট পরে আছে লোকটা। গায়ে সাদা শার্ট, গলায় রেজিমেন্টাল টাই। তার দু'পাশে ঠাঁই গেড়ে বসেছে ভয়ঙ্কর দর্শন কুকুর দুটো। ওগুলোকেও দেখল মাসুদ রানা।

'আপনি একা?'

মাথা দোলাল ও। 'হ্যাঁ।' বৃদ্ধের ছয় ফুটের মধ্যে পৌঁছে গেছে মাসুদ রানা।

'থামুন!' কর্কশ গলায় বলল জর্জ ম্যাকঅ্যাডাম।

'কি ব্যাপার?' বিস্মিত হলো ও।

'আপনাকে সার্চ করব আমি।'

'কেন?'

'আপনার আপত্তি আছে মনে হয়?'

'না না, কিসের আপত্তি? কিন্তু তার কি কোন প্রয়োজন আছে?'

'আপনার না থাকতে পারে, আমার আছে। দয়া করে হাত দুটো তুলুন মাথার ওপর।'

'আমার কাছে একটা পিস্তল আছে,' উপায় নেই দেখে আগেভাগেই জানিয়ে দিল রানা।

সঙ্গে সঙ্গে চেহারা বিগড়ে গেল বৃদ্ধের। 'কেন?' রীতিমত চার্জ করল সে। চাউনিতে দোদুল্যমান সন্দেহ। 'পিস্তল কেন?'

'লাইসেন্স করা পিস্তল,' তাড়াতাড়ি লোকটাকে আশ্বস্ত করতে চাইল মাসুদ রানা। 'আমি ব্যবসায়ী। তাই ব্যক্তিগত নিরাপত্তার জন্যে সব সময় সঙ্গে রাখি ওটা। যদি বলেন, আমিই বের করে দিতে পারি।'

'কোন দরকার নেই। আমি নিচ্ছি।' ত্রিশ সেকেণ্ড পর মোটামুটি সন্তুষ্ট হলো লোকটা। ওয়ালথার দোলাতে দোলাতে বলল, 'যাওয়ার সময় ফেরত পাবেন এটা। আসুন, ভেতরে আসুন। তবে দয়া করে সতর্ক থাকবেন। কুকুর দুটো প্রতি মুহূর্তের জন্যে প্রস্তুত থাকবে, যে কোন পরিস্থিতি মোকাবিলা করতে সম্পূর্ণ সক্ষম ওরা।'

'আমি আপনার শত্রু নই, মিস্টার অ্যাডাম। আমি এসেছি...'

রীতিমত অভদ্রভাবে থামিয়ে দিল ওকে লোকটা। 'আমি শুনেছি কেন এসেছেন আপনি। এক কথা বার বার শুনতে ভাল লাগে না আমার। হাঁটুন।' মাথা ঝাঁকিয়ে রানাকে আগে যাওয়ার নির্দেশ দিল লোকটা। মাঝখানে থাকল কুকুর দুটো, পিছনে সে।

প্রথমে ভিলার ফয়েই-এ নিয়ে আসা হলো মাসুদ রানাকে। সেখান থেকে একটা লাইব্রেরি রুমে। 'এখানেই বসা যাক,' পিছন থেকে বলে উঠল জর্জ ম্যাকঅ্যাডাম।

ঘরের এক কোণে এক সেট সোফা দেখে সেদিকে এগোল মাসুদ রানা। বসল একটা সিঙ্গেল সোফায়। ওর দশ গজ তফাতে একটা রীডিং টেবিলের ওপাশে বসল বৃদ্ধ। কুকুর দুটো অবস্থান নিল দু'জনের মাঝখানে। ম্যাকঅ্যাডামকে ভাল করে দেখল এবার মাসুদ রানা। মাথার চুল পাতলা হয়ে চাঁদি বেরিয়ে পড়েছে বৃদ্ধের। গালের চামড়া ঢিলেঢালা, চাউনিটা যেন কেমন। ভাল লাগল না রানার।

তার পিছনের দেয়ালে কাঁচের ফ্রেমে বাঁধানো একটা এনগ্রেভড্ সার্টিফিকেট দেখা যাচ্ছে। নিশ্চয়ই জর্জ ম্যাকঅ্যাডামকে দেয়া ব্রিটিশ রাজের কোন সনদপত্র। লেখাগুলো বোঝা যাচ্ছে না এত দূর থেকে।

'বলুন,' নড়েচড়ে বসল বৃদ্ধ।

'আপনার পালক মেয়ের ব্যাপারে জানতে আগ্রহী আমি।'

'আমি ওকে নিজের মেয়ে বলেই জানতাম। পালক ভাবিনি কখনও।'

'দুঃখিত। আপনার মেয়ের ব্যাপারে জানতে আগ্রহী আমি। আপনার সাহায্য পেলে লেসলি উপকৃত হবে।'

'আমার সাহায্য?' মুখের ভঙ্গি এমন করল লোকটা, যেন সাহায্য কথাটা খুব জঘন্য কিছু।

'আমার কথা শুনে কি খুব অবাক হচ্ছেন আপনি?' বিরক্ত হয়ে উঠল মাসুদ রানা।

'হতে শুরু করেছি।'

'কেন?'

ওর আপাদমস্তক মাপল বৃদ্ধ কঠিন চোখে। উত্তর দিল না।

'আপনার মেয়ে নিউ ইয়র্কে আছে এ মুহূর্তে। সে দাবি করছে, তার জন্মদাতা এক মার্কিন মালটিমিলিয়নেয়ার। লোকটার নাম...'

'আমি জানি তার নাম।'

'আমি জানি আপনি জানেন। আমি এ-ও জানি আপনি কে, কি ছিলেন।

কিভাবে কোথায় আহত হয়ে অবসর নিয়েছেন।'

'এত কথা কে বলেছে আপনাকে?' চোখের কোণ কুঁচকে উঠল ম্যাকঅ্যাডামের। 'লেসলি?'

'নিশ্চই!'

'আপনি ওর কতখানি ঘনিষ্ঠ?'

'আমরা একে অপরের বন্ধু।'

'কতদিন থেকে পরিচয়?'

'অনেকদিনের।'

একটু ভাবল বৃদ্ধ। তারপর মাথা ঝাঁকাল। 'নিজের সম্পর্কে কি কি বলেছে সে?'

'তার বাবা-মার প্রেম, বিয়ে। নিজের জন্ম। পরবর্তীতে আপনার তাকে পালক মেয়ে বলে গ্রহণ করা। এখানে জিসারেল্লি নামে এক ইটালিয়ান যুবককে হত্যা করার পর তার কানাডায় চলে যাওয়া, ইত্যাদি সবই বলেছে।'

'তাহলে নতুন করে আর কি জানতে চান আপনি আমার কাছে? সবকিছুই তো বলেছে লেসলি!'

'আমি জানতে চাই ওর বক্তব্য আপনি সত্যি বলে মানেন, কি মানেন না?'

'সে ক্ষেত্রে তার বক্তব্য বিস্তারিত শুনতে হবে আমাকে। নিশ্চিত হতে হবে, ঠিক কি কি বলেছে আপনাকে লেসলি।'

'আমিও তাই চাইছি আসলে।'

'তাহলে শুরু করুন।'

শুরু করল মাসুদ রানা। ১৯৪৪ সাল থেকে। শেষ করল ১৯৭৬ সালে এসে, যে সময় হত্যার দায়ে সুইটজারল্যাণ্ড ত্যাগ করে কানাডায় চলে যেতে বাধ্য হয় লেসলি, নিজের সম্পর্কে যতদূর বলেছে সে, সেই পর্যন্ত এসে। বলা শেষ হতে উত্তরের অপেক্ষায় থাকল ও, কিন্তু মুখ খোলার কোন লক্ষণ দেখা গেল না ম্যাকঅ্যাডামের মধ্যে। একদৃষ্টে রানার দিকে তাকিয়েই থাকল লোকটা। বেশ অনেকক্ষণ পর যেন ধরায় এল বৃদ্ধ। পলক ফেলল চোখের।

নড়েচড়ে বসল মাসুদ রানা। 'আমি আপনার মতামতের অপেক্ষায় আছি।'

'লেসলির কাহিনী সত্যি।'

'সত্যি?' মনে মনে আশ্বস্ত হলো মাসুদ রানা। যেন লেসলি খাঁটি প্রমাণিত হওয়ায় ওর-ই বিজয় ঘটেছে।

'হ্যাঁ। তবে আংশিক।'

'মানে?' বেকুব বনে গেল ও।

'আংশিক সত্যি।'

'কোনটা সত্যি নয়?'

'সেটা জানতে হলে কষ্ট করে আরেকবার আপনাকে লণ্ডন যেতে হবে,' নির্বিকার কণ্ঠে বলল বৃদ্ধ। আনমনে রানার অস্ত্রটা নাড়াচাড়া করছে।

'লণ্ডন?'

'হ্যাঁ। আমার মনে হয়, এবারের যাত্রাটা খুব উপভোগ করবেন আপনি।'

'বুঝলাম না।'
'আপনি আগ্রহী?'
'কিন্তু কেন? গোলমালটা কোথায় আপনার বলতে অসুবিধে কি?' সন্দিহান হয়ে উঠল মাসুদ রানা।
'অসুবিধে আছে।'
চুপ করে থাকল মাসুদ রানা। ভাবছে।
'ওয়েল!' খানিক অপেক্ষা করে বলল ম্যাকঅ্যাডাম। 'হ্যাঁ, কি না?'
তবু মুখ বুজে বসে থাকল মাসুদ রানা।
'আপনার ভাল হবে জেনেই আরেকবার লণ্ডন যেতে বলছি আমি আপনাকে, মাসুদ রানা। অনেক উপকার হবে আপনার। ওখানে একজনের সঙ্গে দেখা করতে হবে। তাহলেই বুঝবেন আমার কথার সত্যতা।'
'কে সে? কার সঙ্গে দেখা করতে হবে?'
'পিটার হোয়াইটসাইড।' মুহূর্তখানেক রানাকে পর্যবেক্ষণ করল সে। 'আপনার সব প্রশ্নের উত্তর তাঁর কাছেই পাবেন আপনি।' একটা কাগজে দ্রুত কিছু লিখে সেটা এগিয়ে দিল লোকটা রানার দিকে। 'এতে হোয়াইটসাইডের ফোন নম্বর, বাসার ঠিকানা আছে। নিন।'
আসন ছেড়ে উঠে এল মাসুদ রানা। চোখ বোলাল কাগজটায়। 'কিন্তু...'
'আর একটা কথাও নয়!' আবার কঠোর হয়ে গেল মানুষটা হঠাৎ করেই। 'সব প্রশ্নের উত্তর লণ্ডন গেলে পাবেন আপনি। নাউ, স্যার...।' মুখ ঘুরিয়ে দরজা দেখাল জর্জ ম্যাকঅ্যাডাম। বাড়িয়ে দিল ওর পিস্তলটা।

দুপুর আড়াইটায় হিথ্রোর সাত নম্বর রানওয়েতে অবতরণ করল ব্রিটিশ এয়ারওয়েজের জেনেভা-লণ্ডন রুটের অতিকায় এয়ারবাস। দিনটা ভীষণরকম ঠাণ্ডা। তবে কুয়াশা নেই, একদম পরিষ্কার। কনভেয়র বেল্টের পাশে দাঁড়িয়ে আছে মাসুদ রানা নিজের ব্যাগেজের দেখা পাওয়ার আশায়। এমন সময় ওর পাশে এসে দাঁড়াল ছোটখাট এক পাহাড়।
ছয় ফুট চার ইঞ্চি দীর্ঘ হবে মানুষটা। পাশে কাঁধ থেকে নিচ পর্যন্ত সর্বত্র সমান, কম করেও বেয়াল্লিশ। তবে থলথলে নয়, একেবারে পাকানো নারকেলের রশি। চোখের নিচের অংশ দেখার উপায় নেই তার, কারণ সারামুখ অত্যন্ত ঘন, কুচকুচে কালো দাড়িতে ঢাকা লোকটার। কাটে-ছাঁটে না বোধহয়। বন-জঙ্গলের মত লাগে দেখতে।
'মিস্টার মাসুদ রানা?' বলে উঠল সে।
চোখ কুঁচকে ঘুরে তাকাল ও। চোখে প্রশ্ন।
'আমি রজার্স হান্টার। মেট্রোপলিটান পুলিস ডিপার্টমেন্ট।'
কাঁধ ঝাঁকিয়ে আত্মসমর্পণের ভঙ্গি করল মাসুদ রানা। 'আমি নিরপরাধ, অফিসার।'
'মিস্টার পিটার হোয়াইটসাইডের নির্দেশে আপনাকে নিয়ে যেতে এসেছি আমি, স্যার।'

'কোন প্রয়োজন নেই, অফিসার। আমি নিজেই যেতে পারব।'

'তাতে কোন সন্দেহ নেই,' গম্ভীর গলায় বলল জঙ্গল। 'কিন্তু জর্জ ম্যাকঅ্যাডামের মুখে আপনার আগমনের খবর পেয়ে উনি আমাকে পাঠিয়ে দিলেন। হাই অফিশিয়ালের নির্দেশ না মেনে আমার উপায় নেই। সঙ্গে আরও দু'জন আছে আমার।'

'তিনি আপনার হাই অফিশিয়াল?' খানিকটা বিস্মিত হলো মাসুদ রানা। 'কিন্তু আমি তো জানতাম অনেক আগেই অবসর নিয়েছেন তিনি।'

'এখনও অবসরেই আছেন তিনি, স্যার,' একঘেয়ে কণ্ঠে বলল লোকটা। 'বুড়ো বয়সে নতুন করে সরকারের লাঙল কাঁধে নেয়ার কোন ইচ্ছেই নেই তাঁর। কিন্তু তারপরও তিনি আমার হাই অফিশিয়াল।'

'আই সী!' বেখেয়াল হয়ে পড়ার সুযোগে পাশ দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছিল রানার সুটকেস, লাফিয়ে উঠে সেটা ধরল ও। 'কিন্তু যদি আমি আপনার সঙ্গে যেতে রাজি না হই, অফিসার?'

চেহারা করুণ হয়ে উঠল বন-জঙ্গলের। 'আমি ইনসিস্ট করছি, স্যার।'

'তারপরও যদি প্রত্যাখ্যান করি?'

'তাহলে গ্রেফতার করে নিয়ে যেতে হবে। কিন্তু আমি মনে করি না আপনি এমন এক বাজে কাজে বাধ্য করবেন আমাকে।'

মধুর হাসি ফুটল রানার মুখে। 'আমি ওটাই জানতে চাইছিলাম।'

'জানা তো হলো, স্যার। এবার তাহলে যাওয়া যাক?'

'নিশ্চই!' ডান হাতটা বাড়াল মাসুদ রানা। 'তার আগে আপনার পরিচয় পত্রটা দেখতে চাই।'

এক হাত সুড়ুৎ করে ট্রাউজারের পকেটে সেঁধিয়ে দিল হান্টার। ছোট একটা কার্ড এবং একটা ব্যাজ বের করে আনল। জিনিস দুটো দেখামাত্র বুঝল রানা, একদম খাঁটি। কোন ভেজাল নেই। 'সন্তুষ্ট, স্যার?'

'পুরোপুরি।'

'তাহলে চলুন, যাই!' ডান হাত বাড়াল হান্টার। 'আপনার সুটকেসটা দিন আমাকে।'

'ধন্যবাদ। তার কোন প্রয়োজন নেই।'

আট

পুলিসের ছাপহীন একটা ডার্ক ব্লু রোভারের পিছনের আসনে তোলা হলো মাসুদ রানাকে হান্টার বসল ওর পাশে। অন্য দু'জন বসল সামনের আসনে, ওর মধ্যে একজন চালক। মোটরওয়ে ধরে লণ্ডনের দিকে ছুটল রোভার।

সরাসরি শহরের মধ্যে ঢুকল না গাড়ি। পাশ কাটিয়ে ভিক্টোরিয়া স্টেশনের দিকে চলল। স্টেশনের সামান্য আগে বাঁয়ে বাঁক নিল রোভার। আরও তিন মিনিট চলল, তারপর বেলগ্রাভিয়ার এক টাউনহাউসের সামনের কার্ব ঘেঁষে দাঁড়িয়ে

পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে প্রায় বাঁদরের মত লাফিয়ে বেরিয়ে গেল হান্টার, ঘুরে এপাশে এসে দরজা মেলে ধরল মাসুদ রানার জন্যে। 'আসুন।'

নামল মাসুদ রানা। বাড়িটার দিকে তাকাল। এটাও জর্জ ম্যাকঅ্যাডামের ভিলার মত, কোথাও মালিকের নাম-ঠিকানা কিচ্ছু নেই। তবে ডোরবেল আছে। ওটায় চাপ দিল হান্টার, এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ভেতর থেকে ঘটাং করে খুলে গেল লোহার গেট। কঠোর চেহারার দুই সাদা পোশাকধারী দেখল ওদের, তারপর ইশারায় ঢুকে পড়তে বলল। হান্টারের সাথে এগোল মাসুদ রানা, ওদিকে রোভারের চালক পিছন পিছন আসছে ওর সুটকেস নিয়ে।

একটা প্রায় গোল রুমে নিয়ে আসা হলো ওকে। রুমটার এক দেয়ালে ঝুলছে ইংল্যাণ্ডেশ্বরীর প্রকাণ্ড এক পোর্ট্রেট। ওটার উল্টোদিকে স্ট্যাণ্ডার্ডে দাঁড়িয়ে আছে ইউনিয়ন জ্যাক। ওটা পেরিয়ে মেরুন রঙের পুরু কার্পেট মোড়া এক প্রকাণ্ড হলরুমে নিয়ে আসা হলো রানাকে। চারদিকে তাকিয়ে স্থির বিশ্বাস জন্মাল ওর, এটা নিঃসন্দেহে এডওয়ার্ড আমলের টাউনহাউস। সম্ভবত গোপনে সরকারী কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে। ওটাও পেরিয়ে এল ওরা। ছোট একটা অফিসরুমে এসে ঢুকল। কোন জানালা নেই এটায়।

পুরু ইরানী গালিচার ওপর একদিকে এক সেট নরম গদির সোফা, আরেক দিকে একটা আর্মচেয়ার এবং একটা কাঠের সেক্রেটারিয়েট টেবিল, এ ছাড়া আর কোন আসবাব নেই এ রুমে। সোফা ইঙ্গিত করল হান্টার। 'বসুন, প্লীজ। আমি খবর দিচ্ছি মিস্টার হোয়াইটসাইডকে।'

এক মিনিটও হয়নি আসন নিয়েছে মাসুদ রানা, ঘরে এসে ঢুকল দীর্ঘ, ঋজু এক বৃদ্ধ। অত্যন্ত সুদর্শন, হ্যাণ্ডসাম মানুষ। সেভিল রো-র নিখুঁত ছাঁটের পিন-স্ট্রাইপড্ সুট তার পরনে। পঁচাত্তরের কম হবে না বৃদ্ধের বয়স, অনুমান করল রানা, অথচ ষাটের বেশি মনেই হয় না। চাউনি খুবই তীক্ষ্ণ। এবং ধূর্ত। মাসুদ রানাকে দেখল মানুষটা কয়েক মুহূর্ত। তারপর হাসিমুখে ডান হাত বাড়িয়ে দিল। 'আমি পিটার হোয়াইটসাইড। ভ্রমণ উপভোগ করেছেন নিশ্চই?'

হাত মেলাল রানা। 'কোন্ ভ্রমণের কথা বলছেন? জেনেভা-লণ্ডন, না হিথ্রো-বেলগ্রাভিয়া?'

আর্ম চেয়ারটায় বসল হোয়াইটসাইড। পর্যবেক্ষণ করতে লাগল মাসুদ রানাকে। 'দুটোই বোঝাতে চাইছি আমি।'

'মন্দ নয়। ভালই।'

মাথা দোলাল হোয়াইটসাইড। 'ব্রিটিশ এয়ারওয়েজে ভ্রমণের জন্যে ধন্যবাদ।'

'আমাকে এভাবে ধরে আনার কি প্রয়োজন ছিল?'

'আপনি বিপজ্জনক মানুষ, দুই দশকেরও বেশি আগে মৃত একজনকে জ্যান্ত করে তুলেছেন, যে জন্যে···ইউ নো, সত্যিই যদি আপনাকে ধরে আনা প্রয়োজন মনে করতাম আমি, জেনেভাতেই তা করতে পারতাম, কিন্তু করিনি। আপনি তো আমার কাছেই আসতে চেয়েছিলেন, তাই না? কিছু প্রশ্নের উত্তর পাওয়ার জন্যে। গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। সে জন্যেই এয়ারপোর্টে পাঠিয়েছি আমি ওদের। ইন ফ্যাক্ট

আপনাকে এসকর্ট করে নিয়ে আসার জন্যে। আপনার ''ধরে আনার'' সঙ্গে আমি একমত নই।'

'আমাকে অ্যারেস্ট করা হয়নি তাহলে?' নিশ্চিত হতে চাইল রানা।

চোখ কপালে তুলল বৃদ্ধ। 'অ্যারেস্ট! প্রশ্নই আসে না। আপনি মুক্ত, মাসুদ রানা। ইচ্ছে হলে এই মুহূর্তে চলে যেতে পারেন, প্রয়োজনে রাস্তা পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে আসব আমি আপনাকে। কিন্তু আপনি তা করবেন বলে আমি মনে করি না। অন্তত এখনই নয়। গুরুত্বপূর্ণ কিছু প্রশ্নের উত্তর জানা আপনার প্রয়োজন। ঠিক কি না?'

মাথা দোলাল মাসুদ রানা। 'হ্যাঁ।'

'তাহলে রিল্যাক্স করুন, প্লীজ। আর্থার স্যান্ডলার সম্পর্কে কিছু জানতে বুঝতে বাকি আছে আপনার। অনেক কিছু। আমি আপনাকে সে সম্পর্কে অবহিত করতে পারব। ইয়ে···কফি?' জানতে চাইল বটে হোয়াইটসাইড, কিন্তু ওর 'হ্যাঁ' বা 'না'র জন্যে অপেক্ষা করল না। ইন্টারকমে দু'কাপ কফির নির্দেশ পাঠিয়ে দিল সে।

নীরবে কেটে গেল কয়েক মুহূর্ত। কফি দিয়ে গেল রোভারের ড্রাইভার লোকটা।

'এবার তাহলে শুরু করা যাক,' বলল মাসুদ রানা।

'হ্যাঁ, যাক,' বলে খানিক বিরতি দিল পিটার হোয়াইটসাইড। বক্তব্য গোছাচ্ছে মনে মনে। 'আমি রিটায়ার্ড, মিস্টার রানা। প্রায় দুই দশক হতে চলল অফিশিয়ালি অবসর গ্রহণ করেছি। আমার চাকরি জীবনের শেষ দিকে, ১৯৬৯-এর মাঝামাঝি সময় আর্থার স্যান্ডলার-জর্জ ম্যাকঅ্যাডাম সমস্যা সমাধানের ভার আমার কাঁধে চাপে। বড্ড নোংরা সমস্যা, স্বীকার করতেই হবে আমাকে। আমার···· কি বলব! সেকশন? হ্যাঁ, তাই। আমি ছিলাম এম আই-সিক্সের চ্যান্সেলারি অভ দ্যা এক্সচেকার সেকশনের হেড। অথবা ট্রেজারি সেকশন, যেটা সহজ মনে হয় আপনার।'

'মানি,' মন্তব্য করল মাসুদ রানা।

'কারেন্সি। হ্যাঁ, এটাই উপযুক্ত হয়। তো, কারেন্সি সেকশনের হেড থাকার সময় আর্থার স্যান্ডলারের কেস সুরাহার ভার পড়ে আমার ওপর।'

'কারেন্সি ম্যানিপুলেশন?'

চোখমুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল হোয়াইটসাইডের। 'রাইট, স্যার।'

মাথা দোলাল মাসুদ রানা। 'কোথায় যেন শুনেছিলাম ব্যাপারটা,' বলল ও চিন্তিত ভঙ্গিতে। 'মনে পড়ছে না।'

'মনে করার চেষ্টা চালিয়ে যান, দয়া করে। ইউ সী? আর্থার সম্পর্কে আপনার সব প্রশ্নের জবাব দেব আমি। এবং তারপর, আমারও এক-আধটা প্রশ্নের উত্তর আপনি দেবেন।'

দু'হাতের তালু উল্টে 'আপনি কি বলছেন, বুঝতে পারছি না' ধরনের একটা ভঙ্গি করল মাসুদ রানা। দেখেও পাত্তা দিল না বৃদ্ধ। 'ওই কথাই রইল তাহলে?' কফি শেষ করে সুগন্ধি ক্যানারি আইল্যাণ্ড চুরুট ধরাল সে। মাসুদ রানা ধরাল

সিগারেট।

'আর্থার স্যাণ্ডলারকে আপনি জানেন সম্ভবত একজন ধনকুবের শিল্পপতি, অর্থ লগ্নিকারী হিসেবে। এবং সম্ভবত একজন মাস্টার অভ কেমিস্ট্রি হিসেবে। তাই তো?'

মাথা দোলাল মাসুদ রানা।

'কিন্তু সে যে আসলে কতবড় এক সিঙ্গুলার স্কিল ছিল এনগ্রেভিং শিল্পে, ধারণাই করতে পারবেন না আপনি। ওই লাইনে মুকুটহীন সম্রাট ছিল লোকটা।'

'এনগ্রেভিং?'

'ভদ্র ভাষায় তাই। অভদ্র ভাষায়, মানে সহজবোধ্য উপযুক্ত ভাষায় বলতে গেলে বলতে হয় ফরজার, অথবা জালিয়াত। কাউন্টারফিটার।'

চুপ করে বৃদ্ধের মুখের দিকে চেয়ে বসে থাকল মাসুদ রানা। খানিকটা বিভ্রান্ত

'অপারেশন বার্নহার্ডের নাম শুনেছেন আপনি?' ধূর্ত চোখে রানাকে পর্যবেক্ষণ করছে হোয়াইটসাইড।

খানিক মাথা খাটাল রানা নামটা নিয়ে। 'না।'

'স্যাশেনহসেন?'

কাঁধ ঝাঁকাল ও।

'হেলমুট অ্যানডরফার? অথবা হেইনরিখ কিণ্ডার?'

'না।'

'ঠিক আছে। আপনার জ্ঞানের ভাণ্ডার সমৃদ্ধ করে দেব আমি, চিন্তা নেই। তবে সে জন্যে ইতিহাসের দিকে দৃষ্টি দিতে হবে আপনাকে, স্যার। ১৯৩৯ সালে ব্রিটেনের বিরুদ্ধে যে যুদ্ধের সূত্রপাত ঘটিয়েছিল জার্মানি, সেটা শুধুই সামরিক ছিল না। ছিল আরও অনেক কিছু। অনেক ব্যাপক। ব্রিটিশ জাতিকে ধ্বংস করে দিতে চেয়েছিল হিটলার। সামরিক যুদ্ধ তো বটেই, একই সময়ে সুদূর প্রসারী এক অর্থনৈতিক যুদ্ধও শুরু করে সে আমাদের বিরুদ্ধে। পরেরটার নাম দিয়েছিল ওরা বার্নহার্ড। অপারেশন বার্নহার্ড।'

নড়েচড়ে, খানিকটা কাত হয়ে বসল পিটার হোয়াইটসাইড। পায়ের ওপর পা তুলে দিল।

'অপারেশন বার্নহার্ড ছিল ওদের হাইলি সিক্রেট প্রজেক্ট। প্রজেক্টের মূল কাজ ছিল ব্রিটিশ পাউণ্ড, বিশেষ করে পাঁচ পাউন্ডের নোট জাল করে বাজারে ছাড়া। দশ ও বিশ পাউন্ডের নোটও জাল করত ওরা, তবে কম। পাঁচ পাউন্ড ছিল ওদের মূল আক্রমণের লক্ষ্য। বৃষ্টির মত বাজারে জাল পাউন্ড ছেড়ে ব্রিটিশ অর্থনীতিকে প্রায় পর্যুদস্ত করে দিয়েছিল জার্মানি।

'অত্যন্ত সূক্ষ্ম বুদ্ধির ধূর্ত এক এস এস কর্নেল, হেলমুট অ্যানডরফারকে দেয় হয় এ অপারেশনের দায়িত্ব। যুদ্ধ শুরুর কিছুদিনের মধ্যে। ১৯৪০ সালে প্রজেক্টের নীল নকশা প্রণয়নের কাজ সম্পন্ন করে হিটলারের অনুমোদনের জন্যে ফাইল সাবমিট করে অ্যানডরফার। এবং খুশি মনে অনুমোদন দেয় হিটলার। এরপর শুরু হয় আমাদের অর্থনীতিকে ধ্বংস করার কাজ।'

'ব্রিলিয়ান্ট আইডিয়া,' মন্তব্য করল মাসুদ রানা।

'নিঃসন্দেহে,' মাথা দুলিয়ে সায় দিল বৃদ্ধ।

'ইতিহাস বলে, এ কাজ আপনারাও করেছিলেন আমেরিকার বিরুদ্ধে। যখন মার্কিনীরা ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা সংগ্রাম শুরু করে, ওদের কন্টিনেন্টাল ডলার জাল করে যুক্তরাষ্ট্রকে প্রায় হাঁটুর ওপর বসিয়ে ছেড়েছিলেন আপনাদের জেনারেল হাও। অবশ্য শেষ রক্ষা করতে পারেননি আপনারা।'

'ঠিক।' আবার মাথা দোলাল হোয়াইটসাইড। তবে চেহারার অসন্তুষ্টি চাপা থাকল না তার। 'তবে আপনি নিশ্চই স্বীকার করবেন যে জেনারেল হাও-র জাল নোটগুলো একেবারে নিখুঁত, বরং বলা ভাল, আসল ডলারের চাইতেও ভাল ছিল?'

'ছিল। তবু আমেরিকার বিজয় ঠেকানো সম্ভব হয়নি।'

'তা-ও সত্যি।' নাকের ডগা চুলকাল লোকটা। 'সে যা হোক, অ্যানডরফার কিন্তু অর্থনীতির ছাত্র ছিল না, ছিল ইতিহাসের ছাত্র। তবু তাকে বার্নহার্ডের দায়িত্ব দেয়া হয়, কারণ লোকটা ছিল ফরমিডেবল স্ট্রাটেজিস্ট এবং একসেলেন্ট সৈনিক। প্রজেক্টটা যখন হিটলার অনুমোদন করে, তখন তার প্রয়োজন হয় একজন এনগ্রেভারের।'

'এবং জার্মান ইন্টেলিজেন্সের মধ্যেই ছিল নিশ্চই তেমন এক এনগ্রেভার, আর্থার স্যান্ডলার? আপনার সেই সিঙ্গুলার স্কিল!'

'ঠিক ধরেছেন,' হাসল বৃদ্ধ। 'আর্থার স্যান্ডলার। জার্মান স্পাই বাহিনীতে যাকে সবাই চিনত হেইনরিখ কিণ্ডার নামে। সে-ই ছিল অ্যানডরফারের এনগ্রেভার। প্লেট এনগ্রেভিং ও পাউন্ডের কাগজ ডুপ্লিকেটিং-এ সুপার সুপার মাস্টার। তার প্রোডাক্ট ছিল প্রশ্নাতীত রকম খাঁটি। এ ক্ষেত্রে জেনারেল হাও-কে বহু মাইল পিছনে ফেলে দিয়েছিল সে। বহু মাইল।

'আর্থার স্যান্ডলার, আমাদের ডিয়ার ডিয়ার আমেরিকান ডাবল এজেন্ট। বহুমুখী প্রতিভা। আপনি জানেন, সে কেমিস্ট ছিল?'

'হ্যাঁ।'

'তাকে অত্যাধুনিক প্রিন্টিং মেশিন দিয়ে জাল পাউন্ড ছাপার কাজে লাগিয়ে দেয় অ্যানডরফার। আর সে কী এক ব্লীচ আবিষ্কার করে, যার সাহায্যে আমাদের এক পাউন্ড নোটের প্রিন্ট সম্পূর্ণ তুলে ফেলা হত, পাউন্ড পরিণত হত সাদা কাগজে। স্রেফ সাদা কাগজে। ওই কাগজ মেশিনে দিয়ে মণ্ড তৈরি করত স্যান্ডলার, তারপর সেই মণ্ড থেকে আবার তৈরি করা হত পাঁচ পাউন্ড নোটের আকারের কাগজ। আর তাই দিয়ে দিন-রাত নকল পাঁচ পাউন্ড ছাপা হতে থাকল। বেচারা প্রেস, বিশ্রাম পেত না মোটেই। দিন-রাত কেবল ঘটাং-ঘটাং, ঘটাং-ঘটাং। আমাদের কাজিন আমেরিকা। বিরাট সাহায্য করে হিটলারকে এ কাজে, স্যান্ডলারকে কিন্ডার বানিয়ে ওদেশে পাঠিয়ে।'

'কি পরিমাণ ক্ষতি করতে সক্ষম হয় স্যান্ডলার?'

'যুদ্ধের সময়, খুব সামান্যই। এতবড় এক অপারেশন, পুরোপুরি চালু হতে অনেক সময় লাগাই স্বাভাবিক। স্যান্ডলার, বা কিন্ডারের এই প্রেস ছিল স্যাশেনহসেন কনসেনট্রেশন ক্যাম্পে। সমস্ত মাল-মশলা টুলস্ ইত্যাদি জোগাড় করে পুরোদমে কাজ আরম্ভ করতেই সময় গড়িয়ে যায়। ১৯৪৪ সালের প্রায়

শেষের দিকে শুরু হয় অ্যানডরফারের প্রজেক্ট বাস্তবায়নের কাজ।'

'যুদ্ধ তখন প্রায় শেষ,' আরেকটা সিগারেট ধরাল মাসুদ রানা।

'হ্যাঁ। সব ফ্রন্ট থেকে পিছু হটছে তখন জার্মান বাহিনী। পাউন্ড সংগ্রহের তিনটি চ্যানেল ছিল অ্যানডরফারের, সুইটজারল্যান্ড, উত্তর আফ্রিকা এবং দক্ষিণ আমেরিকা। কোন চ্যানেলই পর্যাপ্ত এক পাউন্ড নোট পাঠাতে পারছিল না প্রয়োজনের সময়ে। এ ছিল অনেকটা আমেরিকানদের অ্যাটম বোমার কার্যকরিতা চাক্ষুষ করার স্থান নির্বাচনের সমস্যার মত। যুদ্ধ শেষ হয়ে যাচ্ছে দ্রুত, অথচ বোমাটা ফেলার মত জায়গা খুঁজে পাচ্ছে না ওয়াশিংটন, তেমনি। সব প্রস্তুত, অথচ কাজের কাজ হচ্ছে না, বেশ সমস্যাই হয়ে দাঁড়াল ব্যাপারটা জার্মানদের জন্যে। ঠিকমত গেলাতে পারছে না আমাদের নকল পাউন্ড, আবার এত ব্যাপক প্রস্তুতির পর বসে থাকতেও পারছে না।'

'আসল সমস্যাটা বলুন প্রীজ। মানে পরের সমস্যা।'

'বলছি। ১৯৪৫-এর প্রথম দিকেই থার্ড রাইখের ভাগ্য নির্ধারিত হয়ে গেল। প্রশ্নাতীত ভাবে। চারদিক থেকে আক্রমণ চলছে বার্লিনের ওপর। শহরটির পতন তখন সময়ের ব্যাপার মাত্র।'

লেসলি ম্যাকঅ্যাডামের কথা মনে হলো মাসুদ রানার। তার বক্তব্য অনুযায়ী বোঝা যায়, নকল পাউন্ড প্রস্তুতের প্রেস যখন সম্পূর্ণ রেডি, তখনই এক্সিটার যায় আর্থার স্যান্ডলার, এবং এলিজাবেথের সঙ্গে তার পরিচয় হয়।

'নিজেকে নিজের মধ্যে গুটিয়ে নিতে আরম্ভ করে তখন রাইখ,' বলে চলেছে পিটার হোয়াইটসাইড। 'হিটলার তারও অনেক আগেই গিয়ে আশ্রয় নেয় তার গোপন এবং দুর্ভেদ্য আস্তানা "আলপেনফেসটুঙে"। এ সময়ে যুদ্ধের সত্যিকার গতি-প্রকৃতির ব্যাপারে আসলে কোন ধারণাই ছিল না তার। গর্তে বসে শিশুদের যুদ্ধে যাওয়ার নির্দেশ দিত সে, এমন সব ব্যাটালিয়ানের জন্যে অর্ডার ইস্যু করত, যে সব ব্যাটালিয়ান বহু আগেই নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। সেই সঙ্গে হেইনরিখ কিন্ডারকেও তার কাজ চালিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দিতে থাকে হিটলার, অবশ্যই।'

'নির্দেশ পালিত হয় নিশ্চই?'

'নিঃসন্দেহে।' হাসির ভঙ্গি করল হোয়াইটসাইড।

'তারপর?'

'চলতে থাকে কিন্ডারের কর্মকাণ্ড। বলশেভিক ভায়ারা যখন বার্লিন দখল করে ফেলে, তখনই ক্ষ্যান্ত দেয় সে।'

'তারপর?'

'পুরো প্রিন্টিং ইউনিট নিয়ে স্যান্ডলার ও অ্যানডরফার পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। সব কিছু রি-প্যাক করে ট্রাক বোঝাই করে অস্ট্রিয়া চলে যায় ওরা। আই মীন, যাওয়ার চেষ্টা করে। এবং তখনই বিষয়টা জানাজানি হয়ে যায়।'

'কি ভাবে?'

'ওদের মেইন ট্রাক, যেটায় প্রেসের গুরুত্বপূর্ণ যন্ত্রপাতি ছিল, অসংখ্য ক্রেট বোঝাই সদ্য ছাপা পাঁচ পাউন্ডের নোট এবং টাকা ছাপানোর প্লেট ইত্যাদি ছিল, পথের মাঝে এক পাহাড়ের ওপর, মারাত্মক যান্ত্রিক ত্রুটির জন্যে অচল হয়ে

পড়ে। ফলে বিপদে পড়ে যায় ওরা। এত মূল্যবান জিনিসপত্র ফেলে যেতেও পারে না, আবার নিয়েও যেতে পারে না। কি করে এ সমস্যার সমাধান করা যায় ভাবতে লাগল স্যান্ডলার-অ্যানডরফার। অবশেষে ট্রাকটা লুকিয়ে রাখার সিদ্ধান্ত নেয় ওরা। পাহাড়টার নিচেই ছিল একটা লেক। ব্রেক রিলিজ করে অচল ট্রাক গড়িয়ে দিল স্যান্ডলার, মালপত্রসহ লেকে গিয়ে পড়ল ওটা, তলিয়ে গেল পানির নিচে।'

'এবং চাপা পড়ে গেল বিষয়টা,' বলল মাসুদ রানা।

'হ্যাঁ। কয়েক সপ্তার জন্যে। একদিন পানির নিচে ভেঙে গেল টাকার ক্রেটগুলো মিলিয়ন মিলিয়ন পাউন্ড ভেসে উঠল ওপরে। পাঁচ, দশ, বিশ এমনকি পঞ্চাশ পাউন্ড নোটও ছিল ওর মধ্যে। নতুন ছাপা। ঝকঝকে নিখুঁত প্রিন্ট। জাল বলে ধরে কার সাধ্য?' মৃদু হাসি ফুটল হোয়াইটসাইডের মুখে। 'সময়টা স্থানীয়দের বড় আনন্দে কেটেছে। লেক থেকে গাট্টি গাট্টি টাকা তুলে মাটিতে ফেলে শুকিয়েছে, আর চোখ বুজে খরচ করেছে। ঘটনাটা কানে আসে অ্যালায়েড ইন্টেলিজেন্সের। আসারই কথা, এমন এক গরম খবর কি চাপা থাকে? ফাঁস হয়ে যায় অপারেশন বার্নহার্ড।'

ভুরু কুঁচকে মন দিয়ে হাতের তালু পরখ করল খানিক পিটার হোয়াইটসাইড 'নানারকম সন্দেহ দেখা দেয়। এবং বলা বাহুল্য মারাত্মকরকম ক্ষতিগ্রস্ত হয় পাউন্ড স্টার্লিং। হঠাৎ করে এত বেড়ে যায় পাউন্ডের সার্কুলেশন যে রীতিমত কপালে উঠে যায় আমাদের চোখ। খোঁজ-খবর করতে শুরু করলাম আমরা, বাজেয়াপ্ত করলাম ওই এলাকার সমস্ত পাউন্ড নোট। তারপর টের পেলাম কি ঘটে গেছে।'

'আর স্যান্ডলার?' প্রশ্ন করল মাসুদ রানা। উত্তর কি হবে বৃদ্ধের, তার কিছুটা আন্দাজ করে ফেলেছে আগেই। 'অ্যানডরফার?'

চেহারায় বিশেষ এক ভঙ্গি ফোটাল বৃদ্ধ, একই সাথে ভেংচি কাটা ও দুঃখ পাওয়ার হাসি, দুটোই বোঝাল তাতে। 'এখানেই জটিল হয়ে উঠল ব্যাপারটা। হেইনরিখ কিভাবে পালিয়ে গেল বটে, তবে তার সঙ্গী...'

'ধরা পড়ল?' জানতে চাইল ও।

'এক সেন্সে, হ্যাঁ।'

'বুঝলাম না।'

'মৃত পাওয়া গেল অ্যানডরফারকে। অস্ট্রিয়ার পঞ্চাশ মাইল পুবে পাওয়া গেল অপারেশন বার্নহার্ডের জনককে। একটা ডিচের মধ্যে পড়ে আছে তার লাশ।' নির্বিকার, একঘেয়ে কণ্ঠে বলে যেতে লাগল প্রাক্তন চ্যান্সেলারি অভ দ্যা এক্সচেকার সেকশন চীফ, পিটার হোয়াইটসাইড। যেন ক্রিকেটের স্কোর অথবা আবহাওয়া বুলেটিন পড়ছে। 'ডিচের কাদাপানির মধ্যে মুখ থুবড়ে পড়ে আছে হেলমুট অ্যানডরফারের গলা কাটা লাশ।'

'গলা কাটা?'

'হ্যাঁ। এ-কান থেকে ও-কান পর্যন্ত। শুধু কণ্ঠার হাড় দেহ থেকে তার মাথার বিচ্ছিন্ন হওয়া ঠেকিয়ে রেখেছিল।'

'আর স্যান্ডলার?'

'তাকে পাওয়া যায়নি

'আই সী!'

'আমরা যখন লেক থেকে ট্রাকটা তুলে আনলাম, দেখা গেল কয়েকটা আইটেম নেই। নিজের ভবিষ্যৎ চিন্তা করে নিয়ে গেছে স্যান্ডলার।'

'কি কি?'

'মূল হচ্ছে প্লেটগুলো। পাউন্ড জাল করার এনগ্রেভড প্লেট।'

আগেই অনুমান করেছিল মাসুদ রানা। মাথা নাড়ল ওপর-নিচে। 'বুদ্ধিমানের কাজ '

ভুরু কুঁচকে সামনে বসা যুবককে লক্ষ করতে লাগল হোয়াইটসাইড। 'এবার,' বলল সে। 'দেখা যাক, আমাদের গোয়েন্দা মাসুদ রানা কতটা সাবালক। নাকি এখনও নাবালকই রয়ে গেছে সে। বলুন দেখি, আমার গল্পে এমন এক পয়েন্ট ছিল, সেটা যেমন অবিশ্বাস্য, তেমনি বেখাপপা। সেটা কোনটা?'

মুচকে হাসল মাসুদ রানা। 'অ্যানডরফারের লাশ পুবে আবিষ্কৃত হওয়া। আর্থার স্যান্ডলার সম্পর্কে যেটুকু জেনেছি, তাতে তার পুবে যাওয়া একেবারেই অসম্ভব মনে হয়।'

'এগজ্যাক্টলি!' উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল বৃদ্ধ। প্রচণ্ড এক ঘুসি বসিয়ে দিল ডেস্কে। 'ঠিক ধরেছেন আপনি। একদম ঠিক। ইস্ট হ্যাজ মেড নো সেন্স অ্যাট অল কেন, সেটা একবার ভেবে দেখা যেতে পারে।'

নীরবে কফি পান করতে লাগল মাসুদ রানা ও পিটার হোয়াইটসাইড। কথা নেই কারও মুখে। কফি শেষ করে একজন চুরুট, আরেকজন সিগারেট ধরাল। খালি কাপ দুটো ফিরিয়ে নিয়ে গেল রোভার চালক এসে।

'যা বলছিলাম, মিস্টার রানা,' শুরু করল হোয়াইটসাইড। 'ব্যাপারটা ছিল একেবারেই দুর্বোধ্য। ভেবেই পাচ্ছিলাম না তার এ আচরণের কারণ। এক টপ আমেরিকান এজেন্ট, যে যুদ্ধের প্রায় পুরোটা সময় শত্রুর লাইনে ঘুরঘুর করে খবর সংগ্রহ করে বেড়িয়েছে, যে জার্মানি আর অস্ট্রিয়ার মধ্যে চরে বেড়িয়েছে বছরের পর বছর, যে মানুষ জার্মান ইন্টেলিজেন্সের ভেতর মিশে গিয়ে কয়েক বছর ধরে বহু মূল্যবান তথ্য সরবরাহ করেছে মার্কিনীদের, জার্মান সামরিক-বেসামরিক সমস্ত বিষয়ে—সেই মানুষ-ই কি করল যুদ্ধ শেষে? একশো আশি ডিগ্রি ঘুরে ভুল পথে এগিয়ে গেল সে প্রভুর লাশ পিছনে ফেলে। কোথায় গেল সে? তার কি আমেরিকায় ফিরে আসা উচিত ছিল না?'

চোখমুখ কুঁচকে কাঁধ ঝাঁকাল হোয়াইটসাইড। 'তা না করে রাশিয়ানদের কোলে চড়ে নাগরদোলা খাওয়ার জন্যে মস্কো চলে গেল আর্থার স্যান্ডলার। পরে আমরা জানতে পারি এক মাসেরও বেশি কাটায় সে মস্কোয়।'

চিন্তিত কণ্ঠে বলল মাসুদ রানা, 'হয়তো কোন কারণ ছিল!'

'ছিল নিশ্চই!' চোখ পাকাল হোয়াইটসাইড 'অবশ্যই ছিল! এবং একটা দুটো নয়, অনেকগুলো কারণ ছিল এর একটা কারণ, আমাদের ফরেন অফিসের

মতে, আর্থার স্যান্ডলার অনেক আগে থেকেই ছিল রুশ এজেন্ট। আমেরিকানরা আসলে এক বলশেভিক এজেন্টকে ভুল করে রিক্রুট করে ১৯৪১ সালে এমন একজনকে রিক্রুট করে খুশিতে বগল বাজাচ্ছিল আঙ্কেল স্যাম যে অনেক আগেই নিজের আত্মা বিক্রি করে দিয়েছিল মস্কোর কাছে। ডেডিকেটেড কমিউনিস্ট ছিল আসলে স্যান্ডলার।'

'বলেন কি?' বিস্মিত হলো মাসুদ রানা।

'হ্যাঁ শুনতে যতই অসম্ভব, অবিশ্বাস্য ইত্যাদি মনে হোক না কেন, আসলে ঘটনা সত্যি। ওয়াশিংটন ভেবেছে আর্থার তাদের এজেন্ট, ডবল এজেন্ট জার্মান ইন্টেলিজেন্সে ঢুকে তাদের হয়ে খবর সংগ্রহ করছে। সেটাও অবশ্য মিথ্যে নয়; যথেষ্ট গোপন তথ্য জানিয়েছে সে ওয়াশিংটনকে। কিন্তু আসলে ওই সময়ে ত্রিমুখী খেলা খেলছিল স্যাণ্ডলার, সুযোগ পেলেই ওয়াশিংটনের গোপন তথ্য মস্কোর গোচরে আনত সে। এই জন্যেই অনুমান করা হয়, যুদ্ধের পর ওদেশে যায় সে। সম্ভবত নতুন নির্দেশ গ্রহণ করতে, এবং নিজের তথ্য ভাণ্ডার উপুড় করে ঢেলে দিয়ে আসতে। ট্রিপল এজেন্ট ছিল আর্থার স্যান্ডলার।'

'অচিন্তনীয়!' মৃদু কণ্ঠে, আপনমনে বলল মাসুদ রানা।

'ঠিক, অচিন্তনীয়। তবে অসম্ভব নয়।' চুরুটটা হঠাৎ করেই সম্ভবত বিস্বাদ লেগে উঠল হোয়াইটসাইডের তাড়াতাড়ি অ্যাশট্রেতে ফেলে দিল সে ওটা। 'ওকে ধরার জন্যে অনেকগুলো ফাঁদ পেতেছি আমরা, কিন্তু ব্যাটা এত চতুর, ধরা দিল না একটাতেও।'

দাঁত বের করে এমন এক ভঙ্গি করল বৃদ্ধ, যেন স্যান্ডলারকে হাতের কাছে পেলে চিবিয়ে খায়। 'হারামজাদা একটা, বুঝলেন? আবার পাউন্ড ছাপতে শুরু করে দিল। আগের বার হয়তো কিছু মাত্রা ছিল, এবার সে সবের কিছুই থাকল না।'

কিছু সময় চোখ বুজে থাকল মাসুদ রানা 'আগের অনুমান পরিষ্কার একটা ছবি হয়ে ফুটে উঠল এবার। অল্প সময়ের মধ্যে আর্থার স্যান্ডলারের কোটিপতি হওয়ার রহস্য বুঝে ফেলেছে ও। অ্যাডলফ জেঙ্গারের বক্তব্যের সঙ্গেও অদ্ভুত মিল আছে এর। তার মতে, যুদ্ধ শেষে আমেরিকায় ফেরার সময় 'এক জাহাজ ডলার' সঙ্গে নিয়ে আসে আর্থার স্যান্ডলার। 'তারপর?'

'এক সময় লোকটা হাওয়া হয়ে গেল। কিছুতেই ট্রেস করতে পারছিলাম না ভাবলাম রাশিয়াতেই বসে আছে হয়তো। কয়েক বছর পর নিউ ইয়র্কে উদয় হলো সে। আই মীন, জনসমক্ষে দেখা গেল স্যান্ডলারকে।'

'কত বছর পর?'

'তা প্রায় সাত-আট বছর হবে।'

'এত বছর ছিল কোথায় লোকটা?'

'সবখানে। আমেরিকায়, রাশিয়ায়, এমনকি ব্রিটেনে পর্যন্ত। ছদ্মবেশ ধারণে জুড়ি ছিল না লোকটার। দেশে দেশে ঘুরে বেড়াত নানান রূপে। এর মধ্যে কয়েকবার জার্মানি এবং অস্ট্রিয়াও গেছে সে, পরে জেনেছি আমরা কখনও এক জায়গায় স্থির হয়ে থাকত না, ঘোরাঘুরির ওপর থাকত কেবল। প্লেটগুলো সব

সময় সঙ্গে থাকত তার।'

'পাউন্ড ছাপত কোথায় বসে?'

'অবশ্যই আমেরিকায় বসে!' খেঁকিয়ে উঠল হোয়াইটসাইড। 'নইলে আর কোথায়? আমাদের এত বড় বান্ধব আর কে আছে? দিনের পর দিন স্যাম চাচার কোলে বসে এমন কুকর্ম করেছে স্যান্ডলার, অথচ ওরা কোন পদক্ষেপ নেয়নি। তাকে বিরত রাখার চেষ্টাই করেনি কখনও ওয়াশিংটন।'

'হয়তো...'

'কোন হয়তো-টয়তো নেই, মিস্টার রানা। ওরা জানত সব। জেনেও বাধা দেয়নি।' খানিক বিরতি দিয়ে যোগ করল বৃদ্ধ, 'কারণ পাউন্ডের সার্কুলেশন যত বৃদ্ধি পেতে থাকে, ততই তার মূল্য পড়তে থাকে। ফলে চাঙা হয়ে উঠতে থাকে ডলার।'

দরজায় টোকার আওয়াজ উঠতে ঘুরে তাকাল বৃদ্ধ। 'কাম ইন।'

ভেতরে এসে ঢুকল দানবসদৃশ রজার্স হান্টার। হাতে একটা হলুদ খাম। ওটা যথেষ্ট সম্ভ্রমের সাথে হোয়াইটসাইডের দিকে এগিয়ে দিল সে। নিল বৃদ্ধ খামটা। ভেতর থেকে বের হলো একটা চিরকুট, চোখ বোলাল সে চিরকুটে, তারপর খামসহ ওটা কোটের সাইড পকেটে ভরে হান্টারের দিকে ফিরল। 'থ্যাঙ্ক ইউ, হান্টার। তুমি যাও।'

চলে গেল লোকটা। নিজের বক্তব্যে ফিরে গেল পিটার হোয়াইটসাইড। 'তো, আমাদের তখনকার অবস্থাটা একবার কল্পনা করুন! আমরা নিশ্চিত, আমাদের অর্থনীতির কবর রচনা করছে স্যান্ডলার আমেরিকার মাটিতে বসে। অথচ আমেরিকার সাহায্য পাচ্ছি না আমরা। কি করতে পারতাম আমরা? একটাই পথ ছিল ওকে ঠেকানোর। বাধ্য হয়ে সে পথেই এগোলাম আমি। নির্দেশ দিলাম, যেখানে যখন পাও, হত্যা করো আর্থার স্যান্ডলারকে। "পুট হিম ডাউন"। নির্দেশটা ব্যক্তিগতভাবে আমিই দিয়েছিলাম সেদিন। এবং আজ আবারও সেই একই নির্দেশ নতুন করে জারি করতে যাচ্ছি আমি।'

'করা উচিত,' অন্যমনস্ক ভঙ্গিতে মাথা দোলাল মাসুদ রানা। 'প্রথমবার মিস্ করেছেন আপনারা।'

'হ্যাঁ। এখন জানি। আমরা কল্পনাই করিনি মার্কিন সরকার স্যান্ডলারকে রক্ষা করার জন্যে তার এক নকল বাজারে ছেড়েছিল।' একটু ভাবল বৃদ্ধ। চেহারা উজ্জ্বল হয়ে উঠল তার। 'কিন্তু এটাও সত্যি, ওই ঘটনার পর নকল পাউন্ড ছাপার কাজ সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যায়। লোকটা স্যান্ডলারের ডবল বা ট্রিপল, যা-ই হয়ে থাকুক, তাকে "পুট ডাউনের" ফলে আমাদের আসল উদ্দেশ্য ষোলো আনাই অর্জিত হয়। হতে পারে, ওই ঘটনায় ভয় পেয়ে আন্ডার গ্রাউন্ডে চলে যায় আর্থার স্যান্ডলার বুঝে ফেলে তার পাণ্ডিত্য জাহির হয়ে গেছে। অথবা এ-ও হতে পারে, আর কোন বিষয়ে গ্রাজুয়েট হওয়ার উদ্দেশে প্রস্তুতি নিতে আরম্ভ করে সে কোথাও পালিয়ে গিয়ে কে জানে!'

চোখ বুজে কানের লতি ডলতে লাগল বৃদ্ধ দু'আঙুলে। 'আমরা যা চাইছিলাম, ব্রিটিশ পাউন্ড জাল হওয়া বন্ধ করতে, হয়ে গেল। ওটাই ছিল আমার একমাত্র

আকাঙ্ক্ষা। স্যান্ডলারের সাথে ওখানেই, সেই ১৯৬৪ সালেই সম্পর্ক চুকে-বুকে গেছে আমার।'

'একটা পয়েন্ট বোধহয় মিস্ করে গেছেন আপনি,' বৃদ্ধের চোখে চোখ রেখে মৃদু কণ্ঠে বলল মাসুদ রানা।

'বুঝলাম না। কোনটা?'

'লেসলি।'

'ও হ্যাঁ! দুঃখিত। ভুলেই গিয়েছিলাম আসল পয়েন্টটা।'

'আমি শুনেছি, বিপদে মেয়েটিকে সাহায্য করেছেন আপনি অনেকভাবে। তার একটা ভাল আশ্রয়ও জুটিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু একটা ব্যাপার বুঝতে পারছি না আমি, কেন নয় বছর পর হঠাৎ করে ফিরে এসেছিল লোকটা এক্সিটারে? কেন খুন করল এলিজাবেথকে? অল্পের জন্যে বেঁচে গেছে লেসলি সেবার নইলে ওকেও তো দিয়েছিল সে শেষ করে। নিজের বউ, মেয়েকে এভাবে কেউ...'

'নিশ্চই কোন কারণ আছে,' বলল হোয়াইটসাইড। 'যদি কোন একটা বিশেষ অ্যাঙ্গেল থেকে দেখা যায় ব্যাপারটাকে, কারণটা হয়তো পাওয়া যাবে।' হাসিমুখে মাথা দোলাতে লাগল বৃদ্ধ আরেক দিকে তাকিয়ে। 'স্যান্ডলার স্যান্ডলার-ই, মিস্টার মাসুদ রানা!' ওর দিকে তাকাল লোকটা হাসি মুছে গেছে। 'একটু ভাবুন, তাহলেই ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে যাবে।'

ইঙ্গিতটা তৎক্ষণাৎ বুঝে ফেলল মাসুদ রানা। মাথা দোলাল 'ভেবেছি। কিন্তু কেমন যেন মনে হয় আইডিয়াটা। বিশ্বাস হয় না।'

'ওটাই সত্যি। অন্তত আমার তাই ধারণা। নইলে স্যান্ডলারের ফিরে আসার কোন কারণ ছিল না। অন্তত এত বছর পর।'

'অর্থাৎ এলিজাবেথ নিজে তার মৃত্যু ডেকে এনেছিলেন?'

'খুব সম্ভব।' ড্রয়ার থেকে একটা সোনার কমপ্যাক্ট কেস বের করল হোয়াইটসাইড ভেতর থেকে বের হলো অধিবেশনের তৃতীয় ক্যানারি আইল্যান্ড সিগার ব্যস্ত হাতে ধরাল সে ওটা। 'সে-ই খুঁচিয়ে জীবিত করে তুলেছিল মৃত অধ্যায়টা, আফটার অল! কিন্তু আজ, এত বছর পর ব্যাপারটা কোন গুরুত্ব বহন করে না, মিস্টার রানা। আমার কাছে অন্তত।'

'কিন্তু তবু, কোথায় যেন একটা ফাঁক রয়ে গেছে বলে মনে হয় আমার বেশ বড় একটা ফাঁক।'

'আছে।' মিটিমিটি হাসছে বৃদ্ধ। 'আপনি যত বড় ভাবছেন, তার চেয়ে অনেক বড় ফাঁক।'

চোখ কুঁচকে উঠল মাসুদ রানার। 'কি রকম?'

চুরুট দাঁতে কামড়ে ধরে দুই হাতের তালু ঘষল খানিক হোয়াইটসাইড অ্যাশট্রেতে ছাই ঝাড়ল। তারপর চট্ করে আসন ছাড়ল 'চলুন, একটা চক্কর দিয়ে আসা যাক।'

'কোথায়?'

'আসুন না! কাছেই। দারুণ একটা জিনিস দেখাব আপনাকে।'

কার্ব ঘেঁষে যেখানে পার্ক করা হয়েছিল, সেখানেই আছে এখনও রোভারটা

হোয়াইটসাইডের পাশে উঠে বসল মাসুদ রানা। হান্টার বসল ড্রাইভিং সীটে, গড়াতে শুরু করল রোভার। তিন মিনিটের মধ্যে লণ্ডনের ঘন ট্রাফিকে ঢুকে পড়ল। টিপ টিপ বৃষ্টি পড়ছে। ওয়াইপার চালু করে দিল হান্টার।

বিশ মিনিট পর আর্ল'স কোর্ট ও কেনসিংটনের মাঝামাঝি এক জায়গায় দাঁড়িয়ে পড়ল গাড়ি। পিছনের দুই আরোহী নেমে এল ভেতর থেকে। জায়গাটা বেশ নিরিবিলি। রাস্তায় ট্রাফিকের চাপ অনেক কম। পথের দু'দিকে ঝাঁকড়া মাথাওয়ালা প্রচুর গাছ। নিজের বাঁ দিকে একটা গির্জা চোখে পড়ল রানার বেশ সাদাসিধে চেহারা, আকারেও ছোট।

'সেন্ট মাইকেল দ্যা রেডীমার চ্যাপেল,' মৃদুকণ্ঠে বলে উঠল হোয়াইটসাইড 'খুব শান্তির জায়গা, মনে হয়।' শ্রাগ করল। 'আমি আসলে ধর্ম-টর্ম তেমন একটা মানি না। তবে কখনও এ ধরনের স্থানে এলে মনটা কেমন যেন হয়ে যায়। ভাল লাগে। আসুন'

বৃদ্ধকে অনুসরণ করে গির্জার ভেতরে ঢুকল মাসুদ রানা। রেক্টরের সঙ্গে চোখাচোখি হলো হোয়াইটসাইডের, মাথা সামান্য ঝুঁকিয়ে পরস্পরকে অভিবাদন জানাল তারা। কোন কথা হলো না। সোজা এসে শেষ প্রান্তের বেদীতে উঠল ওরা দু'জন। বেদী অতিক্রম করে ছোট একটা বন্ধ দরজার সামনে থেমে দাঁড়াল হোয়াইটসাইড। দরজা খুলে আহ্বান জানাল রানাকে, 'চলে আসুন।'

পিছনের দেয়ালঘেরা ছোট এক কবরস্থানে চলে এল ওরা। 'এখানে কেন?' প্রশ্ন করল মাসুদ রানা

'জানেন, লেসলিকে খুব ভালবাসতাম আমি,' খেয়াল করল না বৃদ্ধ, গাঢ় কণ্ঠে বলে চলল, 'প্রাণভয়ে ভীত, আতঙ্কিত ছোট্ট একটি মিষ্টি মেয়ে। আমি বিয়ে করিনি জীবনে কাজেই কোন সন্তানও নেই। কিন্তু লেসলিকে যেদিন প্রথম দেখি, সেদিন মনে হয়েছে, বোধহয় ভুল করে ফেলেছি বিয়ে না করে। করলে ওর মত একটা কি দুটো মেয়ের বাপ হতে পারতাম। বেশ হত ব্যাপারটা।'

'আপনি এখানে কেন নিয়ে এলেন আমাকে?' কিছুটা কঠিন শোনাল মাসুদ রানার গলা।

'ওটা দেখাতে হাত তুলে একটা সমাধিস্তম্ভ দেখাল বৃদ্ধ। চেহারা অভিব্যক্তিহীন। নিভে গেছে দাঁতে ধরা চুরুট, খেয়াল নেই।

স্তম্ভটার দিকে তাকিয়ে জমে গেল মাসুদ রানা। বড় বড় গথিক অক্ষরে লেখা আছে ওটার গায়ে:

লেসলি ম্যাকঅ্যাডাম
১৯৬০-১৯৭৮

লেখাটার দিকে অবিশ্বাস মাখা দৃষ্টিতে দীর্ঘ সময় চেয়ে থাকল রানা। তারপর ঘুরে তাকাল হোয়াইটসাইডের দিকে, নিবিষ্টমনে ওর প্রতিক্রিয়া লক্ষ করছে বৃদ্ধ এইমাত্র যে নিজের ট্রাম্প কার্ড শো করেছে যুবককে, সে ব্যাপারে পূর্ণ সচেতন মানুষটা।

'এর অর্থ?' প্রায় ফিস ফিস করে বলল মাসুদ রানা।

'অর্থটা খুব সহজ, মিস্টার রানা। পাউন্ড জালকারী আর্থার স্যান্ডলারের এক জাল মেয়েও আছে। লেসলি নেই বটে, তবে তার আর সব ঠিকই আছে। একটি তথ্যও মিথ্যে বা ভুল নয়।'

'আর সব?' বেকুবের মত তার মুখের দিকে তাকিয়েই থাকল রানা।

'মানে বুড়ো ম্যাকঅ্যাডামকে লেসলির যে কাহিনী আপনি শুনিয়েছেন, তার কথা বলছি। শুনে রক্ত ঠাণ্ডা হয়ে গেছে বেচারী ম্যাকের। কাহিনীটা একদম পারফেক্ট। প্রতিটি খুঁটিনাটি আশ্চর্যরকম নির্ভুল, যা একমাত্র লেসলির-ই জানার কথা। আপনার নিউ ইয়র্কের লেসলি, সে আসল না হয়েও এত কিছু কি করে জানল ভেবে কোন কিনারা পাচ্ছি না আমি। এত অবাক জীবনে কখনও হইনি আমি।'

মাটির সঙ্গে প্রায় মিশে যাওয়া লেসলি ম্যাকঅ্যাডামের কবরের দিকে তাকাল মাসুদ রানা। 'কি করে বুঝব যে ওই কবরে সত্যিই কোন লাশ আছে?'

'কোন উপায় নেই। সত্যি। কিন্তু আমি জানি আছে, এবং সেটা লেসলির মৃতদেহ। আপনাকে মিথ্যে বলে আমার কোন লাভ নেই, মিস্টার রানা আপনি কি করোনারের রিপোর্ট দেখতে চান? চাইলে আমি সে ব্যবস্থা করতে পারি।'

তবু মাসুদ রানার মন মানে না। 'আপনি নিশ্চিত যে আসল লেসলিকেই কবর দিয়েছেন ওখানে?'

ওপর-নিচে মাথা দোলাল পিটার হোয়াইটসাইড। 'আসল লেসলি ম্যাকঅ্যাডাম। ১৯৭৮-এর মে মাসে নিহত হয় সে।'

'স্যান্ডলার?'

'সেরকমই আমাদের ধারণা। ছুটিতে কানাডা থেকে বেড়াতে এসেছিল হতভাগী। থাকত ব্লুমসবেরির এক ফ্ল্যাটে, চারজন আর্মড গার্ড ছিল তার পাহারায়। তবু মরতে হলো মেয়েটিকে। একদিন সকালে পাওয়া গেল তার গলা কাটা লাশ।'

নিউ ইয়র্কের লেসলির কমনীয় মুখটা ভেসে উঠল রানার চোখের সামনে। ভেসে উঠল তার গলার দাগটা। অন্তত একজন, ভাবল মাসুদ রানা, অন্তত এদের একজন মিথ্যে বলছে, এদের কেউ না কেউ।

'আমাদের দৃষ্টিতে,' বলে উঠল হোয়াইটসাইড, 'বিষয়টা ভীষণরকম বিভ্রান্তিকর। এদিকে দুটো হত্যাকাণ্ড, একটা এলিজাবেথের, অন্যটা তার মেয়ে লেসলির। কোনটিরই সুরাহা করতে পারিনি আমরা আনফিনিশড বিজিনেস। হাইয়েস্ট প্রায়োরিটি পাওয়ার যোগ্য নয় কোনটিই, তবে একেবারে গুরুত্ব-হীনও নয়। হেলাফেলা করার মত নয়।

'আমার ব্যক্তিগত মতামত যদি জানতে চান, তো বলি। আমার ধারণা, এলিজাবেথের মত লেসলিকেও আর্থার স্যান্ডলারই হত্যা করেছে। এবং আমার মনে হয়, এখনও বেঁচে আছে আর্থার স্যান্ডলার। কোথাও বসে কলকাঠি নাড়ছে সে। যদি জানতাম কোথায় আছে!'

জোর, ঠাণ্ডা বাতাসে শীত লেগে উঠল রানার। শিউরে উঠল ও।

'আপনার সমস্যাটা একবার ভাবুন, মিস্টার রানা। যে মানুষটি অফিশিয়ালি মৃত, দেখা যাচ্ছে সে বেঁচে আছে। আবার যে মেয়েটি বাস্তবে মৃত, সে-ও বেঁচে উঠেছে কোন অলৌকিক উপায়ে। ব্যাপারটা কতদূর টেনে নিয়ে যাবে আপনাকে, কে জানে!'

খানিক পর ফিরে চলল ওরা দু'জন। পিছন দরজা দিয়ে ঢুকে বেদী, তারপর গির্জার মেঝেতে নেমে এল একযোগে। এই সময় লোকটার ওপর চোখ পড়ল মাসুদ রানার। একটা বেঞ্চে বসে আছে সে, যেন প্রার্থনা করছে। অথচ আড়চোখে ওকেই দেখছে লোকটা। চোখাচোখি হতেই মুখ ঘুরিয়ে নিল সে। ভাল করে লোকটাকে লক্ষ করল মাসুদ রানা। দেখে মনে হয় ইউরোপীয়। আলপস অথবা টাইরল, কোনও এক জায়গার হবে। চেহারাটা মনের মধ্যে গেঁথে নিল মাসুদ রানা।

'মিস্টার রানা,' রোভারের কাছে এসে মুখ খুলল হোয়াইটসাইড। 'আপনি কি বিষয়টা নিয়ে আরও এগোতে চান?'

'অনেকদূর ইতিমধ্যেই এগিয়েছি আমি, তাই না?' বৃদ্ধের ধূর্ত চোখের দিকে তাকিয়ে পাল্টা প্রশ্ন করল ও।

'অল রাইট। এগিয়ে যান। আমার একটা অনুরোধ ছিল, যদি কিছু মনে না করেন।'

'বলুন।'

'আর্থার স্যান্ডলারকে এ মুহূর্তে কে বা কারা পরিচালনা করছে যদি জানতে পারেন, দয়া করে জানাবেন আমাকে। আমার সরকার কৃতজ্ঞ থাকবে আপনার প্রতি।'

সরাসরি কোন কথা দিল না মাসুদ রানা। 'যদি সক্ষম হই।'

গাড়িতে উঠে বসল ওরা। স্টার্ট দিল রজার্স হান্টার। নিঃশব্দে বেলগ্রাভিয়ার উদ্দেশে যাত্রা করল রোভার।

***

মাসুদ রানা

কালপুরুষ

দ্বিতীয় খণ্ড

কাজী আনোয়ার হোসেন

দ্বিতীয় খণ্ড

কাজী আনোয়ার হোসেন

কুখ্যাত এনগ্রেভার—জালিয়াত, আর্থার স্যাণ্ডলার, যাকে '৬৪ সালে প্রকাশ্যে 'গান ডাউন' করা হয়, দেখা যাচ্ছে বেঁচে আছে সে। তার মেয়ে লেসলি, যাকে সে নিজহাতে হত্যা করেছে '৬৯ সালে, সে-ও বেঁচে আছে।

এদিকে রানা এজেন্সির বিশ্বস্ত নাইটগার্ড, জ্যাকবাস; জানা গেল সে আসলে এক ডীপ কভার কে. জি. বি. এজেন্ট, সের্গেই সোলাভস্কি। রেকর্ড বলে, '৬৫ সালে মৃত্যু হয়েছে তার। মরে গিয়েও দিব্যি হেঁটে বেড়াচ্ছে।

আরেক 'মৃত' ব্রিটিশ গোয়েন্দা কর্মকর্তা, সে-ও বেঁচে। চার মৃত, আচমকা জ্যান্ত হয়ে পিছু নিয়েছে মাসুদ রানার! পর পর দু'বার আক্রান্ত হয়ে রুখে দাঁড়াল ও।

কেন এতগুলো জিন্দালাশ সওয়ার হলো রানার কাঁধে? কি চায় ওরা?

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

সেবা প্রকাশনী, ২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
শো-রুম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
শো-রুম: ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

Help Us To Keep Banglapdf.net Alive!
Please Give Us Some Credit When You Share Our Books!
Don't Remove This Page!
Edited By
Sewam Sam
Scanned By
shuva969
Edited By
Sewam. Sam
Visit Us at Banglapdf.net
If You Don't Give Us Any Credits, Soon There ll Nothing Left To Be Shared!

কাল পুরুষ-২

প্রথম প্রকাশ: ১৯৯৬

এক

বাইশ-কি-তেইশ বছর বয়স হবে সেদিনের সেভেনটি থার্ড স্ট্রীটের হত্যাকাণ্ডের শিকার হতভাগ্য মার্ক রাইডারের স্ত্রী, কাইল ফারলোর। একমাত্র সন্তান দেড় বছরের মেয়ে সুজিকে কোলে নিয়ে বসে আছে কাইল, চাউনি ভাবলেশহীন, দু'দিন ধরে কেঁদে কেঁদে চোখমুখ ফুলিয়ে ফেলেছে বেচারী।

কাইলের মুখোমুখি বসে আছে শওকত। চেহারায় বেদনার ছাপ। নিজের কাজ ভালই বোঝে শওকত। তারওপর রয়েছে মাসুদ রানার নির্দেশ। আন্তরিক সববেদনা জানাল সে কাইল ফারলোকে তারপর আসল কাজ শুরু করে দিল। এক এক করে প্রশ্ন করতে লাগল মেয়েটিকে।

না, বলল কাইল শওকতের প্রশ্নের জবাবে, ঘটনার আগের দিন সকালে অফিসের উদ্দেশে বেরিয়ে যাওয়ার পর আর দেখা হয়নি তার স্বামীর সাথে। দুপুরে টেলিফোনে কথা হয়েছিল কেবল। মার্ক রাইডার ফোন করে স্ত্রীকে জানিয়ে দিয়েছিল যে কাজের চাপে রাতে বাড়ি ফিরতে পারবে না সে।

না, তার কোন শত্রু আছে বলে জানা নেই কাইলের। কারও কাছে এক পয়সাও দেনা নেই রাইডারের।

তিনি কি জানিয়েছিলেন সে রাতটা কোথায় কাটাবেন বলে মনস্থির করেছেন তার স্বামী? আর কোন মেয়ের সঙ্গে তার গোপন সম্পর্ক থাকা সম্ভব?

যা জানার মাত্র পাঁচ মিনিটে জেনে নিল শওকত। তারপর আরেকবার কাইলকে সমবেদনা জানিয়ে বেরিয়ে এল। গাড়ি হাঁকিয়ে সোজা ব্র্যাডফোর্ড এল সে, মেহর অ্যাণ্ড কোম্পানিতে। তখন দুপুর আড়াইটা। নিজেকে মার্ক রাইডারের 'বন্ধু মানুষ' পরিচয় দিয়ে তার সহকর্মীদের সঙ্গে আলাপ করল শওকত। নিজে যে একজন 'প্রাইভেট আই', সে কথাও জানাল। ফলে প্রত্যেকেই, যে যা জানে হতভাগ্য যুবক সম্পর্কে, বলল তাকে।

আলাপের ছলে কয়েকজনের জবানবন্দী নিল সে। রাইডারের বস যেচে পড়ে তার এমপ্লয়মেন্ট রেকর্ডস দেখাল ওকে। কোথাও সন্দেহের কিছু দেখা গেল না। কাইলকে সর্বশেষ যে প্রশ্নটা করেছিল শওকত, এদেরকেও করল। উত্তর পাওয়া গেল একইরকম। না, আর কোন মেয়ের সঙ্গে সম্পর্ক ছিল না মৃতের। অন্তত তাদের জানামতে।

বসকে প্রশ্ন করল শওকত মেহর অ্যাণ্ড কোম্পানির কোন মেয়ে কর্মচারী সেভেন্টি থার্ড স্ট্রীটের ইস্ট দু'শো ছেচল্লিশ নম্বর ভবনে থাকে কি না, বা তর আশেপাশের ভবনে? জানা গেল কেউ থাকে না। তবে নাইন্টি ফোর্থ স্ট্রীটের ইস্ট তিনশো ষোলো নম্বর ভবনে থাকে একজন, কিন্তু সে পুরুষ, প্রৌঢ়। নাম ডারবান হিভি।

মেহর অ্যাণ্ড কোম্পানি থেকে বেরিয়ে সেভেন্টি থার্ড স্ট্রীটের ইস্ট দুশো ছেচল্লিশ নম্বর অ্যাপার্টমেন্ট ভবনে এল শওকত। এর ছয়-তলায় থাকে মাসুদ রানা। অবশ্য এ মুহূর্তে ইউরোপে রয়েছে রানা। কোথায় যেতে হবে, কাকে খুঁজতে হবে, সে ব্যাপারে তাকে মোটামুটি একটা ধারণা দিয়ে গেছে রানা, অতএব সোজা ডেবি মোরানের দরজায় নক করল এসে শওকত। রানার ঠিক নিচের-তলায় থাকে মেয়েটি। নিঃসঙ্গ।

এখানে নিজেকে নাইন্টিনথ প্রিসিঙ্কটের ডিটেকটিভ পরিচয় দিল শওকত। আইডি কার্ডও দেখাল মোরানকে। সন্তুষ্ট হয়ে ভেতরে এনে বসতে দিল তাকে মেয়েটি। সে নিজে বসল বিশাল সাদা এক ভিনাইল কাউচে। টাইট জিনস পরা এক পা তুলে দিয়েছে অন্য পায়ের ওপর। সিগারেট ফুঁকছে।

মুখোমুখি বসে মেয়েটিকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পর্যবেক্ষণ করল শওকত। বয়স হবে বড়জোর বিশ। চোখা চেহারা। শরীরের তুলনায় বুক দুটো বেশি ভারি। চোখেমুখে ড্যাম কেয়ার একটা ভাব ডেবি মোরানের।

ধোঁয়া গেলার ফাঁকে যথেষ্ট সময় নিয়ে শওকতের এটা-ওটা প্রশ্নের উত্তর দিল সে। নিউ ইয়র্কের অ্যাকসেন্টে কথা বলে ডেবি। সেন্ট পল, মিনেসোটার মেয়ে সে। পেশা? পার্টটাইম অভিনেত্রী এবং পার্টটাইম মডেল।

'অভিনেত্রী?' আগ্রহের সুর ফুটল শওকতের কণ্ঠে। 'তাহলে নিশ্চই আপনাকে দেখেছি আমি কোন ছবিতে, টিভি সিরিয়ালে, তাই না? কি যেন নাম?' নিজের কপালে তর্জনীর ডগা দিয়ে কয়েকটা টোকা দিল ও। 'ব্রডওয়ে? না, অফ ব্রডওয়ে?'

'না।'

'তাহলে কোন মুভিতে?'

এবারের 'না'-টা বেরুল সময় নিয়ে। দৃষ্টি নামিয়ে অ্যাশট্রের দিকে নজর দিল ডেবি মোরান। রুমের চারদিকে তাকাল শওকত। প্রতিটি আসবাব লেটেস্ট ডিজাইনের এবং নিঃসন্দেহে যথেষ্ট দামী। ওয়াশরুম ব্যবহারের ছলে সংলগ্ন বেডরুমটায় একটা চক্কর দিয়ে এল ও এক ফাঁকে। ওয়াশরুমের মহামূল্য ওয়াটারবেড দেখে চোখ কপালে উঠল তার। ওটার দাম কত হতে পারে অনুমান করতেও ব্যর্থ হলো শওকত। পুরো অ্যাপার্টমেন্ট থেকে টাকার ঘ্রাণ আসছে।

'আপনি শেষ অভিনয় করেছেন কিসে?'

'টিভিতে, ওয়েস্ট কোস্টের ওপর এক কমার্শিয়ালে। এখনও দেখানো শুরু হয়নি অবশ্য, তবে খুব শিগগির হবে।'

জ্যাকেটের পকেট থেকে মার্ক রাইডারের একটা ছবি বের করল শওকত। নিজস্ব কন্ট্যাক্টকে দিয়ে মর্গ থেকে ছবিটা তুলিয়েছিল মাসুদ রানা। এগিয়ে দিল ওটা ডেবির দিকে। 'দেখুন তো একে কখনও দেখেছেন কি না?'

ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখল ওটা ডেবি। 'না।'

তীক্ষ্ণ চোখে মেয়েটিকে লক্ষ করল শওকত। না, ছবি দেখে কোন প্রতিক্রিয়া হলো না তার মধ্যে। চেহারা একদম স্বাভাবিক। 'আপনি নিশ্চিত?'

'আমি নিশ্চিত,' ছবিটা ফিরিয়ে দিল ডেবি মোরান। 'দেখিনি।'

'কয়েক দিন আগে এই অ্যাপার্টমেন্ট ভবনের সামনে খুন হয়েছে লোকটা।

রাত সাড়ে তিনটা থেকে পোনে চারটার মধ্যে।'

'কী সাঙ্ঘাতিক!' শিউরে ওঠার ভান করল সে।

আবার খানিক তাকে পর্যবেক্ষণ করল শওকত। 'এই বিল্ডিঙেরই কারও সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল সে।'

কথা বলল না ডেবি। কাঁধ ঝাঁকাল কেবল।

'এখানে কি কাজে এসেছিল সে, তা জানতে আগ্রহী নই আমি। আমি শুধু জানতে চাই ঠিক কখন বেরিয়েছিল লোকটা।'

'দুঃখিত। জানা নেই আমার। আমার ঘুম খুব গাঢ়। সকাল সকাল শুয়ে পড়ি, উঠি সেই আটটা ন'টায়। একা থাকি, বুঝতেই পারছেন!' অসহায় ভঙ্গি করল ডেবি শ্রাগ করে।

অবশ্যই পারছি, মনে মনে জঘন্য একটা গাল পাড়ল শওকত। অফিসে ফেরার সময় সারাটা পথ ডেবি মোরানকে অকথ্য-অশ্রাব্য ভাষায় গালাগাল করল শওকত। ও নিশ্চিত, মেয়েটি স্রেফ একটা বেশ্যা, একটু উঁচু দরের এই যা। এবং তার ওখান থেকেই সে-রাতে বেরিয়েছিল মার্ক রাইডার।

'কোথাও কোন ভুল হচ্ছে না তো আমাদের, শওকত ভাই?' ঘটনা শুনে বলল এজেন্সির উপ-প্রধান ইউনুস। ইউনুস খন্দকার। চব্বিশ-পঁচিশ বছর বয়স ইউনুসের। হালকা পাতলা গড়ন। উচ্চতা প্রায় ছয় ফুট। মাথা ভর্তি লালচে ঘন কোঁকড়া চুল। এতই ঘন যে ঘণ্টাখানেক ধরে গোসল করলেও সব চুলের গোড়া ভেজে না তার।

'যেমন?' গরম কফিতে চুমুক দিল শওকত।

'হয়তো স্রেফ ডাকাত ছিল ওরা। ছিনতাইকারী। শুধুই ছিনতাই করতে এসেছিল?'

'তা হতে পারে না,' ঘন ঘন মাথা দোলাল শওকত। পুরু চশমার নিচে বুদ্ধিদীপ্ত চোখ পিট্ পিট্ করে উঠল তার বার কয়েক। 'ওর গলার ক্ষতটা দেখেছি আমি। একজন সার্জনও অমন নিখুঁত কাজ করতে পারবে কি না সন্দেহ।'

'তাহলে?'

'ভাবছি ওরা ভুল মানুষের ওপর চড়াও হয়েছিল কি না।'

নিচের ঠোঁট কামড়ে ধরে কি যেন ভাবল ইউনুস। নতুন কোণ থেকে বিষয়টা নিয়ে চিন্তা করার একটা সূত্র ধরিয়ে দিয়েছে তাকে শওকত। 'আপনি বলতে চাইছেন…!'

'হ্যাঁ, তাই। ডেবি মোরান এবং তার খদ্দের মার্ক রাইডার দুর্ভাগ্য-জনকভাবে জড়িয়ে গেছে এর সঙ্গে। ভেতরের ঘটনার সঙ্গে কোনভাবেই সংশ্লিষ্ট নয় ওরা। স্রেফ দুর্ভাগ্যজনক। আমার থিওরি হচ্ছে শেষ রাতে যে কারণেই হোক ডেবির ঘর থেকে বেরিয়ে আসে রাইডার। সন্ধের দিকে তাকে হয়তো কোন পাব থেকে পিক করেছিল মেয়েটি। সে যাই হোক, সে সময়ে আর কাউকে আক্রমণ করার জন্যে বাইরে অপেক্ষায় ছিল দুই খুনী। এমন কাউকে, যার ওই একই সময়ে বেরিয়ে আসার কথা ছিল ভেতর থেকে। কিন্তু যাকে তারা আশা করছিল, সে না এসে এল রাইডার। এবং আবছা আলোয় তাকেই শিকার ভেবে ঝাঁপিয়ে পড়ে দুই

খুনী। খেয়াল করো, একই সময় আরও একজন কিন্তু সত্যিই বেরিয়েছিল ওই বিল্ডিং থেকে, আকারে-গঠনে অবিকল মার্ক রাইডারের মতই ছিল সে, চেহারা বাদে।'

'মাসুদ ভাই!' রুদ্ধশ্বাসে বলে উঠল ইউনুস।

'হ্যাঁ। মাসুদ ভাই। ভাগ্য ভাল যে সামনে দিয়ে না বেরিয়ে পিছন দিয়ে বেরিয়েছিলেন মাসুদ ভাই। যদি মার্ক রাইডার না হয়ে মাসুদ ভাই হতেন সেখানে, কি ঘটত?'

'কিন্তু ওই লোকের চুলের রং লাল, আর...'

'ওটা বড় কোন ব্যাপার নয়। বৃষ্টির মধ্যে নিশ্চই মাথা নিচু করে দ্রুত হাঁটছিল রাইডার গাড়িতে ওঠার জন্যে, তাছাড়া জায়গাটা ছিল আবছা অন্ধকার। আর সবচে' বড় কথা অমন মুহূর্তে চুলের রং দেখতে যাওয়ার কথা নয় কারও, মানুষটার আকার-গঠনই যথেষ্ট।'

'বুঝলাম। কিন্তু ঠিক মাসুদ ভাইর জন্যেই কেন বাইরে অপেক্ষা করবে খুনী? তারা কি ভাবে নিশ্চিত ছিল যে উনি সেই মুহূর্তেই বের হবেন?'

'নিশ্চিত করা হয়েছিল, অফিসে আগুন লাগিয়ে। বুঝতে পারছ না?'

হতভম্ব চেহারা হলো ইউনুসের। 'না!'

'ফোন করে মাসুদ ভাইকে অফিসে আগুন লাগার সংবাদ দেয়া হয়েছিল, কেন?'

'কেন?' প্রতিধ্বনি করল উপ-প্রধান।

'কারণ জানা কথা, অমন খবর পেলে অবশ্যই তড়িঘড়ি ছুটে আসবেন তিনি। না এসেই পারেন না। এবং ফোন করেই ওরা পুরোপুরি নিশ্চিত হয় যে উনি সত্যিই আসছেন।'

'কিন্তু...কিন্তু ফোনটা তো করেছিল জ্যাকবাস!'

'হ্যাঁ, তাই।'

'জ্যাকবাস কেন অমন কাজ করবে?' চরম বিস্ময়ে চোখ কপালে উঠল ইউনুসের। 'জ্যাকবাস...জ্যাকবাস! কি বলছেন, শওকত ভাই! এ-ও কি সম্ভব?'

হঠাৎ করে অন্যমনস্ক হয়ে পড়ল শওকত। 'কি জানি! আগে কখনও ভাবিনি এ নিয়ে। এখন ভাবতে হবে।'

যে যে পথে এগিয়েছে শওকতের মার্ক রাইডার হত্যাকাণ্ডের তদন্ত কাজ, প্রায় সেই একই পথে এগোল হেরেনের পুলিসী তদন্ত। কেবল মৃতের বাসায় যাওয়ার প্রয়োজন বোধ করল না সে। গিয়েছিল অবশ্য পরে একবার, শুধুই কর্তব্য পালনের খাতিরে। মেহের অ্যাণ্ড কোম্পানি থেকে সরাসরি ঘটনাস্থলে এল ডিটেকটিভ, দু'শো ছেচল্লিশ নম্বর অ্যাপার্টমেন্ট ভবনের অন্য সব ভাড়াটের সাথে কথা বলল।

অবশেষে ডেবি মোরানকে মনে ধরল প্যাটি হেরেনের। মেয়েটির সঙ্গে দুই মিনিট আলাপ করেই বুঝে ফেলল এই বিল্ডিঙে কার ফ্ল্যাটে সে-রাতে এসেছিল মার্ক রাইডার, এবং কেন এসেছিল।

অফিসে ফিরে রুমেই পেল সে অ্যারাম সাশাদকে। গভীর চিন্তায় ডুবে আছে

সে। তার মাথার সামান্য পিছনে, দেয়ালে ঝুলছে একটা বুলেটিন বোর্ড। কম্পিউটারে ছাপা নানা আকারের বুলেটিনের সঙ্গে ছোট দুটো পোস্টারও গাঁথা আছে ওতে। একটায় এক ট্রাফিক পুলিসকে শহরের এক স্কুল ক্রসিঙে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যাচ্ছে। ওটার ক্যাপশন 'পুলিস অফিসার আপনার বন্ধু। তাদের প্রতি আস্থা রাখুন'। আরেকটায় শুধু লেখা। বেশ বড় অক্ষরে, চমৎকার টানে লেখা, 'কালোদের ঈশ্বর ভালবাসেন। কালোরা আমেরিকার গর্ব'।

'পেয়েছি,' বলল হেরেন।

ধ্যান ভাঙল সাশাদের। নড়েচড়ে বসল সে। 'কি?'

'দু'শো ছেচল্লিশের সেই মেয়েটি, যার কথা বলেছিল মাসুদ রানা। আমার ধারণা যদি মিথ্যে না হয়, মেয়েটা হাই প্রাইসড হুকার। হয়তো কোন বারে ফাঁদে ফেলে সে রাইডারকে, অথবা কালো খাতায় নাম আছে তার।'

'কি নাম মেয়েটির?'

'ডেবি। ডেবি মোরান। বাজি ধরে বলতে পারি, সে রাতে অন্তত সাড়ে তিনটে পর্যন্ত ওর কাছেই ছিল রাইডার।'

তার মানে আমরা মিথ্যে সন্দেহ করেছিলাম মাসুদ রানাকে! তিক্ত মনে ভাবল সাশাদ। 'ওকে রাইডারের ছবি দেখিয়েছ?'

'হ্যাঁ।'

'তো?'

'চিনেও না চেনার ভান করল হারামজাদী।'

'হুম!'

পরদিন সকালে ডেবি মোরানের গতিবিধির ওপর নজর রাখার জন্যে দুই শিফটে দু'জন করে চারজন ডিটেকটিভ নিয়োগ করল অ্যারাম সাশাদ। বিকেল পর্যন্ত গাড়িতে বসে গল্প-গুজব আর ঘন ঘন হাই তুলে কাটাল প্রথম শিফটের দু'জন, মেয়েটির ছায়া পর্যন্ত দেখা গেল না। ঘরেই কাটাল সে প্রায় সারাটা দিন।

অবশেষে সাড়ে পাঁচটার সময় অ্যাপার্টমেন্ট ভবন থেকে বেরিয়ে আসতে দেখা গেল ডেবিকে। একটা ইয়েলো ক্যাব ডেকে দুই অপেক্ষমাণ ডিটেকটিভকে লেজে বাঁধিয়ে রওনা হয়ে গেল সে। সিক্সথ ও সেভেনথ অ্যাভিনিউর মাঝখানে ফিফটি ফিফথ্-এর এক বারের সামনে নামল। ট্যাক্সি ভাড়া মিটিয়ে ঢুকে পড়ল বারে।

অনুসরণকারীদের তলব পেয়ে দুই মিনিটের মধ্যে সেখানে পৌঁছল স্মার্ট এক যুবক। মিডটাউন অ্যান্টি-ভাইস স্কোয়াডের এক আণ্ডারকাভার ডিটেকটিভ সে। পুলিসে এই স্কোয়াডের সবাই 'পুসি পোজি' নামে পরিচিত। যুবকের নাম স্যামুয়েল ম্যাকগোয়ান। তার টাইপিনটা আসলে একটা মাইক্রো রিসিভার। তার পিছন পিছন এল আরও একজন–এক যুবতী। সে-ও একই স্কোয়াডের, নাম তেরেসা দুচেকি। আড়ালে পুরুষ সহকর্মীরা ডাকে সেইন্ট তেরেসা বলে। কারণ, কোন পুরুষ পাত্তা পায় না তার কাছে। ওই বিষয়ে সে যাকে বলে একেবারে সাক্ষাৎ দজ্জাজননি। ভেতরে ঢুকল তেরেসাও। বসল আলাদা।

বারের সামনে ডেবিকে বসা দেখে তার কাছাকাছি একটা টুলে চড়ে বসল ম্যাকগোয়ান। প্রথম দৃষ্টিতেই নজর কাড়ল সে ডেবির কিন্তু প্রথম প্রথম পাত্তা

দিল না সে আনমনে সিপ করতে থাকল নিজের গ্লাসে। যেন কোন চিন্তায় আছে। দশ মিনিট পর হঠাৎ করেই যেন চোখ পড়ল তার ডেবির ওপর। শুরু হলো মুচকি হাসি দিয়ে। পাঁচ মিনিট পর দেখা গেল, তার ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে বসে বক বক করছে মেয়েটি। ম্যাকগোয়ান থেকে থেকে 'হুঁ', 'হাঁ' করছে আর মাথা দোলাচ্ছে।

যখন মনে হলো বড়শি গিলেছে যুবক, লাইনে এল ডেবি মোরান। 'এখানে সময় নষ্ট না করে আমরা আর কোথাও গিয়ে মজা করতে পারি,' তীর ছুঁড়ল সে।

'এখানেই তো যথেষ্ট মজা করছি, আর কি চাই?'

'কামন, সুগার,' চোখ টিপল মেয়েটি। 'দারুণ এক অ্যাপার্টমেন্টে একদম একা থাকি আমি।'

'তাই নাকি?' ঘায়েল হলো যেন 'পুসি পোজি'

'কিছু খরচ করলে অকল্পনীয় এক সঙ্গে উপহার পেতে পারো তুমি আমার তরফ থেকে। যাবে?'

'টাকা?'

'হ্যাঁ।'

'আই সী! কিন্তু···ইয়ে, কত?'

'একশো পঞ্চাশ,' সামনে ঝুঁকে প্রায় ফিসফিস করে বলল ডেবি মোরান।

'ঠিক আছে,' একটু ইতস্তত করে রাজি হয়ে গেল যুবক। 'চলো।'

বেরিয়ে পড়ল ম্যাকগোয়ান ও ডেবি। তবে কয়েক কদমের বেশি এগুবার সুযোগ হলো না। তার আগেই পিছন থেকে মেয়েটির কাঁধে টোকা দিল তেরেসা। বলতে হলো না, পলকে বুঝে ফেলল ডেবি মোরান গ্রেফতার করা হয়েছে তাকে।

নিজের থিওরি, বলা ভাল অবিশ্বাস্য থিওরি, নিজের কাছেই সত্য প্রমাণ করার জন্যে উঠে পড়ে লাগল শওকত।

ইউনুসসহ এজেন্সির মোট ছয়জনকে জ্যাকবাসের পিছনে লাগাল সে। তিন শিফটে চব্বিশ ঘণ্টা ছায়ার মত লোকটাকে অনুসরণ করতে থাকল ওরা। কিন্তু না, পরপর তিন দিন কেটে গেল, আশানুরূপ কিছুই অনুমান পর্যন্ত করা গেল না। হতাশ হলো শওকত। দুশ্চিন্তায় পড়ে গেল। তাহলে কি ভুল হয়েছে ওর কোন? অনর্থক নিরপরাধ, নির্বিরোধী একজনের পিছু লেগেছে সে?

তার অ্যাসটোরিয়ার ফ্ল্যাটের ওপর শ্যেন দৃষ্টি রাখা হয়েছে গত তিন দিন। কিছুই ঘটল না। সব স্বাভাবিক। রাতে তার পুরানো ফোর্ডে চড়ে নিয়মিত কর্মস্থলে যায় জ্যাকবাস। পার্ক অ্যাভিনিউ সাউথের থার্টিয়েথ স্ট্রীটের একই জায়গায় পার্ক করে ওটা রোজ। তারপর সামান্য পথ হেঁটে পৌঁছায় রানা এজেন্সিতে। অপরিচিত কাউকে এর মধ্যে তার বাড়িতে আসা-যাওয়া করতে দেখা যায়নি। সে-ও কারও সঙ্গে দেখা করেনি। অফিস আর বাসা, বাসা আর অফিস করেছে কেবল।

ওদিকে, শওকতের জানা নেই ব্যাপারটাকে এখন পুলিসও অভিন্ন দৃষ্টিতে দেখছে। যদিও প্রতিটি ক্ষেত্রেই তার থেকে সামান্য পিছিয়ে আছে সাশাদ হেরেন। এখন আর মাসুদ রানা বা তার সঙ্গে ম্যাডিসন স্কয়ার গার্ডেনের আইস হকি মাঠে

দেখা রহস্যময় মেয়েটিকে নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছে না তারা একেবারেই, ঘামাচ্ছে রানা এজেন্সির নাইট গার্ড জ্যাকবাসকে নিয়ে। শুধু ঘামাচ্ছে-ই না, দু'দিন থেকে তার পিছনে সার্বক্ষণিক ওয়াচারও লাগিয়েছে সাশাদ। বুঝে গেছে জ্যাকবাস-ই সময়মত ফোন করে বাসা থেকে বের করে আনে সে রাতে রানাকে। দূর থেকে জ্যাকবাসের ওপর যেমন নজর রাখছে তারা, তেমনি লক্ষ-রাখছে রানা এজেন্সির অপারেটরদের কার্যকলাপের ওপরও। প্রতি মুহূর্ত পুলিসের বিনকিউলারে নজর বন্দী হয়ে আছে এজেন্সির ছেলেরা।

নজরদারীর চতুর্থ দিনের ঘটনা। পার্ক অ্যাভিনিউ সাউথের এক কার পার্কে গাড়ি ডবল পার্ক করে বসে আছে শওকত ও ইউনুস। ইউনুসের সঙ্গীকে শরীর খারাপ হয়ে পড়ায় ছুটি দিয়ে তার জায়গায় নিজেই লেগেছে আজ শওকত। যেখানে বসে আছে ওরা, সেখান থেকে রানা এজেন্সির প্রবেশ পথ, আর শ'তিনেক গজ দূরের আরেক কার পার্কে জ্যাকবাসের নিশ্চল ফোর্ড, দুটোই দেখা যায়। ওদের একশো গজ পিছনের একটা গলিতে রয়েছে আরও একটা গাড়ি। পুলিসের গাড়ি ওটা। ভেতরে রয়েছে ডিটেকটিভ অ্যারাম সাশাদ ও প্যাটি হেরেন। প্রথম দুটোর ওপর তো বটেই, শওকত-ইউনুসের ওপরও নজর রেখেছে তারা।

রাত সাড়ে তিনটা। স্টীয়ারিং হুইলের পিছনে নড়েচড়ে বসল শওকত। ঘুমে চোখ বুজে আসছে তার, জোর করে খুলে রাখতে হচ্ছে পাতা। হঠাৎ করেই সামনে একটা নড়াচড়া চোখে পড়ল, শিরদাঁড়া খাড়া হয়ে গেল শওকতের। পলকে উবে গেছে ঘুমের রেশ। চট করে ড্যাশ বোর্ডের ওপরে রাখা নাইটগ্লাস তুলে নিয়ে চোখে লাগাল সে।

'অ্যাই!' লাফিয়ে উঠল সে। 'ওটা কি?'

ধড়মড় করে সোজা হয়ে বসল ইউনুস। 'কই?'

সামনে ঝুঁকে বসে আছে শওকত। একদৃষ্টে চেয়ে আছে সামনের দিকে। কোনদিক থেকে আচমকা উদয় হয়েছে সামনের সবুজ রঙের গাড়িটা বুঝতেই পারেনি। জ্যাকবাসের গাড়ির পাশের ফাঁকা জায়গায় দাঁড়াল সেটা। একটা শেভ্রোলে নোভা। প্রচুর জায়গা থাকতেও ঠিক ওই জায়গাটাই কেন বেছে নিল গাড়িটা? উত্তেজিত হয়ে উঠল শওকত। ইউনুসও তাকিয়ে আছে নাক বরাবর। খালি চোখেই দেখতে পাচ্ছে সে ওদিকের তৎপরতা। একই অবস্থা পুলিসের দুই ডিটেকটিভেরও। হাঁ করে দেখছে তারা গাড়িটা।

নোভার ওটার চালকের আসন থেকে নামল এক লোক। পিছনের বুটের সামনে এসে দাঁড়াল সে। বুট খুলল, ডালা পুরো তুলে দিয়ে জ্যাকবাসের ফোর্ডের পিছনে চলে এল। ওটার বুটও খুলে ফেলল সে চাবি ঘুরিয়ে। তুলে ফেলল ডালা।

'কি ব্যাপার!' ছিলার মত টান টান হয়ে উঠেছে শওকতের প্রতিটি পেশী। রুদ্ধশ্বাসে বলল সে, 'জ্যাকবাসের বুটের চাবি···এর কাছে কেন?'

ওদিকে সাশাদ দৃশ্যটা দেখছে আর জিকির করছে, 'হোয়াট ইজিট! হোয়াট ইজিট! হোয়াট ইজিট!'

নোভার লাইসেন্স নাম্বারটা দেখে। হতভম্বের মত চেহারা হলো শওকতের। ওটা একটা ডিপ্লোম্যাটিক লাইসেন্স। ফোর্ডের বুটের সামনে ঝুঁকে দাঁড়াল নোভার

চালক। ভেতর থেকে বের করল পোস্ট-অফিস মেইল ব্যাগের মত একটা ব্যাগ। ব্যাগটা দেখে মনে হলো হালকা, যদিও পেটমোটা। নিজের বুটে রাখল সে ওটা। তারপর নিয়ে এল আরও একটা।

কাজ শেষ। শব্দ করে হাত ঝাড়ল নোভার চালক। বন্ধ করল বুট দুটো, তারপর উঠে বসল নিজের আসনে।

'কি হলো ব্যাপারটা!' বিড় বিড় করে বলল শওকত। বোকা বোকা চোখে সঙ্গীর দিকে তাকাল। 'বুঝলে কিছু?'

ঠোঁট উল্টে মাথা ঝাঁকাল ইউনুস। 'নাহ!'

ওদিকে ছোটখাট একটা হুঙ্কার ছাড়ল সাশাদ, 'কে রে, শালা!'

মুচকে হাসল হেরেন। 'শালাই বটে। তবে হাই র‍্যাঙ্কিং শালা।'

'কি?'

'ডিপ্লোম্যাটিক লাইসেন্স নাম্বার বহন করছে ওর গাড়ি।'

'ডিপ্লোম্যাটিক!' চেহারা ভীষণরকম কুঁচকে উঠল সাশাদের।

'হ্যাঁ। ডিপিএল লাইসেন্স, নিউ ইয়র্ক স্টেটের। কোন এমব্যাসি না কনসুলেটের কে জানে!'

'কবে থেকে মিউজিক্যাল ট্রাঙ্কস্ খেলছে শালা জ্যাকবাসের সঙ্গে?' গাড়ি স্টার্ট দিল সে। নাইটগ্লাস তুলে দিল হেরেনের হাতে। 'লক্ষ রাখো কোনদিকে যায়।'

লট থেকে বেরিয়ে এল নোভা, মুখ ঘুরিয়ে লেক্সিংটনের দিকে রওনা হয়ে গেল। সামনের একটা লাল ট্রাফিক সঙ্কেত পুরোপুরি অগ্রাহ্য করল গাড়িটা, মাঝারি গতিতে বাঁক নিয়ে থার্টিয়েথ অ্যাভিনিউতে পড়ে অদৃশ্য হয়ে গেল।

'এইবার ওকে ধাওয়া করা যায়,' পরামর্শ দেয়ার ভঙ্গিতে বলল হেরেন। 'ট্রাফিক লাইট অগ্রাহ্য করেছে ব্যাটা।'

'লাল লাইট?' বাঘের চোখে তাকাল সাশাদ।

ভাল মানুষের মত মাথা দোলাল সে, 'হুঁম!'

ব্যস্ত হাতে গীয়ার এনগেজ করল সাশাদ, পরমুহূর্তে লাফ দিল ছদ্মবেশী পুলিস কার। 'শা-লা! আজ তোর একদিন কি আমারই একদিন!' ঝড়ের বেগে গাড়ি ছোটাল সে।

ওদিকে শওকতও স্টার্ট দিল নিজের গাড়িতে। 'ওরা ধরুক গিয়ে ব্যাটাকে, আমরা আগে এদিকের কাজটা সারি।'

জ্যাকবাসের ফোর্ডের পিছনে এসে থামল সে, লাফিয়ে নেমে পড়ল গাড়ি থেকে। এক মিনিট পর, শূন্য দৃষ্টিতে ফোর্ডের খালি বুটের দিকে তাকিয়ে থাকতে দেখা গেল ওদের বেকুবের মত। কিছু নেই ভেতরে, একদম ফাঁকা।

'জলদি চলো,' বুটের ডালা আছড়ে বন্ধ করল শওকত। 'লোকটাকে ধরতে পেরেছে কি না ওরা দেখে আসি।'

ওদিকে লেক্সিংটন অ্যাভিনিউতে কূটনৈতিক গাড়িটিকে আটক করেছে সাশাদ। চালকের জানালার পাশে পাহাড়ের মত দাঁড়িয়ে আছে সে কোমরে দুই হাত রেখে। ঘুমের অভাব এবং প্রচণ্ড রাগ, দুইয়ে মিলে টকটকে লাল করে তুলেছে তার দু'চোখ।

নিজ আসনে ভেজা বেড়ালের মত বসে আছে নোভার চালক। দু'হাত কোলের ওপর ভাঁজ হয়ে আছে বন্ধ জানালার ওপাশ থেকে প্রায় আকাশ ছোঁয়া পুলিস অফিসারকে দেখছে সে।

'অ্যাই ব্যাটা!' খেঁকিয়ে উঠল সাশাদ। 'কাঁচ নামা জলদি! নয়তো এক ঘুসিতে কাঁচ আর তোর মুখ দুটোই সমান করে দেব।' নমুনা স্বরূপ হালকা দুটো ঘুসি লাগাল সে নোভার জানালায়। কেঁপে উঠল গাড়ি।

ধীরেসুস্থে কাঁচ নামাল চালক। শান্ত গলায় প্রশ্ন করল, 'সমস্যাটা কি অফিসার?' অজানা অ্যাকসেন্টের ইংরেজি তার।

লোকটার নাকের সামনে 'পটাশ' করে তুড়ি বাজাল সাশাদ। চমকে উঠল সে। 'লাইসেন্স আর রেজিস্ট্রেশন বের করুন, কুইক!'

'আমি একজন কূটনীতিক, অফিসার,' আগের মতই শান্ত কণ্ঠে বলল নোভার চালক। তারপর ড্যাশবোর্ড থেকে কাগজপত্র বের করে তুলে দিল তার হাতে।

ওগুলোয় চোখ বোলাতে লাগল ডিটেকটিভ। ওদিকে তার সঙ্গী ধীরপায়ে নোভার পিছনে গিয়ে দাঁড়াল। নজর বুটের তালায়। লোকটার লাইসেন্সে লেখা নাম পড়ল সাশাদ, বোগদান বেলিয়া। লোকটা জাতিসংঘের রোমানিয়ান ডেলিগেশনের অ্যাটাশে। ভেতরে ভেতরে অক্ষম রাগে ফুলতে থাকল সাশাদ। জানে ট্রাফিক সঙ্কেত ভঙ্গের অভিযোগে এরকম একজনকে আটক করার ক্ষমতা তার নেই। তাতে ক্ষতি ছাড়া লাভ হবে না কিছু। আবার তাকে এ-ও বুঝতে দেয়া যাবে না যে তাকে নয় বরং জ্যাকবাসকে অনুসরণ করতে গিয়ে বোগদানের নাগাল পেয়েছে ওরা।

আবার আটক যখন করা হয়েই গেছে, তখন এমনি এমনি ছেড়ে দেয়াও ঠিক হবে না। অর্থাৎ না ঘাঁটিয়েও ছাড়া যাবে না ব্যাটাকে।

'দেখলেন?' বলল বোগদান বেলিয়া। 'ডিপ্লোম্যাট। আপনি এভাবে…'

'গেট আউট!'

'কি?'

'গেট আউট!' গর্জে উঠল সাশাদ। 'কলার ধরে টেনে বের করার আগে ভদ্রভাবে বেরিয়ে আসুন।'

'আপনি কিন্তু বেআইনীভাবে…'

'কথা বাড়াবেন না। আইন এখন আমার পকেটে। যা খুশি তাই করব আমি আজ রাতে। আউট!'

ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে বসেই থাকল বেলিয়া। পরিচয় পাওয়ার পরও তার সঙ্গে অফিসারের এমন আচরণের কারণ খুঁজে পাচ্ছে না। পিছন থেকে সাশাদকে শান্ত হওয়ার অনুরোধ জানাল হেরেন। 'উত্তেজিত হয়ো না। ঠাণ্ডা মাথায়…'

'রাখো তোমার ঠাণ্ডা মাথা! এই লোক ভুয়া বলে সন্দেহ করছি আমি। এগুলো,' হাতে ধরা কাগজপত্র দিয়ে বাতাসে ঝাপটা মারল সে, 'স্রেফ জাল ডকুমেন্টস। একে অ্যারেস্ট করতে যাচ্ছি আমি।'

বোগদানের দিকে তাকাল হেরেন। 'দেখুন, আমার বন্ধু খুব রাগী মানুষ। আপনি দয়া করে বেরিয়ে আসুন, আমি ওকে শান্ত করছি।'

'আপনারা শুধু শুধু আমাকে হয়রানী করছেন, অফিসার,' অভিযোগের সুরে

বলল কূটনীতিক। 'এমন কোন অন্যায় করিনি আমি যে কারণে...'
'করেননি, তাই না?' খ্যাক করে উঠল সাশাদ। 'লাল সঙ্কেত অগ্রাহ্য করেননি আপনি একটু আগে?'
চুপ করে গেল রোমানিয়ান।
'আমার মনে হয় এটা হট কার,' হেরেনের উদ্দেশে মন্তব্য করল সাশাদ।
'কি বললেন?' বুঝতে না পেরে বলে উঠল বেলিয়া। নজর অপেক্ষাকৃত ভদ্র, শান্ত হেরেনের ওপর।
'আমার বন্ধুর ধারণা আপনার এটা চোরাই গাড়ি,' বলল সে।
ফাঁদে পড়া চেহারা হলো কূটনীতিকের। 'না না! চোরাই হতে যাবে কেন?'
'প্রমাণ করুন,' নির্বিকার মুখে বলল সাশাদ। পরমুহূর্তে প্রসঙ্গ বদল করল। 'বুটে কি আছে?'
'কিছু নেই।'
'খুলুন। দেখব আমি।'
'বললাম তো কিছু নেই ওতে।'
'বিশ্বাস করলাম না।'
খানিক ইতস্তত করল লোকটা। তারপর বুটের লকে চাবি ঢোকাল বিরক্ত মুখে। 'ঠিক আছে। দেখুন।'
সামনে ঝুঁকল অ্যারাম সাশাদ। 'ওই ব্যাগে কি?'
'ফিলম ক্যান।'
'কি?' চোখ কোঁচকাল ডিটেকটিভ। 'খুলুন ব্যাগ। দেখান।'
বিনা বাক্য ব্যয়ে ব্যাগ দুটো খুলল কূটনীতিক। ভেতর থেকে বেরোল বেশ কিছু চ্যাপ্টা, গোল মুভি ফিলম ক্যান। এর মধ্যে ছায়াছবির ফিলম রীল থাকে। সবগুলো খালি। প্রতিটি ক্যানের গায়ে লেখা রোটা ফিলমস্, ভারিক স্ট্রীট, নিউ ইয়র্ক। প্রশ্নবোধক দৃষ্টিতে লোকটার দিকে তাকাল সাশাদ।
'আমার দেশী এক ফিলম কোম্পানির ক্যান এগুলো,' ব্যাখ্যা করল বেলিয়া। 'ভারিক স্ট্রীটে লোকাল অফিস ওদের। আমার এক বন্ধু চাকরি করে সেখানে।'
'তো?'
'ওর গাড়ি নেই। তাই আমি ওর বাসা থেকে নিয়ে এসেছি ক্যানগুলো। পৌঁছে দেব বন্ধুর অফিসে।'
দু'মিনিট পর লোকটাকে রেহাই দিল সাশাদ, চলে গেল নোভা। ঘুরে নিজের গাড়ির দিকে পা বাড়াতে যাবে, এই সময় কয়েক ফুট দূরে দাঁড়ানো শওকতের ওপর চোখ পড়ল তার। এক মুহূর্ত দেখল সে শওকতকে, তারপর উঠে পড়ল গাড়িতে। চিনতে পেরেছে সে শওকতকে। ও এখানে কেন, তা-ও নিশ্চয়ই বুঝে নিয়েছে।

দুই

মাথায় এক পাহাড় চিন্তার বোঝা নিয়ে নিউ ইয়র্ক ফিরে এল মাসুদ রানা। রাত

দশটায় জন এফ কেনেডি এয়ারপোর্টের টারম্যাক স্পর্শ করল ওকে বয়ে আনা ব্রিটিশ এয়ারওয়েজের দৈত্যাকার ডাবল ডেকারের আণ্ডার ক্যারিজ।

থেকে থেকে বোয়াল মাছের মত হাঁ করছে মাসুদ রানা–হাই তুলছে। ভীষণরকম ক্লান্ত ও। আটলান্টিকের ওপারের সময়ে অভ্যস্ত দেহ খাড়া রাখা মহা দায় হয়ে পড়েছে। ঘরে ফিরে ট্রাভেল ব্যাগটা লিভিংরুমের সোফায় ছুঁড়ে ফেলল মাসুদ রানা। মাতালের মত এলোমেলো পায়ে বেডরুমের দিকে এগোল। কাপড়-চোপড় খুলে নিজেকে পীপিং গাউনের মধ্যে গুঁজল কোনরকমে। তারপর সোজা বিছানায় গিয়ে উঠল।

ঘুমের রাজ্যে তলিয়ে যাওয়ার আগমুহূর্তে আবছাভাবে রানার মনের পর্দায় লেসলি ম্যাকঅ্যাডামের কমনীয় মুখটা ভেসে উঠল। কে ও? সত্যিই কি ভুয়া মেয়েটি?

পরদিন সকাল সাড়ে দশটায় টেলিফোনের আওয়াজে ঘুম ভাঙল মাসুদ রানার। সাপের মত খানিক আড়মোড়া ভাঙল ও, তারপর হ্যাণ্ডসেট তুলল ফোনের। 'হ্যালো!'

'গুড মর্নিং!' একটা সুরেলা মেয়ে কণ্ঠ সম্ভাষণ জানাল।

চোখ কুঁচকে উঠল ওর, 'মর্নিং?'

'লেসলি বলছি।'

উঠে বসল মাসুদ রানা। 'দুঃখিত। তোমার টেলিফোনিক টোন একেবারে বাচ্চা মেয়েদের মত, চিনতে পারিনি। তারপর, কি মনে করে?'

'কোথায় ছিলে গত দু'দিন? খুঁজে খুঁজে হয়রান!'

'কেন খুঁজছিলে বলো।'

'এইটি নাইনথ স্ট্রীটে যাচ্ছি আমি। তুমিও এসো। কিছু কথা আছে তোমার সঙ্গে।'

'ওখানে কোথায়?'

'স্যাণ্ডলার ম্যানসনের সামনে।'

একটু ভাবল মাসুদ রানা। 'কখন?'

'এই ধরো, বারোটায়? অসুবিধে হবে?'

'না, ঠিক আছে।'

'ধন্যবাদ। ঠিক বারোটায় পৌঁছব আমি ওখানে।'

'এসো।'

রিসিভার রেখে আকাশ-পাতাল ভাবল রানা কয়েক সেকেণ্ড। দাড়ি গজানো থুতনি ডলল আনমনে। বিছানা থেকে নেমে রাস্তার দিকের জানালার কাছে এসে দাঁড়াল, তাকিয়ে থাকল ঠিক যেখানটায় মার্ক রাইডারের মৃতদেহটা পড়ে ছিল, সেদিকে।

এইটি নাইনথ স্ট্রীট ও ম্যাডিসন অ্যাভিনিউর সংযোগস্থলে দাঁড়িয়ে আছে মাসুদ রানা। ওর ঠিক সামনে, রাস্তার ওপারে, গম্ভীর চেহারার স্যাণ্ডলার ম্যানসন, দাঁড়িয়ে আছে এক শতাব্দীরও বেশি কালের ইতিহাসের নীরব সাক্ষী হয়ে। রিয়েল এস্টেট কর্তৃপক্ষ সম্প্রতি সীল করে দিয়েছে ম্যানসনটা। ওটার আর কোন

দাবিদার নেই, তাই।

দূর থেকে ম্যানসনের বন্ধ দরজা-জানালা, ইটের সীমানা দেয়াল ও ভেতরের ঘন, আকাশ-ছোঁয়া গাছ-গাছালিপূর্ণ বাগান দেখছে মাসুদ রানা। অন্যমনস্ক চোখে ভেতরে ঢোকার ভারি স্টীল গেটের দিকে তাকাল ও। গেটটা প্রকাণ্ড। '৬৪ সালে ওই গেট দিয়ে বেরিয়ে অপেক্ষমাণ গাড়িতে উঠতে গিয়েই নিহত হয়েছিল আর্থার স্যাণ্ডলারের 'ডবল'। কে ছিল মানুষটা? দেয়ালের ইট-সিমেন্ট বা পেভমেন্টের কংক্রীট কথা বলতে পারে না, পারলে জিজ্ঞেস করে জেনে নিত মাসুদ রানা।

ঘড়ি দেখল ও। এখনও আধ মিনিট বাকি বারোটা বাজতে। চোখ তুলেই লেসলিকে দেখতে পেল। পার্ক অ্যাভিনিউর মোড় ঘুরে দৃঢ় পায়ে হেঁটে আসছে ওর দিকে। মেয়েটির হাঁটার স্টাইল দারুণ, প্রায় রাজকীয়। প্রতিটি পদক্ষেপ মাপা, স্থির নিশ্চিত। হাঁটু ছুঁই ছুঁই চকলেট রঙের লেদার কোট পরেছে আজ লেসলি, ওটার কলার ও দুই হাতার প্রান্ত ধূসর পশমমোড়া। কাঁধে বড় চামড়ার একটা ব্যাগ। চোখে গাঢ় সানগ্লাস। গলায় স্কার্ফ।

কাছে এসে রানার উদ্দেশে মোহনীয় এক টুকরো হাসি দিল লেসলি ম্যাকঅ্যাডাম। উত্তরে মাসুদ রানাও হাসল। যদিও চোখের সামনে ভাসছে লণ্ডনে দেখে আসা লেসলির কবরের স্মৃতিস্তম্ভের ছবি, তবু কেন যেন মেয়েটিকে দেখে ভেতরে ভেতরে খুশি হয়ে উঠল রানা। স্বস্তিও পেল। ওর আধ হাতের মধ্যে এসে দাঁড়াল লেসলি, জুতোর আগায় ভর দিয়ে উঁচু হয়ে মুখ এগিয়ে নিয়ে এল মাসুদ রানার মুখের কাছে। আলতো করে তার ঠোঁটের কোণ ও গালের একাংশে চুমু খেলো রানা।

'হ্যালো, রানা!'

'হ্যালো!'

'খুব খুঁজেছি তোমাকে দু'দিন।'

'দুঃখিত। ব্যস্ত ছিলাম।' বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্স চীফ, মেজর জেনারেল (অব.) রাহাত খানের একটা সতর্কবাণী মনে পড়ল মাসুদ রানার 'কখনও কোন ক্লায়েন্টের সাথে ব্যক্তিগত সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ো না,' কখনও কখনও এ উপদেশ দিয়ে থাকেন তিনি ওকে। ওদের সবাইকে। যে ভাবেই হোক, লেসলির সঙ্গে জড়িয়ে গেছে মাসুদ রানা। মেয়েটি এখন ওর ক্লায়েন্ট, অন্তত শেষ পর্যন্ত না হোক, একটা পর্যায় পর্যন্ত তো বটেই। অতএব বসের উপদেশটা...

সানগ্লাস নামিয়ে স্যাণ্ডলার ম্যানসনের দিকে তাকাল লেসলি ম্যাকঅ্যাডাম। ম্যানসনের বুলওয়ার্ক ও সীমানা-দেয়ালের ওপর ঘুরে বেড়াচ্ছে ওর দুই মাঝারি নীল চোখ। রানার সন্দেহ হলো, মনে মনে কোন ফন্দি আঁটছে হয়তো মেয়েটি।

মাসুদ রানাও তাকাল সেদিকে। ভাবল ও বাড়ির চার দেয়াল ও তার ভেতরের রহস্যময় সাম্রাজ্যের ততোধিক রহস্যময় কিন্ডার ওরফে স্যান্ডলারদের বিগত তিন পুরুষের কথা। বৃদ্ধা ভিক্টোরিয়ার কথা, যে প্রায় সাড়ে তিন দশক বলতে গেলে একাই কাটিয়েছে ওই বিশাল ম্যানসনে। এই সেই বাড়ি, একদিন যেখান থেকে বেরিয়ে এসেছিল অ্যাডলফ জেঙ্গার, সম্পূর্ণ অন্য মানুষ হয়ে। এবং তারপরই 'ড্যানিয়েলস অ্যান্ড জেঙ্গার অ্যাসোসিয়েটস'-এর জমজমাট আইন ব্যবসা

ছেড়ে নিজের স্বেচ্ছা অবসর গ্রহণের কথা ঘোষণা করেছিল।

মাসুদ রানার সঙ্গে এ বিষয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে ড্যানিয়েলস বলেছিলেন, 'কেন যে ও এমন আচমকা অবসরের সিদ্ধান্ত নিল, আমি ভেবে পাই না। জেঙ্গার এক আজব, ব্যতিক্রমি মানুষ।'

'ওর ভেতরে ঢোকা যায় কি করে, রানা?' বলল লেসলি।

শুনতে পায়নি রানা কথাটা। 'কিছু বলছ?'

'বলছিলাম স্যান্ডলার ম্যানসনে ঢোকা যায় কি করে?'

'সোজা পথে হলে এখনই কোন উপায় দেখছি না আমি। তবে যদি বাঁকা পথে ঢুকতে চাও, তাহলে উপায় আছে একটা।'

'কি সেটা?'

'বার্গলার'স টুলস্।'

'ফাইন।' সন্তুষ্ট মনে হলো মেয়েটিকে।

'কি?'

'ভাল বুদ্ধি দিয়েছ।'

পূর্ণ দৃষ্টিতে লেসলিকে দেখল মাসুদ রানা। 'আমি ঠাট্টা করছিলাম।'

'আমি সিরিয়াস,' গম্ভীর গলায় বলল লেসলি।

'এখনই এমন কোন প্রয়োজন পড়েনি যে চুরি করে স্যান্ডলার ম্যানসনে ঢুকতে হবে তোমাকে,' কঠিন কণ্ঠে বলল মাসুদ রানা। 'তোমার সমস্যা নিষ্পত্তির ভার এখন আমার কাঁধে, সেই অর্থে তুমি আমার মক্কেল। আমি চাই না আমার মক্কেল বেআইনী কিছু ঘটিয়ে জটিল একটা বিষয়কে আরও জটিল করে তুলুক।'

দু'কাঁধ ঝাঁকাল লেসলি। 'তুমি আমাকে হতাশ করলে, রানা।'

'দুঃখিত। তুমি যদি আশা করে থাকো অমন এক কাজে আমি তোমাকে সাহায্য করব তাহলে হতাশ তোমাকে হতেই হবে, লেসলি। আইনের লড়াই জেতার জন্যে আইন ভাঙতে পারব না আমি। অন্তত এখনই নয়।'

'যাক!' হাঁপ ছাড়ার ভঙ্গি করে হাসল মেয়েটি। 'তবু বোঝা গেল পরে হলেও বিষয়টা নিয়ে মাথা ঘামাবে তুমি। হয়তো।'

মাথা দোলাল মাসুদ রানা। 'হয়তো। এবার বলো ডেকেছ কেন।'

'চলো, হাঁটি।'

'কোথায় যেতে চাও?'

'ম্যাডিসন অ্যাভিনিউর দিকে। বিশেষ কোন কাজ নেই তো তোমার?'

'না। চলো।'

মুখ নিচু করে পাশাপাশি হাঁটতে লাগল ওরা। এক হাতে পেটের কাছে লেদার কোট আঁকড়ে ধরে আছে লেসলি ম্যাকঅ্যাডাম, অন্য হাতে ধরেছে রানার বাহু। নাকেমুখে তীরের মত বিধছে এসে তীব্র ঠাণ্ডা বাতাস। স্যান্ডলার ম্যানসন পিছনে রেখে অনেকটা পথ নীরবে পেরিয়ে এল ওরা। সামনের একটা বাঁক ঘুরলেই ম্যাডিসন অ্যাভিনিউ।

'দু'দিন কোথায় ছিলে বললে না তো, রানা!' তরল কণ্ঠে বলল লেসলি। 'আমি জানি এ শহরে ছিলে না তুমি, বাইরে কোথাও গিয়েছিলে। সে কি আমার

ব্যাপারে?'

'কিছুটা,' উত্তর দিল মাসুদ রানা।

'কোন অগ্রগতি হলো?'

'নাহ্!'

শ্রাগ করল লেসলি। আর কোন প্রশ্ন করল না। বাঁক নিয়ে ম্যাডিসন অ্যাভিনিউতে এসে পড়ল ওরা। ব্যস্ত অ্যাভিনিউ। সামনেই একটা আর্ট গ্যালারি। দাঁড়িয়ে পড়ল মেয়েটি গ্যালারির রাস্তা ঘেঁষে প্রকাণ্ড প্লেট-গ্লাস জানালার সামনে। অ্যানসপেচার গ্যালারি এটার নাম। ভেতরে মার্কিন এক ইমপ্রেশনিস্ট, জেরাল্ড ডেটুইলারের একক চিত্র প্রদর্শনী চলছে।

'ওহ্, দারুণ তো!' খুশি হয়ে উঠল লেসলি ম্যাকঅ্যাডাম। 'আর্ট গ্যালারি!'

'কয়েক কুড়ি আর্ট গ্যালারি আছে ম্যাডিসনে। গ্যালারির ডিপো এই জায়গা।'

'তাই নাকি?' বাচ্চা মেয়ের মত খুশি হয়ে উঠল মেয়েটি। এ মুহূর্তে মুখের হাসিটিও তার একেবারে নিষ্পাপ অবোধ শিশুর মত–উজ্জ্বল, অজানা উত্তেজনায় পূর্ণ। চকচকে চোখে কয়েক মুহূর্ত প্লেট-গ্লাস ডিসপ্লে উইন্ডো দেখল সে। 'রানা, ভেতরে যেতে পারি না আমরা?'

'না পারার কোন কারণ নেই। কিন্তু কেন? আর্ট দেখতে?'

'নিশ্চই! এসো এসো!' হাত ধরে রানাকে প্রায় হিড় হিড় করে টেনে নিয়ে চলল লেসলি। 'তুমি জানো না আমি নিজেও একজন আর্টিস্ট। তেমন নাম করা কিছু নই অবশ্য।'

'আচ্ছা!'

'কাম অন। অন্যদের আঁকা ছবি দেখতে ভাল লাগে আমার।'

গ্যালারিতে পা রেখে অবাক হয়ে গেল ওরা। বাইরে থেকে আন্দাজ করাও সম্ভব নয় কী প্রচণ্ড ভিড় ভেতরে। পা ফেলার জায়গা নেই, পিঁপড়ের মত সর্বত্র পিলপিল করছে মানুষ। তিন ফ্লোরে চলছে ডেটুইলারের প্রদর্শনী, তিনটেরই একই অবস্থা। ভিড় ঠেলে একেকটা ক্যানভাসের সামনে গিয়ে দাঁড়াচ্ছে লেসলি, আর মুগ্ধ দৃষ্টিতে ছবি দেখছে।

বেশিরভাগই আমেরিকার উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় ল্যান্ডস্কেপ। নদীর তীরে সার বেঁধে দাঁড়ানো কারখানা, সাগর সৈকতের জনারণ্য, লেকে নৌ-বিহারে রত পর্যটক ইত্যাদি। 'দারুণ সব আর্ট!' প্রশংসার সুরে বলল লেসলি। 'কি বলো?'

'আর্ট সম্পর্কে তেমন একটা আগ্রহ নেই আমার,' পানসে গলায় বলল মাসুদ রানা। 'বুঝি কম।'

বিস্মিত দৃষ্টিতে ওকে দেখল লেসলি। 'সত্যি বলছ?'

ওপর-নিচে মাথা দোলাল ও। 'জলদি করো। আর্থার স্যান্ডলার সম্পর্কে কিছু প্রশ্ন আছে আমার। জরুরী।'

কোন পরিবর্তন লক্ষ করা গেল না মেয়েটির মধ্যে। মনে হলো হয় সে রানার কথা শুনতে পায়নি, নয়তো ভান করছে না পাওয়ার। আরেকটা ক্যানভাসের সামনে গিয়ে দাঁড়াল লেসলি। খুব কাছ থেকে দেখতে লাগল ছবিটা। উজ্জ্বল নীল, সবুজ ও হলদে রঙে আঁকা আরেকটা ল্যান্ডস্কেপ ওটা। 'ভদ্রলোকের

ব্রাশস্ট্রোকগুলো দেখেছ? এক কথায় অতুলনীয়! মনেটের সার্থক অনুসারী এ লোক, কোন ভুল নেই তাতে।' হাসি মুখে ঘুরে তাকাল লেসলি। 'দুঃখিত। কি যেন বলছিলে, রানা?'

'আর্থার স্যান্ডলার সম্পর্কে...' পিঠে রামগুঁতো খেয়ে থেমে গেল ও। খাটো, হোঁৎকা এক চুরুটখেকো বেরিয়ে গেল রানার গা ঘেঁষে। ধাক্কা লাগার জন্যে দুঃখ প্রকাশ দূরে থাক, দয়া করে একবার তাকাল না পর্যন্ত লোকটা।

কপালে সরু কয়েকটা ভাঁজ পড়ল লেসলির। মনে হলো গ্যালারিতে ঢুকে ভুলেই গিয়েছিল সে আর্থারের কথা। মনে করিয়ে দিয়ে চিন্তায় ফেলে দিয়েছে ওকে মাসুদ রানা। 'তার সম্পর্কে কি?' এমন চেহারা করল সে, যেন বলতে চায়, ওই ব্যাপারটা তো এখানে তোলার কথা ছিল না! বেশ বুঝতে পারছে রানা এ নিয়ে কথা বলতে মোটেই আগ্রহী নয় লেসলি। এড়াতে চাইছে সে বিষয়টা।

'যতটা সম্ভব জানতে চাই আমি তার সম্পর্কে,' দৃঢ় কণ্ঠে বলল মাসুদ রানা।

'তাই বলো। কিন্তু আমার মনে হয় এর মধ্যে তার ব্যাপারে আমার চাইতে অনেক বেশি জ্ঞান অর্জন করে ফেলেছ তুমি, রানা।'

'আমি তা মনে করি না,' বলল ও। পরক্ষণে আরেক দীর্ঘদেহী নিগ্রোর ধাক্কা খেয়ে এক পা এগিয়ে গেল সামনে। বিরক্তিতে চেহারা বিগড়ে গেল রানার।

ব্যাপারটা খেয়াল করল লেসলি। ওর এক হাত ধরে সামনে টানল সে। 'চলো। একটা ফাঁকা জায়গা দেখে দাঁড়ানো যাক।'

গায়ে গায়ে লেগে এগোল ওরা। যতবারই মেয়েটির দিকে তাকাচ্ছে মাসুদ রানা, মনেপ্রাণে নিজেকে বিশ্বাস করাতে চাইছে এ-ই আসল লেসলি, ততবারই চোখের সামনে ভেসে উঠছে লণ্ডনের সমাধি স্তম্ভটা। 'তারচে' বরং ওপরে চলো,' বলল রানা। 'ভিড় হয়তো কিছুটা কম হবে দোতলায় বা তিনতলায়।'

'ঠিক আছে। চলো।'

এলিভেটরের দিকে চলল রানা ও লেসলি। 'তোমার পালক পিতা,' বলল ও, 'বা অন্য যার কথা বলছিলে, ব্রিটিশ ইন্টেলিজেন্সের অফিসার, কি যেন নাম ভদ্রলোকের?'

'পিটার হোয়াইটসাইড?'

'হ্যাঁ। ম্যাকঅ্যাডাম আর হোয়াইটসাইড।'

'হঠাৎ ওঁদের কেন টানাটানি আর্থারকে ছেড়ে?'

'ওদের কাছ থেকে আর্থার সম্পর্কে নতুন কোন তথ্য পাওয়া যেতে পারে হয়তো।'

মাথা দোলাল লেসলি। 'যেতে পারত, হয়তো, যদি...'

'যদি?'

'যদি জীবিত থাকত ওরা।'

বিস্মিত হবে কি-না ভাবল মাসুদ রানা। 'মানে?'

'বেঁচে নেই ওরা, মারা গেছে। দু'জনেই।'

'মারা গেছে?'

মাথা দুলিয়ে সায় দিল লেসলি। 'কোন সন্দেহ নেই তাতে।'

'আগে বলোনি তো?' গম্ভীর গলায় বলল মাসুদ রানা।

'তুমি জানতে চাওনি, তাই বলিনি।' আগ্রহ ভরা চোখে ওর দিকে তাকাল মেয়েটি। 'কিন্তু ওদের প্রসঙ্গ হঠাৎ জরুরী হয়ে দেখা দিল কেন, রানা?'

'কবে মারা গেছে ওরা?' লেসলির প্রশ্ন শুনতে পায়নি ও। এলিভেটরের বন্ধ দরজার সামনে এসে দাঁড়াল দু'জনে। সবাই মৃত! ভাবছে মাসুদ রানা, ম্যাকঅ্যাডাম মৃত, হোয়াইটসাইড মৃত, লেসলি…। প্রথম দু'জনের মৃত্যু হয়েছে কি ভাবে? বার্ধক্যজনিত কারণে? কিন্তু ও যাদের দেখেছে, দু'জনকেই যথেষ্ট স্বাস্থ্যবান মনে হয়েছে রানার। তাহলে? জবাবের আশায় কয়েক মুহূর্ত অপেক্ষা করল ও, তারপর আবার একই প্রশ্ন করল, 'কবে মারা গেছে ওরা? কি ভাবে?'

চোখ কপালে তুলল লেসলি। 'মাই গড, রানা! তুমি যে নাছোড়বান্দা উকিলের মত জেরা করতে শুরু করে দিলে!'

ঠাণ্ডা দৃষ্টিতে লেসলির দিকে তাকিয়ে থাকল রানা। 'এটা আমার প্রশ্নের উত্তর হলো না, লেসলি।'

'দুঃখিত।' মুহূর্তের জন্যে নার্ভাস হয়ে পড়ল যেন মেয়েটি। হাত কচলাল, তারপর সামলে নিল নিজেকে। কাঁধের বড়সড় ব্যাগটার ফিতে ডলতে লাগল দুই আঙুলে। 'ওঁদের মৃত্যু একটা দুঃখজনক ঘটনা ছিল। আমার জন্যে অন্তত।'

'আমি শুনতে চাই।'

'বলছি।'

মৃদু আওয়াজ তুলে মাঝখান থেকে ফাঁক হয়ে গেল এলিভেটরের স্টীলের দরজা। খুদে একটা এলিভেটর। ছয়জন আছে ভেতরে। এতেই ভরে আছে ওটার উদর। লোকগুলো নেমে এল। ভেতরে ঢুকে পড়ল রানা-লেসলি। পিছন পিছন ঢুকল আরও দু'জন। একজন বেশ মোটা। রানা-লেসলির মাঝখানের ফাঁক গলে এলিভেটরের পিছন দেয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়াল গিয়ে লোক দুটো। মোটার হাতে একটা উলের স্কার্ফ ঝুলছে দেখা গেল। নার্ভাস চোখে তাদের দিকে তাকাল লেসলি।

মাসুদ রানাও দেখল তাদের এক পলক। ওদের দিকে খেয়াল নেই লোক দুটোর। খুদে একটা পকেট ক্যালকুলেটরে কী যেন হিসেব কষছে সঙ্গী, গলা বাড়িয়ে তাই দেখছে মোটা লোকটা। নিজেদের নিয়ে ব্যস্ত। সেকেণ্ড ফ্লোরের বোতাম টিপে দিল মাসুদ রানা। এলিভেটরের দরজা বন্ধ হওয়ার শব্দ কানে যেতে হুঁশ হলো যেন মোটার, তাড়াতাড়ি হাত বাড়িয়ে টপ ফ্লোরের বোতাম টিপল সে।

আলতো একটা দোল খেয়ে উঠতে আরম্ভ করল এলিভেটর। দোতলা ছাড়িয়ে তিনতলার উদ্দেশে চলছে। জায়গা মত পৌঁছতে গতি পড়ে এল এলিভেটরের, খানিক ইতস্তত করে থেমে দাঁড়াল ওটা। খুলে গেল দরজা। মাথা ঝাঁকিয়ে আগে লেসলিকে নামতে বলল মাসুদ রানা, তারপর নিজে পা বাড়াল। বাইরে এসে দাঁড়িয়েছে, এই সময় পিছনে দরজা বন্ধ হতে শুরু করল।

পা বাড়াতে গেল মাসুদ রানা, তখনই আচমকা বাধাটা পড়ল। চোখের সামনে মোটা লোকটার হাতে ধরা স্কার্ফটা পলকের জন্যে দেখতে পেল ও, পরক্ষণেই ফাঁস হয়ে রানার গলায় পেঁচিয়ে বসল ওটা। পিছন দিকে হ্যাঁচকা এক টান খেয়ে ভারসাম্য হারিয়ে ফেলল মাসুদ রানা, এলিভেটরের দরজায় পিঠ দিয়ে

আছড়ে পড়ল দড়াম করে। মাথা ঠুকে গেল ভীষণ জোরে। ওদিকে মৃদু 'ঠং' আওয়াজে বন্ধ হয়ে গেল এলিভেটরের দরজা। নড়ে উঠল ওটা।

ফাঁসির দড়ির মত শক্ত হয়ে গলায় এঁটে বসেছে স্কার্ফ, পিছনের টানে জিভ বেরিয়ে পড়ার দশা মাসুদ রানার। চোখ বিস্ফারিত, মনে হলো যে-কোন মুহূর্তে কোটর ছেড়ে লাফিয়ে বেরিয়ে পড়বে। দু'হাতে স্কার্ফ মুঠো করে ধরল মাসুদ রানা, মরীয়া হয়ে টানা-হ্যাচড়া করছে বজ্র গেরোর হাত থেকে নিজেকে মুক্ত করতে, কিন্তু এক চুল শিথিল তো হলোই না, বরং আরও এঁটে বসল ওটা। উঠতে শুরু করেছে এলিভেটর। ভেতরের মোটা লোকটার মত ওটার স্টীল দরজাও এ মুহূর্তে চরম শত্রু হয়ে দাঁড়িয়েছে রানার। ফাঁকের মধ্যে এমনভাবে আঁকড়ে ধরেছে স্কার্ফ, মনে হচ্ছে ওর মাথা আঠা দিয়ে সেঁটে দেয়া হয়েছে যেন দরজার সাথে।

উন্মত্তের মত গোড়ালি দিয়ে দরজার গায়ে দমাদম লাথি লাগাল মাসুদ রানা। কিন্তু কিছু হলো না তাতে। ওদিকে, পিছনে এলিভেটরের দরজায় রানার আছড়ে পড়ার শব্দে চর্কির মত ঘুরে দাঁড়িয়েছে লেসলি। সামনের দৃশ্য দেখে সশব্দে আঁতকে উঠল সে, গলায় আটকে গেছে দম। বেকুবের মত হাঁ করে তাকিয়ে থাকল। ওর চোখের সামনে মাসুদ রানা অসহায়ের মত হাঁসফাঁস করতে করতে, পা ছুঁড়তে ছুঁড়তে ওপরে উঠে যাচ্ছে একটু একটু করে।

মাটি ছেড়ে শূন্যে উঠে গেছে রানার পা। আর বড়জোর পাঁচ সেকেণ্ড, তারপরই ওপরের কিনারায় ঠুকে যাবে মাসুদ রানার খুলি, মট্ করে ভেঙে যাবে ঘাড়। নাকে মৃত্যুর গন্ধ পেল রানা।

আগের মতই পাথর হয়ে দাঁড়িয়ে থাকল লেসলি ম্যাকঅ্যাডাম, বিস্ফারিত চোখ। চিৎকার করল না সে। আতঙ্ক বোধ করলেও চেহারায় তার কোন আভাস লক্ষ করা গেল না। এদিকে দম ফুরিয়ে মরতে বসেছে মাসুদ রানা। সর্বশক্তিতে স্কার্ফ ধরে টানছে, কিন্তু ফলাফল একই। হঠাৎ প্রাণ ফিরে পেল যেন লেসলি। এক ঝটকায় ব্যাগ খুলে ডান হাত ঢুকিয়ে দিল ভেতরে, ব্যাগ হাতড়ে কিছু একটা বের করল, আলো লেগে ঝিকিয়ে উঠল জিনিসটা। ছুরি!

ছুটে এল লেসলি। ছুরি চালাল সামনে। আঁতকে উঠে পা ছুঁড়তে যাচ্ছিল রানা মেয়েটির তলপেট সই করে, সামলে নিল একেবারে শেষ মুহূর্তে। ওর গলা নয়, পরম স্বস্তির সাথে টের পেল রানা স্কার্ফের ফাঁসটা কাটার চেষ্টা করছে সে অস্ত্রটা দিয়ে। ধারাল ছুরির খসড় খসড় কয়েক পোঁচে ফাঁস খানিকটা ঢিল হলো যেন, পরক্ষণে সম্পূর্ণ মুক্ত হয়ে গেল মাসুদ রানা, ঠিক ওপরের কিনারার সাথে মাথা ঠুকে যাওয়ার আগমুহূর্তে। হুড়মুড় করে আছড়ে পড়ল ও ফ্লোরে।

ফুঁপিয়ে উঠে দম নিল রানা, কেশে উঠল ভয়ঙ্করভাবে। দু'হাতে গলা আঁকড়ে ধরে হাঁটুতে ভর দিয়ে উঠে বসল ও, চেহারা বিকৃত হয়ে আছে। মনে হচ্ছে যেন একটা মালবাহী ট্রাক ওর গলা মাড়িয়ে দিয়ে গেছে এইমাত্র। চোখে টলমল করছে পানি। ছুরিটা ব্যাগে পুরে দু'হাতে শক্ত করে ধরল ওকে উদ্বিগ্ন লেসলি। 'রানা! রানা! ঠিক আছ তুমি?'

কাশতে কাশতে উঠে দাঁড়াল মাসুদ রানা। নিজে থেকে নয়, ভেতর থেকে কেউ ঠেলে তুলে দিয়েছে ওকে। প্রচণ্ড রাগে তালু জ্বলছে ওর। এলোমেলো পায়ে

সিঁড়ির দিকে ছুটে গেল রানা দু'তিন কদম, পিছন থেকে আস্তিন মুঠো করে ধরে ঠেকাল ওকে লেসলি। বুঝে ফেলেছে কোথায় যেতে চাইছে সে।

'লাভ নেই,' মৃদু গলায় বলল লেসলি। 'ওপরে যায়নি ওরা। নিচে নেমে গেছে। ওই দেখো।' হাত তুলে এলিভেটরের ইন্ডিকেটর দেখাল সে।

চোখের পানি মুছে ওপরে তাকাল মাসুদ রানা। সত্যি তাই। সবুজের মাঝে সাদা 'দুই' অক্ষরটা ভাসছিল, ও তাকানোমাত্র 'এক' হয়ে গেল সেটা। প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে বুঝতে পেরে নিশ্চয়ই চারতলা থেকে ফিরে এসেছে ব্যাটারা।

ভেতরের উত্তেজনা উবে গেল রানার। ভীষণ দুর্বল বোধ করল ও, বসে পড়ল আবার ফ্লোরে। সারা দেহ কাঁপছে থর থর করে। কাশছে। কণ্ঠনালী জ্বালা করছে খুব।

দেখতে দেখতে চারদিকে ভিড় লেগে গেল। সবাই জানতে চাইছে কি হয়েছে ভদ্রলোকের? কোথায় চোট লেগেছে?

'তেমন কিছু নয়,' ব্যাখ্যা করল লেসলি ম্যাকঅ্যাডাম। 'স্কার্ফ আটকে গিয়েছিল এলিভেটরের দরজায়।'

গুঞ্জন উঠল ওদের চারদিকে। 'এত অসতর্ক মানুষ তো দেখিনি!' ক্যাটকেটে গলায় ঝাঁঝিয়ে উঠল এক বুড়ি। 'কি করে দরজায় পেঁচায় স্কার্ফ?'

'পা বাড়াবার আগে দেখে-শুনে নেবেন, মিস্টার,' পরামর্শ দিল এক পুরুষ কণ্ঠ।

চুপ করে থাকল ওরা।

তিন

মেঘে ছেয়ে গেছে আকাশ হঠাৎ করে। অসময়ে সাঁঝ নেমেছে নিউ ইয়র্কে। ম্যাডিসন অ্যাভিনিউর স্বল্পালোকিত এক পাবে বসে আছে মাসুদ রানা ও লেসলি ম্যাকঅ্যাডাম। দু'জনের সামনে আধ খালি বড় দুই মগ ফেনিল বীয়ার। হাতে সিগারেট পুড়ছে রানার, টানার কথা ভুলে বসে আছে।

অনেকক্ষণ পর বীয়ারে চুমুক দিল রানা। গিলতে গিয়ে বিচ্ছিরিভাবে কুঁচকে উঠল চোখ মুখ। কণ্ঠনালী নাড়ানোর চেষ্টা করলেই ব্যথা করছে ভীষণ। জ্বালা করছে। খিদে পেয়েছে আগেই, কিন্তু এই ভয়ে খাওয়ার ভাবনা আপাতত দূরে সরিয়ে রেখেছে মাসুদ রানা। খায়নি লেসলিও।

সিগারেট অ্যাশট্রেতে ফেলে আবার চুমুক দিল ও। 'এখন কেমন বোধ হচ্ছে, রানা?' টেবিলে দুই কনুই রেখে সামনে ঝুঁকে এল মেয়েটি।

'জঘন্য!' 'ফ্যাসফেসে গলায় বলল মাসুদ রানা। তবে দম নিতে পারছি, বাতাস আসা-যাওয়া করছে গলা দিয়ে, এই যা স্বস্তি।'

মাথা ঝাঁকাল লেসলি। চেহারায় সমবেদনার ছাপ। 'আমাকে কিছু প্রশ্ন করবে বলেছিলে।'

'বলেছিলাম,' অন্যমনস্কের মত মাথা দোলাল ও। ভাবছে, লোকগুলো কি

আসলে ওকেই হত্যা করতে চেয়েছিল, না লেসলিকে? তাহলে স্কার্ফের ফাঁস ওর গলায় কেন পরাল ব্যাটারা? আগে সার্বক্ষণিক ফেউটাকে খসাতে চেয়েছিল? তারপর ধরত মেয়েটিকে?

'বড় বাঁচা বেঁচে গেছ তুমি, রানা,' বলল লেসলি। 'অন্তত আমার মত গলায় চিরস্থায়ী দাগ বয়ে বেড়াতে হবে না তোমাকে।'

উত্তর দিল না মাসুদ রানা। মনে হলো শুনতেই পায়নি তার কথা।

'দু'দিন কি কাজে ব্যস্ত ছিলে তুমি?' আবার প্রশ্ন করল মেয়েটি। 'কোথায় গিয়েছিলে?'

মাসুদ রানা নিরুত্তর।

'আবার জেঙ্গারের সাথে দেখা করতে?'

'না।' পরিষ্কার অনাগ্রহ ফুটল ওর চেহারায়। বোঝাতে চায় এ নিয়ে কথা বলতে রাজি নয় ও।

কিছু সময় অপেক্ষা করল লেসলি, তারপর কাঁধ ঝাঁকাল হতাশা প্রকাশের ভঙ্গিতে। 'বেশ, বোলো না। তবে মনে হয় যার সাথে দেখা করতে গিয়েছিলে তুমি, বা যাদের সাথে, সে বা তারা কেউ বিশ্বাসঘাতকতা করেছে, রানা। হয়তো তাদের ধারণা, অনেক বেশি জেনে গেছ তুমি।'

'উল্টোটাও তো হতে পারে।'

'এ ক্ষেত্রে সে সম্ভাবনা কম! কারণ আমাকে নয়, ওরা তোমাকে খুন করতে চেয়েছিল।'

সত্যি, ভাবল মাসুদ রানা। হাত তুলে ওয়েট্রেসের দৃষ্টি আকর্ষণ করল। নিজের জন্যে এক কাপ গরম কফির অর্ডার দিল রানা। তারপর আলোচনার মোড় ঘুরিয়ে দিল। 'আর্ট সম্পর্কে ভালই জ্ঞান আছে তোমার মনে হয়?'

'খুব একটা না। বুঝি, কিছু কিছু।'

'ফরজারি সম্পর্কে?'

মাঝপথে থেমে গেল লেসলির বীয়ারের মগ, ভুরু সামান্য কুঁচকে উঠল তার। অনিশ্চিত ভঙ্গিতে মুখের সামনে কয়েক মুহূর্ত ধরে থাকল সে ওটা, তারপর রেখে দিল চুমুক না দিয়ে। 'ফরজারি?'

চুমুক দিল রানা কফিতে। মাথা দোলাল ওপর-নিচে।

'আর্ট ফরজারি?'

আবার মাথা দোলাল মাসুদ রানা।

'জানি, ওসব চলে,' চিন্তিত গলায় বলল লেসলি। 'নাম করা কোন শিল্পীর বিশেষ কোন আর্ট কখনও কখনও নকল করে জালিয়াতরা। তারপর সেটাকে আসল বলে চড়া দামে বিক্রি করে। এমন কয়েকটা ঘটনা আমার জানা আছে।' আবার চোখ কোঁচকাল সে। 'কিন্তু হঠাৎ এ প্রশ্ন কেন?'

'কতটা নিখুঁত হয় সে সব?'

'ভাল জালিয়াতের হাতে পড়লে আসল-নকলে তফাত বের করা খুবই কঠিন হয়ে পড়ে। অলমোস্ট একশো ভাগ নিখুঁতও হয় কখনও কখনও।'

'জাল মানুষ সম্পর্কে জানো কিছু?'

'জাল মানুষ?'

শান্ত ভঙ্গিতে মাথা দোলাল মাসুদ রানা। চুমুক দিল কফিতে।

'আসলজনের স্থানে নকল আরেকজনকে সেট করা, এটাই তো তোমার প্রশ্ন?' চিন্তার রেখা ফুটল লেসলির চেহারায়। রানার মনে হলো ব্যাপারটা ভান নয়, অকৃত্রিম। 'আমার ধারণা সেটাও অসম্ভব নয়, রানা। সম্ভব। কেন?'

'না, এমনিই জিজ্ঞেস করলাম।' কফি শেষ করে সিগারেট ধরাল মাসুদ রানা। 'এবার আমাদের বাধা-পড়া আলোচনাটা শুরু করা যাক নতুন করে। জর্জ ম্যাকঅ্যাডাম আর পিটার হোয়াইটসাইডের মৃত্যু সম্পর্কে বলতে যাচ্ছিলে তুমি।'

'হ্যাঁ।' অস্বস্তিকর নীরবতা। ঘন ঘন নিচের ঠোঁট চাটছে লেসলি চিন্তিত ভঙ্গিতে। যেন কতটা বলা যায় রানাকে ভাবছে। চোখাচোখি হলো রানার সঙ্গে। স্থির দৃষ্টিতে মেয়েটিকে পর্যবেক্ষণ করছে মাসুদ রানা। অবশেষে মনস্থির করল লেসলি, দীর্ঘ চুমুকে মগের অবশিষ্ট পানীয়টুকু গলায় চালান করে দিয়ে সামনে ঝুঁকে এল। দ্রুত চোখ বুলিয়ে দেখে নিল নিজেদের চারদিক। 'আমার পালক বাবা, জর্জ ছিলেন "স্যান্ডহগ"।'

'পার্ডন?'

'"স্যাণ্ডহগ"। ডাক নাম। ব্রিটিশ সিক্রেট ইন্টেলিজেন্স সার্ভিসের বিশেষ এক শাখার এজেন্টদের "স্যাণ্ডহগ" নামে ডাকা হয়।'

'এস আই এস।'

'হ্যাঁ।'

'বলে যাও।'

'এরা বিশেষ এক বিষয়ে এক্সপার্ট। তোমাকে বলেছি তিনি মিডল ইস্টে কর্মরত ছিলেন। সুয়েজ সংলগ্ন অঞ্চলে। ওখানেই গুলিবিদ্ধ হন তিনি।

'তেল বিশেষজ্ঞ?'

'রাইট। বহু বছর ধরে একটু একটু করে এসব তথ্য সংগ্রহ করেছি আমি, তিনি বলেননি কিন্তু। তথ্য সংগ্রহ করেছি, তারপর সেসব জোড়া লাগিয়ে অনুমান করে নিয়েছি তাঁর পেশা কি ছিল। ঠিক যে ভাবে নিজের পরিচয় বের করেছি আমি নিজের চেষ্টায়, তেমনি। ব্রিটেনের প্রতি বছর প্রচুর তেল প্রয়োজন হয়, অথচ নিজের নেই এক ফোঁটাও, পুরোটাই আমদানী নির্ভর। সব কিছুই আমদানী করতে হয় ব্রিটেনকে।

'জানি। আসল প্রসঙ্গে এসো।'

'সারা বছর পৃথিবীর এখানে-সেখানে ঘুরে বেড়াতেন আমার বাবা, সব সময় ভীষণ ব্যস্ত থাকতেন। '৬৮ সালের দিকে মধ্যপ্রাচ্যের তেল নিয়ে আমেরিকা, রাশিয়া আর ব্রিটেনের মধ্যে পর্দার অন্তরালে বেশ বড় ধরনের এক আলোড়ন ঘটে। ঠিক কি হয়েছিল জানি না অবশ্য। এরই কোন এক সময় গুলিবিদ্ধ হন জর্জ।'

'তারপর?'

'কয়েক মাস চিকিৎসা চলে তাঁর। মোটামুটি সুস্থ হয়ে ওঠেন, তবে দু'পায়ের অনেকগুলো নার্ভ শুকিয়ে যায়। যা হোক, অবসর নিতে অনাগ্রহ প্রকাশ করেন জর্জ। আসলে তিনি ছিলেন অন্য ধাঁচের মানুষ, বসে থাকতে পারতেন না,

সারাক্ষণ কিছু না কিছু কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকতে চাইতেন। তাঁর ইচ্ছের কথা জানতে পেরে খুশি হয় এস আই এস, নতুন এক অপারেশনের ভার দেয় ওরা তাঁকে। তবে সেবার আর মধ্যপ্রাচ্যে নয়, ওখানে বড্ডো বেশি কামড়াকামড়ি চলছিল তখন তেল নিয়ে। তাছাড়া জর্জের পরিচয় ফাঁস হয়ে গিয়েছিল। তাই দক্ষিণ আমেরিকায় পাঠানো হয় তাঁকে। ভেনিজুয়েলায়।

'নিজের শাখার সুপিরিয়র এক অফিসারের সঙ্গে বসে বিষয়টা রফা করেন বাবা। ভদ্রলোকের অফিস ছিল হোয়াইটহলে। ঠিক হয় দু'জনে একসঙ্গে যাবেন কারাকাস। সেখানে মিশনের কার্যক্রম চালু করে দিয়ে মায়ামি যাবেন তাঁরা, ইউ.এস.ইন্টেলিজেন্স সার্ভিসের সঙ্গে যোগাযোগ করতে।'

'তারপর?'

'কারাকাস ওঁরা গিয়েছিলেন ঠিকই, সেখানে কাজ শুরু করে দিয়ে মায়ামির উদ্দেশে যাত্রাও করেছিলেন। তবে পৌঁছতে পারেননি সেখানে।'

'কারণ?'

'আকাশে ওড়ার এক ঘণ্টা পর বিস্ফোরিত হয় ওঁদের বিমান।'

চোখের কোণ কুঁচকে উঠল মাসুদ রানার। 'কবেকার ঘটনা এটা?'

'জুন, চোদ্দ, উনিশশো একাশি,' ওর চোখে চোখ রেখে বলল লেসলি ম্যাকঅ্যাডাম। 'অ্যাভিয়াংকা এয়ারওয়েজের কারাকাস-মায়ামি ফ্লাইট ছিল ওটা। আমার ধারণা বিমানে বোমা পেতে রেখেছিল রুশ স্পাইরা, ওঁদের দু'জনকে হত্যা করার জন্যে। মধ্যপ্রাচ্যের মত ওই অঞ্চলের তেল হাতাবার জন্যেও তৎপর ছিল রুশরা। ব্রিটিশ স্যান্ডহগ আর তার সুপিরিয়রকে সরিয়ে দিয়ে পথ কিছুটা পরিষ্কার করেছে ওরা।'

মন দিয়ে পুরোটা শুনল মাসুদ রানা। কেন যেন মনে হলো, সম্ভবত সত্যি বলছে লেসলি। বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হচ্ছে ওর ঘটনাটা।

'কাজেই,' কাঁধ ঝাঁকাল লেসলি। 'তিনি কোন সাহায্য করতে পারছেন না তোমাকে।'

'আর পিটার হোয়াইটসাইড?'

দৃষ্টি থমকে গেল লেসলির। 'জর্জের সুপিরিয়র অফিসার কে ছিল বলে মনে হয় তোমার?'

দীর্ঘ নীরবতা। ভাবছে মাসুদ রানা, তাহলে ওরা কারা? যে হোয়াইটসাইড আর ম্যাকঅ্যাডামের সঙ্গে দেখা করে এল ও? মানুষ, না ভূত? আর লেসলি? আর্থার স্যান্ডলারের ডবলের মত আর কেউ? কে আসল কে নকল, কে মিথ্যা কে সত্য কিছুই ভেবে উঠতে পারছে না ও। অদ্ভুতরকম এলোমেলো লাগছে সব।

কয়েকটা ফুটবল মাঠের সমান বিশাল নিউ ইয়র্ক টাইমসের আণ্ডারগ্রাউণ্ড কার পার্কে গাড়ি ঢোকাল মাসুদ রানা। এলিভেটরে চড়ে উঠে এল সতেরো তলায়। পনেরো থেকে আঠারো, এই চারটা ফ্লোর এদের সিটি নিউজ উইং।

সিটি নিউজ এডিটর টমাস রেইড মাসুদ রানার ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের একজন। তার সাথে দেখা করতে এসেছে ও। দূর থেকে দেখা গেল, নিজের কাচঘেরা রুমে বড়

এক রিভলভিং চেয়ারে বসে আছে রেইড। হেলান দিয়ে সিলিং দেখছে। ভাবছে হয়তো কিছু। সামনে টেবিলের ওপর স্তূপ হয়ে আছে এক গাদা কম্পিউটর প্রিন্ট আউট, ফ্যাক্স কপি, লেখার প্যাডসহ আরও নানান হাবিজাবি।

কাগজপত্রের দাপটের কাছে লজ্জিত ভঙ্গিতে নিজেদের অস্তিত্ব কোনরকমে ঘোষণা করছে তিনটে টেলিফোন সেট। রেইডের বাঁ দিকে খোলা একটা ফাইল র‍্যাক, তার ওপর পাশাপাশি বসানো একটা করে কম্পিউটর ও ফ্যাক্স মেশিন।

দরজার শব্দে ঘুরে তাকাল রেইড। পরক্ষণে হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল তার চেহারা। 'আরে! গোয়েন্দা সাহেব যে!' ছাগলের মত তড়াক করে উঠে দাঁড়াল সে। ডান হাত বাড়িয়ে দিল হ্যাণ্ডশেকের জন্যে। 'এখনও মনে রেখেছিস তাহলে এই অধমকে?'

জবাবে এক টুকরো মারফতি হাসি দিল মাসুদ রানা। 'কেমন আছিস?'

'ভাল,' চট করে গম্ভীর হয়ে গেল টমাস। 'তোর এই পিত্তি জ্বালানো হাসি আমি একদম সহ্য করতে পারি না, রানা। বন্ধ কর ছিপি।'

'করলাম।' রানাও গম্ভীর হয়ে গেল। 'ঠিক আছে?'

'হ্যাঁ, ঠিক আছে। তোর পোঁদে আগুন লাগার খবর পেয়ে দু'দিন গিয়েছি আমি। একদিনও পেলাম না তোকে। কেন?'

'সময়মত যাসনি বলেই পাসনি। যেদিন ঘটনা ঘটে, সেদিন তো প্রায় আঠারো ঘণ্টাই ছিলাম অফিসে। কখন গিয়েছিস তুই?'

'তিন দিন পরে। এখানে ছিলাম না আমি। বড়দিনের ছুটি এবার বাবা-মার সঙ্গে কাটাতে গিয়েছিলাম।'

'তাই বল।'

মিনিট পাঁচেক চলল দুই বন্ধুর অভিযোগ, পাল্টা অভিযোগ, কফি পান। তারপর কাজের কথায় এল মাসুদ রানা। 'তোদের পুরানো অফিস ফাইলে চোখ বোলাতে চাই।'

'কত পুরানো?'

'১৯৮১ সালের।'

'অত আগের ফাইল তো এখানে পাবি না তুই। ওসব ফাইল এবং তার রেকর্ড মাইক্রোফিল্‌ম করে আর্কাইভে রাখা আছে, ফর্টি থার্ড স্ট্রীটে।'

'জাহান্নামে হলেও কিছু এসে যায় না।'

'ভেরি ওয়েল। কখন যেতে চাস?'

'এখনই।' একটু ভাবল মাসুদ রানা। 'ওই সময়ের আর কোন পত্রিকার রেকর্ড আছে তোদের আর্কাইভে?'

'সমস্ত জাতীয়-আঞ্চলিক পত্রিকার রেকর্ড আছে। দৈনিক পত্রিকার অবশ্য, অন্যগুলোর নয়।'

'গুড।'

'চল, পৌঁছে দিয়ে আসি তোকে।'

পনেরো মিনিট পর। আর্কাইভের চার দেয়াল ঘেরা, সিলিং ছোঁয়া অসংখ্য র‍্যাকে যত্নের সাথে সাজিয়ে রাখা হাজার হাজার ফাইল দেখছে মাসুদ রানা। কিন্তু

কিছু ফাইলের কিনারা লালচে হয়ে গেছে। অনেক পুরানো ওগুলো, ত্রিশ চল্লিশ দশকের।

'তুই দেখতে থাক,' বলল টমাস রেইড। 'আমি অফিসে চললাম।'

'ঠিক আছে।'

'এর পরেরটা মাইক্রোফিলমের রুম। এখানে ঝামেলা মনে হলে ওখানে গিয়ে দেখিস। আমি অ্যাটেনডেন্টকে বলে যাচ্ছি, প্রয়োজন হলে তার সাহায্য নিতে পারবি।'

'অনেক ধন্যবাদ। তুই যা।'

পাঁচ মিনিট পর পাশের রুমে এল মাসুদ রানা। ফাইল ঘাঁটাঘাটির চেয়ে ফিলমে চোখ বোলানই ভাল মনে হলো ওর। অনেক সহজ হবে সেটা। আর্কাইভের যুবক অ্যাটেনডেন্টের সাহায্যে টাইমস পত্রিকার '৮১ সালের জুন মাসের ফিলম স্পূলটা বের করল রানা। ওটা প্রজেক্টর মেশিনের মত দেখতে ভিউয়ারে সেট করে সামনের বিশ বাই বিশ সাদা পর্দায় ছায়া ফেলল ফিলমের। এনলার্জড ছায়া পড়ল সেখানে। একেবারে ঝকঝকে পরিষ্কার ছায়া।

স্পূলের হাতল ঘুরিয়ে পর্দায় '৮১ সালের জুন মাস নিয়ে এল মাসুদ রানা। তারপর ১৫ জুন। মৃদু উত্তেজনা অনুভব করল ও। ১৪ তারিখে লেসলির কথামত সত্যিই যদি ঘটে থাকে বিমান দুর্ঘটনাটা, তাহলে এই তারিখের পত্রিকাতেই ছাপা হওয়ার কথা সেটা। প্রথম থেকে তৃতীয় পাতার প্রতিটি হেডিঙে চোখ বোলাল মাসুদ রানা। নেই। কি খেয়াল হতে প্রথম পাতায় ফিরে এল ও, সূচীপত্রের হেডিংগুলো পড়ল। সেখানেও এক অবস্থা। নেই।

আবার চার নম্বর থেকে শুরু করল রানা। আধ ঘণ্টা পর, অষ্টম পাতায় পাওয়া গেল ও যা খুঁজছিল। একেবারে নিচের দিকে, ছোট করে ছাপা হয়েছে খবরটা, প্রায় দায় সারার মত করে। ওটার হেডিং এরকম কারাকাস-মায়ামি ফ্লাইট বিধ্বস্ত, নিহতের সংখ্যা ৩৯। খুবই সংক্ষিপ্ত খবরটা, যাত্রীদের নামের তালিকা দূরে থাক, বিস্তারিত আর প্রায় কিছুই নেই ওতে।

হাতল ঘুরিয়ে ১৬ জুনে এল মাসুদ রানা। ওইদিনের বারো নম্বর পাতায় এক কলাম তিন ইঞ্চি জুড়ে আছে খবরটা। উড্ডয়নের এক ঘণ্টা পর অ্যাভিয়াঙ্কার কারাকাস-মায়ামি ফ্লাইট অজ্ঞাত কারণে মাঝ আকাশে বিধ্বস্ত হয়। দুর্ঘটনার কারণ রহস্যজনক। ক্যারিবিয়ান অঞ্চলের আবহাওয়া সে সময়ে একদম স্বাভাবিক ছিল। ওটার ভেতর বোমা পেতে রাখা হয়েছিল বলে সন্দেহ করা হচ্ছে ইত্যাদি ইত্যাদি। এদিনও হতভাগ্য নিহত যাত্রীদের তালিকা ছাপেনি টাইমস।

হয়তো পরের কোনও দিন ছাপা হয়েছে, ভেবে এক এক করে বিশ তারিখ পর্যন্ত চষে ফেলল মাসুদ রানা। কিন্তু না, নেই। আর কিছুই ছাপেনি এরা ওই দুর্ঘটনার ব্যাপারে। বিষয়টা নিয়ে মাথা ঘামাল খানিক মাসুদ রানা। তারপর স্পূলটা খুলে রেখে দিল জায়গামত। মাইক্রো ফিলম ইনডেক্স নিয়ে পড়ল ও এবার। পাঁচ মিনিটের মধ্যে পেয়ে গেল রানা মনে মনে যা খুঁজছিল। ইনডেক্স রেখে একই সময়ের মায়ামি হেরাল্ডের রেকর্ড বের করে ভিউয়ারে ঢোকাল মাসুদ রানা।

মায়ামি হেরাল্ড ১৫ জুনের প্রথম পাতায় বেশ গুরুত্বের সাথে ছেপেছে

সংবাদটা। পড়ল রানা পুরোটা। মোটামুটি একই খবর। পরদিনের দ্বিতীয় পাতায় পাওয়া গেল আসল জিনিস–যাত্রীদের নামের তালিকা। অ্যালফাবেটিক্যাল তালিকা। দ্রুত ওটায় চোখ বোলাল মাসুদ রানা। তালিকার মাঝামাঝি স্থানে পৌঁছে আটকে গেল ওর দৃষ্টি। নামটা জ্বল জ্বল করছে পর্দায়:

ম্যাকঅ্যাডাম, জর্জ এফ, কিলনউইক, সরি ইংল্যান্ড

ঝপ করে তালিকার তলায় নেমে এল ওর দৃষ্টি। আগেরটার মতই জ্বল জ্বল করছে একেবারে শেষ নামটা:

হোয়াইটসাইড, পিটার এস, অক্সফোর্ড, অক্সফোর্ডশায়ার, ইংল্যান্ড

পুরো তালিকাটা দেখল এবার মাসুদ রানা। আর কোন পরিচিত নাম বা ব্রিটিশ নাম চোখে পড়ল না। বাকি সবাই হয় কারাকাস ও অন্য দুয়েকটা ক্যারিবীয় দেশের, নয়তো আমেরিকান।

সময় নিয়ে ধীরে সুস্থে স্পূলটা গোছাল মাসুদ রানা। তারপর ওটা খুলে হাতে নিয়ে বসে থাকল। কপালে গভীর চিন্তার ছাপ। অফিসে আগুন লাগা থেকে আজ পর্যন্ত ঘটে যাওয়া প্রতিটি ঘটনা মনে মনে নাড়াচাড়া করছে ও। আর্থার স্যান্ডলার এবং সংশ্লিষ্ট কাহিনী সম্পর্কে লেসলি, জেঙ্গার, ম্যাকঅ্যাডাম এবং হোয়াইটসাইডের মুখে শোনা বিবরণ নিয়ে ভাবছে। মরীয়া হয়ে খুঁজছে কোথাও কোন ফাঁক আছে কি না। না নেই। নিখুঁত, নিটোল একটা কাহিনী।

অথচ আরেক দিক থেকে দেখলে এর কোন ভিত্তিই নেই। জেঙ্গার ছাড়া আর সবাই মৃত। লেসলি মৃত, অন্তত আর্ল'স কোর্টে দেখা সমাধিটা তাই বলে, ম্যাকঅ্যাডাম আর হোয়াইটসাইডও মৃত, ওর হাতে ধরা স্পূলটা সেরকমই বলে। অথচ তারপরও দেখা যাচ্ছে কেউ মরেনি। বেঁচে আছে প্রত্যেকে। এবং বহাল তবিয়তেই আছে। এর অর্থ কী? কী ঘটছে এসব? কেন?

লেসলি ম্যাকঅ্যাডামের কথা ভাবল মাসুদ রানা। ওর গলার কাটা দাগটার কথা ভাবল। ওটা কি মিথ্যে? মনে হয় না। তাহলে লণ্ডনের কবরটার কি ব্যাখ্যা হতে পারে? এদের কেউ না কেউ মিথ্যে, ভুয়া, ভাবল মাসুদ রানা। নাকি...তাই যদি হবে, তাহলে সে কে? আসন ছাড়ল মাসুদ রানা। স্পূল যথাস্থানে রেখে প্রথম রুমে চলে এল। এখানে কোথাও 'বায়োগ্রাফিক্যাল সেকশন' লেখা একটা লেবেল দেখেছিল ও, র‍্যাকের সঙ্গে সাঁটা। খুঁজে সেটা বের করল আবার। নতুন একটা আইডিয়া এসেছে মাথায়।

পুরো তিন ঘণ্টা ব্যয় করল রানা এই সেকশনের কয়েকটা ফাইলের পিছনে কোনার দিকের একটা টেবিলে বসে একটার পর একটা সিগারেট ফুঁকল মাসুদ রানা আর পাতা ওল্টাল ফাইলের। আর্থার স্যান্ডলার ও উইলিয়াম ওয়ার্ড ড্যানিয়েলস সম্পর্কে যতগুলো সম্ভব ক্লিপিং, নিউজ স্টোরি ইত্যাদি খুঁজেপেতে বের করে গিলতে লাগল গোগ্রাসে। ওই দু'জনের ব্যক্তিগত সম্পর্কের কোথাও

কোন অসংলগ্ন কিছু আছে কি না যথাসম্ভব আঁতিপাতি করে খুঁজল ও। না, নেই।

আর্থার স্যান্ডলার শুধুই একজন শিল্পপতি। এবং উইলিয়াম ড্যানিয়েলস কেবলই একজন অ্যাটর্নি। মক্কেল-আইনজীবী ছাড়া আর কোন সম্পর্ক নেই, ছিল না তাদের মধ্যে।

খিদেয় পেট চোঁ চোঁ করছে বলে সেদিনের মত বিদায় নিল মাসুদ রানা। যাওয়ার আগে মোটা বকশিশ দিয়ে খুশি করে গেল অ্যাটেনডেন্ট ছেলেটিকে। কাল আবার আসবে ও, সে কথা জানাতেও ভুলল না।

পরদিন সকাল দশটায় টাইমস আর্কাইভে পৌঁছল মাসুদ রানা। লেগে পড়ল কাজে। একটানা চার ঘণ্টা খাটুনির পর একটা নতুন বিষয় চোখে পড়ল ওর। চোখে আসলে আগেই পড়েছিল, তখন খেয়াল করেনি। এবার করল। বিষয়টা একটা নাম। ডি সেপিটো। ব্যাপারটা অদ্ভুতরকম কাকতালীয় মনে হলো মাসুদ রানার। এ আরেক জালিয়াত, ডি সেপিটো। তবে স্যান্ডলারের মত টাকা জাল করত না লোকটা, জাল করত সই। সই জাল করে চেকের মাধ্যমে লক্ষ লক্ষ ডলার লোপাট করেছে এ লোক। মজার কথা, ডি সেপিটো ও আর্থার স্যান্ডলারের মত একই সময়ে ড্যানিয়েলসের মক্কেল ছিল।

ব্যাপারটা কি? ভাবল মাসুদ রানা, আসলেই কাকতালীয়? না ভেতরে আর কোন বিষয় আছে? প্রায় একই লাইনের দুই ক্রিমিনাল, একই সময়ে মক্কেল ছিল উইলিয়াম ড্যানিয়েলসের! এর মধ্যে নিশ্চই আর কিছু আছে। বহু খুঁজে ফাইল থেকে ডি সেপিটোর সংক্ষিপ্ত জীবনী বের করল মাসুদ রানা। পড়ে গেল দ্রুত।

ডি সেপিটো ইটালিয়ান। ১৯২০ সালে পালের্মো বন্দরে জন্ম তার। দু'বছর বয়সে বাবা-মা'র সঙ্গে নিউ ইয়র্ক চলে আসে সে। মালবেরি ও ক্যানালের মধ্যবর্তী এক এথনিক এনক্লেভে বাসা ভাড়া নেয় তার বাবা। মাত্র বারো বছর বয়সে পুলিসের খাতায় নাম ওঠে সেপিটোর, চুরি, ছিনতাই আর দাঙ্গা-ফ্যাসাদ বাধাতে ওস্তাদ হিসেবে। পুলিসের হাতে বহুবার ধরা পড়ে সে। যদিও নিরেট প্রমাণের অভাবে সাজা এড়াতে সক্ষম হয় প্রতিবারই।

বিশ বছর বয়সে, ১৯৪০ সালে প্রথম প্রকাশ পায় তার সই জাল করার অদ্ভুত ক্ষমতা। তিনটি সুনির্দিষ্ট অভিযোগে গ্রেফতার করা হয় ডি সেপিটোকে। সমস্যার সমাধানের জন্যে ড্যানিয়েলসের সাহায্য প্রার্থনা করে সে। ড্যানিয়েলসের 'অলৌকিক ক্ষমতা' সম্পর্কে জানা ছিল তার। শেষ পর্যন্ত সেই ক্ষমতাবলে তাকে ঠিকই উদ্ধার করেন তিনি। তিনটে অভিযোগ থেকেই বেকসুর রেহাই পেয়ে যায় ডি সেপিটো।

তবে মামলাগুলোর নিষ্পত্তি কোন কোর্টে হয়নি, এই পর্যায়ে এসে উত্তেজিত হয়ে উঠতে শুরু করল মাসুদ রানা, হয়েছিল এক স্পেশাল প্রসিকিউটরের দফতরে। প্রসিকিউটরের নাম আর্চিবল্ড ম্যাকফেড্রিস। থমকে গেল রানা। এই সেই লোক, একদিন যার সামনে আক্ষরিক অর্থেই তুলে নিয়ে যাওয়া হয় আর্থার স্যান্ডলারকে। এই সেই ম্যাকফেড্রিস, যার চাপে পড়ে আর্থারকে এসপিওনাজ এজেন্ট হিসেবে আমেরিকার স্বপক্ষে যোগ দেয়ার প্রস্তাব দিয়েছিলেন উইলিয়াম ওয়ার্ড ড্যানিয়েলস।

দীর্ঘ সময় অনড় বসে থাকল মাসুদ রানা। নড়াচড়া নেই। চোখের পলক

পড়ছে না। স্থির চোখে তাকিয়ে আছে সামনের দেয়ালটার দিকে। পর পর দুটো সিগারেট পোড়াল মাসুদ রানা। তারপর আবার ফাইলে নজর দিল।

পরের বছর, ১৯৪১ সালে কোন সংবাদ সৃষ্টি করেনি ডি সেপিটো। তার পরের বছর না, তার পরের বছরও না। আবার পত্রিকার পাতায় উদয় হয় সে প্রায় এক দশক পর, ১৯৫০ সালে। সই জাল করে টাকা তুলে কেটে পড়ার তিন মাস পর পুলিস পাকড়াও করতে সক্ষম হয় তাকে। মামলা ওঠে কোর্টে। এবারও ডি সেপিটোর উদ্ধার কাজে এগিয়ে আসেন আইনের জাদুকর ড্যানিয়েলস। ছাড়া পায় সে বেকসুর।

১৯৬৪ সাল পর্যন্ত, দুই-এক বছর ছেড়ে ছেড়ে প্রায়-ই পত্রিকার পাতায় উদয় হয়েছে ডি সেপিটো, অস্ত গেছে। কোনবারই সাজা হয়নি। প্রতিবার তার ত্রাণকর্তা হিসেবে এগিয়ে এসেছেন উইলিয়াম এবং যথারীতি রেহাই পেয়ে গেছে লোকটা।

তারপর ১৯৬৪ সাল। যে বছর 'অফিশিয়ালি' নিহত হয় আর্থার স্যান্ডলার, সে বছর গ্রীষ্মে বেশ বড় ধরনের এক জালিয়াতি কেসে গ্রেফতার হয় ডি সেপিটো, শেষবারের মত। মামলা ওঠে কোর্টে। দেন-দরবার করে মামলার তারিখ পিছিয়ে নভেম্বর মাসের ছয় তারিখে নিয়ে আসেন ড্যানিয়েলস।

অতঃপর নভেম্বরের ছয় থেকে তেরো তারিখ পর্যন্ত আরও তিনদফা পিছানো হয় মামলার দিন, এবং সেই দিন, অর্থাৎ তেরো তারিখে আচমকা খারিজ করে দেয়া হয় ডি সেপিটোর মামলা।

একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে হেলান দিয়ে বসল মাসুদ রানা। তেরোই নভেম্বর, ১৯৬৪, ভাবল ও। ওই দিনই স্যান্ডলার ম্যানসনের সামনের রাস্তায় খুন হয়েছিল আর্থার স্যান্ডলারের 'ডবল'। পরদিন, ১৪ তারিখের নিউ ইয়র্ক টাইমসের প্রথম পাতায় সেই হত্যাকাণ্ড ও সেপিটোর মুক্তি পাওয়ার ঘটনা দুটোই ছাপা হয়। প্রথম পাতায়, প্রায় পাশাপাশি।

ডি সেপিটোর মামলা সংক্রান্ত খবরটা পড়ল মাসুদ রানা। বলা হয়েছে ওয়াশিংটন ডিসি-র জারিকৃত 'বিশেষ ক্ষমা' বলে মুক্তি লাভ করে লোকটা। এর মধ্যে 'গুরুতর রহস্য' আছে, মন্তব্য করেছে টাইমস। তবে সেটা কি, সে সম্পর্কে কিছু বলেনি। সেই থেকে আর কোন খবর নেই ভিনসেন্ট ডি সেপিটোর। পত্রিকার বুক থেকে সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে মানুষটা।

ঠিক আর্থার স্যান্ডলারের মত।

অ্যাডলফ জেঙ্গারের কথা ভাবল মাসুদ রানা। এসব যখনকার ঘটনা, তখন সে ছিল ড্যানিয়েলসের ব্যবসায়ী অংশীদার। তার মানে আর্থারের ঘটনা যেমন বিস্তারিত জানে সে, তেমনি ডি সেপিটোর সমস্ত মামলা সম্পর্কেও জানে। পরেরজনের কয়েকটা মামলাও নিষ্পত্তি হয়েছে সেই আর্চিবল্ড ম্যাকফেড্রিসের অফিসে। যার কথা রানাকে জেঙ্গার-ই বলেছে আর্থার প্রসঙ্গে।

অথচ ভিনসেন্ট ডি সেপিটো নামটা পর্যন্ত উচ্চারণ করেনি সে ওর সামনে। কেন? অপ্রাসঙ্গিক বলে? উঁহুঁ! রানা তা মনে করে না। যেখানে ইউ এস স্পেশাল অ্যাসিসটেন্ট অ্যাটর্নির সহকারী আর্চিবল্ড ম্যাকফেড্রিস, সেখানে নিশ্চই এই দুই রথীর মধ্যে কোন না কোন সম্পর্ক আছে। ছিল। কিন্তু কি সেটা?

জানতে হবে ওকে।

রানা এজেন্সি।

নিজের অফিস রুমে বসে আছে মাসুদ রানা। শওকত ওর সামনে বসা। ইউরোপ যাওয়ার আগে তাকে যে কাজের ভার দিয়ে গিয়েছিল রানা, মৌখিক রিপোর্ট করছে শওকত সে ব্যাপারে। কাইল ফারলো, ডেবি মোরান প্রসঙ্গ ব্যাখ্যা করল শওকত গড়গড় করে। মার্ক রাইডার যে নেহায়েত দুর্ভাগ্যবশত খুন হয়েছে, তা-ও জানাল। কিন্তু ঠেকে গেল জ্যাকবাসের ব্যাপারে বলতে গিয়ে। ও জানে লোকটাকে যথেষ্ট ভালবাসে মাসুদ রানা। বয়স্ক বলে সমীহও করে। শুধু রানা কেন, এজেন্সির সবাই তাই করে। সেই মানুষের ব্যাপারে সরাসরি এমন মারাত্মক এক অভিযোগ তুলতে কেমন বাধো বাধো ঠেকছে শওকতের।

আরেক দিকে তাকিয়ে ছিল মাসুদ রানা। ওকে আমতা আমতা করতে দেখে এদিকে ফিরল। 'অমন করছ কেন? কি হয়েছে?' প্রশ্ন করল রানা।

'না, মানে···ব্যাপারটা অকল্পনীয়, মাসুদ ভাই।'

'কোনটা?'

'মার্ক রাইডারকে হত্যা করা, মানে, আপনাকে ভেবে ভুল করে আর কি। তার মানে, আপনিই ছিলেন আসল টার্গেট।'

'এরমধ্যে অকল্পনীয় কি দেখলে তুমি?' হাসল ও। 'সেটাই তো স্বাভাবিক। খুব স্বাভাবিক। অনেকেই চায় আমাকে দুনিয়া থেকে সরিয়ে দিতে।'

'না, আমি বলছিলাম···মানে, ইয়ে···।'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, বলো! এত ইতস্তত করছ কেন?'

'এর সঙ্গে জ্যাকবাস জড়িত আছে, মাসুদ ভাই।'

থমকে গেল মাসুদ রানা। পূর্ণ দৃষ্টিতে বেশ কয়েক মুহূর্ত শওকতের দিকে তাকিয়ে থাকল। শান্ত কণ্ঠে প্রশ্ন করল, 'কি বললে?'

'হ্যাঁ, ঠিকই শুনেছেন আপনি।'

'তার মানে? তুমি কি করে···?'

'আমি খোঁজ নিয়ে জেনেছি, মাসুদ ভাই। মানে আমার হিসেব সেরকমই বলে।'

আবার দীর্ঘ সময় চুপ করে থাকল রানা। 'আমার বিশ্বাস যে অভিযোগটা তুলছ তুমি, জেনেশুনেই তুলছ?'

'জ্বি। জেনেশুনেই তুলছি।'

'বেশ। ব্যাখ্যা করো।'

কেশে গলা পরিষ্কার করল শওকত। তারপর বলতে শুরু করল। মন দিয়ে তার বক্তব্য শুনল মাসুদ রানা। কপালের ভাঁজগুলো ক্রমেই গভীর হতে থাকল ওর। এক সময় থামল শওকত।

দীর্ঘ সময় পর মুখ খুলল রানা। 'রোটা ফিলমসের ওপর নজর রাখো। আর জ্যাকবাসের ব্যাপারে এখনই কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছানো বোধহয় ঠিক হবে না।' বলল বটে ও, কিন্তু নিজের কানেই হাস্যকর শোনাল কথাগুলো। সঠিক তথ্যই

সংগ্রহ করেছে শওকত, ভুল হওয়ার কোন সম্ভাবনা আছে বলে মনে করে না রানা। 'তবু, ওর ওপরও নজর রাখার ব্যবস্থা করো।'

লজ্জিত হাসি ফুটল ইন্টেলেকচুয়ালের মুখে। 'করেছি, মাসুদ ভাই।'

'গুড।'

চার

রাত আটটা। ব্রুকলিন হাইটস প্রমিনেডের দীর্ঘ রেলিঙে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে মাসুদ রানা। ওর পিছনে ম্যানহাটনের বিশাল উন্মুক্ত আকাশ ঝলমল করছে। ঘন ঘন ডানে-বাঁয়ে তাকাচ্ছে রানা। লেসলি ম্যাকঅ্যাডামের জন্যে অপেক্ষা করছে ও। খোলামেলা প্রমিনেডের এ-মাথা ও-মাথা গোঁয়ারের মত ছোটাছুটি করে বেড়াচ্ছে প্রচণ্ড ঠাণ্ডা বাতাস।

ভীষণ শীত করছে রানার। প্রতিবার শ্বাস নেয়ার সময় আহত গলা জ্বালা করছে হিমশীতল বাতাসের কামড়ে। দুই গালের চামড়া জমে যাওয়ার অবস্থা। আবার ডানে তাকাল মাসুদ রানা, তারপর বাঁয়ে। দূরে একজন ফেরিওয়ালা ছাড়া আর কাউকে দেখা গেল না। খাঁ-খাঁ করছে বিস্তৃত প্রমিনেড।

ব্যাপার কি? বিরক্তির সঙ্গে পা ঠুকল মাসুদ রানা। এখনও কেন আসছে না মেয়েটা? টাইমস আর্কাইভ থেকে অফিস হয়ে বাসায় ফিরতে সন্ধে হয়ে যায় আজ রানার। ঘরে ঢুকে পায়ের সামনে একটা নোট পড়ে থাকতে দেখে ও, লেসলির লেখা। রানাকে না পেয়ে ফিরে যাচ্ছে সে, বলা হয়েছে নোটে। যদি ফিরতে বিশেষ দেরি না হয়, রানা যেন রাত আটটায় প্রমিনেডে ওর জন্যে অপেক্ষা করে। তাই এসেছে মাসুদ রানা। দেখতে দেখতে সোয়া আট বেজে গেল, দেখা নেই লেসলির।

প্রমিনেডের এক মাথা থেকে আরেক মাথা পর্যন্ত পায়চারি শুরু করল মাসুদ রানা। মেয়েটির কথা ভেবে উদ্বিগ্ন খানিকটা। নিজেকে উষ্ণ রাখার জন্যে স্বাভাবিকের চেয়ে দ্রুত পা চালাচ্ছে ও, আর ভাবছে। উলের দস্তানা পরা দু'হাত ভারি গ্রেটকোটের পকেটে, সরাসরি ঠাণ্ডার কামড় থেকে বাঁচার জন্যে হ্যাটটা যথাসম্ভব নিচের দিকে টেনে নামিয়ে দিয়েছে, চোখ জুতোর ডগায়। থেকে থেকে মাথা তুলছে রানা, চারদিক দেখে নিচ্ছে। হঠাৎ খেয়াল হলো, কখন যেন বাতাস পড়ে গেছে। কুয়াশা দখল করেছে তার স্থান।

টুং-টুং ধাতব শব্দে চোখ তুলল মাসুদ রানা। দশ গজ বাঁয়ে একটা কুকুর দেখা গেল, জার্মান শেফার্ড। তার গলার চেইন ধরে পিছন পিছন হাঁটছে মাঝবয়সী এক লোক। পাগল না ছাগল, ব্যাটা! ভাবল রানা। এই শীতের মধ্যে বেরিয়েছে 'ডগ ওয়াক'-এ? পাশ কাটিয়ে ওর বিপরীত দিকে চলে গেল শেফার্ড আর তার মালিক।

মুখ ঘুরিয়ে ইস্ট রিভারের চিকচিকে পানির দিকে তাকাল মাসুদ রানা ওপারের ব্যস্ত কার্গো ডকের দিকে তাকাল। মাথার মধ্যে গিজগিজ করছে ডি

সেপিটো, জেঙ্গার, জ্যাকবাস। সেই সাথে লেসলি এবং তার পিতৃ পরিচয়ের দাবি নিষ্পত্তির ভাবনা। ড্যানিয়েলসের দেয়া খামটা যদি না খোয়া যেত, নিশ্চয়ই এতদিনে সহজ সমাধান হয়ে যেত এ কঠিন সমস্যার। গোলক ধাঁধায় ঘুরে মরতে হত না মাসুদ রানাকে। ভালই খাচ্ছিল ও তাঁত বুনে, মাঝখান থেকে এঁড়ে গরু কিনে এখন তার শিঙের গুঁতোয় অস্থির।

মৃদু শব্দ কানে যেতে চট করে মুখ তুলল মাসুদ রানা। দশ ফুট সামনে দাঁড়িয়ে আছে লেসলি ম্যাকঅ্যাডাম। চোখাচোখি হতে মৃদু হাসল সে। 'দুঃখিত, রানা। অনেক দেরি করে ফেলেছি।' কুয়াশার পর্দা ঠেলে এগিয়ে এল কাছে।

ওকে দেখে স্বস্তি পেল মাসুদ রানা। ভুলে গেল কষ্টের কথা। 'দ্যাট'স অল রাইট। আমি কিছু মনে করিনি।'

ওর মুখোমুখি এসে দাঁড়াল লেসলি। এমনিতে যথেষ্ট সুন্দরী মেয়েটি, এ মুহূর্তে খুবই আকর্ষণীয় লাগছে ওকে, মনে মনে স্বীকার করতে বাধ্য হলো রানা। পরমুহূর্তে নিজেকে চোখ রাঙাল ও, মক্কেল সম্পর্কে কোন ব্যক্তিগত ভাবনা...।

'তোমার চেহারা কিন্তু উল্টোটা বলছে, রানা।'

'তাই নাকি?' হাসল মাসুদ রানা। 'কি বলছে আমার চেহারা?'

'বলছে ঠাণ্ডার মধ্যে অপেক্ষা করতে করতে বিরক্ত হয়ে উঠেছ তুমি। এতক্ষণ মনে মনে পিণ্ডি চটকাচ্ছিলে আমার।'

'হলো না।'

'সত্যি?'

'হ্যাঁ।'

'তাহলে চেহারা অমন শুকনো লাগছে কেন তোমার?'

বলবে না বলবে না করেও মুখ ফসকে বলে উঠল রানা, 'আমি তোমার নিরাপত্তার কথা ভেবে উদ্বেগের মধ্যে ছিলাম।' একটু ভাবল ও। ঘড়ি দেখল। 'পৌঁছতে বেশ দেরি করে ফেলেছ আজ তুমি।'

আরও ঘনিষ্ঠ হয়ে এল লেসলি। ওর চোখে চোখ রেখে খুঁজল যেন কিছু। 'আমি তোমার প্রতি কৃতজ্ঞ, রানা। কি করে তোমার ঋণ শোধ করব...'

শব্দ করে হেসে উঠল মাসুদ রানা। 'এখনও তোমাকে ঋণগ্রস্ত করার মত কিছু করতে পারিনি আমি, লেসলি।'

'তবু, এ পর্যন্ত...' থেমে গেল সে কথা শেষ না করে। 'চলো, হাঁটি। খুব বেশি ঠাণ্ডা এখানে। কোথাও গিয়ে বসি।'

'খুব নয়, প্রচণ্ড ঠাণ্ডা এখানে। হাড়-মাংস জমে যাওয়ার অবস্থা হয়েছে আমার।'

'আমি দুঃখিত।' পাশাপাশি পা বাড়াল ওরা। রানার বাহু আঁকড়ে ধরে হাঁটছে লেসলি। 'এ ঠাণ্ডা তবু সহনীয়। এ সময়ে যদি কুইবেক যাও, বুঝতে ঠাণ্ডা কাকে বলে।'

মুচকে হাসল ও। কিছু বলল না।

'হাসলে কেন?'

'এমনি।'

'এমনি!' চোখ পাকাল লেসলি। 'এমনি এমনি হাসে হয় পাগল, নয় বোকারা। তোমাকে ওই দুই দলের কোনটির সদস্য ভাবতে কষ্ট হচ্ছে আমার।'

ফোঁস করে ধোঁয়ার মত নিঃশ্বাস ছাড়ল মাসুদ রানা। কাঁধ ঝাঁকিয়ে হার মানার ভঙ্গি করল। 'জানুয়ারির শীতে নর্থ পোলে হেঁটে বেড়ানোর অভিজ্ঞতা আছে আমার। অবশ্য এই পোশাকে নয়।'

'অ।' কিছু সময় নীরবে এগোল ওরা। থেকে থেকে রানার মুখের দিকে তাকাচ্ছে মেয়েটি। চেহারা দেখে মনে হয় কিছু একটা চিন্তা করছে ও। 'রানা!'

'বলো।'

'কি ভাবছ?'

'ভিনসেন্ট ডি সেপিটো নামটা শুনেছ কখনও?'

সময় নিয়ে উত্তর দিল মেয়েটি। 'ভিনসেন্ট ডি সেপিটো! নাহ্! কে সে?'

'বা ভিন্নি দ্যা প্যারট?'

চোখ কোঁচকাল লেসলি। 'সে আবার কে?'

'একই লোক। হাতের কাজের ওস্তাদীর জন্যে কেউ দিয়েছিল তাকে এ নাম।'

'শুনিনি তো! আসলে কে সে?'

'আমিও জানি না।'

'তাহলে? কোথায় শুনেছ তুমি নামটা?'

'শুনিনি। পুরানো পত্রিকা ঘেঁটে বের করেছি।'

বিহ্বল দৃষ্টিতে রানার দিকে তাকিয়ে থাকল লেসলি। আরও কিছু শুনতে চায়।

'আর্থার স্যান্ডলারের সমসাময়িক ছিল ডি সেপিটো। প্রায় একই সময় দু'জনই ছিল উইলিয়াম ওয়ার্ড ড্যানিয়েলসের মক্কেল। যে-কারও সই একবার দেখলেই তা জাল করে ফেলার অদ্ভুত ক্ষমতা ছিল ডি সেপিটোর। ১৯৬৪ সালে, যেদিন আর্থার স্যান্ডলার নিহত হয়...'

'তার "ডবল।"' সংশোধন করল লেসলি।

'সে যা-ই হোক। সেইদিনই খুব বড় রকমের এক জটিল জালিয়াতির মামলা থেকে বেকসুর খালাস পেয়ে যায় লোকটা। এর আগেও অনেকবার একই কারণে ধরা পড়ে সে, অনেক শক্ত শক্ত চার্জ আনা হয় তার বিরুদ্ধে, কিন্তু কখনও সাজা ভোগ করতে হয়নি তাকে। প্রতিবারই ড্যানিয়েলস বাঁচিয়ে দিয়েছেন লোকটাকে। শেষবার ১৯৬৪ সালের ১৩ নভেম্বর সেপিটোর সর্বশেষ মামলা খারিজ করে দেয়া হয়।'

'কেন?'

'ওয়াশিংটন বিশেষ ক্ষমা ঘোষণা করে তার প্রতি।'

দীর্ঘ নীরবতা। 'আশ্চর্য!' বলল লেসলি। 'জীবনেও শুনিনি লোকটার নাম।'

'আর্থার স্যান্ডলারের আর্থিক অবস্থা কেমন ছিল? মানে তার ব্যক্তিগত, পারিবারিক নয়।'

'শুনেছি কোটিপতি ছিল সে। ডাকাও হত তাকে কোটিপতি-শিল্পপতি ইত্যাদি নামে। এ প্রশ্ন কেন?'

'তার মূল ব্যবসা কি ছিল?'
ঠোঁট ওল্টাল লেসলি। 'শুনেছি কেমিকেলসের খুব বড় ব্যবসা ছিল তার।'
'আর কিছু?'
'নাহ্! কেন?'
'কোন বিশেষ কারণ নেই। এমনিই জানতে চাইছি।' মনে হচ্ছে আর্থার স্যান্ডলারের জীবনের ওই দিকটা সম্পর্কে জানা নেই লেসলির, ভাবল মাসুদ রানা। কিন্তু ভুলটা পরক্ষণেই ভাঙল।
'তবে তার একটা ব্যাপার আমি জানি,' বলে উঠল মেয়েটি। 'জর্জের মুখে শুনেছি।'
'কি?'
'সে-ও নাম করা এক জালিয়াত ছিল। অবশ্য সই নয়, টাকা জাল করত।'
চুপ করে থাকল রানা।
'মনে হচ্ছে...এই সেপিটোর সঙ্গে হয়তো কোন সম্পর্ক ছিল আর্থার স্যান্ডলারের,' চিন্তিত গলায় বলল লেসলি। 'দু'জনেই জালিয়াত ছিল। মক্কেল ছিল একই অ্যাটর্নির...তাছাড়া...! রানা, ওদের দু'জনের মাঝে কোন যোগসূত্র ছিল না তো?'
মাথা দোলাল ও। 'জানি না।'
প্রমিনেডের শেষ মাথায় পৌঁছল ওরা। সামনেই পেভমেন্ট। আচমকা থেমে পড়ল মাসুদ রানা। চট করে চোখ বোলাল বাঁয়ে। তারপর ডানে। হাত উঠে গেছে হোলস্টারের কাছে।
'কি!' গলা কেঁপে গেল লেসলির। খামচে ধরল রানার বাহু।
'সঙ্গে কেউ এসেছে তোমার?'
'না তো! একাই এসেছি আমি। কেন?'
গম্ভীর হয়ে উঠল রানার চেহারা। 'হুঁম! মনে হয় আরেক রিসেপশন পার্টির মুখোমুখি হতে যাচ্ছি আমরা।' পিস্তল বের করল ও। 'আমার সাথে এগোও। কিসে চড়ে এসেছ তুমি?'
'বাসে।'
'ঠিক আছে। আমার গাড়ি আছে সামনে। চলো।'
এবারও দু'জন, ভাবল মাসুদ রানা। তবে অন্য দু'জন। আর্ট-গ্যালারির সেই মোটা বা তার সঙ্গী নয়। সামনে একজন, পিছনে একজন। প্রথমজন মনে হলো বয়স্ক, ওদের বিশ গজ সামনে দাঁড়িয়ে আছে পেভমেন্টে। মানুষটা দীর্ঘদেহী, হালকা-পাতলা। দাঁড়িয়ে আছে সরাসরি এক লাইট পোস্টের নিচে, যে কারণে চেহারা দেখা যায় না তার। কুয়াশা না থাকলে হয়তো কিছুটা হলেও দেখা যেত।
অন্যজন তুলনায় খাটো। তবে বেশ মোটা। আসলের তুলনায় আরও বেশি মোটা মনে হচ্ছে তাকে পারকা আর হুড পরেছে বলে। ওদের প্রায় ত্রিশ গজ পিছনে আছে সে। মনে হলো যেন দাড়ি আছে এ লোকের। পলকের জন্যে একটা সন্দেহ জাগল রানার। কিন্তু বিশ্বাস করতে মন চাইল না। হেলেদুলে এগিয়ে আসছে লোকটা। সামনেরজন স্থির। নড়ছে না।

মনে মনে দ্রুত হিসেব কষল মাসুদ রানা। একা থাকলে ওদের মুখোমুখি হতে বিন্দুমাত্র চিন্তা করত না ও। কিন্তু এ মুহূর্তে করতে হচ্ছে, লেসলি রয়েছে ওর সঙ্গে। অতএব কোন ঝুঁকি নেয়া চলবে না। কুয়াশার পর্দাটা দেখল রানা। অনুমান করল এক ছুটে ত্রিশ পঁয়ত্রিশ গজ যেতে পারলেই হারিয়ে যেতে পারবে ওরা। তারপর একবার গাড়িতে উঠে পড়তে পারলেই···

'লেসলি!' ওর বাহু মুঠো করে ধরল রানা বাঁ হাতে। 'দৌড় দাও!'

ছুটল দু'জনে কোনাকুনি। সামনের লোকটাকে বাঁয়ে রেখে। চোখের পলকে তাকে অতিক্রম করে গেল ওরা। কোনরকম বাধা দেয়ার চেষ্টাই করল না লোকটা। এমনকি নড়ল না পর্যন্ত। যদিও তৈরি হয়েই ছিল মাসুদ রানা, তার মধ্যে সন্দেহজনক কিছু দেখলে চুপ করে থাকত না ওর ওয়ালথার। তবে পিছনের দাড়িওয়ালা বসে নেই। ওদের সাথে সাথে খিঁচে দৌড় শুরু করেছে সে। ভারি দেহ নিয়ে দ্রুতগতিতে ছুটে আসছে ধুপ-ধাপ পা ফেলে।

কিন্তু কুলিয়ে উঠতে পারছে না সে আগে থেকেই বেশ পিছনে পড়ে থাকার জন্যে। একটু একটু করে পিছিয়ে পড়ছে তার পদশব্দ। প্রমিনেড হাইটস থেকে বেরিয়ে কলাম্বিয়া হাইটসে পড়ল ওরা। ছুটল দুই ব্লক দূরে পার্ক করা রানার গাড়ির দিকে। এক ছুটে উঠল এসে পাইনঅ্যাপেল স্ট্রীটে. ঠিক সেই মুহূর্তে শুরু হলো প্রচণ্ড দমকা বাতাস। কানের পাশ ঘেঁষে গোঁ-গোঁ করে বেরিয়ে যাচ্ছে বরফ ঠাণ্ডা বাতাস। প্রতি নিঃশ্বাসে তীক্ষ্ণধার ছুরির মত খোঁচা মারছে ওদের ফুসফুসে।

'জোরে!' বলল মাসুদ রানা। 'আরও জোরে!'

পৌঁছে গেল ওরা গাড়ির পাশে। পিছনের পদশব্দ এখন ক্রমেই বাড়ছে। চাবির জন্যে তাড়াতাড়ি ট্রাউজারের পকেটে হাত ভরে দিল মাসুদ রানা। খেয়াল নেই গ্লাভস পরে থাকা সত্ত্বেও প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় আঙুল জমে গেছে, মস্তিষ্কের নির্দেশ মেনে চলার মত অবস্থায় নেই এখন ওগুলো। কয়েকটা মূল্যবান মুহূর্ত ব্যয় করে ফেলল ও অকাজে, চাবির খোঁজই পেল না অসাড় আঙুল। তারপর হুঁশ হলো। দ্রুত হাত বের করে ফেলল রানা, গ্লাভস খুলে আবার ঢোকাল পকেটে।

এবার সন্ধান পাওয়া গেল চাবির। অবাক হলো রানা আঙুলগুলোর অবাধ্যতা দেখে, বার বার খাবলে খাবলে চাবি ধরার চেষ্টা করছে ও, কিন্তু পারছে না ধরতে। ওদিকে অনেক কাছে চলে এসেছে দাড়িওয়ালার পায়ের আওয়াজ।

'রানা!' আঁতকে উঠল লেসলি। 'এসে পড়েছে!'

অনেক কসরৎ করে চাবির গোছাটা বের করল মাসুদ রানা। এই সামান্য কাজটুকু করতেই প্রায় ঘাম ছুটে যাওয়ার দশা ওর। ডোর লকে চাবি ঢোকাল, ঘোরাবার চেষ্টা করল ডান দিকে। কিন্তু ঘুরল না। ভুল চাবি ঢুকিয়েছে ভেবে বের করে চোখের সামনে ধরল রানা ওটা। না, ঠিকই তো আছে! আবার পটে ঢোকাল ও চাবি, ঘোরাবার চেষ্টা করল। ঘুরছে না। আতঙ্কিত হয়ে উঠেছে ওদিকে লেসলি। রানার মনে হলো যে কোন মুহূর্তে ঘুরে দাঁড়িয়ে ছুটতে শুরু করবে হয়তো মেয়েটি।

আবার চাবি ঘোরাল মাসুদ রানা, মানে ঘোরাবার চেষ্টা করল। এবারও ব্যর্থ হলো ও। ঠাণ্ডায় জমে গেছে লক!

চোখ বুজল রানা। নিজেকে স্থির রেখে মনে মনে তিন পর্যন্ত গুনল, তারপর

আবার চেষ্টা করল। বার দুয়েক ডানে-বাঁয়ে করতেই খুলে গেল লক। ওদিকে পৌঁছে গেছে প্রায় ধাওয়াকারী, যে কোন মুহূর্তে কুয়াশার পর্দা ফুঁড়ে বেরিয়ে আসবে। এক ঝটকায় দরজা খুলে ফেলল মাসুদ রানা। লেসলিকে প্রায় ছুঁড়ে ফেলল পিছনের সীটে। 'শুয়ে পড়ো!' চাপা গলায় নির্দেশ দিল ও। 'নড়াচড়া করবে না।' নিজেও ঝটপট উঠে পড়ল সামনের সীটে। দরজা বন্ধ করে শুয়ে পড়ল চিত হয়ে। ওয়ালথার বাগিয়ে প্রতীক্ষা করতে লাগল। চোখ জানালায়।

এখন স্টার্ট দিয়ে পালাবার সময় নেই, ভালই জানে মাসুদ রানা। সে চেষ্টা করলে পিছনের লোকটাকে গুলি ছুঁড়তে প্ররোচিত করা হবে। কারের টায়ার ফাটিয়ে দিয়ে ওদের ঠেকাতে চাইবে সে, অথবা... গাড়ি নড়ে উঠতে চাপা ধমক লাগাল রানা লেসলিকে। 'নোড়ো না!'

'সরি,' ফিস ফিস করে বলল সে। 'বেকায়দা ভঙ্গিতে পড়ে ছিলাম কিন্তু গাড়ি ছাড়ছ না কেন তুমি?'

'সময় নেই। ফ্রিজ হয়ে থাকো।' এক চুল এক চুল করে মাথা তুলল রানা, তাকাল ফেলে আসা পথের দিকে। প্রায় সাথে সাথে দেখতে পেল ও লোকটাকে। যদিও চেনার কোন উপায় নেই। বাতাস বোধহয় পড়ে গেছে, আগের থেকে আরও পুরু হয়ে উঠেছে কুয়াশার চাদর। 'এখন সে চেষ্টা করতে গেলে উল্টে বিপদ হবে,' বলেই ওয়ালথারের সেফটি ক্যাচ অফ করল মাসুদ রানা। 'এসে গেছে!'

দৃষ্টি সীমার মধ্যে এসে দাঁড়িয়ে পড়ল ধাওয়াকারী, পনেরো-বিশ গজ দূরে। ওদের গজ পাঁচেক পিছনে। দ্বিধায় পড়ে গেছে। কোন দিকে গেছে ওরা ভেবে পাচ্ছে না। মাসুদ রানার গাড়ির দু'পাশে আরও কয়েকটা গাড়ি আছে। গাড়িগুলোর দিকে তাকাল সে একবার, তারপর সামনের একটা বাঁকের দিকে তাকাল। নেই। ছায়াও নেই ওদের কারও। গেল কোথায় ওরা? ভাবল লোকটা। অনিশ্চিত পায়ে গাড়িগুলোর দিকে এগোল সে কয়েক কদম। আঁতকে উঠল রানা, ঠিক ওর গাড়ির দিকেই আসছে ব্যাটা।

কিন্তু না। চার পাঁচ পা এগিয়েই থেমে গেল লোকটা। আবছা একটা মূর্তির মত লাগছে লোকটাকে, চেহারা দেখা যাচ্ছে না এখনও। আবারও দু'পা এগোল লোকটা। থেমে পড়ল। পুরোপুরি বিভ্রান্ত। পকেট থেকে হাত বের করে সম্ভবত নাক চুলকাল। এই সময় তার হাতে ধরা অস্ত্রটা দেখতে পেল মাসুদ রানা। নিজেকে ধন্যবাদ দিল মনে মনে। পালাবার চেষ্টা না করে সঠিক কাজটিই করেছে ও।

এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে লোকটা। আবাসিক এলাকা এটা। পথের দু'পাশে নিচু ফেন্স ঘেরা সারি সারি বাংলো। প্রায় বিরক্তিকর দীর্ঘ সময় নিয়ে প্রতিটি বাংলোর গেট, ফেন্স, জানালায় চোখ বোলাল সে। তারপর আবার নজর দিল গাড়িগুলোর দিকে। এগিয়ে এল বেশ কয়েক পা।

এইবার প্রমাদ গুনল মাসুদ রানা। আর কয়েক গজ এগোলেই জারিজুরি ফাঁস হয়ে যাবে, ভালমত তাকালেই ওদের দেখে ফেলবে লোকটা। তবে শেষ পর্যন্ত তেমন কিছু ঘটল না। আবার থেমে পড়েছে লোকটা। দীর্ঘ সময় নিশ্চল দাঁড়িয়ে থাকল। নাক চুলকাচ্ছে ঘন ঘন। এদিকে ঘাড় গোঁজ করে অসহায়ের মত পড়ে পড়ে তার চোদ্দগুষ্ঠি উদ্ধার করছে মাসুদ রানা অকথ্য অশ্রাব্য ভাষায়।

অবশেষে ঘুরে দাঁড়াল লোকটা। পায়ের কাছে থুথু ফেলল এক দলা। পা তুলল ফিরে যাওয়ার জন্যে। ডানে-বাঁয়ে সতর্ক নজর রেখে ধীর পায়ে পাইনঅ্যাপেল স্ট্রীটের দিকে হাঁটতে লাগল।

ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ল মাসুদ রানার। উঠে বসল ধীরে ধীরে।

মাথা তুলল লেসলি ম্যাকঅ্যাডাম। 'গেছে?'

'হ্যাঁ।'

'সেই লোক না তো, গ্যালারিতে যে…'

'না। আর কেউ।'

উঠে বসল মেয়েটি। 'চিনতে পেরেছ?'

মাথা দোলাল মাসুদ রানা। 'কুয়াশার জন্যে বোঝা যায়নি চেহারা।'

ওপাশ দিয়ে বেরিয়ে সামনে এসে বসল লেসলি। চিন্তিত। 'কারা ওরা?'

কাঁধ ঝাঁকাল ও। সন্দেহটা মনে উঁকি দিল আবার। কিন্তু চেপে গেল ও ব্যাপারটা। পাইনঅ্যাপেল স্ট্রীটের দিকে তাকাল। কোন চিহ্ন নেই লোকটার। চলে গেছে। তবু আরও কিছু সময় বসে থাকল মাসুদ রানা, তারপর স্টার্ট দিল। নিজের অস্তিত্ব জানান দেয়ার আগে এঞ্জিনও কম ভোগাল না। ব্যাক করল ও, নাক ঘুরিয়ে ছুটল অন্যদিকে।

একটু পর উইলো স্ট্রীটে পড়ল রানার বুইক। সোজা ব্রুকলিন ব্রিজের দিকে চলল ও। ব্রিজ পেরিয়ে ম্যানহাটনের পরিচিত এক ইটালিয়ান রেস্তরাঁর সামনে গাড়ি রাখল মাসুদ রানা।

'এখানে কেন?'

'খালি পেটে যথেষ্ট ব্যায়াম হয়েছে। কিছু পেটে না দিলে আর চলছে না। নামো।'

এ ধরনের রেস্তরাঁয় রিজার্ভেশন না থাকলে জায়গা পাওয়া মুশকিল। তবে আমেরিকানদের ডিনারের স্ট্যাণ্ডার্ড আওয়ার পেরিয়ে গেছে বলে অসুবিধে হলো না। কোনার দিকে নির্জন দেখে একটা টেবিল বেছে নিল মাসুদ রানা। ভরপেট খেয়ে যখন বেরিয়ে এল ওরা, তখন প্রায় দশটা বাজে।

'চলো আমার সাথে,' বলল লেসলি ম্যাকঅ্যাডাম।

'কোথায়?' সিগারেট ধরাল রানা।

'আমার ফ্ল্যাটে।'

একটু ভেবে রাজি হয়ে গেল ও। 'বেশ। চলো।' গাড়ি ছাড়ল রানা। কিছুদূর এগিয়ে ডানে বাঁক নিয়ে ম্যানহাটন এক্সিট র‍্যাম্পের দিকে চলল। প্রশ্নবোধক দৃষ্টিতে তাকাল লেসলির দিকে।

'ওয়েস্ট থার্টিয়েথ স্ট্রীট,' পথ নির্দেশ জানাল সে। 'টেনথ আর ইলেভেনথ এর মাঝখানের এক ব্লকে আছি আমি আপাতত।'

জায়গামত পৌঁছে বিস্মিত হলো মাসুদ রানা। হার্লেমের থেকেও জঘন্য এক জায়গা, মনে হলো ওর। যেমন অন্ধকার তেমনি দুর্গন্ধ চারদিকে। কর্পোরেশনের ময়লা সরানোর গাড়ি কতদিন আসে না কে জানে! মাসুদ রানা নিশ্চিত, ভর দুপুরবেলায়ও রোদের আলো পৌঁছায় না এখানে। একটা অল-ডে-গ্যারাজ, দুটো

স্প্যানিশ দোকান, ব্রিটিশ আমলের গোটা তিনেক ওয়্যারহাউস এবং কয়েকটা প্লাস্টারবিহীন আজব ধরনের ইটের তৈরি দোতলা-তিনতলা বাড়ি পেরিয়ে এসে গাড়ি দাঁড় করাল মাসুদ রানা।

'কোন এককালে লিথুয়ানিয়ান এনক্লেভ নামে পরিচিত ছিল এই জায়গা,' বলল মেয়েটি। 'বর্তমানে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ আর সেন্ট্রাল আমেরিকানদের আবাসস্থল। এদের সাথে নতুন জুটেছি এসে আমি।'

গাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে এল ওরা। পুরো স্ট্রীট জুড়ে অস্বাভাবিক নীরবতা। সামনের একটা বার কেবল জেগে আছে। মাথায় নিয়ন আলোয় লেখা নাম ফ্ল্যাশ করছে ওটার। বারের সামনে পাঁচটা পুরানো, তোবড়ানো গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে দেখা গেল। দ্রুত পায়ে বারের প্রবেশ পথ পেরিয়ে এল ওরা দু'জন।

ওর ফাঁকে যেটুকু সময় পাওয়া গেল, বারের ভেতরে চোখ বোলাল মাসুদ রানা। এদিকে মুখ করে বসে আছে বিশালদেহী এক নিগ্রো। তার কোলে সমান আকারের এক নিগ্রো মেয়ে। চুমু খাচ্ছে, সেই সাথে মেয়েটির দেহের যত্রতত্র হাত চালাচ্ছে লোকটা। ভেতরের প্রায় সবখানেই আরও নানান ধরনের তৎপরতা চলছে। সব এত অল্প সময়ে অনুধাবন করা গেল না।

বার-টার পাশের খুব সরু, অন্ধকার একটা গলিতে ঢুকল লেসলি। এগিয়ে চলল পিছনদিকে। ওকে অনুসরণ করল রানা। 'বারের ওপরতলায় আমার ফ্ল্যাট,' ওর অনুচ্চারিত প্রশ্নের জবাবে বলল লেসলি। 'তোমার বোধহয় পছন্দ হবে না।'

সিঁড়ি ভেঙে দোতলায় নিয়ে এল ওকে লেসলি। রংহীন একটা দরজার তালায় চাবি ঢোকাল। 'এক রাতে বারের কিছু মাতাল খদ্দের পিছু লেগেছিল আমার। ওরা ভেবেছে আমি বোধহয় লাইনের মেয়ে।'

ভেতরে ঢুকল ওরা। আলো জ্বেলে দিল লেসলি। 'তারপর?' প্রশ্ন করল রানা।

'তারপর আর কি? মুখের ওপর দিলাম দরজা বন্ধ করে।'

মেয়েটির সাহসের প্রশংসা করল ও মনে মনে। নিউ ইয়র্ক শহরে এরকম এক জায়গায় এর মত সুন্দরী যুবতীর একা একা বাস করা খুব কঠিন একটা কাজ। অসম্ভবের চেয়েও কঠিন কাজ। কিন্তু তা সত্ত্বেও এ আছে, থাকছে। ঘরের চারদিকে নজর বোলাল রানা। চারটে যেমন-তেমন গদিমোড়া চেয়ার, একটা ডিভান, একটা সেন্টার টেবিল, আর একটা চেস্ট অভ ড্রয়ার, আসবাব বলতে লিভিং রুমে এই আছে।

পায়ের নিচে কার্পেটবিহীন কাঠের ফ্লোর। হাঁটলেই ব্যথায় আর্তনাদ করে। দেয়ালের রং কোন এক কালে হয়তো হালকা সবুজ ছিল, এখন ধূসর হয়ে গেছে কত বছর রঙের ছোঁয়া পায়নি দেয়াল বলা মুশকিল। ও মাথায় পাখির বাসার মত কিচেন। পুরানো আমলের এক গ্যাস স্টোভ আছে কিচেনে। ওয়াশ বেসিনটার চেহারা যাচ্ছেতাই মার্কা। বিনা আমন্ত্রণেই একটা চেয়ারে বসে পড়ল মাসুদ রানা। ওর বাঁ দিকে লেসলির বেডরুম।

'তোমার নিশ্চই পছন্দ হয়নি আমার ঘর?' লজ্জা এবং ক্ষমা প্রার্থনার ভঙ্গি ফুটল লেসলির হাসিতে।

'ইচ্ছে করলে এর মাঝেও থাকা যায় স্বচ্ছন্দে,' বলল ও। 'যদি মনমত করে

গুছিয়ে নেয়া যায়।'

'হ্যাঁ, তা ঠিক।'

'কিন্তু জায়গাটা খুঁজে বের করলে কি ভাবে তুমি?'

নিচের বার থেকে উত্তেজিত তর্কাতর্কির আওয়াজ ভেসে এল। গলার রগ ফাটিয়ে চেঁচাচ্ছে দুই মেয়ে-পুরুষ। উত্তপ্ত গালাগাল বিনিময় হচ্ছে সমানে।

'এক বন্ধুর সাহায্যে,' গলা চড়িয়ে বলল লেসলি। 'এর চেয়ে বেশি পয়সা খরচের সঙ্গতি আমার নেই। তাছাড়া আরেক দিক থেকে এটা আমার জন্যে খুবই উপযুক্ত হয়েছে।'

'কোনদিক থেকে?'

'চারটা এসকেপ রুট আছে এ ফ্ল্যাটের। কিচেনের জানালা এবং বাথরুমের জানালা। দুটো দিয়েই ওপাশের বাড়ির খোলা ছাদে পৌঁছানো যায়। তারপর আছে ফ্রন্ট ডোর এবং আমার বেডরুম সংলগ্ন ফায়ার এসকেপ রুট। শেষেরটা দিয়ে আরেক বাড়ির ছাদে যাওয়া যায়। সেখান থেকে এসকেপ রুট আছে ছয়টা।'

'চমৎকার!' বলল রানা।

'চমৎকারিত্বের কিছু নেই। স্রেফ সেলফ প্রিজারভেশন।' চোখ কুঁচকে চার দেয়াল দেখল সে। 'দেয়ালের রংটা খুব খারাপ দেখায়। ভাবছি যাওয়ার আগে দেয়ালে কিছু ছবি এঁকে ওগুলোর চেহারা পাল্টে দিয়ে যাব। কয়েকটা মুরাল।'

হঠাৎ করেই বিষণ্ন হয়ে উঠল লেসলি। অন্যমনস্ক হয়ে পড়ল। 'বলা যায় না, হয়তো কোন দিন হঠাৎ করে নাম করা কোন আর্ট সমঝদারের চোখে পড়ে যাবে আমার মুরাল। রাতারাতি ছড়িয়ে পড়বে আর্টের, আর্টিস্টের নাম। দর্শনার্থীদের আহ্বান জানাবে কোন কার্নিভাল হাঁকিয়ে। ডেকে বলবে, ''আসুন, দেখে নয়ন সার্থক করুন শিল্পপতি ওরফে বিখ্যাত জালিয়াত ওরফে স্পাই আর্থার স্যান্ডলারের সম্পত্তির দাবিদার লেসলি স্যান্ডলারের আঁকা মুরাল। আপনারা হয়তো জানেন উত্তরাধিকার লাভের আশায় বছরের পর বছর সাধনা করেও কিছুই পায়নি মেয়েটি। বরং বেঘোরে প্রাণটা খোয়াতে হয়েছে তাকে অল্প বয়সে। যদি দেখতে চান, আসুন থার্টিয়েথ স্ট্রীটের...'' হঠাৎ ঝর ঝর করে কেঁদে ফেলল লেসলি দু'হাতে মুখ ঢেকে।

পুরো বেকুব বনে গেল মাসুদ রানা। এমনটি হবে ভাবতেই পারেনি ও। তাড়াতাড়ি উঠে মেয়েটার পাশে গিয়ে দাঁড়াল, একটা হাত রাখল তার মাথায়। আর কি করবে, ভেবে পেল না। চেহারায় গভীর সমবেদনার ছাপ।

পাঁচ মিনিট পর শান্ত হলো মেয়েটি। চোখের পানি মুছে মুখ বাঁকিয়ে হাসির ভঙ্গি করল। 'দুঃখিত। খুব আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েছিলাম।'

'আমি বুঝতে পারছি।'

'বোসো, কফি করে আনি,' বলতে বলতে উঠে পড়ল লেসলি। প্রায় দৌড়ে গিয়ে ঢুকল কিচেনে। বুঝল রানা, আসলে কিছু সময়ের জন্যে পালিয়ে গেল, নিজেকে পুরোপুরি ফিরে পাওয়ার জন্যে।

কফি নিয়ে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক হয়ে ফিরল সে। 'নতুন এই লোক, সেপিটোর ব্যাপারে কি ঠিক করলে, রানা?'

'যতদূর সম্ভব আরও তথ্য জানতে হবে তার ব্যাপারে।'
'কি করে?'
'অ্যাডলফ জেঙ্গারের সঙ্গে দেখা করে।'
'হ্যাঁ, ঠিক। তার ব্যাপারে নিশ্চই সে ভাল জানে।'
'জানা উচিত। তুমিও যাবে আমার সাথে।'
'আমি?' কিছুটা বিস্মিত হলো লেসলি।
'কেন, আপত্তি আছে?'
দ্বিধান্বিত মনে হলো তাকে। 'না, আপত্তি কিসের? তবে আমি ভাবছি এর কোন প্রয়োজন আছে কি না।'
'প্রয়োজন নেই। তবু গেলে মন্দ হবে না। আমি কোন পয়েন্ট মিস করলে তুমি নিজে সরাসরি প্রশ্ন করতে পারবে তাকে।'
'সে আমার সাথে দেখা করতে রাজি হবে না,' বলল লেসলি। 'আমি ভাল করেই জানি।'
'হয়তো হবে না। কিন্তু আমরা নানটুকেটে তার বাড়ির দরজায় না পৌছানো পর্যন্ত জেঙ্গার জানবে না তুমিও আমার সাথে আছ। দরজায় যখন তোমাকে দেখবে সে, তখন প্রত্যাখ্যান করার কোন উপায় থাকবে না আর।'
আবার ভাবনায় পড়ে গেল লেসলি, পরিষ্কার বুঝতে পারছে মাসুদ রানা। গভীর চিন্তায় ডুবে আছে সে।
'আগামী পরশু তার সঙ্গে দেখা করার কথা আমার।'
মুখ তুলল লেসলি। চোখে প্রশ্ন।
'টেলিফোনে কথা হয়েছে আমার তার সাথে,' বলল মাসুদ রানা।
যেন নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও রাজি হলো মেয়েটি। 'ঠিক আছে। যাব আমি।'
'গুড। পরশু সকালে এয়ার নিউ ইংল্যাণ্ডের...'
'না, রানা!' আঁতকে উঠল প্রায় সে। 'প্লেনে আমি যাব না। ওই জিনিসটাকে আমি খুব ভয় পাই।'
'তাহলে গাড়ি নিয়েই যেতে হবে, কি আর করা!' কাঁধ ঝাঁকাল রানা।
'তাই চলো, প্লীজ।'

পাঁচ

সমগ্র ইস্ট কোস্টের আবহাওয়া ভীষণরকম অস্থির। আকাশ অন্ধকার। দমকা বাতাস আর বিরতিহীন বৃষ্টি শুরু হয়েছে গত মাঝরাতের পর থেকে। থামার লক্ষণ তো নেই-ই, বরং ক্রমেই খারাপের দিকে মোড় নিচ্ছে পরিস্থিতি।
এর মধ্যেই খুব ভোরে বেরিয়ে পড়েছে রানা-লেসলি। কানেকটিকাটের বুক চিরে উত্তরে চলেছে ওরা মাঝারি গতিতে, রোড আইল্যাণ্ডের দিকে। সেখান থেকে যাবে ম্যাসাচুসেটসের দক্ষিণ সীমান্তে। চেষ্টা করেও গতি তুলতে পারছে না মাসুদ রানা। উত্তাল বাতাস আর ঘন বৃষ্টির ছাঁট চোখের সামনে স্থায়ী একটা পর্দা ঝুলিয়ে

রেখেছে। ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ গজের ওপাশে নজর চলে না, সব ঝাপসা।

একটানা গাড়ি চালিয়ে তিনটের দিকে উডস হোল ফেরিঘাট পৌঁছল ওরা। ঘাটের বিশাল শেডে ঢুকে অপেক্ষা করতে থাকল। উডস হোল-নানটুকেট দ্বিতীয় ও শেষ ফেরি ছাড়বে চারটায়। যথাসময়ে নানটুকেট সাউন্ডের উদ্দেশে যাত্রা করল ফেরি। উথাল পাতাল করতে করতে দৈত্যাকার একটা কচ্ছপের মত ধীরগতিতে এগোচ্ছে গন্তব্যের দিকে। ভীষণ উত্তাল সাউন্ড। মাটিতে থাকতে আসলে টের পায়নি ওরা। এখন পাচ্ছে হাড়ে হাড়ে।

দোল খেতে খেতে একেকটা পাহাড় সমান ঢেউয়ের মাথায় উঠে যাচ্ছে ফেরি, তারপর সাঁই সাঁই করে তলিয়ে যাচ্ছে দুই ঢেউয়ের মধ্যবর্তী ফাঁকে। প্রতিবার আশঙ্কা জাগে, এই শেষ, আর ওপরে উঠতে পারবে না। ভয়ে মুখ শুকিয়ে গেছে লেসলি ম্যাকঅ্যাডামের। ফেরির তিনতলায় ডাইনিং হলে এক প্লেট-গ্লাস জানালার পাশে বসেছে সে মাসুদ রানার মুখোমুখি। দু'হাতে টেবিলের কোণ আঁকড়ে ধরে শক্ত হয়ে বসে আছে।

দু'ঘণ্টা চলার পরও যখন ডুবল না ফেরি, সাহস ফিরে এল তার একটু একটু করে। একটা দুটো প্রশ্ন, মন্তব্য করতে শুরু করল। 'জীবনে এত লম্বা ফেরি জার্নি করিনি। তারওপর এই আবহাওয়ায়। খুব ভয় লাগছিল।'

'আমারও,' বলল মাসুদ রানা।

'তুমি!' অবাক চোখে তাকাল লেসলি। হাসল মিষ্টি করে। 'চেহারা দেখে তো মনে হয় না!'

'সত্যি ভয় পেয়েছি।' দার্শনিক বনে গেল ও। 'মানুষের অসাধ্য প্রায় কিছুই নেই। চাঁদে ঘর বাঁধার কথা ভাবছে মানুষ, মঙ্গল গ্রহের বাস সম্ভব কি না তা নিয়ে গবেষণার অন্ত নেই, এতই ক্ষমতা মানুষের। অথচ দেখো,' মুখ ঘুরিয়ে সাউন্ড নির্দেশ করল ও, 'প্রকৃতির খেয়াল-খুশির কাছে কত অসহায় সে। এই ঝড়, ঢেউ ঠেকাবার বিন্দুমাত্র ক্ষমতাও নেই তার। যে কারণে এমন পরিস্থিতিতে পড়লে ভয় জাগে মনে।'

'ঠিকই বলেছ।' একটু চুপ করে থাকল মেয়েটি। 'রাতে থাকব কোথায় আমরা?'

'নানটুকেট ইনে। রুম বুক করা আছে। চা, না কফি?'

'এখানে চা-ও আছে?'

'অর্ডার দিলে তৈরি করে দেয়া হয়,' হাত তুলে দেয়ালে ঝোলানো খাদ্য তালিকার ফুটনোট দেখাল রানা। লেখা আছে কথাটা।

'তাহলে চা। এ দেশে এসে চায়ের চেহারাও দেখিনি। কফি আসলে ঠেকায় না পড়লে খাই না আমি।'

'আমি ভুলেই গিয়েছিলাম যে তুমি ব্রিটিশ।' হাত তুলে ওয়েটারের দৃষ্টি আকর্ষণ করল রানা। হাসল লেসলি। 'মানুষ যতই চেষ্টা করুক, জন্মগত স্বভাব-চরিত্র সহজে যায় না তার। ছোট বেলায় প্রায়ই মা'র মুখে শুনতাম কথাটা। অর্থ বুঝতাম না তখন।'

'এখন?'

'বুঝি। মনে হয় ঠিকই বলতেন মা।'
'মনে হয়?'
'ওহ্, ওটা কথার কথা।' খানিক বিরতি। 'একটা প্রশ্ন করি?'
'করো।'
'আশা করি সত্যি জবাব পাব।'
'আমি সাধারণত মিথ্যে বলি না,' ওর চোখে চোখ রেখে বলল মাসুদ রানা।
'সরি, সেভাবে মীন করিনি আমি।'
'আমিও তেমন কিছু ভেবে বলিনি কথাটা। সে যাক, তোমার প্রশ্নটা কি?'

মুখ খুলতে গিয়েও বুজে ফেলল লেসলি ম্যাকঅ্যাডাম। চা নিয়ে এসেছে ওয়েটার। লোকটা চলে না যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করল। পরপর দুটো চুমুক দিল চায়ে। 'দারুণ!' রানার ওপর চোখ পড়ল। ওর প্রশ্নের অপেক্ষায় আছে।

'আমার কাহিনী বিশ্বাস করেছ তুমি?' বলল লেসলি। 'আমার পরিচয় সম্পর্কে যা যা বলেছি বিশ্বাস হয় তোমার?'

'প্রায়।' একটা সিগারেট ধরাল মাসুদ রানা।

'প্রায়?' চোখ কোঁচকাল মেয়েটি। 'এ কেমন উত্তর হলো?'

'যদি বলি হ্যাঁ, মিথ্যে বলা হবে, লেসলি। না-র ক্ষেত্রেও তাই, অতএব মধ্য পন্থা ছাড়া উপায় নেই আমার। কারণ তুমি সত্যি জবাব চেয়েছ।'

'মানলাম। কিন্তু আরেকটু ব্যাখ্যা করে বলতে পারো না?'

'পারি। তুমি যখন প্রথম আমার অফিসে এলে, কাহিনীটা বললে, বিশ্বাস অবিশ্বাস কোনটাই করিনি আমি। কারণ গল্পে আস্থা রেখে পা চালাবার দলে আমি পড়ি না। আমি যুক্তিবাদী মানুষ, প্রমাণ ছাড়া কিছু বিশ্বাস করি না।'

'অর্থাৎ?'

'অর্থাৎ তোমার দাবির স্বপক্ষে যে সব নিরেট তথ্য-প্রমাণ প্রয়োজন, তার সব এখনও সংগ্রহ করতে পারিনি আমি। তবে যেটুকু জানতে পেরেছি, তাতে মনে হয়, রিপিট, মনে হয়, মিথ্যে নয় তোমার দাবি। কয়েক জায়গায় কিছু গ্যাপ আছে, সেগুলো পূরণ করতে পারলে তবেই পুরোপুরি বিশ্বাস হবে আমার। তবে আমার ব্যক্তিগত মতামত যদি চাও, আমি বলব তোমাকে অবিশ্বাস করি না আমি।'

চেহারা আলো হয়ে উঠল লেসলি ম্যাকঅ্যাডামের। 'ধন্যবাদ, রানা। কিন্তু…!'

'কিন্তু কি?'

'জেঙ্গার নিশ্চই একমত হতে পারবেন না তোমার সাথে।'

'তাতে আমার ধারণা বিন্দুমাত্র নড়চড় হবে বলে মনে করি না আমি,' দৃঢ়কণ্ঠে উত্তর দিল মাসুদ রানা।

'তুমি আমাকে বিশ্বাস করো জেনে খুব খুশি হয়েছি আমি, রানা। খুব খুশি হয়েছি।'

জেটির সঙ্গে ফেরির মৃদু সংঘর্ষের ঝাঁকিতে আলোচনায় ছেদ পড়ল ওদের। এসে গেছে নানটুকেট। ফেরি থেকে নেমেই দ্বীপের দক্ষিণ-পশ্চিম প্রান্তের দিকে গাড়ি ছোটাল মাসুদ রানা। বেশ কয়েক মাইল যেতে হবে ওদের, এদিকে সাতটা

বাজে প্রায়। বাতাস আর বৃষ্টির বেগ এখনও একটুও কমেনি।

সোয়া আটটায় অ্যাডলফ জেঙ্গারের বাড়ির গেটে পৌঁছল ওরা। রাস্তার দিকের সব জানালার পর্দা নামানো। ভেতরে আলো জ্বলছে। গাড়ি থেকে নেমে দৌড়ে সামনের লন পেরিয়ে বন্ধ দরজার সামনে পৌঁছল রানা ও লেসলি। এই সামান্য পথ পেরোতেই পুবাল বাতাস আর বৃষ্টির ছাঁটে বেহাল অবস্থা হলো, প্রায় হাফ গোসল হয়ে গেল দু'জনেই। নিরেট ওক কাঠের দরজার সাথে ঝোলানো ব্রাস নকারের সাহায্যে আওয়াজ তুলল মাসুদ রানা। তারপর মাথা আর কাঁধের পানি ঝরাল দু'হাতে। লেসলিও তাই করল। চেহারা ভদ্রোচিত বানাবার কাজে একে অন্যের আয়নার কাজ করল ওরা।

পনেরো সেকেন্ড পর ভেতর থেকে দরজার চেইন খোলার আওয়াজ পাওয়া গেল, পরমুহূর্তে ঝট্ করে খুলে গেল পাল্লা। অ্যালকোভে দাঁড়িয়ে আছে বৃদ্ধ জেঙ্গার। 'মাসুদ রানা!' চোখ কোঁচকাল লোকটা বাতাসের তোড়ে। 'আপনার আসার কথা...।' থেমে গেল সে লেসলিকে দেখে।

'গুড ইভনিং, মিস্টার জেঙ্গার,' কড়া ব্রিটিশ অ্যাকসেন্টে সম্ভাষণ জানাল মেয়েটি।

উত্তর দিল না বৃদ্ধ। কড়া দৃষ্টিতে কয়েক মুহূর্ত দেখল ওকে। তারপর অভদ্রের মত ঝট্ করে দু'পা পিছিয়ে অ্যালকোভের অপেক্ষাকৃত অন্ধকার এক জায়গা দেখে দাঁড়াল। এখনও তাকিয়ে আছে ওর দিকে। লোকটার আচরণ বিস্মিত করল মাসুদ রানাকে। লেসলিকে দেখছে তো দেখছেই লোকটা। চাউনি কাঁচা চিবিয়ে খাওয়ার মত। মেয়েটিও তেমনি। পলকহীন চোখে বৃদ্ধের আপাদমস্তক নজর বোলাচ্ছে। চেহারা নির্বিকার।

'চিনেছি,' বিড় বিড় করে বলে উঠল জেঙ্গার, যেন স্বীকারোক্তি করছে। 'এ নিশ্চই সেই মেয়ে, যার কথা সেবার বলেছেন আপনি?' পলকের জন্যে মাসুদ রানার দিকে তাকাল সে, তারপর আবার লেসলির দিকে। ঠিক দেখেছে কি না বলতে পারবে না, তবে রানার মনে হলো সে চাউনি থেকে যেন ঘৃণা উপচে পড়ছে। 'যে নিজেকে আর্থার স্যান্ডলারের মেয়ে বলে দাবি করছে?'

'ঠিক বলেছেন, মিস্টার জেঙ্গার,' বলে উঠল লেসলি ম্যাকঅ্যাডাম। 'আমি-ই সেই মেয়ে। আর আমার দাবির মধ্যে মিথ্যে নেই এক বিন্দুও। আর্থার স্যান্ডলারের একমাত্র সন্তান আমি।'

'মাই ডিয়ার ইয়াং লেডি,' টিটকিরির ভঙ্গিতে বাঁকা কিন্তু কঠোর হাসি হাসল বৃদ্ধ অ্যাটর্নি। চেহারায় অবিশ্বাস আর অপছন্দ। 'ব্যাপারটা নিয়ে তর্ক করার ইচ্ছে বা রুচি কোনটাই নেই আমার। আপনার ওপিনিয়ন, ক্লেইম ইত্যাদি শোনার জন্যে কোর্ট হয়তো আপনাকে স্বাগত জানাবার জন্যে অপেক্ষায় আছে, কিন্তু আমি সে সব শুনতে রাজি নই। এটা কোর্ট নয়, আমার বাড়ি। এখানে আমি মুক্ত কণ্ঠে সত্য প্রকাশ করার অধিকার রাখি।' মাসুদ রানার দিকে তাকাল সে। 'কে খাঁটি কে নকল, দেখলেই চিনি আমি। একে কেন নিয়ে এসেছেন আপনি আমার বিনা অনুমতিতে?'

'দুঃখিত [illegible]ঙ্গার।' মোটেও দুঃখিত মনে হলো না রানাকে। 'ব্যাপারটা

গুরুত্বপূর্ণ। আপনার অনুমতি নেয়ার সময় ছিল না।'

'গুরুত্বপূর্ণ?'

'হ্যা। ভাবলাম ব্যাপারটা নিয়ে আলোচনা করা দরকার আমাদের সবার।'

'সবার বলতে?'

'আমাদের তিনজনের।' এক পা এগিয়ে চৌকাঠে পা রাখল রানা। 'ভেতরে আসতে পারি?'

'দেখে তো মনে হয় না আমার অনুমতির কোন প্রয়োজন আছে।' এগিয়ে এল জেঙ্গার। মুখ বাড়িয়ে 'থোক' করে এক দলা থুথু ফেলল পোর্চে। 'আসুন। দয়া করে তাড়াতাড়ি রেহাই দিন আমাকে।'

ঢুকে পড়ল রানা লেসলি। সামনের হলওয়েতে ঢোকার মুখে দাঁড়িয়ে থাকা স্ট্যাণ্ডে ঝুলিয়ে রাখল নিজেদের কোট। তারপর জেঙ্গারকে অনুসরণ করে পৌছল তার সীটিং রুমে। ফায়ার প্লেসের কাছাকাছি বসল সবাই। ওদের সামনে, সাউন্ডের দিককার এ ঘরের একমাত্র জানালায় গোঁ-গোঁ শব্দে মাথা কুটছে বাতাস। থেকে থেকে ক্যাঁচকোঁচ আওয়াজ উঠছে পুরানো ঘরটার কোথাও কোথাও। নিজের আর্ম চেয়ারে বসল জেঙ্গার জানালার কাছের নির্ধারিত জায়গায়।

'প্রয়োজন মনে করলে গলা ভেজাতে পারেন আপনারা,' ঘরের অন্য প্রান্তের একটা খুদে বার ইঙ্গিত করল বৃদ্ধ। 'হেলপ ইওরসেলফ।'

দু'জনেই মাথা দোলাল ওরা। প্রয়োজন নেই।

'ওয়েল দেন,' বলল সে রানার উদ্দেশে। রাগ পড়ে গেছে। 'শুরু করা যাক তাহলে। বলুন আর কি জানতে চান আপনি?'

'আপনার সাহায্য প্রয়োজন আমার,' বলল ও।

'নিশ্চই দরকার। কিন্তু সেটা কি?'

বৃদ্ধের চোখের দিকে তাকিয়ে আছে লেসলি।

'কয়েকটা প্রশ্নের উত্তর।'

'যা জানতাম সবই তো জানিয়েছি আমি আপনাকে।'

'একটা গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট বলেননি।'

ভুরু কোঁচকাল জেঙ্গার। 'কোনটা?'

'ভিনসেন্ট ডি সেপিটো,' মৃদু গলায় নামটা উচ্চারণ করল মাসুদ রানা।

মনে হলো যেন আচমকা ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল বৃদ্ধ নামটা শুনে। কিন্তু পরমুহূর্তে নিজেকে সামলে নিতে সক্ষম হলো জেঙ্গার। 'কি?'

আবার বলল ও। 'এক সময় ড্যানিয়েলস অ্যাণ্ড জেঙ্গার অ্যাসোসিয়েটসের মক্কেল ছিল।'

'ছিল। অনেকেই মক্কেল ছিল আমাদের' তাতে কি?'

'আমার সন্দেহ আর্থার স্যান্ডলারের সাথে লোকটার ঘনিষ্ঠ কোন সম্পর্ক ছিল।'

'যা খুশি তাই সন্দেহ করতে পারেন আপনি। আমেরিকা গণতান্ত্রিক দেশ।'

বেশ কয়েক মুহূর্ত বৃদ্ধকে পর্যবেক্ষণ করল মাসুদ রানা। 'টাকা-পয়সার ব্যাপারে কিছু আলোচনা হোক তাহলে?'

'হোক। কোন টাকা?'

'জাল টাকা।
চুপ করে থাকল জেঙ্গার। বেশ দুশ্চিন্তায় পড়ে গেছে।
'কখনও কোন টাকা জালকারীর হয়ে মামলায় লড়েছেন?'
'আমার জানামতে না।'
'নিজেকে নিজে ট্যাম্পার করছেন আপনি, কাউন্সেলর!' তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলল রানা। 'আপনি এতটা স্মৃতিহারা হয়ে পড়েছেন বলে মনে করি না আমি।'
কাঁধ ঝাঁকাল বৃদ্ধ। দম ছাড়ল ফোঁস করে। 'ঠিক আছে। মনে করুন আপনার প্রশ্নের উত্তর "হ্যাঁ"। তারপর?'
'সেপিটো আর স্যান্ডলার, এদের মধ্যে কোন সম্পর্ক ছিল।'
'সেপিটো ছিল নামকরা এক জালিয়াত।'
'চেক জাল করত সে,' মন্তব্য করল যেন মাসুদ রানা।
'হ্যাঁ।'
'আর্থার স্যান্ডলার জাল করত টাকা?'
'করত।'
'এদের দু'জনের মধ্যে কোন সম্পর্ক ছিল?'
'একে অন্যকে চিনত ওরা।'
'আর কিছু?'
চুপ করে থাকল বৃদ্ধ।
'ওয়েল?'
'বন্ধু ছিল ওরা।'
'এক সাথে কাজ করত?'
ক্লান্ত ভঙ্গিতে মাথা দোলাল জেঙ্গার। 'করত।'
'আর্থারের মত সেপিটোর নিশ্চই আরও কোন পরিচয় ছিল?' নড়েচড়ে বসল রানা।
'হ্যাঁ। মার্কিন সেনাবাহিনীতে চাকরি করত সে।'
বিস্মিত হলো মাসুদ রানা। 'কি বললেন! সেনাবাহিনীর সদস্য হয়ে চেক জাল করত ডি সেপিটো?'
'হ্যাঁ। তবে রেগুলার সদস্য ছিল না সে আর্মির, ছিল ইরেগুলার।' আসন ছাড়ল অ্যাডলফ জেঙ্গার। বার থেকে নিজের জন্যে খানিকটা ব্র্যান্ডি নিয়ে এসে বসল আবার। 'তার কাজ ছিল আবর্জনা সংগ্রহ করা,' বলল বৃদ্ধ। চুমুক দিল গ্লাসে।
'আবর্জনা সংগ্রহ?'
'হ্যাঁ, পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গা থেকে আবর্জনা সংগ্রহ করতে হত তাকে। " হারবার আইওমা জিমা বার্লিন স্ট্যালিনগ্রাদ, সর্বত্র ঘুরে ঘুরে ওসব সংগ্রহ ক সে।' মৃদু হাসির আভাস ফুটল বৃদ্ধের মুখে।
'বুঝলাম না। কিসের আবর্জনা?'
দৃষ্টিতে কৌতুক নেচে উঠল যেন লোকটার। 'বুঝলেন না?'
'না,' মাথা দোলাল মাসুদ রানা।

'তাহলে সেপিটোকে নিজেই জিজ্ঞেস করে জেনে নেবেন আপনার প্রশ্নের উত্তর।'

নড়ে উঠল লেসলি। সামনে ঝুঁকে বসল।

'এরপর আপনি নিশ্চই জানতে চাইবেন ১৯৬৪ সালে কেন হঠাৎ করে মামলা খারিজ হয়ে যায় ডি সেপিটোর?' আবার চুমুক দিল জেঙ্গার। 'কেন সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করা হলো তার প্রতি?'

সম্মোহিতের মত মাথা দোলাল রানা।

'দেশপ্রেম।' এমন এক মুখভঙ্গি করল জেঙ্গার, যেন ওই এক শব্দেই সব কথা বলা হয়ে গেল।

'দেশপ্রেম! একজন...'

'জালিয়াতের মধ্যে,' ওর মুখের কথা কেড়ে নিল জেঙ্গার। 'হ্যাঁ। জালিয়াত হিসেবে যত না বড় ছিল তার চেয়ে অনেক বড় দেশপ্রেমিক ছিল ডি সেপিটো।'

একটু ভাবল মাসুদ রানা। 'আপনি বলছেন লোকটা বেঁচে আছে এখনও?'

'অবশ্যই। বহাল তবিয়তে।'

'কোথায় আছে সে?'

'পেনসিলভেনিয়ার ছোট এক শহর, ব্র্যানসটেবল-এ। ১৯৬৪ সালে "অবসর" দেয়া হয়েছে তাকে সরকারীভাবে। সপরিবারে আছে সে ওই শহরে। অন্য নাম পরিচয়ে।'

'কি তার নতুন নাম?'

'নতুন?' হাসল বৃদ্ধ। 'দুই দশকেরও বেশি আগে ধারণ করা নাম যদি নতুন হয়, তাহলে তাই।'

'কি নাম?' শান্ত গলায় জানতে চাইল রানা।

'জোনাথন গ্রোভার। যে কাউকে জিজ্ঞেস করলেই দেখিয়ে দেবে। ব্র্যানসটেবল-এ এই নামে একজনই আছে।'

'কি করে জানেন আপনি একজন আছে?' তীক্ষ্ণ চোখে বৃদ্ধকে দেখছে ও।

চোয়াল দৃঢ় হয়ে উঠল তার। প্রসন্ন ভাবটা চেহারা থেকে গায়েব হয়ে গেছে মুহূর্তে। 'সময় সুযোগ হলে মাঝেমধ্যে আসে সে আমার সাথে দেখা করতে।'

'আচ্ছা।'

'ওখানে বড় এক স্টেশনারি দোকানের মালিক গ্রোভার। স্টেশনারি ছাপায়, টাকা নয়। এত বছর আঁধারে ছিল সে। আমার ধারণা আপনারা তাকে আবার আলোয় নিয়ে আসতে চান।'

'হ্যাঁ। কিছুক্ষণের জন্যে অন্তত।'

'ওকে, জেন্টলম্যান। আর কিছু?'

মাথা দোলাল মাসুদ রানা। 'না।'

'নিশ্চিত হয়ে নিন। কারণ এবারই শেষ, এরপর এ বাড়ির লনেও ঢুকতে পারবেন না আপনি। যদি সে চেষ্টা করেন, আপনাকে পুলিসে দেব আমি। মনে রাখবেন এখানকার পুলিস স্টেশনের সবার খুব প্রিয় আমি। আমার অনুরোধ খুব খুশি মনে রক্ষা করবে ওরা।'

'সতর্ক করে দেয়ার জন্যে ধন্যবাদ।' আসন ছাড়ল রানা। 'আপনাকে ঝামেলায় ফেলার কোন ইচ্ছে নেই আমার।'

বেরিয়ে আসছিল ওরা, পিছন থেকে ডেকে উঠল অ্যাডলফ জেঙ্গার, 'মিস্টার রানা, অ্যাটর্নি পরিচয়ের আড়ালে ড্যানিয়েলসেরও কিন্তু আরেকটা পরিচয় ছিল।'

ঘুরে দাঁড়াল মাসুদ রানা। চোখে সন্দেহের ছায়া।

'হ্যাঁ।' ওর চোখে চোখ রেখে হাসল বৃদ্ধ। 'দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়, এবং তার পরেও।'

'কি পরিচয়?'

' "রিক্রুটিং সার্জেন্ট" ছিল সে।'

'কি?'

' "রিক্রুটিং সার্জেন্ট"।'

এক পা এগোল মাসুদ রানা। 'বুঝলাম না। কিসের "রিক্রুটিং সার্জেন্ট"?'

'দেশ প্রেমিকদের রিক্রুট করত ড্যানিয়েলস। গট দ্যাট? খুব গোপনে। ওর সেই পরিচয় যেদিন পাই, সেদিনই কেন জানি ওকালতির ওপর ঘেন্না ধরে গেল আমার। চলে এলাম সব ছেড়ে।' একটু বিরতি। 'বুঝতে পারলেন না?'

'না।'

'জোনাথন গ্রোভারকে জিজ্ঞেস করবেন। ও বলতে পারবে ভাল। আফটার অল সে নিজেও একজন দেশপ্রেমিক। সে-ই বলবে "রিক্রুটিং সার্জেন্ট" কি? আরও অনেক কিছু জানতে পারবেন হয়তো। যদি আপনি তার খোঁজ পাওয়ার আগেই মৃত্যু আপনার খোঁজ না পায়।'

হ্যারিকেনের দিকে মোড় নিচ্ছে পরিস্থিতি। ওর মধ্যেই পরদিন সকালে ছাড়ল ফেরি। হালকা ম্যাচ বক্সের মত লাফাতে লাফাতে দোল খেতে খেতে চলল উড্স হোলের দিকে। আধি ভৌতিক রং আকাশের, গা ছমছম করে তাকালে। আবহাওয়ার সর্বশেষ বুলেটিনে বলা হয়েছে, দুপুরের পর আঘাত হানবে হ্যারিকেন।

অল্প কয়েকজন ক্রু আর জনাবিশেক যাত্রী নিয়ে চলেছে আজ দ্য আইল্যান্ডার। নিচতলার যাত্রী রুমে বসেছে রানা ও লেসলি। কথা বলছে না কেউ। লেসলি বেশ গম্ভীর এবং চিন্তিত।

'কি ভাবছ?' জানতে চাইল মাসুদ রানা।

'জেঙ্গারের কথা।'

'কি?'

'লোকটাকে কেমন যেন মনে হয়েছে আমার। অনুভূতিটা ঠিক বুঝিয়ে বলতে পারব না তোমাকে। কিন্তু কাল যতক্ষণ লোকটার ওখানে ছিলাম কেমন গা ছম ছম করেছে আমার। কোথায় যেন একটা গড়বড় আছে, রানা। ঠিক ধরতে পারছি না আমি। আবার অস্বস্তিকর চিন্তাটা দূরে সরিয়ে রাখতেও পারছি না।'

মেয়েটিকে পর্যবেক্ষণ করল রানা গভীর দৃষ্টিতে। চেহারায় কিসের যেন ছাপ দেখা যাচ্ছে তার। কিন্তু কিসের, বুঝতে ব্যর্থ হলো ও। চোখ বুজল মাসুদ রানা

বসে থাকল ঝিম মেরে। ভাবছে।

'আমি একটু ঘুরে আসি,' উঠে দাঁড়াল লেসলি।

'কোথায়?'

'একটু হাঁটাহাঁটি করি। বসে থাকতে ভাল্লাগছে না।'

'ফিরতে দেরি কোরো না। রেলিঙের বেশি কাছে যেয়ো না।'

'ঠিক আছে,' ঝুঁকে রানার গালে আলতো করে চুমু খেলো লেসলি। 'আমার নিরাপত্তা নিয়ে ভাবছ বলে আমি কৃতজ্ঞ বোধ করছি।'

পিছনের লেডিস রুমের দিকে যেতে দেখল রানা ওকে, তারপর আবার চোখ বুজল। টেরও পেল না কখন ঘুম এসে জুড়ে বসেছে দু'চোখে। দু'টি ছোট শিশুর হুল্লোড়ের আওয়াজে এক ঘণ্টা পর ভাঙল ওর ঘুম। দুই সীটের মধ্যবর্তী আইলে ছোটাছুটি করে খেলছে পাঁচ-ছয় বছরের দু'টি ছেলে, থেকে থেকে তীক্ষ্ণ বাঁশির মত চিৎকার করছে। কুম্ভকর্ণেরও সাধ্য নেই এর মধ্যে ঘুমায়।

পাশে তাকাল রানা। এখনও আসেনি লেসলি। ঘড়ি দেখল ও। সতর্ক হয়ে উঠল সঙ্গে সঙ্গে। এখনও আসেনি? নাকি ওকে ঘুমে দেখে···চট করে উঠে পড়ল মাসুদ রানা। ব্যাপারটা চেক করা দরকার। ফেরির দোলের সাথে ভারসাম্য রেখে এগোল ও। এক এক করে তিনটে ফ্লোরের সবখানে খুঁজল রানা লেসলিকে। ডাইনিং হল, বার-রেস্টুরেন্ট, লেডিস রুম, জেন্টস রুম, ক্রু'স মেস, কোন জায়গা বাদ রাখল না রানা। কিন্তু কোথাও নেই লেসলি ম্যাকঅ্যাডাম। জলজ্যান্ত একটা মানুষ হাওয়ায় মিলিয়ে গেছে যেন।

হার্টবিট দ্রুততর হলো মাসুদ রানার। কোথায় গেল? রাজ্যের অশুভ চিন্তা এসে ভর করল ওর মাথায়। পড়ে যায়নি তো সাগরে, সবার অলক্ষে? পরক্ষণে ভাবনাটা দূর করে দিল ও, অসম্ভব! এমনি এমনি পড়ে যাওয়ার দলে পড়ে না লেসলি। তাহলে?

কি খেয়াল হতে আঁতকে উঠল রানা। ফেলে দেয়া হয়নি তো ওকে? অ্যানসপেচার গ্যালারির সেই দু'জন, অথবা ব্রুকলিন হাইটস প্রমিনেডের সেই···ভেতরে ভেতরে মস্ত এক ঝাঁকি খেলো মাসুদ রানা। ওদের কেউ আছে ফেরিতে? কই, তেমন কাউকে তো চোখে পড়ল না! রীতিমত অসুস্থ হয়ে পড়ল ও অজানা আশঙ্কায়।

মনে পড়ল ঠিক এই ধরনের এক ঘটনা ঘটেছে বাহামার এক ক্রুজ ফেরিতে। মাত্র তিন সপ্তাহ আগের ঘটনা, স্ত্রীকে অ্যালকোহলের সাহায্যে মাতাল করে সাগরে ঠেলে ফেলে দিয়েছিল পাষণ্ড স্বামী। অস্থির হয়ে উঠল মাসুদ রানা। ব্যস্ত পায়ে পুরো ফেরি চক্কর দিয়ে এল আরেকবার। নেই লেসলি। চেহারা চেনে না অথচ চেনা চেনা লাগে, এমন কাউকেও দেখল না কোথাও। দৌড়ে নিচে নেমে এল মাসুদ রানা। ফেরির একেবারে পিছনে, যেখানে গাড়ি রাখার জায়গা, সেদিকে চলল। জায়গাটা উন্মুক্ত। ঝড়-বৃষ্টির মধ্যে ওখানে কারও থাকার কথা নয় ভেবে আগেরবার যায়নি রানা ওদিকে। মনের মধ্যে ক্ষীণ আশা, হয়তো ওর গাড়ির মধ্যে ঘুমিয়ে আছে লেসলি। খেয়াল আছে ফেরির ভাড়া দেয়ার সময় গাড়ির চাবির রিংটা ওর হাতে দিয়েছিল মাসুদ রানা। পরে আর ফেরত নেয়া হয়নি।

নিচতলার সীটিংরুমের সীটের মধ্যে দিয়ে এঁকেবেঁকে জোর পায়ে এগোল মাসুদ রানা। ফায়ার স্টেশন পেরিয়ে সরু একটা গলিতে ঢুকল। গলির শেষ প্রান্তে বিশাল পার্কিং এরিয়া। গলির দুই দেয়ালে ঝুলছে কয়েকটা ফায়ার এক্সটিংগুইশার ও ফায়ার অ্যাক্স। একটা অ্যাক্সের ক্রেডল শূন্য দেখা গেল। গলি পেরিয়ে পিছনের খোলা অংশে বেরিয়ে এল মাসুদ রানা। কার লটের কিছু অংশ ত্রিপলের আচ্ছাদন দিয়ে ঢাকা, তার নিচে দাঁড়িয়ে চারদিক তাকাল।

এখানে ওখানে পার্ক করে রাখা গোটা ছ'য়েক কার ও একটা হুডওয়ালা লরি ছাড়া কিছু নেই। সামনে ঝুঁকে বুইকের দিকে ছুটল মাসুদ রানা। পেয়ে বসল যেন এলোমেলো দমকা বাতাস, চারদিক থেকে প্রচণ্ড আক্রমণে বেহাল দশা হলো রানার। মাতালের মত টালমাটাল পায়ে এগোল রানা। কাছে এসে উঁকি দিল গাড়ির ভেতর। ফাঁকা। নেই ভেতরে লেসলি। চোখের সামনে লেসলিকে দেখল ও কল্পনায়, অসহায়ের মত পিছনে কোথাও খাবি খাচ্ছে উত্তাল নানটুকেট সাউন্ডে। তার সাহায্যের আর্ত আবেদন শুনতে পাচ্ছে না কেউ। নাকি মরেই গেছে হতভাগী? কখন ফেলে দেয়া হয়েছে ওকে কে জানে?

এক ছুটে ফেরির একেবারে পিছনের রেলিঙে এসে দাঁড়াল মাসুদ রানা। রেলিং শক্ত করে ধরে যতদূর দেখা যায়, পানির বুকে চোখ বোলাল। স্রেফ পানি আর পানি। ঘুরে আচ্ছাদনের দিকে ছুটল ও। ওপরে যেতে হবে, মাস্টার ব্রিজে। মাস্টারকে বলে...। ব্রেক কষল রানা, ফায়ার স্টেশনের এপাশের সরু গলি জুড়ে দাঁড়িয়ে আছে দীর্ঘদেহী কে একজন। হ্যাটটা ভুরুর ওপর পর্যন্ত টেনে নামানো। চেহারা দেখা যায় না ঠিকমত।

না, দাঁড়িয়ে নেই, ভুল দেখেছে মাসুদ রানা। এদিকেই আসছিল, রানাকে ভেতরে ঢুকতে দেখে দ্বিধায় পড়ে গেছে কেবল লোকটা, কমিয়ে দিয়েছে হাঁটার গতি। কাৎ হয়ে দাঁড়াল সে রানার সুবিধের জন্যে, নইলে ধাক্কা লাগবে। এগোল রানা লোকটার গা ঘেঁষে। এবং ভুলটা বুঝতে পারল তৎক্ষণাৎ। তার পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে যাওয়ার সময় কণ্ঠনালীতে শীতল, ধাতব স্পর্শ পেয়ে জমে গেল ও। চাপ পড়তে মুখ পিছিয়ে নিতে গেল রানা, কিন্তু ব্যর্থ হলো। মাথা ঠেকে গেছে পিছনের বাল্কহেডে।

'খুব বেশি ব্যস্ত নাকি, গোয়েন্দা সাহেব?' মুখের সামনে মুখ নিয়ে এল হ্যাটধারী।

কাছ থেকে ভাল করে দেখল তাকে ও। চিনে ফেলল মুহূর্তে। এ সেই অঙ্ক বিশারদ, গ্যালারির মোটার সঙ্গী, ক্যালকুলেটরে হিসেব করতে দেখেছিল একে মাসুদ রানা। 'কে তুমি!'

'তার চেয়ে বরং শোনা যাক, মেয়েটা কোথায়?'

খানিকটা যেন আশার আলো দেখতে পেল মাসুদ রানা। 'মেয়েটা মানে?'

'মেয়েটা মানে,' দাঁত বের করে হাসল সে। 'স্ত্রী লিঙ্গ থাকে যাদের সঙ্গে, তাদের একজন। ফেরিতে তোমার সাথে ওদের একজনকে উঠতে দেখেছি। গেল কোথায় সে?'

'তোমার ভুল হচ্ছে। কেউ ছিল না আমার সাথে।'

হতাশ ভঙ্গিতে মাথা দোলাল লোকটা। চেহারা তার পূর্ব ইউরোপীয় ধাঁচের, লক্ষ করল মাসুদ রানা। হাসিটা আরও চওড়া হলো তার। মাথা দোলাল। 'তুমি খুব দুর্বল স্মৃতিশক্তির মানুষ। দেখি তোমাকে খানিকটা সাহায্য করা যায় কি না।'

পর মুহূর্তে ভাঁজ হয়ে গেল রানা সোলার প্লেক্সাসে ভয়ঙ্কর এক ঘুসি খেয়ে। ফুসফুসের সব বাতাস বেরিয়ে গেছে। দু'হাতে ব্যথা পাওয়া জায়গাটা চেপে ধরে উবু হয়ে থাকল মাসুদ রানা। সর্ষে ফুল দেখছে চোখে।

এক হাতের শক্ত মুঠোয় রানার ওভারকোটের ল্যাপেল চেপে ধরল লোকটা, ঠেলে নিয়ে চলল ওকে পিছনের দিকে। পিছনে ফুট আটেক চওড়া আচ্ছাদন দেয়া একটা স্পেস, সেখানে এনে দাঁড় করাল। লোকটার দেহে অসুরের শক্তি আছে, টের পেল মাসুদ রানা। গলার চাপ এক চুলও শিথিল হয়নি। একটু এদিক-ওদিক দেখলেই তীক্ষ্ণধার ব্লেড ঢুকিয়ে দেবে সে ওর কণ্ঠনালীর ভেতর। সোজা হয়ে দাঁড়াতে গেল রানা, সাথে সাথে আবার বেঁকে গেল একই জায়গায় একই ওজনের আরেক ঘুসি খেয়ে। হাঁ করে দম নিতে গেল, মুহূর্তে মুখ ভরে গেল বৃষ্টির পানিতে। খক খক কেশে উঠল রানা। অর্ধেক পানি গিলে ফেলল।

'কি বলো, ভায়া! সাহায্য করতে পেরেছি?'

'আমি জানি না সে কোথায়!' নিচের ভারি ডিজেল এঞ্জিনের গুরুগম্ভীর আওয়াজ ছাপিয়ে চেঁচিয়ে উঠল মাসুদ রানা।

গম্ভীর হয়ে গিয়েছিল লোকটা। আবার হেসে উঠল। 'সাঁতার জানো? যদি জবাব না দাও, তুলে পানিতে ছুঁড়ে ফেলে দেব। কেমন হবে মনে হয় ব্যাপারটা?'

'ওকে কেন খুঁজছ তুমি?' গলায় ছুরির চাপ অগ্রাহ্য করে দু'জনের মাঝখানের ব্যবধান মাপল মাসুদ রানা। 'কে তোমাকে আমাদের খোঁজ দিল? জেঙ্গার?'

'যা খুশি তাই ভাবতে পারো।' পরক্ষণে উন্মত্তের মত চেঁচিয়ে উঠল সে, 'কোথায় মেয়েটা!'

'তাহলে এ নিশ্চই জেঙ্গারের কাজ,' আলাপের সুরে বলল রানা। মনে মনে চাইছে আরও একটু রেগে উঠুক ব্যাটা, তাতে সুবিধে হয় ওর।

'শাট আপ, ইউ ব্লাডি সোয়াইন!' গর্জে উঠল লোকটা। 'কোথায় লুকিয়ে রেখেছ ওকে?' মধ্য ইউরোপীয়দের মত ইংরেজি বলছে সে, বুঝল রানা। কোনদেশী, জার্মান? পোলিশ?

মারল রানা। ডান হাঁটু ঝট করে ওপরে উঠে গেল ওর ভাঁজ হয়ে। কিন্তু তৃপ্তি পেল না রানা, মারটা যুৎসই হয়নি। লাভের মধ্যে লাভ হয়েছে খানিক চমকে দেয়া গেছে লোকটাকে, সঙ্গে উপরি হিসেবে এক পা পিছিয়ে যেতে বাধ্য হয়েছে সে। গলার চাপ মুক্ত হওয়ামাত্র তার ছুরি ধরা হাতের কবজি সই করে ভয়ঙ্কর এক জুডো চপ মারল মাসুদ রানা। পড়ে গেল অস্ত্রটা হাত থেকে তার। পিছলে নাগালের বাইরে চলে গেল। পরক্ষণে সোলার প্লেক্সাসে রানার ছোঁড়া সমান ওজনের এক ঘুসি খেয়ে সামনে ঝুঁকে গেল সে। এবার পাশ থেকে তার চোয়াল লক্ষ্য করে প্রচণ্ড ঘুসি মারল রানা। আওয়াজ উঠল 'ঠকাশ'।

ছুটে গিয়ে রেলিঙের ওপর আছড়ে পড়ল লোকটা দড়াম করে। বেদম জোরে ঠুকে গেল মাথা লোহার রেলিঙে। তাজ্জব হয়ে গেল রানা যখন দেখল এত শক্ত

মারেও একটু কাহিল করা যায়নি ব্যাটাকে। মাথা ঝাড়া দিয়ে সটান দাঁড়িয়ে পড়ল লোকটা, দু'হাত বাড়িয়ে খ্যাপা ষাঁড়ের মত ছুটে এল রানার দিকে। লাফ দিয়ে সরে যেতে চাইল রানা সামনে থেকে, কিন্তু পারল না। ভেজা মেঝেতে পা পিছলে গেল, ভারসাম্য ফিরে পাওয়ার আগেই ওর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল লোকটা মত্ত আক্রোশে।

হুড়মুড় করে পড়ে গেল মাসুদ রানা, লোকটা পড়ল ওর ওপর। পরক্ষণে মল্লযুদ্ধ শুরু হয়ে গেল দু'জনের মধ্যে। খ্যাপা, ক্রুদ্ধ জন্তুর মত লড়ছে দু'জনে নীরবে, গড়াগড়ি খাচ্ছে ফ্লোরে, কেউ প্রভাব বিস্তার করতে পারছে না কারও ওপর। গড়াগড়ির বেগ কমে এল এক সময়, লোকটার বুকের ওপর উঠে বসেছে মাসুদ রানা, বসেই আরেক ঘুসি চালাল ও লোকটার নাক-মুখ সই করে। কিন্তু লাগাতে ব্যর্থ হলো, হাত তুলে ঘুসিটাকে বেলাইনে পাঠিয়ে দিয়েছে অঙ্ক বিশারদ।

পরমুহূর্তে থুতনিতে তার বেমক্কা আপার কাট খেয়ে টলে উঠল রানা। ঘিলু নড়ে গেছে। ওই অবস্থাতেই অন্ধের মত অপর হাত চালাল ও, আওয়াজ উঠল 'থ্যাচ' করে। দেখতে দেখতে নাকমুখ রক্তে ভেসে গেল লোকটার। নাক ভেঙে দিয়েছে তার মাসুদ রানা। গুঙিয়ে উঠে এক হাতে নাক চেপে ধরল সে, এবং একই সাথে অন্য হাতে মুগুরের ঘা-র মত কিল এবং ঘুসির মাঝামাঝি জাতের একটা মার মেরে বসল রানার বুকের বাঁ পাঁজরে।

ব্যথায় নীল হয়ে গেল মাসুদ রানা। হাঁ করে দম নেয়ার চেষ্টা করল, কিন্তু কাজ হলো না। ক্ষণিকের জন্যে কর্মক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছে ওর ফুসফুস, কাজ করছে না। সুযোগটা চিনতে ভুল করল না শত্রু। দুই পায়ের পাতায় ভর দিয়ে কোমর ওপরদিকে ছুঁড়ল সে প্রচণ্ড এক ঝাঁকির সাহায্যে, শূন্যে উঠে গেল রানার দুই হাঁটু, লোকটার পেটের সঙ্গে ওর নিতম্বের সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল মুহূর্তের জন্যে।

সাথে সাথে এক হাত ভরে দিল লোকটা ওর ডান উরুর তলা দিয়ে। অন্যহাতে পেঁচিয়ে ধরল ডান চোয়াল-ঘাড়, মুহূর্তে ধরাশায়ী করে ফেলল সে রানাকে। ততক্ষণে কিছুটা সামলে নিয়েছে ও, প্রায় স্বাভাবিক হয়ে এসেছে ফুসফুসের কার্যক্রম। কাত হয়ে পড়েই সবুট লাথি হাঁকল রানা লোকটার হাঁটু লক্ষ্য করে। কেঁউ করে উঠল সে। হাঁটুতে ভর দিয়ে উঠে বসল রানা, ঝাঁপিয়ে পড়তে গেল আবার লোকটার ওপর।

কিন্তু ব্যর্থ হলো। সুস্থ পা-টা তুলে ওর বুকে ঠেকিয়ে দিয়েছে লোকটা, দিয়েই লাথি ছুঁড়ল সে। পিছিয়ে গেল মাসুদ রানা, বিশারদ নিজেও ভেজা, পিচ্ছিল ধাতব ফ্লোরে পিঠ দিয়ে সরসর করে পিছিয়ে গেল কয়েক ফুট, পৌঁছে গেল পড়ে থাকা ছুরিটার তিন ফুটের মধ্যে। ওটা তুলে নিয়েই হাঁচড়ে-পাঁচড়ে উঠে দাঁড়াল শত্রু প্রচণ্ড রাগে কুকুরের মত দাঁত বেরিয়ে পড়েছে তার, ঠোঁট সরে গেছে। হ্যাট পড়ে গেছে মাথা থেকে। রানার মত বৃষ্টির ছাঁট থেকে রেহাই পাওয়ার জন্যে চোখ কুঁচকে তাকিয়ে আছে সে। চোখে খুনীর দৃষ্টি।

গোল হয়ে ঘুরতে শুরু করল ওরা। দু'হাত দু'দিকে ছড়ানো। কয়েক চক্কর ঘুরে চার্জ করল লোকটা, এতই আচমকা এবং দ্রুত যে তার চোখের দিকে তীক্ষ্ণ

নজর রেখেও সময়মত সামাল দিতে পারল না মাসুদ রানা। থুতনিতে মনে হলো গরম শিকের ছ্যাঁকা খেলো ও, চিরে গেছে খানিকটা জায়গা।

এমন সময় লোকটার পিছনে লেসলি ম্যাকঅ্যাডামকে দেখতে পেল মাসুদ রানা। আশ্চর্যরকম নিঃশব্দ পায়ে ছুটে আসছে। হাতে উদ্যত এক আইস অ্যাক্স। দেয়ালের শূন্য অ্যাক্স ক্রেডলটার কথা মনে পড়ল রানার। জিনিসটা তাহলে লেসলি-ই সরিয়ে ছিল! আঁতকে উঠল ও। প্রায় পৌঁছে গেছে লেসলি লোকটার ঘাড়ের ওপর।

'না!' তীক্ষ্ণ কণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠল রানা শেষ মুহূর্তে। লোকটা টের পেলে সর্বনাশ।

আমলই দিল না মেয়েটি, কাঠ চেরাইয়ের ভঙ্গিতে গায়ের জোরে চালাল সে অ্যাক্স। 'ঘ্যাস' করে প্রায় অর্ধেকটা ফলা সেঁধিয়ে গেল লোকটার পিঠে, ঠিক হৃৎপিণ্ড বরাবর। জোর এক ঝাঁকি খেলো লোকটা, থমকে গেল, পরমুহূর্তে তার অপার্থিব চিৎকারে শিউরে উঠল মাসুদ রানা। গায়ের পশম খাড়া হয়ে গেল ওর। হ্যাঁচকা টানে কুঠার ছুটিয়ে নিয়েই আবার বসিয়ে দিল লেসলি। আবার আকাশ ফাটিয়ে চেঁচিয়ে উঠল লোকটা।

হাত থেকে খসে পড়ল তার ছুরি। বিস্ফারিত চোখে মাসুদ রানাকে দেখছে সে। কুঠার টেনে বের করল আবার লেসলি। কাঁপতে কাঁপতে ঘুরে দাঁড়াল লোকটা বহু কষ্টে। তার পিঠে চোখ পড়তে আবার শিউরে উঠল রানা। পুরো হাঁ হয়ে গেছে পিঠ। সাত ইঞ্চি দীর্ঘ ক্ষত দুটো গুণ চিহ্নের মত মাঝখান থেকে ছেদ করেছে পরস্পরকে, স্রোতের মত গলগল করে গড়াচ্ছে রক্ত। মাতালের মত খানিক টলল লোকটা, তারপর সটান আছড়ে পড়ল উপুড় হয়ে। প্রচণ্ড আক্ষেপে জবাই করা খাসির মত হাত-পা ছুঁড়ল সে কিছুক্ষণ। তারপর স্থির হয়ে গেল দেহটা। সেদিকে তাকিয়ে মূর্তির মত দাঁড়িয়ে আছে লেসলি ম্যাকঅ্যাডাম। এখনও মাথার ওপর তুলে রেখেছে সে কুঠার, আড়াআড়ি কোপ মারার ভঙ্গিতে।

দ্রুত চারদিকে চোখ বুলিয়ে নিল মাসুদ রানা। এ মুহূর্তে কেউ এদিকে এলেই বারোটা বেজে যাবে। ছুটে গিয়ে মৃতদেহটা চিৎ করল ও, দুই বগলের নিচে হাত ভরে দিয়ে টেনে হিঁচড়ে রেলিঙের দিকে নিয়ে চলল। জায়গামত এনে দেহটা কাঁধে তোলার চেষ্টা করতে লাগল মরিয়া হয়ে। কিন্তু কাজ হলো না, অসম্ভব ভারি।

'লেসলি, কুইক! এদিকে এসো। সাহায্য করো আমাকে।' মনে হলো শুনতেই পায়নি সে। বেকুবের মত চেয়ে থাকল ফ্যাল ফ্যাল করে। ধমকে উঠল রানা। 'লেসলি! হেলপ মি, ফর গড'স সেক!'

এবার কাজ হলো। দু'বার পলক ফেলল মেয়েটি। তারপর সচকিত হলো আচমকা। কুঠার ফেলে ছুটে এল। রানার ইঙ্গিতে লোকটার দু'পা ধরল ও, তারপর দু'জনে মিলে দেহটা উঁচু করে ধরে দ্রুত পায়ে এগোল রেলিঙের দিকে। কাছে নিয়ে অনেক কসরত করে দেহটা রেলিঙের ওপর তুলল ওরা। শেষবারের মত আরেকবার এদিক-ওদিক দেখল মাসুদ রানা। তারপর ছেড়ে দিল।

আছড়ে পড়ল ওটা পানিতে, অথচ আশ্চর্য, কোন শব্দই হলো না। বাতাসের গোঙানি, ফেরির এঞ্জিনের আওয়াজ আর বৃষ্টির শব্দে চাপা পড়ে গেল ওটার

পতনের আওয়াজ। রেলিঙে হেলান দিয়ে হাঁপাল কিছুক্ষণ দু'জনে। অদৃশ্য হয়ে গেছে দেহটা ততক্ষণে। বৃষ্টির পানিতে ডেকের রক্ত ধুয়ে-মুছে যাচ্ছে। একটু পর কোন চিহ্নই থাকল না আর রক্তের। সব গড়িয়ে নেমে গেছে ড্রেন দিয়ে।

কুঠারটা তুলে নিল মাসুদ রানা, ছুঁড়ে মারল জোরে। বুমেরাঙের মত কাত হয়ে পাক খেতে খেতে অনেক দূর পর্যন্ত গেল ওটা, তারপর ঝপ করে পানিতে পড়ল। ছুরিটাও পড়ল ওর কাছাকাছি। একটু পর রানা-লেসলির ভেজা কাপড়-চোপড়ের ভারি একটা বোঁচকাও গেল ওই পথে।

ছয়

এসে গেছে উডস হোল হোয়ার্ফ। আর দশ-পনেরো মিনিটের মধ্যে ঘাটে ভিড়বে ফেরি। গাড়ির মধ্যে বসে আছে রানা ও লেসলি। দূর থেকে জেটির শেডে অপেক্ষমাণ কয়েকজন পুলিস দেখতে পাচ্ছে ওরা। মনে হলো আইল্যান্ডারের অপেক্ষায় আছে। ওদের জন্যেই অপেক্ষা করছে কি না ব্যাটারা কে জানে?

'কাকে ফেলে দিলেন আপনারা ফেরি থেকে?' কল্পনায় অজ্ঞাত চেহারার পুলিস অফিসারের জেরার মুখোমুখি হলো মাসুদ রানা। 'কেন খুন করলেন তাকে? কে ছিল লোকটা, কি করেছিল?'

ঘুরে সঙ্গিনীর দিকে তাকাল রানা। আশ্চর্যরকম শান্ত দেখাচ্ছে লেসলি ম্যাকঅ্যাডামকে। দেখে কে বলবে মাত্র ঘণ্টাখানেক আগে জলজ্যান্ত এক মানুষ খুন হয়েছে এর-ই হাতে। নিজের মুখের ওপর মাসুদ রানার দৃষ্টি নিবদ্ধ বুঝতে পেরে মুখ ফেরাল সে। 'দু-দু'বার খুন করতে চেয়েছিল ওরা তোমাকে,' রানার অনুচ্চারিত প্রশ্নের উত্তরে মৃদু কণ্ঠে বলল মেয়েটি। 'তোমাকে শেষ করে আমাকেও নিশ্চই ওই পথেই পাঠাত। তাই···সামলাতে পারিনি আমি নিজেকে। আত্মরক্ষার অধিকার একটা পশুরও আছে, রানা।'

'তুমি গিয়েছিলে কোথায়?'

'লুকিয়েছিলাম।'

'খুলে বলো।'

'ফেরির দুলুনির জন্যে হাঁটতে অসুবিধে হচ্ছিল। তাই লেডিসরুম ঘুরে দশ মিনিট পর ফিরে এলাম। এসে দেখি তুমি ঘুমিয়ে পড়েছ। ভাবলাম ওপরে গিয়ে এক কাপ চা খাই। ওপরে উঠে ওকে দেখতে পাই আমি, ও আমাকে দেখার আগেই। বুঝলাম আমরা এই ফেরিতে উঠেছি জেনেই এসেছে সে, শুধু শুধু আসেনি। বসে আছে, হয়তো উপযুক্ত সময়ের অপেক্ষায়।

'ভয় পেয়ে পালিয়ে এলাম। কোথাও লুকোবার জায়গা না পেয়ে ঠিক করলাম তোমার গাড়ির বুটে ঢুকে পড়ি। কিন্তু পরে ভেবে দেখলাম, বদ্ধ জায়গায় বসে থাকলে ও এদিকে আসছে কি না দেখতে পাব না। তাই ওই লরিতে উঠে বসে থাকলাম ফায়ার অ্যাক্স নিয়ে। ওটার ক্যারিয়ারে।'

গাড়িটার দিকে তাকাল মাসুদ রানা। পিছনটা মোটা ত্রিপলের হুড দিয়ে

ঢাকা। পিছনে আসা-যাওয়ার গলির ঠিক মুখোমুখি পার্ক করা আছে ওটা।

'তোমাকে না পেয়ে ও হয়তো আমাকে...'

'পারত না,' রানার মুখের কথা কেড়ে নিল লেসলি। 'প্রথম কারণ, অন্য যাত্রীদের উপস্থিতি। মানুষজনের মধ্যে তোমার কিছু করার মত বোকামি করত না লোকটা। তাছাড়া আমি তৈরি ছিলাম। ওকে নামতে দেখলে আমিও এগোতাম। লরি থেকে কম্প্যানিয়নওয়ে পরিষ্কার দেখা যায়।' ব্যাগ থেকে চিরুনি বের করে আধ শুকনো চুলের জট ছাড়াতে লাগল লেসলি। 'তাছাড়া তুমি তো জানো, তুমি নও, আসলে আমাকেই চায় ওরা। আমাকে মুঠোয় পেলে তোমার কথা ওরা ভুলে যাবে।'

ঘাটের দিকে তাকাল মাসুদ রানা। লেসলির যুক্তি অকাট্য, খণ্ডন করার বা অন্য রকম কিছু ভাবার উপায় নেই এ ক্ষেত্রে।

'আমার ধারণা জেঙ্গারই ওকে আমাদের খোঁজ জানিয়েছে,' মন্তব্য করল মেয়েটি। 'শয়তান বুড়ো!'

'এতে তার লাভ?' সিগারেট ধরাল মাসুদ রানা।

'সেটাই ভাবছি।'

আমিও, মনে মনে বলল ও। যেখানে ড্যানিয়েলসের অন্তিম ইচ্ছে ছিল একরকম, সেখানে তার অংশীদারের এ আচরণ, যদি সত্যিই তাই হয়ে থাকে, ভেবে দেখার মত বিষয় বটে।

আচমকা এক ঝাঁকি খেলো ফেরি, জেটির সাথে বেশ জোর সংঘর্ষ হলো তার। নিজের ইচ্ছেমত ভিড়তে পারেনি, বাতাস আর ঢেউ ঠেলে এনে প্রায় আছড়ে ফেলেছে তাকে। পাঁচ মিনিট পর র‍্যাম্প বেয়ে গড়িয়ে নেমে এল মাসুদ রানার বুইক। ওর কল্পনার সঙ্গে বাস্তব মিলল না, জেরা করার জন্যে এগিয়ে এল না পুলিস। অন্য কোন কাজে এসেছে তারা। হাইওয়েতে উঠে উত্তরে চলল মাসুদ রানা, মেইনল্যাণ্ডে ওঠার ব্রিজের উদ্দেশে।

মাঝখানে দুপুরের খাওয়ার বিরতি ছাড়া একটানা সন্ধে পর্যন্ত গাড়ি চালিয়ে নিউ জার্সি অতিক্রম করে পেনসিলভেনিয়া পৌঁছল ওরা। ব্রানসটেবল-এ যখন পৌঁছল, রাত তখন দশটা। এখানকার আবহাওয়া চমৎকার। প্রাকৃতিক দুর্যোগের চিহ্নমাত্র নেই। রাতের জন্যে একতলা এক মোটেল বেছে নিল মাসুদ রানা। ম্যাজিক ফিঙ্গারস নাম মোটেলের। ঘুমাতে ঘুমাতে রাত বারোটা বেজে গেল।

জানালা গলে চাঁদের স্নিগ্ধ আলো আসছে ওদের রূমে, ঠিক ঘুমন্ত মাসুদ রানার মুখের ওপর পড়েছে তার এক অংশ।

ঘুম ভেঙে গেল ওর হঠাৎ করে। প্রায় অকারণেই। চোখ খুলল না মাসুদ রানা, পড়ে থাকল এক ভাবে। বিছানার নরম গদি দুলে উঠল একবার, দু'বার। তারপর থেমে গেল দোল। চোখের পাতা সিকি ইঞ্চি মেলল ও। ঘরের মধ্যে হাঁটছে কেউ। লেসলি? কিন্তু দেখার উপায় নেই। রানা এ মুহূর্তে মেয়েটির দিকে পিঠ দিয়ে শুয়ে আছে। এখন দিক বদল করা ঠিক হবে না।

তবে ওর মুখোমুখি রয়েছে ড্রেসিং টেবিলটা, তার আয়নায় পরিষ্কার দেখতে পেল সে লেসলিকে। সম্পূর্ণ নগ্ন। বিছানা থেকে নেমে ওটার সামনে গিয়ে

দাঁড়িয়েছে মেয়েটি। মনে হলো কিছু চিন্তা করছে। ঘুরে তাকাল লেসলি। স্বাভাবিকভাবে পাশ ফিরল রানা, মেয়েটির দিকে মুখ করে শুলো। স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকল মেয়েটি, একভাবে তাকিয়ে আছে বিছানার দিকে। বোঝার চেষ্টা করছে ঘুম ভেঙে গেছে কি না রানার।

ঝাড়া এক মিনিট পর নিশ্চিত হলো লেসলি ভাঙেনি। এগিয়ে এসে খাটের পাশে কার্পেটে পড়ে থাকা নিজের পরিধেয় তুলে পরে ফেলল ব্যস্ত হাতে। ক্লজিট খুলে নিঃশব্দে বের করল নিজের কোট। ওটার মধ্যে এক হাত ভরে দিয়ে ড্রেসারের সামনে এসে দাঁড়াল আবার সে। উবু হয়ে কি যেন করছে। টুং-টাং ধাতব আওয়াজ উঠল কয়েনের। খুচরো পয়সা নিচ্ছে। বিছানায় ওঠার আগে পকেটের কয়েন সব বের করে ওখানে রেখেছিল মাসুদ রানা। এক মুঠো কয়েন নিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াল লেসলি, জুতোয় পা গলিয়ে নিঃশব্দ পায়ে এগোল দরজার দিকে।

ডোর নব ধরে শেষবারের মত বিছানার দিকে তাকাল লেসলি, তারপর বেরিয়ে গেল পা টিপে টিপে। দরজা বন্ধ হয়ে যেতে সটান উঠে বসল মাসুদ রানা। এক লাফে নেমে পড়ল খাট থেকে। ঘড়ি দেখল, তিনটে বাজে। শার্ট-প্যান্ট পরল ও দ্রুত হাতে, কোট নেয়ার জন্যে ক্লজিটের দিকে এগোল, এই সময় জানালার বাইরে পায়ের আওয়াজ উঠল। জানালার দিকে এগিয়ে গেল ও এক পা এক পা করে, সাবধানে উঁকি দিল। চোখ পড়ল সরাসরি লেসলির ওপর। জোর পায়ে পিছনের পার্কিং লটের দিকে এগোচ্ছে সে।

ওদিকে কোথায় যাচ্ছে ও? ভাবল মাসুদ রানা। গাড়ির চাবি তো নিয়ে যায়নি! তাকিয়ে থাকল রানা। জোর পায়ে লটের মাঝখানের একটা টেলিফোন বুদের সামনে গিয়ে দাঁড়াল লেসলি। চকিত দৃষ্টিতে এদিক ওদিক দেখে নিয়ে ঢুকে পড়ল ভেতরে। আবার মোটেলের ব্যাক এন্ট্রান্সের দিকে তাকাল সে। তারপর দুটো কয়েন ফোনের পটে ফেলে অপেক্ষা করতে লাগল ডায়াল টোন শোনার আশায়।

কিছু একটা গড়বড় হয়ে গেছে, দূর থেকেও পরিষ্কার বুঝতে পারল মাসুদ রানা। এখনও নাম্বার ঘোরাচ্ছে না মেয়েটি। ক্রেডল ধরে জোরে নিচের দিকে টান দিল সে, বেরিয়ে এল কয়েন দুটো। আবার ওগুলো পটে ফেলে অপেক্ষা করল কয়েক মুহূর্ত। ফোনটা বোধহয় খারাপ, ভাবল রানা, পরক্ষণেই ভাবনাটা সত্যি প্রমাণ হলো। কিছু সময় অপেক্ষা করল লেসলি, দড়াম করে বাঁ হাতে থাবড়া লাগাল সেটের গায়ে।

আবার একই কাজ করল সে। কয়েন বের করে ফের পটে ছাড়ল। অবশেষে হাল ছেড়ে দিল, রিসিভারটা প্রায় আছড়ে ক্রেডলে রাখল। বেরিয়ে এসে বিরক্ত মুখে লটের এ দেয়াল ও দেয়াল দেখল, আর কোন বুদ আছে কি না খুঁজল হয়তো। না, নেই। কয়েক সেকেণ্ড নীরবে দাঁড়িয়ে থাকল লেসলি। চিন্তিত। অবশেষে ধীর পায়ে ফিরে আসতে লাগল সে।

কাপড়-চোপড় খুলে বিছানায় ডাইভ দিল মাসুদ রানা। পুরু পশমী কম্বলটা টেনে আনল গলা পর্যন্ত। ঠিক তখনই আস্তে করে খুলে গেল দরজা। ভেতরে এসে কাপড় ছাড়ল লেসলি। যেটা যেখানে ছিল সেখানে রেখে পা টিপে টিপে

বিছানায় এসে উঠল। আধবোজা চোখে চেয়ে থাকল মাসুদ রানা। চাঁদের আলো সরাসরি পড়েছে মেয়েটির গালে ও বুকের প্রায় পুরোটা জুড়ে। রানাকেও দেখল লেসলি কিছু সময়, তারপর আস্তে করে শুয়ে পড়ার আয়োজন করল।

'ঘুম আসছে না?' চোখ মেলল মাসুদ রানা।

আতঙ্কে তড়াক করে লাফিয়ে উঠল লেসলি, 'ও মাগো!' সাথে সাথেই অবশ্য নিজেকে সামাল নিল। হাসল লজ্জা পেয়ে। 'ওহ্, গড!'

'ভয় পেয়েছো?'

'ভয় মানে?' হাত দিয়ে বুকের ধড়ফড়ানি অনুভব করল লেসলি। 'আধমরা হয়ে গেছি আর বলছ ভয় পেয়েছি কি না!'

'দুঃখিত। কিন্তু ব্যাপারটা কি? ঘুমের মধ্যে হেঁটে বেড়ানোর অভ্যেস আছে নাকি তোমার?'

মনে মনে ওর প্রশ্নটা নাড়াচাড়া করল লেসলি। প্রশ্নটার পিছনে বিশেষ কোন উদ্দেশ্য আছে কি না ভাবল হয়তো। 'না, মানে…ঘুম আসছিল না, তাই…।'

'তাই?' উঠে বসল মাসুদ রানা। বেডসাইড টেবিলের ওপর থেকে হাতড়ে হাতড়ে সিগারেট প্যাকেট আর গ্যাস লাইটার নিল। সামান্য উঠে বালিশে পিঠ রাখল, মাথা খাটের হেডরেস্টে। একটা সিগারেট ধরাল রানা।

খানিক নীরবতা। 'একটু বেরিয়েছিলাম।'

চুপ করে থাকল রানা। আধো অন্ধকারে সিগারেটের আগুন ঘন ঘন বাড়ছে-কমছে।

'ভাবলাম একটু হাঁটাহাঁটি করলে ঘুম আসবে আবার।'

'আচ্ছা!'

'তাছাড়া তেষ্টাও পেয়েছিল খুব।'

মুখ ঘুরিয়ে লেসলির দিকে তাকাল রানা। মুখে বলল না কিছু।

'ড্রেসার থেকে তোমার কিছু খুচরো পয়সা নিয়ে সফট ড্রিঙ্কের আশায় বেরিয়েছিলাম।'

হাসল ও। 'পেলে না তো? সেটাই স্বাভাবিক। আমেরিকান কাস্টমার সার্ভিস কানাডা বা ইংল্যাণ্ডের মত নয়।'

'বুঝলাম না।' কাত হয়ে রানার দিকে ফিরে শুয়ে পড়ল লেসলি। চাঁদের আলোয় তাকে পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে রানা। তার বাহু, কাঁধ, বুক, মসৃণ পেট, সব। এ মুহূর্তের ভঙ্গিমাটা অদ্ভুতরকম মোহনীয় লেসলির। 'কাস্টমার সার্ভিস?'

'মানে এদেশে কোন বুদের সঙ্গে পানীয় বিক্রির কোন আয়োজন রাখে না এরা, তাই বলছিলাম আর কি!'

ধরা পড়ে গেছে বুঝতে পেরে চুপ করে থাকল লেসলি ম্যাকঅ্যাডাম। চেহারা দেখে মনে হলো কষে এক চড় বসিয়ে দিয়েছে রানা ওর গালে। অস্বস্তিকর নীরবতা ঘরের মধ্যে। বেশ সময় লাগল লেসলির স্বাভাবিক হতে। বুক পর্যন্ত কম্বল টেনে আনল সে।

'দেখে ফেলেছ তাহলে।' বিড় বিড় করে বলল লেসলি।

মাথা দোলাল রানা। 'দুঃখিত। অনিচ্ছাসত্ত্বেও।'

চার আঙুলে অন্যমনস্কের মত কপাল ডলল মেয়েটি। 'আমি মনেপ্রাণে চেয়েছি ব্যাপারটা গোপন রাখতে। তারপরও…।'

'কাকে ফোন করতে গিয়েছিলে?'

'লাইন পাইনি। ফোনটা খারাপ।'

'তা দেখেছি। কিন্তু ভাল থাকলে কাকে করতে ফোন?'

'না শুনলেই নয়, রানা?' মৃদু গলায় বলল মেয়েটি।

'তোমার আমার সম্পর্ক বর্তমানে এমন এক পর্যায়ে পৌঁছেছে, যেখানে যে-কোন ধরনের লুকোছাপা উভয়ের জন্যেই ক্ষতিকর হয়ে দেখা দিতে পারে। অন্তত তোমার জন্যে।'

'ঠিক বলেছ,' খানিক ইতস্তত করে বলল সে। 'আমি সেভাবে চিন্তা করিনি। ফোনটা করতে চেয়েছিলাম আমার প্রেমিককে।'

সিগারেটটা অ্যাশট্রেতে টিপে মারল মাসুদ রানা। 'কে সে?'

'আমার শিক্ষক। হ্যারি স্টুয়ার্ট।'

'আই সী।'

'তোমাকে যত দেখি, ততই স্টুয়ার্টের কথা মনে পড়ে। এদেশে আসার পর একদিনও যোগাযোগ করতে পারিনি ওর সঙ্গে। বেচারী নিশ্চই খুব টেনশনে আছে। তাই আজ চেয়েছিলাম কথা বলতে। কিন্তু হলো না।'

'বুঝলাম। কিন্তু সে কাজ এত গোপনে কেন করতে হবে?'

'আমি চাইনি বিষয়টা কেউ জানুক। গোপন ছিল, আজ ধরা না পড়লে গোপন-ই রাখতাম শেষ পর্যন্ত।'

'স্টুয়ার্ট জানে তোমার আসল পরিচয়?'

'না-না! পাগল নাকি? কিছুই জানে না। সময় হলে ভবিষ্যতে কোনদিন জানাব হয়তো।'

'অল রাইট। শুয়ে পড়ো। ভোর হতে বাকি নেই তেমন।'

চট করে এগিয়ে এল লেসলি। নিজের বুকে ওর নরম বুকের ছোঁয়া পেল মাসুদ রানা। 'শুধু শুধু শুয়ে থেকে লাভ কি? ঘুম আসছে না যে!' চুমু খেলো লেসলি ওর গালে। এক হাতে জড়িয়ে ধরল কোমর। 'আমার কথা বিশ্বাস হয় তোমার?'

'হবে না কেন?'

'আমি মিথ্যেও তো বলে থাকতে পারি তোমাকে ধোঁকা দেয়ার জন্যে।'

হাসল মাসুদ রানা। 'সত্য-মিথ্যে ধরার অদ্ভুত এক ক্ষমতা আছে আমার। আমি জানি, মিথ্যে বলোনি তুমি।'

পড়ন্ত চাঁদের হলদেটে আলোয় রানাকে খুব কাছ থেকে দেখল লেসলি কয়েক মুহূর্ত। তারপর আরও ঘনিষ্ঠ হয়ে এল। চোখ বুজে ব্যস্ত হয়ে খুঁজছে ওর ঠোঁট।

সকাল আটটায় ম্যাজিক ফিঙ্গার থেকে চেক আউট করল ওরা। এক রেস্টুরেন্টে নাস্তা করল। তারপর চলল জোনাথন গ্রোভারের খোঁজে। ব্রানসটেবল-এর উত্তর

প্রান্তে থাকে সে। একটা মাইনিং এরিয়া ও এক কয়লা প্রসেসিং প্ল্যান্ট পার হয়ে নির্দিষ্ট স্থানে পৌঁছল মাসুদ রানা।

বাড়িটা খুঁজে বের করতে বিন্দুমাত্র বেগ পেতে হলো না ওদের। ধপধপে সাদা রং করা বড়সড় বাংলো টাইপের একটা বিল্ডিং। অ্যাসবেস্টস সিমেন্টের চৌ-চালা ছাদ। তার চারদিকে ন্যাড়া মাথার প্রচুর বড় বড় গাছ। সামনের লনে সুন্দর এক ফুলের বাগান। ছবির মত সুন্দর বাড়িটা। গেটে ঝোলানো মেইল বক্সে গৃহকর্তার নাম লেখা জে. গ্রোভার।

গেটের সামনে কার্ব ঘেঁষে গাড়ি দাঁড় করাল মাসুদ রানা। বাংলোর সামনে, ভেতরের ড্রাইভওয়েতে দাঁড়িয়ে আছে আরেকটা গাড়ি। একটা ডার্ক-ব্লু পন্টিয়াক। ওটার সামনে ছোটখাট একটা লোমশ কুকুরের সাথে খেলায় ব্যস্ত দশ-এগারো বছরের একটি মেয়ে। ইউরোপীয় ধাঁচের চেহারা তার। মেয়েটির ওপর থেকে আবার গাড়ির ওপর ফিরে গেল মাসুদ রানার নজর। স্টার্ট বন্ধ করল ও। 'তুমি আসছ?' জানতে চাইল রানা।

'যদি তুমি বলো,' জবাব দিল লেসলি। 'তবে না যাওয়াই বোধহয় ভাল হবে আমার।'

'কেন ভাবছ এরকম?'

'লোকটা আর্থার স্যান্ডলারের সহযোগী, কথাটা ভাবলেই কেমন গা ছম ছম করে আমার। তার মুখোমুখি হওয়া, মানে, মনের সাড়া পাচ্ছি না। তুমি জানো কত কিছুর মধ্যে দিয়ে এ পর্যন্ত পৌঁছতে পেরেছি আমরা।'

'ঠিক আছে,' দরজা খুলে ফেলল রানা। 'থাকো তুমি।'

চট করে ওর কাঁধে হাত রাখল লেসলি। 'অবশ্য তুমি বললে আমি আসব।'

'প্রয়োজন নেই,' ওর হাতে মৃদু চাপড় লাগাল রানা। 'আমি একাই যাচ্ছি।'

'থ্যাঙ্কস।'

বেরিয়ে এল রানা। সোজা হয়ে দাঁড়াতেই এক লোকের ওপর চোখ পড়ল। বেরিয়ে আসছে লোকটা বাংলো থেকে। দীর্ঘদেহী, হালকা-পাতলা। পরনে দামী সুট, ওভারকোট। বেশ হ্যান্ডসাম চেহারা। চটপটে। হাতে একটা ব্রিফকেস। বয়স ষাট থেকে সত্তর বা পঁচাত্তরও হতে পারে। তবে চেহারা দেখে অনুমান করা খুবই শক্ত। সিঁড়ির ধাপ টপকে দৃঢ় পায়ে পন্টিয়াকে এসে উঠল লোকটা, স্টার্ট দিল।

বিস্মিত চোখে তার দিকে চেয়ে থাকল মাসুদ রানা। লোকটাকে আগে কোথাও দেখেছে ও, কিন্তু মনে করতে পারছে না এ মুহূর্তে। নাকের সামনে দিয়ে 'হুশ!' করে বেরিয়ে এল পন্টিয়াক, মুখ ঘুরিয়ে ওরা যেদিক থেকে এসেছে, সেদিকে ছুটল দ্রুতবেগে। এদিকে একবারও তাকায়নি লোকটা। এক মুহূর্ত দ্বিধা-দ্বন্দ্বে দুলল মাসুদ রানা, তারপর পা বাড়াল বাংলোর গেটের দিকে।

গেটের কাছে পৌঁছল ও, এবং সাথে সাথে বিদ্যুৎ চমকের মত চিনে ফেলল পন্টিয়াক এবং তার মালিককে। নিউ ইয়র্কের এইটথ অ্যাভিনিউর বহুতল এক কার পার্কে প্রথমবার দেখেছিল রানা ওই গাড়ি আর লোকটাকে। এই গাড়ির ট্রাঙ্কে লুকিয়ে সাশাদকে ফাঁকি দিয়েছিল সেদিন লেসলি ম্যাকঅ্যাডাম। কিন্তু ঘুরে

তাকাবার মত বোকামি করল না রানা। জানে এ মুহূর্তে ওর দিকে তাকিয়ে আছে মেয়েটি।

এই লোক-ই গ্রোভার কি না ভাবল মাসুদ রানা। ছেদ পড়ল ওর ভাবনায়, ছুটে এল মেয়েটি খেলা ফেলে। 'আপনি কি আমার বাবাকে খুঁজছেন, মিস্টার?'

হাসল মাসুদ রানা। 'জোনাথন গ্রোভারকে খুঁজছি।'

'আসুন আমার সাথে। বাবা ভেতরে আছেন।'

'এইমাত্র যে ভদ্রলোক বেরিয়ে গেলেন, উনি কে?'

'মিস্টার হ্যামন্ড। বাবার বন্ধু। আসুন।'

ভেতরের রাজকীয় লিভিংরুমে নিয়ে এল ওকে মেয়েটি। তারপর একছুটে অদৃশ্য হয়ে গেল অন্দরমহলে। পিছন পিছন কুকুরটাও ছুটল। মিনিট পার হওয়ার আগেই রুমে এসে ঢুকল গৃহকর্তা।

'ইয়েস, স্যার?' ভারি কণ্ঠস্বর লোকটার। উচ্চতায় প্রায় রানারই সমান। তার চাউনি স্থির, শীতল। বয়স প্রায় সত্তর হবে। বেশ মোটা। গলা নেই। কাঁধের ওপর জেঁকে বসে আছে বড়সড় মাথাটা তবে চটপটে।

'আপনি জোনাথন গ্রোভার?' বলল মাসুদ রানা। আগ্রহের সাথে লক্ষ করছে ও এককালের বিখ্যাত জালিয়াত ভিনসেন্ট ডি সেপিটো ওরফে ভিন্নি দ্যা প্যারট ওরফে জোনাথন গ্রোভারকে।

'ঠিক,' মাথা দোলাল লোকটা। 'আপনার পরিচয় জানতে পারি?' অ্যাপ্রন পরা এক মহিলা এসে দাঁড়াল তার পাশে। এলিন গ্রোভার, অনুমান করল মাসুদ রানা, লোকটার স্ত্রী।

'আমার নাম মাসুদ রানা। নিউ ইয়র্ক থেকে এসেছি।'

চাউনি সতর্ক হয়ে উঠল গ্রোভারের। 'কারণ?'

'ভিনসেন্ট ডি সেপিটোর সঙ্গে আলোচনা করতে চাই আমি। বিষয়টা জরুরী।'

মুহূর্তের জন্যে থতমত খেয়ে গেল মানুষটা, চকিতে স্ত্রীর দিকে তাকাল একবার। 'কি নাম বললেন?' কঠোর হয়ে উঠল তার ভারি কণ্ঠ।

নির্বিকার মুখে বলল রানা, 'ওরফে ভিন্নি দ্যা প্যারট ওরফে জোনাথন গ্রোভার।'

দুই কোমরে হাত রাখল লোকটা। মারমুখি হয়ে উঠেছে চেহারা। 'জনাবের পরিচয় জানতে পারি?'

বলল মাসুদ রানা।

'কে দিল আপনাকে আমার ঠিকানা?'

'অ্যাডলফ জেঙ্গার।'

চেহারার টান টান ভাব খানিকটা শিথিল হলো গ্রোভারের। 'জেঙ্গার?'

'হ্যাঁ।'

'কি নিয়ে আলোচনা করতে চান?'

'আর্থার স্যান্ডলার।'

নিচের ঠোঁট কামড়ে ধরে কি যেন ভাবল গ্রোভার। আবছা ইঙ্গিতে স্ত্রীকে

'নিজের কাজে যাও' ধরনের ইঙ্গিত করে রানাকে বলল সে, 'ঠিক আছে। বসুন।'

টেনশনমুক্ত হলো রানা। ভাব দেখে মনে হচ্ছিল এ হয়তো স্রেফ হাঁকিয়ে দেবে ওকে। 'ধন্যবাদ।'

'কফি?' বলল গ্রোভার।

মাথা ঝাঁকাল মাসুদ রানা, 'হ্যাঁ।'

'জেঙ্গারকে টেলিফোন করলে আপনি কিছু মনে করবেন?'

'অফকোর্স নট। গো অ্যাহেড।'

লিভিংরুম সংলগ্ন কিচেনে গিয়ে ঢুকল জোনাথন গ্রোভার। ও রুমের একাংশ এখান থেকে দেখতে পাচ্ছে মাসুদ রানা। ডাইনিং টেবিলটা বিরাট, আট আসনের। ভেবে পেল না ও তিনজনের এক পরিবারের এত বড় ডাইনিং টেবিলের কি প্রয়োজন। পাঁচ মিনিট পর ফিরে এল গ্রোভার, চেহারা আগের চেয়ে প্রসন্ন অনেকটা। হাতে ধরা এক ট্রেতে কফি ও দারুচিনি কেক।

'প্লীজ!' ইশারায় হাতের কাজ শুরু করার অনুরোধ জানাল লোকটা রানাকে। দু'বাহু বুকের ওপর ভাঁজ করে হেলান দিয়ে বসল ওর মুখোমুখি। রানাকে কাপের দিকে হাত বাড়াতে দেখে বাধা দিল গ্রোভার। 'কেকের স্বাদ একটু চেখে দেখুন, মিস্টার রানা। আমার স্ত্রীর তৈরি। চমৎকার স্বাদ।'

মৃদু আপত্তি জানাল ও।

'না না, আমি ইনসিস্ট করছি। অন্তত একটু খেয়ে দেখুন।'

বাধ্য হয়ে সামান্য কেক মুখে দিল মাসুদ রানা। সত্যিই চমৎকার স্বাদ। অপূর্ব!

'কেমন, বাড়িয়ে বলেছি?' ভুরু নাচাল গ্রোভার।

'না। সত্যিই দারুণ স্বাদ।' কফিতে চুমুক দিল মাসুদ রানা।

'হতেই হবে। আমরা, ইটালিয়ানরা পৃথিবীর সেরা রাঁধুনী, বেকার্স। অথচ ফরাসীরা এ কাজে নিজেদের সেরা বলে গর্ব করে।' ঠোঁট বাঁকাল লোকটা। 'আসলে পেস্ট্রি সম্পর্কে স্বচ্ছ কোন ধারণাই নেই ওদের। নামকরা একজন মাত্র ফরাসী বেকারের নাম বলুন, সঙ্গে সঙ্গে আমি দশজন ইটালিয়ান বেকারের নাম বলব।'

কিছু সময় নীরব থাকল দু'জনেই। 'কথা হলো জেঙ্গারের সাথে?' প্রশ্ন করল রানা।

'না। বাসায় নেই সে, বাইরে কোথাও গেছে। তবে মিসেস ক্ল্যানসির সাথে কথা বলেছি। জেঙ্গারের হাউসকীপার। আপনাকে আইডেন্টিফাই করেছে মহিলা। ক'দিন আগে নানটুকেট গিয়েছিলেন আপনি, বলেছে সে। ওতেই আমি সন্তুষ্ট।'

'পরশু রাতেও গিয়েছিলাম আমি। সে সময় মহিলা ছিলেন না।'

'আই সী।' একটু ভাবল জোনাথন গ্রোভার। 'জেঙ্গারের সঙ্গে আপনার সম্পর্ক হলো কি করে? কতদিনের পরিচয়?'

সংক্ষেপে বলল মাসুদ রানা।

অন্যমনস্কের মত মাথা দোলাল লোকটা। 'আমার সম্পর্কে সে নিজেই যেচে জানিয়েছে আপনাকে?'

'না। আমি অন্য সূত্রে জেনে তাকে জিজ্ঞেস করেছি।'

চর্বি মোড়া থুতনি ডলল খানিক গৃহকর্তা। অপলক চোখে মাপছে মাসুদ রানাকে। 'ঠিক আছে। বলুন শুনি, কি জানতে চান? যদিও খুবই বিস্মিত হয়েছি আমি যে আমার অতীত নিয়ে আজও পর্যন্ত ঘাঁটাঘাঁটি হচ্ছে আমার অজান্তে।'

'হচ্ছে না, যা হওয়ার হয়ে গেছে,' বলল মাসুদ রানা। 'এবং বিষয়টা আমার আর অ্যাডলফ জেঙ্গারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ আছে। আর কেউ জানে না।'

কাঁধ ঝাঁকাল গ্রোভার, 'জানে জানুক সবাই, তাতে কিছু আসবে-যাবে না আমার। আমি ভাবছি, কেন? কেন দুই যুগেরও বেশি সময় পরে আমার-আর্থারের সম্পর্কে জানার প্রয়োজন পড়ল কারও?'

'আর্থারের অতীত ঘাঁটতে গিয়ে পুরনো পত্রিকায় আপনার নামও চোখে পড়েছে আমার। অলমোস্ট সাইড বাই সাইড। এবং একই অ্যাটর্নির ক্লায়েন্ট ছিলেন আপনারা দু'জন।'

'বেশ। ও নিয়ে আর ব্যাখ্যার প্রয়োজন নেই। প্রশ্ন করুন। হাতে বেশি সময় নেই আমার। কাজে বেরুতে হবে।'

'নিজের ক্ষেত্রে খুব বিখ্যাত ছিলেন আপনি,' মন্তব্যের সুরে বলল ও।

ভুরু কোঁচকাল গ্রোভার। 'বিখ্যাত?'

'একজন ফরজার হিসেবে।'

কয়েক মুহূর্ত নির্বিকার থাকল গ্রোভার। তারপর হাসল, গর্বের হাসি। 'তার চাইতেও অনেক বেশি কিছু ছিলাম। অনেক বেশি। শুনতে চান?'

নীরবে মাথা দোলাল ও।

সোফার হাতলে দ্রুত লয়ে তবলা বাজাল গৃহকর্তা। হাসছে মিটিমিটি। হারানো অতীতে ফিরে গেছে। 'যে কোন লোকের সই একবার দেখলেই হলো, নিখুঁত নকল করে ফেলতে পারতাম আমি। জাল সই করা চেক নিয়ে ব্যাংকে গিয়ে জমা দিয়ে বলতাম, "সইটা দয়া করে চেক করে দেখবেন। ওটা যে দিয়েছে তাকে ব্যক্তিগতভাবে চিনি না আমি। নকল-টকল হয়েও থাকতে পারে"।'

'তারপর?'

'টেলার উঠে গিয়ে নিজেদের রেকর্ডের সঙ্গে মিলিয়ে দেখত সে সই। ফিরে এসে জানাত, "ঠিকই আছে। সই আসল"।'

'সব সময়?'

'কখনও ধরা পড়িনি। অন্তত তাৎক্ষণিকভাবে। আমার লাইন অভ ওয়ার্ক কোন চোখে দেখবেন আপনি সে আপনার ব্যাপার। কিন্তু আমি তা নিয়ে এখনও গর্ব করি। নিজেকে ক্ষণজন্মা প্রতিভা ভেবে তৃপ্তি পাই আমি।'

'যখন আইনগত সমস্যা দেখা দিত?' সিগারেট ধরাল মাসুদ রানা গ্রোভারকেও অফার করল।

'ড্যানিয়েলসের সাহায্য নিতাম, জানেন-ই তো। প্রথমবার তিনটে মামলা থেকে ভদ্রলোক বাঁচিয়ে দেন আমাকে। তারপর যুদ্ধ বেধে গেল। ইউরোপের যুদ্ধে যোগ দিলাম আমি। বিভিন্ন জায়গায়...'

' "ট্র্যাশ কালেকশন" কি মীন করে?'

খানিক নীরবতা। 'আমার এক কাজিন ছিল, আবর্জনা সংগ্রহ করত। এ ছা

আর কিছু জানি না ওই ব্যাপারে।'

'কিন্তু জেঙ্গার মনে হয় এ বিষয়ে অন্য কিছু বলেছেন,' তীক্ষ্ণ চোখে লোকটাকে পর্যবেক্ষণ করল মাসুদ রানা। 'মিলছে না।'

'জেঙ্গার কি বলেছে না বলেছে আমি জানি না,' শান্ত গলায় বলল সে। 'তার কথায় খুব একটা আস্থা রাখাও ঠিক হবে না আপনার। লোকটা মিথ্যেবাদী। সব উকিল-ই তাই। একই বিষয়ে এখন এক রকম একটু পরই অন্যরকম বলে অভ্যস্ত ওরা।'

একটু ভাবল মাসুদ রানা। 'আর্থার স্যান্ডলার সম্পর্কে কি জানেন?'

'অনেক আগেই মারা গেছে সে। ১৯৬৪ সালে।'

'যদি বলি সে মরেনি, খুব অবাক হবেন আপনি?' আগের মতই পর্যবেক্ষণ করছে ও লোকটিকে। মনে হলো এ প্রশ্নে বেশ বিস্মিত হয়েছে সে। এবং সেটা অকৃত্রিম। ভণিতা নয়।

'অবশ্যই হব,' জোর দিয়ে বলল গ্রোভার। 'আমি নিজের চোখে তার মৃতদেহ দেখেছি। বহুদিনের ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলাম আমরা পরস্পরের, আপনি সেটাও জানেন নিশ্চই। আমার চোখ আরেকজনকে আর্থার বলে সনাক্ত করেছে এমনটা মনে করার কোন কারণই নেই।'

'যদি আমি বলি,' মৃদু গলায়, আলাপের সুরে বলল ও, 'আপনি জেনেশুনেও সত্য গোপন করছেন আমার কাছে? মিথ্যে বলছেন, কি করবেন?'

দৃষ্টি কড়া হয়ে উঠল গৃহকর্তার। 'প্রথমে আপনার ঘাড়ে হাত দেব, তারপর ঠেলে বের করে দেব আমার বাসা থেকে।' নীরবতা। মাথা দোলাল সে, মৃদু হাসল। 'যদি বলেন, তবেই। তার আগে নয়। লুক, ম্যান, আমি যা দেখেছি তাই বলছি। কোন ভয়ে এত বছর পর আর্থার সম্পর্কে মিথ্যে বলতে যাব আমি? আইনের? ও ভয় আমার নেই। মার্কিন সরকার সব ধরনের অভিযোগ থেকে চিরদিনের জন্যে রেহাই দিয়েছে আমাকে। কোন নতুন প্যাঁচে পড়ার আশঙ্কা নেই আমার। আমি সত্যি কথাই বলছি।' ঘড়ি দেখল সে। উঠি উঠি ভাব করছে।

'কয়টি দেশের হয়ে কাজ করত আর্থার স্যান্ডলার?'

'হোয়াট!' তাজ্জব হয়ে গেল যেন জোনাথন গ্রোভার। অস্থির দৃষ্টিতে রানার পা থেকে মাথা পর্যন্ত দেখল দু'বার। 'কি বললেন?'

'অথবা আপনি?'

রেগে উঠতে গিয়েও নিজেকে সামলে নিল লোকটা। 'আমার একটা প্রশ্নের উত্তর দিন তো! আসলে কেন এসেছেন আপনি? কি চান আমার কাছে?'

'আমার এক ক্লায়েন্টের স্বার্থ…'

'কে আপনার সেই ক্লায়েন্ট?'

'আর্থার স্যান্ডলারের মেয়ে।' রানা নির্বিকার।

'কি!' এমনভাবে তাকাল সে যেন এখনই কোটর ছেড়ে বেরিয়ে আসবে দু'চোখ। 'কে? আর্থার…' আচমকা হা হা করে হেসে উঠল লোকটা।

গম্ভীর হয়ে গেল মাসুদ রানা। 'হাসির কিছু বলেছি কি?'

দেহ সোজা করে নড়েচড়ে বসল গ্রোভার। হাসির ঠেলায় গড়িয়ে নেমে

গিয়েছিল। ঘন ঘন মাথা দোলাল, 'নিশ্চই বলেছেন! একশোবার বলেছেন! আর্থারের মেয়ে, অ্যাঁ?'

'ঠিকই শুনেছেন আপনি,' আগের মতই গম্ভীর ও।

'কোন মেয়ে নেই আর্থারের, মিস্টার। ছেলেও নেই। থাকার প্রশ্নই আসে না, সে বিয়ে-ই করেনি।' আবার হেসে উঠল লোকটা, তবে নিঃশব্দে।

'মেয়েটি এই মুহূর্তে আপনার বাংলোর সামনে বসে আছে, আমার গাড়িতে।'

পলকে হাসি উবে গেল গ্রোভারের। 'অসম্ভব!'

হাত ইশারায় রাস্তার দিককার একটা জানালা দেখাল রানা, 'বি মাই গেস্ট।'

ওর ওপর চোখ রেখে তড়াক করে আসন ছাড়ল লোকটা। জানালায় নয়, দ্রুত পায়ে সামনের খোলা দরজায় গিয়ে দাঁড়াল। রানাও এল তার পিছন পিছন। গাড়ির দিকে তাকিয়ে আছে গ্রোভার, আর ও চেয়ে রয়েছে গ্রোভারের মুখের দিকে। প্রথম দুই-তিন মুহূর্ত কিছুই বোঝা গেল না, লেসলিকে শুধুই দেখছে লোকটা, চেহারা নির্বিকার।

হঠাৎ করেই পরিবর্তনটা দেখতে পেল মাসুদ রানা। দু'চোখ ঈষৎ বিস্ফারিত হলো তার, নিচের ঠোঁট ঝুলে পড়ল সামান্য। মাত্র এক সেকেন্ড, তারপরই সামলে নিল ইটালিয়ান, আগের মুখোশের মধ্যে নিজেকে গুটিয়ে ফেলল। তবুও কঠিন এক সত্য অপ্রত্যাশিত আবিষ্কারের মত বিমূঢ় একটা ভাবের আভাস ও মুখে শেষ পর্যন্ত যেন রয়েই গেল মনে হলো রানার।

আগের জায়গায় ফিরে এল দু'জনে। 'মেয়েটাকে পেলেন কোথায় আপনি?' থমথমে গলা গ্রোভারের।

'আগে বলুন কি বুঝলেন?' সন্ধানী দৃষ্টিতে তাকে দেখছে এখনও রানা।

'বুঝলাম মিথ্যে কতবড় মিথ্যে হতে পারে। ও ভুয়া। জাল।' লম্বা করে দম নিল জোনাথন গ্রোভার, হাঁটুর ওপর দুই কনুইয়ের ভর রেখে ঝুঁকে এল সামনে। 'আপনাকে একটা পরামর্শ দিতে চাই।'

'নিজের ভালর জন্যে, নাকি আমার?'

অধীর কণ্ঠে বলল সে, 'শুনতে চান কি চান না?'

'দুঃখিত। বলুন।'

'স্যান্ডলারের একটা মেয়ে ছিল, সত্যি। কিন্তু সে ওই মেয়েটি নয়,' চোখ ইশারায় রাস্তা বোঝাতে চাইল গ্রোভার। 'লন্ডনে আছে তার মেয়ে। মৃত। শুয়ে আছে আর্ল'স কোর্টের এক কবরে। খুব শিগ্গিরই আপনারও মৃত্যু ঘটবে যদি এখনই আপনি সতর্ক না হন।'

ভাল করে আরেকবার জোনাথন গ্রোভারকে দেখল মাসুদ রানা। ভেতরে ভেতরে লোকটা ঘামছে মনে হলো ওর। চোখের সামনে ক'দিন আগের বৃষ্টিস্নাত আর্ল'স কোর্ট, সেন্ট মাইকেল দ্যা রেডীমার-এর চ্যাপেল, সেখানকার লেসলি ম্যাকঅ্যাডাম নামাঙ্কিত সেই কবর এবং পিটার হোয়াইটসাইডের চেহারা ভেসে উঠল। সেই সঙ্গে গাড়িতে বসা লেসলির গলার দাগটার কথাও মনে পড়ল।

'স্রেফ খুন হয়ে যাবেন আপনি!' ঝাঁঝিয়ে উঠল লোকটা।

'কার হাতে?'

'ওই মেয়ের হাতে,' আবার রাস্তা দেখাল গ্রোভার।

'গত কয়েকদিনে ও বলতে গেলে দু'বার প্রাণ বাঁচিয়েছে আমার।' নির্বিকার কণ্ঠে বলল মাসুদ রানা।

'হয়তো। কিন্তু সে আপনার বিশ্বাস অর্জনের জন্যে করেছে, আপনার আরও ঘনিষ্ঠ হওয়ার জন্যে করেছে। সঠিক সময়ের প্রতীক্ষায় আছে ও মেয়ে।'

'কিসের?'

'খুব গুরুত্বপূর্ণ কোন ইনফর্মেশন, অথবা এমন কোন তথ্য প্রমাণ, যার অপেক্ষায় আছে সে, যা তার জানা অপরিহার্য। ওগুলো পেলেই ও শেষ করে দেবে আপনাকে, কারণ পথ চলার মত পর্যাপ্ত আলোর দেখা পেলে কাউকে প্রয়োজন হবে না মেয়েটির। সে একাই তখন চলতে পারবে বাকি পথ। আপনাকে মরতে হবে এই কারণে যে ততক্ষণে আপনি আরও কিছু গোপন তথ্য জেনে যাবেন সংশ্লিষ্ট বিষয়ে।'

সোফার হাতলে সশব্দে চাপড় লাগাল জোনাথন গ্রোভার। আচমকা ছেদ টানল আলোচনায়। 'ও কে, মিস্টার মাসুদ রানা। আপনার সঙ্গে খানিক অতীত ঘাঁটাঘাঁটি করে ভালই কাটল সময়। এবার বেরুতে হবে আমাকে, স্যার। আর সময় দিতে পারছি না, দুঃখিত।'

'আর একটা...'

'প্লী-জ!' দ্রুত বাধা দিল গ্রোভার। হাত তুলে মাথা নাড়ল। 'আর একটা শব্দও নয়। আমি যা যা জানি, কিছুই বাদ রাখিনি বলতে।' হাতের তালু চিত করে দরজা দেখাল সে। 'প্লী-ই-জ!' চেহারাতেই বুঝিয়ে দিল লোকটা কথা আর বাড়ালে ভাল হবে না।

'অল রাইট, মিস্টার গ্রোভার,' আসন ছাড়ল মাসুদ রানা। 'থ্যাঙ্কস এনিওয়ে।' দরজার কাছে গিয়ে থমকে দাঁড়াল ও, ঘুরে তাকাল। 'বাই দ্যা বাই, "রিক্রুটিং সার্জেন্ট" কথাটার অর্থ...'

'আউট!' চাপা হুঙ্কার ছাড়ল লোকটা। রাগে টকটকে লাল হয়ে উঠেছে দু'চোখ। 'গেট আউট!'

ঘুরে পা বাড়াল মাসুদ রানা। কেমন এক খটকা লাগল যেন শেষ মুহূর্তে, কিন্তু কি নিয়ে, বুঝতে পারছে না। কি হতে পারে সেটা? গ্রোভারের কোন আচরণ? না কথা? ব্যাপারটা নিয়ে মাথা ঘামাতে ঘামাতে অর্ধেক লন পেরিয়ে এল ও। এই সময় রানার সামনে এসে দাঁড়াল সেই মেয়েটি। হাসছে দাঁত বের করে। এতক্ষণ গাড়িতে বসা লেডির সঙ্গে গল্প করছিল সে। লেডির কথা শুনতে দারুণ লেগেছে তার, জানাল সে রানাকে।

একদম রানীর মত ইংরেজি বলে লেডি। ইংল্যাণ্ডের রানীর মত। ওরকম ইংরেজি খুব পছন্দ তার। কিন্তু আফসোস, ও ভাবে বলতে পারে না সে। ওর ইংরেজি সব নাক দিয়ে হড়হড় করে বেরিয়ে আসে। তবে তার বাবা পারে, জোনাথন গ্রোভার পারে। একদম ওই লেডির মত ইংরেজি বলে তার বাবা।

'কি বললে?' থমকে গেল মাসুদ রানা।

'মানে আমার...'

'সুজান!'

ঘুরে তাকাল রানা। সামনের বারান্দায় চোখমুখ কুঁচকে দাঁড়িয়ে আছে গ্রোভার। মেয়ের দিকে তাকিয়ে আছে। পরক্ষণেই আবার হাঁক ছাড়ল, 'সুজান! চলে এসো!'

সন্ত্রস্ত খরগোশের মত দৌড়ে ঘরে ঢুকে গেল সুজান। ভয় পেয়ে গেছে বাপের রুদ্র মূর্তি দেখে। এদিকে মাসুদ রানার খটকাটা দূর হয়ে গেছে। সারাক্ষণ ইটালিয়ান অ্যাকসেন্টে হলেও, একেবারে শেষ মুহূর্তে রাগের ঠেলায় গ্রোভারের মুখ দিয়ে ব্রিটিশ অ্যাকসেন্টের ইংরেজি বেরিয়ে এসেছিল।

'বেরিয়ে যান আমার সীমানা থেকে!' রানার উদ্দেশে হুঙ্কার ছাড়ল লোকটা। 'যদি আর কখনও আমার এখানে আসার স্পর্ধা দেখান, তাহলে আমি···তাহলে আমি···!' তোতলাতে শুরু করল গ্রোভার।

ঘুরে গাড়ির দিকে হাঁটতে লাগল মাসুদ রানা। গাড়িতে উঠে আবার তাকাল বাড়িটার দিকে। এখনও আগুন ঝরা চোখে দেখছে ওদের লোকটা। ইগনিশনে চাবি ঢোকাল মাসুদ রানা।

'বিদায় পর্বটা খুব একটা বন্ধুত্বপূর্ণ ছিল না মনে হয়, রানা?' হাসল লেসলি।

'ঠিক বলেছ,' রানাও হাসল। 'ব্যাটা কঠিন মাল। মুখ খুললই না।'

সাত

সন্ধে সাড়ে ছ'টায় অফিসে ফেরার সুযোগ পেল ইউনুস। শওকতের নির্দেশে স্টেট ডিটেকটিভ ব্যুরো আর এন.ওয়াই.পি.ডি-র কম্পিউটরের সামনে বসে বসে হাই তুলেছে সে আজ প্রায় সারাদিন। অবশেষে খোঁজ মিলেছে। মনটা তাই খুশি।

গাড়ি থেকে বেরিয়ে গুনগুন করে গান ধরল ইউনুস। হাতে বাদামী রঙের পুরু কাগজের একটা খাম। হাঁটার সাথে তাল মিলিয়ে উরুতে তাল ঠুকছে সে ওটা দিয়ে। ভেতরে ঢুকে সামনেই জসিমকে দেখতে পেয়ে টুথপেস্টের সংক্ষিপ্ত বিজ্ঞাপন প্রদর্শন করল ইউনুস। জসিম তার সমসাময়িক রিক্রুট, এক্সপার্ট ফটোগ্রাফার।

খামটা তুলে শাখা প্রধানের রুম ইঙ্গিত করল ইউনুস। 'কাপালিক বাবাজি আন্দার হ্যায় বাহার?'

হেসে উঠল জসিম। শওকত নিজের দাড়ি গোঁফের খুব একটা যত্ন নেয় না, ছাঁটে না নিয়মিত। তাই আড়ালে তাকে এই নামে ডাকে ইউনুস। 'আছেন,' বলল সে, 'তোমার অপেক্ষা করছেন অস্থির হয়ে। তা খবর কি? কাজ হলো কিছু, না মাঠে মারা গেল আমার এতদিনের পরিশ্রম?'

'হবে না মানে?' চোখ পাকাল ইউনুস। 'অপেক্ষা করো। একটু পরেই জানতে পারবে।'

নক করে শওকতের রুমে ঢুকে পড়ল সে। চিন্তিত মুখে বসে আছে শওকত। চুল এলোমেলো। চোখ লাল, চেহারা ফ্যাকাসে। ঘুমে ঢুলু ঢুলু। কেবল ওর নয়,

ইউনুস-জসিমেরও প্রায় এক অবস্থা। গত কয়েক দিন এক সঙ্গে টানা চার ঘন্টাও ঘুমাবার সুযোগ হয়নি কারও। সবাই ব্যস্ত কাজে।

ওকে দেখে সোজা হয়ে বসল শওকত। 'পেলে কিছু?'

মারফতি হাসি দিল ইউনুস। 'পেয়েছি। কিন্তু আগে কিছু মালপানি খরচ করুন, তারপর দেখাব। খিদে আর তেষ্টা, দুটোর হামলায় একেবারে নাস্তেহাল দশা আমার।'

টেলিফোনে চিকেন বার্গার আর কফির অর্ডার দিল শওকত। হাত বাড়িয়ে দিল ইউনুসের দিকে। 'দাও খামটা।'

দিল সে। 'নিন, দেখুন। দেখে নয়ন-মন সার্থক করুন। ব্যাপারটা পছন্দ না করে পারবেন না আপনি।'

ব্যস্ত হাতে খামটা খুলল শওকত। ভেতরের কাগজপত্র বের করে রাখল সামনে। চোখ বোলাল ওগুলোয়। একটু একটু করে কুঁচকে উঠছে কপাল, চোখের কোণ। রীতিমত হতভম্ব হয়ে গেল শওকত। ওর মনোভাব টের পেল ইউনুস, কিন্তু মুখ খোলার ব্যস্ততা দেখাল না। পেট ঠাণ্ডা করছে।

'এ-এসব কি?' চোখ তুলল শওকত। 'এত পুরনো...'

'মানুষটা পুরনো, তাই তার আঙুলের ছাপও পুরনো। প্রথমবার আমার দেয়া ছাপ রেকর্ডের সাথে মিলিয়ে ওরা তো হেসে খুন। বলে, "বোকার দল, আরও একটু স্মার্ট হওয়ার চেষ্টা করো। আধুনিক হওয়ার কোশেশ করো"। জানতে চাইলাম, "কেন বললে এ কথা? কি এমন বোকামি করলাম আমরা"?' আরেক চোট হাসির মুখে পড়লাম। বসে থাকলাম বেকুবের মত। পরে জানলাম, যার ফিঙ্গারপ্রিন্ট নিয়ে গবেষণা করছি আমরা, ১৯৬৫ সালে মারা গেছে সে।' বার্গারে কামড় বসাল ইউনুস।

চোখ নামিয়ে হাতে ধরা শীটটার ওপর নজর দিল শওকত। ওয়াশিংটনের মাস্টার কম্পিউটারের পাঠানো রেকর্ডের একটা কপি ওটা। দুই সারিতে দশটা বুড়ো আঙুলের ছাপ, প্রতিটি সাদা-কালো বক্সের মধ্যে বসানো। একই ব্যক্তির ওগুলো, ব্যক্তিটির নাম জ্যাকবাস। ওটা রেখে আরেকটা শীট তুলে নিল শওকত। একটা ব্যক্তি পরিচিতি আছে ওতে সংক্ষেপে। ওপরে নামও লেখা আছে একটা।

'কি নাম?' প্রথমবার নামটা বুঝতে ব্যর্থ হলো সে।

'সের্গেই সোলাভস্কি,' কফির কাপে চুমুক দিল ইউনুস।

'জ্যাকবাসের আসল নাম!'

'অথবা প্রাক্তন নামও বলতে পারেন।'

নামটার পিছনেই ঝাড়া এক মিনিট পার করে দিল শওকত। তারপর বেকুবের দৃষ্টিতে ইউনুসের মুখের দিকে তাকাল। 'সোভিয়েত স্পাই?'

উত্তরটা সরাসরি দিল না ইউনুস। 'বুঝতে পারছেন কিসের ভেতর হোঁদিয়ে পড়েছি আমরা?' আফসোসের ভঙ্গিতে মাথা দোলাল। 'দুধ-কলা খাইয়ে এত বছর কী কালসাপই না পুষেছি!'

আনমনে সামনের যুবককে দেখল শওকত কয়েক সেকেণ্ড। হাতের প্রোফাইলটায় নজর দিল। বার দশেক বিড় বিড় করে উচ্চারণ করল নামটা।

তারপর নিচের টেক্সটের দিকে তাকাল। পড়তে শুরু করল:

সের্গেই সোলাভস্কি জন্মসূত্রে রাশিয়ান। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের কয়েক বছর পর মিনস্ক-এ জন্ম তার। বাপ জাহাজ ঘাটের শ্রমিক, নাম, সের্গেই ইগরোভস্কি। পুত্র সোলাভস্কি একজন গোঁড়া কমিউনিস্ট। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে রেড আর্মির অফিসার হিসেবে জার্মান ফ্রন্টে লড়াই করে সে, আর্টিলারি ক্যাপ্টেন ছিল সে। যুদ্ধের পর কর্নেল হিসেবে পদোন্নতি দেয়া হয় তাকে এবং সে কেজিবি-তে যোগ দেয়। অসলো ও প্যারিসের সোভিয়েত দূতাবাসে কেরানী হিসেবে দীর্ঘ সময় চাকরি করে সোলাভস্কি।

শীটটার ফুটনোটে চোখ বোলাল শওকত। জানা গেল, ১৯৬৫ সালে আঙ্কারার রুশ দূতাবাসে কাজ করার সময় হার্ট ফেইলিওরে মারা যায় সের্গেই সোলাভস্কি। 'তার মানে,' চোখ তুলল শওকত। 'আমরা কোথাও কোন ভুল...'

'না।' মাথা দোলাল ইউনুস এপাশ ওপাশ। 'কোন ভুল করিনি আমরা।'

কোটের ভেতর পকেট থেকে একটা খাম বের করল সে। এগিয়ে দিল চীফের দিকে। 'এর মধ্যে সোলাভস্কির এক কপি অরিজিনাল ছবি আছে। বাকিগুলো আমার সঙ্গে থেকে জসিম তুলেছে, জ্যাকবাসের। মিলিয়ে দেখুন।'

তাই করল শওকত। মাত্র ত্রিশ সেকেণ্ডের মধ্যে নিশ্চিত হলো সে, ঠিকই আছে, জ্যাকবাসই সোলাভস্কি। আগের ছবির লোকটির মাথায় চুল বেশি, মুখের চামড়া টান টান। আর বর্তমান লোকটির মুখটা আগের চেয়ে একটু ভারি, মাথায় চুলের পরিমাণ অল্প, চোখের নিচের ভাঁজ আগের চেয়ে সংখ্যায় কয়েকটা বেশি—এই যা পার্থক্য। নইলে মানুষ একই।

মুখ তুলল সে। 'বুঝলাম।'

একজন অন্যজনের দিকে তাকিয়ে থাকল দীর্ঘ সময়। কোত্থেকে কোথায় গড়িয়েছে ব্যাপারটা, ভাবছে সবিস্ময়ে। নিজেদের অবিশ্বাস্য, অকল্পনীয় আবিষ্কারে নিজেরাই হতভম্ব।

'এ কেমন হলো?' চশমা খুলে কাঁচ পরিষ্কার করায় মন দিল শওকত।

'যা হওয়ার তাই হয়েছে, শওকত ভাই। আমাদের নিতান্তই সৌভাগ্য যে চরম সর্বনাশটা ঘটাতে ব্যর্থ হয়েছে ব্যাটা শেষ পর্যন্ত। যদি সে রাতে মাসুদ ভাই...' থেমে গেল ইউনুস। শিউরে উঠল।

আবার ছবিগুলোর দিকে নজর দিল শওকত। একটা বাদে অন্যগুলো এক্সপার্ট ফটোগ্রাফার জসিমের তোলা। দুই দিন ধরে ঘাপটি মেরে বসে থেকে টেলিফোটো লেন্সের সাহায্যে দূর থেকে ছবিগুলো তুলেছে সে আর ইউনুস।

'কিন্তু আমি কিছুতেই বুঝতে পারছি না, ও ব্যাটা কেন স্যান্ডলারদের দলিলগুলো হাতাল? ওগুলো ওর কি কাজে লাগবে?'

'নিশ্চই উপযুক্ত কারণ আছে। খুঁজলে প্রতিটি প্রশ্নের উত্তরই পাওয়া যাবে। তবে ওর ব্যাপারে কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছার আগে আমাদের মাসুদ ভাইয়ের ফিরে আসার অপেক্ষায় থাকতে হবে।'

'অবশ্যই। এবং ওর ওপর আরও কড়া নজর রাখার ব্যবস্থা করতে হবে।'
মাথা দোলাল ইউনুস।
'কোথায় যে গেল মানুষটা,' মাসুদ রানাকে উদ্দেশ করে বলল শওকত। 'টেলিফোন করতে করতে আঙুল ব্যথা হয়ে গেল। অথচ...'
'নিশ্চই ব্যস্ত আছেন।'
'সে তো বুঝলাম। কিন্তু এদিকে যে আমাদের চাঁদি গরম হওয়ার দশা, প্রতিকারের কি উপায়?'
'রোটা ফিলমসের খবর কি, শওকত ভাই?'
'বিরাট এক গোলক ধাঁধা।'
'কি রকম?'
'ওটার সঙ্গেও যত রাজ্যের অসাধারণ ব্যাপার-স্যাপার জড়িত। রুমানিয়ান এমব্যাসির ডিপ্লোম্যাটিক ব্যাগে এখান থেকে ভরা ফিল্ম ক্যান বুখারেস্ট যায় নিয়মিত, ফিরে আসে খালি ক্যান।'
মাথা দোলাল ইউনুস, 'সেটাই তো হওয়া উচিত। ওরা এখানে ছবি তোলে, তারপর রীল দেশে পাঠায় ডেভেলপ করার জন্যে। তারপর খালি ক্যান পাঠিয়ে দেয় নতুন চালান...'
'ওটা হচ্ছে থিওরি,' বাধা দিল শওকত। 'ওপর থেকে দেখলে সেটাই মনে হবে যে কারও। কিন্তু আসলে ঘটছে অন্যরকম।'
'আচ্ছা!'
'এদেশে রুমানিয়ানদের কোন আধুনিক ক্যামেরা ইউনিট নেই, একজনও প্রফেশনাল ক্যামেরাম্যান নেই। অনেক আগেই তুলে দেয়া হয়েছে সে পাট। আমেরিকান বিভিন্ন ফিল্ম কোম্পানির কাছ থেকে আগে মাঝেমধ্যে এক-আধটা ডকুমেন্টারি ছবি কিনত ওরা। নেগেটিভ। ডেভেলপ করতে দেশে পাঠাত। সেটাও ১৯৭৩ সালের অগাস্ট মাস থেকে বন্ধ হয়ে গেছে। তাহলে? কি পাঠায় ওরা নিয়মিত ওইসব ক্যানে ভরে?'
চুপ করে থাকল ইউনুস। অপলক দেখছে চীফকে।
'আটলান্টিকের ওপারে পৌঁছেই নিরুদ্দেশ হয়ে যায় ক্যানবাহী ডিপ্লোম্যাটিক ব্যাগগুলো। কোথায় যায়?'
'কোথায় যায়?' প্রতিধ্বনি তুলল সে।
'জানি না। বলতে গেলে কোন কার্যক্রম-ই নেই রোটা ফিলমসের। অথচ চব্বিশ ঘণ্টা তার ভারিক স্ট্রীটের অফিসে কড়া গার্ড থাকে। ফাঁক গলে মশা-মাছিরও ভেতরে ঢোকার উপায় নেই। কেন?'
অজ্ঞতা প্রকাশের ভঙ্গি করল ইউনুস কাঁধ ঝাঁকিয়ে।
'যার কোন কার্যক্রম নেই, আয় নেই এক পয়সাও, এমন এক প্রতিষ্ঠান ম্যানহাটনের মত কমার্শিয়াল এরিয়ায় শুধু বসে থাকার জন্যে মাসে হাজার হাজার ডলার ওড়াবে, এ কোন কথা হলো?' টেবিলের কোণ খুঁটল শওকত। 'ও, ভাল কথা। রোটা ফিলম আর আমাদের জ্যাকবাস ভায়ার অ্যাকাউন্ট একই ব্যাংকে।'
'তাই নাকি?'

'হ্যাঁ। আরও আছে...' বলে চলল শওকত।

নিজেদের অফিস রুমে মুখোমুখি বসে আছে ডিটেকটিভ অ্যারাম সাশাদ ও প্যাটি হেরেন। এদের আলোচনার বিষয়বস্তুও এক।

জ্যাকবাসের হাতের ছাপ এবং তার সম্পর্কে সেন্ট্রাল কম্পিউটারের ধারণা ইত্যাদির তথ্য প্রমাণ: ইউনুস যা যা জোগাড় করে এনেছে, সেই একই জিনিস ওদের সামনেও রয়েছে। হেরেন সংগ্রহ করে এনেছে সমস্ত। জ্যাকবাসের আসল পরিচয় জানতে পেরে মাথা ঘুরে গেছে সাশাদের।

'শালা স্পাই!' একটা মাত্র হুঙ্কার ছেড়েই শান্ত হয়ে গেছে সে। কথা নেই মুখে। চোখ ডেস্কের কাগজপত্রের ওপর স্থির। এসব কি? ভাবছে সে। সাধারণ একটা খুনের তদন্ত করতে গিয়ে এ কিসের সাথে জড়িয়ে গেলাম? মার্ক রাইডারের হত্যাকারী যে সাধারণ খুনী নয়, তা সে নিহতের গলার ক্ষত দেখে তখনই বুঝেছে। কিন্তু তাই বলে এতদূর? রাশিয়ান স্পাই? জ্যাকবাস? রানা এজেন্সির নাইট গার্ড? ওহ, ল-অ-র্ড!

কিন্তু এসব সামাল দেয়া তো ওদের কাজ নয়, ভাবছে সাশাদ। ওরা নিউ ইয়র্ক সিটি হোমিসাইড বিভাগের সাধারণ দুই ডিটেকটিভ মাত্র, কাউন্টার এসপিওনাজ এজেন্ট নয়। আর দশটা সাধারণ খুনের মত মার্ক রাইডারের খুন হওয়ার কারণ উদঘাটন করতে গেছে, কোন স্পাই রিং উদ্‌ঘাটন করতে নয়।

অথচ...অথচ...

এক সাধারণ হত্যাকাণ্ডের কারণ তদন্ত করতে গিয়ে যে এমন ডাইনোসর সদৃশ বিকট সমস্যার মুখে পড়তে হবে, কে জানত? জ্যাকবাসের অতীত, প্রায় ভুলে যাওয়া জীবনী পড়ল সাশাদ আরেকবার। হেরেনের মন্তব্যে ধ্যান ভাঙল তার।

'স্টেট ডিটেকটিভ ব্যুরোতে রানা এজেন্সির এক অপারেটরকে দেখেছি আমি আজ।'

চোখ তুলল সাশাদ। 'কাকে? কি নাম?'

'ইউনুস। সে রাতে গাড়িতে ছিল লোকটা, যে রাতে রুমানিয়ান ডিপ্লোম্যাটকে...'

'বুঝেছি। কি করছিল সে ওখানে?'

'জ্যাকবাসের পুরানো রেকর্ড সংগ্রহ করছে। অবশ্য আমার আগেই কাজ সেরে বেরিয়ে যেতে দেখেছি তাকে।'

এ-ও আরেক সমস্যা, ভাবতে লাগল সাশাদ। রানা এজেন্সির সাথে জ্যাকবাসের সম্পর্ক আছে, এমন কোন সিদ্ধান্তে যদি পৌঁছানো যেত, একটা কাজের কাজ হত। তাও হচ্ছে না। ওরাও জ্যাকবাসের পরিচয় সম্পর্কে নিশ্চিত হতে চায়। অর্থাৎ...? সে রাতে বোগদান বেলিয়াকে তাড়া করে ধরার সময় শওকতকে দেখেছে সে। ইউনুসকেও দেখেছে। জানে, ওদের আগে থেকেই জ্যাকবাসের পিছনে লেগেছে রানা এজেন্সি। নিজেদের এক কর্মচারীর পিছনে: রোটা ফিলমসের পিছনে। দেখা যাচ্ছে প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রেই ওদের থেকে অন্তত কয়েক ধাপ এগিয়ে আছে রানা এজেন্সি। এর ভেতরে নিশ্চই কোন গভীর, ওরা

যতটা কল্পনা করছে, তার চাইতেও সম্ভবত অনেক অনেক গভীর ষড়যন্ত্র রয়েছে।

'শোনো, হেরেন,' মুখ খুলল সাশাদ। 'পরিষ্কার বোঝা যায় এ মামলা অন্য ধরনের। আমাদের দ্রুত কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছানো উচিত।'

'যেমন?'

'এইসব,' তর্জনী দিয়ে ডেস্কের কাগজপত্র দেখাল ডিটেকটিভ, 'গাট্টি বেঁধে এফবিআই-এর ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে আসি, চলো। ওরা সামলাক। এ ওদেরই কাজ, আমাদের নয়। কি বলো?'

'সেটাই বোধহয় ভাল হবে,' চিন্তিত, দ্বিধান্বিত গলায় বলল দ্বিতীয় ডিটেকটিভ। 'আমারও ঠিক পছন্দ হচ্ছে না ব্যাপারটা।'

'আমারও না। আমরা হোমিসাইড ডিটেকটিভ, স্পাই নই। বিষয়টা নিয়ে না হয় আরেকটু চিন্তা-ভাবনা করি আমরা। তারপর কাল গ্রুপের অন্যদের নিয়ে এক সভায় মিলিত হওয়া যাবে। কেমন?'

মাথা দোলাল হেরেন। 'ঠিক আছে।'

'তাহলে এখন এসো, এর সঙ্গে জ্যাকবাস কানেকশন নিয়ে আরেকবার নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে দেখি। তারপর...।'

পরদিন দুপুরের পর বসল মীটিং। সভাপতি ও প্রধান বক্তা ডিটেকটিভ অ্যারাম সাশাদ। উপস্থিত আছে হেরেন ছাড়া আরও চারজন। এরা সবাই এতদিন পালা করে নজর রেখেছে জ্যাকবাস ও রোটা ফিলম্‌সের ওপর।

'যেদিন মাসুদ রানা নিজে এসে জানিয়ে গেল,' শুরু করল অ্যারাম সাশাদ, 'মার্ক রাইডারের নিহত হওয়ার একই সময়, আরও পরিষ্কার করে বলতে গেলে বলতে হয়, একেবারে একই মুহূর্তে নিজের অ্যাপার্টমেন্ট ত্যাগ করে সে, অফিসে আগুন লাগার খবর পেয়ে ছুটে যায় অফিসে, তখন অন্যরকম মনে হলেও দু'দিন পরই বুঝলাম, আসলে মার্ক রাইডার স্রেফ ঘটনাচক্রের শিকার। আর কিছু নয়। দুর্ভাগ্য তার। খুন হওয়ার কথা ছিল মাসুদ রানার, তার নয়।

'যা হোক, ডেবি মোরান ধরা পড়ার আগ পর্যন্ত আমার-হেরেনের ধারণা ছিল, মাসুদ রানা আর মার্ক রাইডারের মধ্যেকার নারীঘটিত কোন গণ্ডগোলের জের হিসেবে খুন হয়েছে পরের জন মাসুদ রানার হাতে। কিন্তু ডেবি মোরান সে ধারণা পাল্টে দিল। বোঝা গেল ভুল পথে চালিত হচ্ছিলাম আমরা ভুল লোকের পিছনে লেগে।

'এরপর মাসুদ রানাকে ছেড়ে লাগলাম তার অফিসের নাইটগার্ড, জ্যাকবাসের পিছনে। ঘটতে শুরু করল অদ্ভুত সব ঘটনা, তোমরা জানো। রুমানিয়ান কূটনীতিক বোগদান বেলিয়াকে ধাওয়া করে রোটা ফিলম্‌সের খোঁজ পাওয়া গেল। রুমানিয়ান ফিলম্ কোম্পানি ওটা। এদেশের ওয়াইল্ড লাইফ, জিওলজি ইত্যাদির ওপর প্রামাণ্য চিত্র তোলে, দেশে পাঠায়। মাঝেমধ্যে আমাদের একটা-দুটো ফিচার ফিলমও দেশে রপ্তানি করে ওরা। কিন্তু সে খুবই কম। ধর্তব্যের মধ্যে পড়ে না।

'প্রতিষ্ঠানটির সম্পর্কে খোঁজ-খবর নিয়ে কি জানা গেল? ১৯৭৩ সাল থেকে এ দেশে ওদের সমস্ত কার্যক্রম বন্ধ রয়েছে। আধুনিক কোন ক্যামেরা ইউনিট

নেই, নেই একজন ক্যামেরাম্যান। অথচ ভারিক স্ট্রীটে খুবই শানদার ভবনে অফিস আছে ওদের। কি কাজ হয় সেখানে? কেউ জানে না। জানার কোন উপায় নেই। কারণ চব্বিশ ঘণ্টা অফিসের প্রবেশ পথ পাহারা দেয় সশস্ত্র গার্ড। হাতে গোনা কয়েকজন রুমানিয়ান ছাড়া কারও প্রবেশাধিকার নেই রোটা ফিলমসে। যে সংস্থার বলতে গেলে কোন কাজ নেই এদেশে, আয় নেই, তারা অনর্থক কেন মাসে হাজার হাজার ডলার খরচ করবে অফিস ভাড়া আর অফিস কর্মচারীদের বেতন-ভাতার পিছনে?

'এদিকে কাজ নেই, অথচ প্রতিমাসে অন্তত একবার করে দেশে ফিলম ক্যান পাঠায় তারা ডিপ্লোম্যাটিক ব্যাগে ভরে। কি পাঠায় তারা? ফিলম? কিসের ফিলম? নিজেদের তোলা? না। আমাদের কাছ থেকে কিনে নেয়া? না। তাহলে? এখান থেকে ওয়াশিংটন হয়ে বুখারেস্ট যায় রোটা ফিলমসের চালান, নিয়মিত। প্রতি মাসে কম করেও একবার। কি যায় ওর মধ্যে করে?'

সবাই তাকিয়ে আছে সাশাদের দিকে। উত্তর দিল না কেউ।

'ওটার সঙ্গে একটা নোংরা শব্দ জড়িয়ে আছে আমার বিশ্বাস। "এফ" দিয়ে শুরু শব্দটা। কি হতে পারে বলো তো?'

প্রত্যেকেই চার অক্ষরের একটা শব্দ উচ্চারণ করল।

'না,' মাথা দোলাল সভাপতি। 'ওটা পাঁচ অক্ষর বিশিষ্ট। এফ আর ও এন টি। ফ্রন্ট। রুমানিয়ানদের কিছু একটার "ফ্রন্ট" রোটা ফিলমস। কিন্তু কিসের?'

একে একে মাথা দোলাল সবাই। জানে না কেউ।

সশব্দে দম ছাড়ল সাশাদ। 'ওয়েল। আমিও জানি না।'

মাথার ওপর সাঁ করে পিছিয়ে গেল লিঙ্কন টানেল, ম্যানহাটনে এসে নাক ঢোকাল মাসুদ রানার বুইক। প্রায় তিনটা বাজে তখন। টেনথ অ্যাভিনিউ হয়ে ওয়েস্ট থার্টি এইটথ স্ট্রীটে পড়ল রানা, তারপর দক্ষিণে ঘোরাল গাড়ির নাক। পাঁচ মিনিট পর থার্টিয়েথ স্ট্রীটে লেসলির বাসার সামনে থামল ও।

নিজের অনুমানের সঙ্গে এখানকার বর্তমান পরিস্থিতি মিলিয়ে দেখল মাসুদ রানা। ঠিকই আছে। সূর্যের আলোর আভাস পর্যন্ত নেই। এরকম ব্যস্ত সময়ও রাস্তা প্রায় ফাঁকা। লোকজন তেমন নেই।

দরজার হাতল ধরল লেসলি। রানার দিকে তাকাল। 'তুমি নামবে না?'

মাথা দোলাল ও। 'অফিসে যেতে হবে আগে।'

'এক কাপ কফি খেয়ে যাও অন্তত।'

'ধন্যবাদ। আরেক সময় খাওয়া যাবে।'

দরজা খুলেও ইতস্তত করতে লাগল মেয়েটি। নামছে না। চিন্তিত।

'কিছু বলবে?' বলল মাসুদ রানা।

'একটা বিষয়ে আমাকে তোমার প্রশ্ন করা উচিত ছিল, অথচ করোনি তুমি। ভাবছি ইচ্ছে করেই প্রসঙ্গটা চেপে গিয়েছ, নাকি ভুলে গিয়েছ?'

'কোন প্রসঙ্গে বলো তো?'

'গ্রোভারের বাসার সামনে কিছু একটা দেখেছ তুমি। দেখোনি?'

'পন্টিয়াক?'

'এবং তার চালক।'

'হ্যামন্ড।'

বিস্ফারিত হয়ে উঠল লেসলির চোখ। 'তুমি চেনো ওকে?'

'চিনি,' গুল মারল রানা।

'ওই গাড়িটার সাথে আমার সম্পর্ক আছে, তা-ও জানো তুমি,' ঠিক প্রশ্ন নয়, মন্তব্যের সুরে বলল লেসলি।

'জানি।'

'সারা পথ আমি আশা করেছি ব্যাপারটা নিয়ে প্রশ্ন তুলবে তুমি। মানে, আমার মনে হয়েছে বিষয়টার ব্যাপারে ক্লীয়ার হতে চাইবে তুমি। সেটাই স্বাভাবিক।'

'তোমাকে বিরক্ত করতে চাইনি,' বলল রানা। 'ভেবেছি নিজের সূত্রে খোঁজ নিয়ে ব্যাপারটা সম্পর্কে জানব।'

একটু যেন আহত হয়েছে মনে হলো লেসলি, নিচের ঠোঁট কামড়ে ভাবল কি যেন। 'আমি বিরক্ত হব কেন মনে হলো তোমার?'

হেসে ফেলল মাসুদ রানা। 'অনর্থক ভাবছ তুমি এ নিয়ে। ব্যাপারটাকে তেমন গুরুত্ব দিইনি আমি। দিলে অবশ্যই জিজ্ঞেস করতাম তোমাকে। এ নিয়ে শুধু শুধু দুশ্চিন্তা কোরো না। যাও, আমি অপেক্ষা করছি এখানে।'

চেহারার মেঘ একটু একটু করে কেটে গেল লেসলির। 'সত্যি বলছ?'

'নিশ্চই সত্যি বলছি।'

'ওকে,' মুখ বাড়িয়ে রানার গালে চুমু খেলো মেয়েটি। নেমে পড়ল। 'বাই।'

'বাই।'

যতক্ষণ দেখা যায় একভাবে তার গমনপথের দিকে তাকিয়ে থাকল মাসুদ রানা। বারের সামনে দিয়ে ওপাশের গলিতে ঢুকে পড়ল লেসলি, কেউ পিছু ধাওয়া করল না। এক মিনিট পর নিজের বেডরুমের জানালার পর্দা তুলে উঁকি দিল সে। হাত নাড়ল রানার উদ্দেশে।

উত্তরে রানাও হাত নাড়ল, তারপর গাড়ি ঘুরিয়ে ফিরে চলল নিজের ডেরায়।

'তাহলে?' প্রশ্ন করল ম্যাকগোয়ান। 'এখন আমাদের করণীয় কি?'

'আমি-হেরেন ঠিক করেছি কেসটা ড্রপ করব,' বলল অ্যারাম সাশাদ। 'জোয়াল এফ.বি.আই-এর কাঁধে তুলে দেব। তোমাদের ডেকেছি এ বিষয়ে কার কি মত জানতে। এতক্ষণে তোমরা নিশ্চই বুঝতে পেরেছ আমাদের কাজ নয় এসব সামাল দেয়া? এর মধ্যে অন্যরকম ষড়যন্ত্র আছে, কোন সন্দেহ নেই। অনেক অনেক জটিল কেস এটা। রাষ্ট্র-বিরোধী কিছু একটা জড়িত এর সাথে। অতএব, যার কাজ তার হাতেই গছিয়ে দেয়া ভাল। আমি অন্তত তাই মনে করি। এখন তোমরা ভেবে দেখো।' কফির অর্ডার দিল সাশাদ।

হেরেন বাদে উপস্থিত অন্য ডিটেকটিভরা নিচু গলায় আলোচনা শুরু করল। অবশেষে সিদ্ধান্ত হলো আরও কয়েক দিন পরিস্থিতির ওপর নজর রাখবে তারা। আরও গুরুত্বপূর্ণ কোন তথ্য যদি পাওয়া যায়, ক্ষতি কি? একেবারে রান্না করা

খাবার-ই না হয় তুলে দেয়া যাবে এফবিআই-এর হাতে। এতে বরং তাদের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল হবে। ইজ্জত বেড়ে যাবে।

'ঠিক আছে,' সবার মতামত শুনে সিদ্ধান্ত জানাল সাশাদ। 'তাই হোক তাহলে। আর নজর যখন রাখতেই হবে, মাসুদ রানা কোথায় আছে খোঁজ নাও, ওর ওপরও কড়া নজর রাখো। আমার ধারণা যদি ভুল না হয়, খুব শিগগিরই হয়তো বড় ধরনের একটা আঘাত আসবে লোকটার ওপর। জ্যাকবাস ব্যর্থ হয়েছে কাজটা সারতে, তার বন্ধুরাও যে তাই বলে ব্যর্থ হবে, আমার তা মনে হয় না। ওর সাথে হকি খেলা দেখছিল যে মেয়ে, তার ওপরও একটা চোখ রাখতে হবে।'

'ঠিক আছে,' সম্মতি জানাল অন্য ডিটেকটিভরা। সমাপ্তি ঘোষণা করা হলো বৈঠকের।

রানা এজেন্সি।

নিজের অফিস রুমে বসে আছে মাসুদ রানা। ওর সামনে আছে শওকত ও ইউনুস। কথা নেই কারও মুখে, প্রত্যেকে গম্ভীর। এক ঘণ্টা আগে অফিসে পৌঁছেছে মাসুদ রানা, এর মধ্যেই ভেতরের যাবতীয় খবর জানা হয়ে গেছে।

রোটা ফিলমস, ভাবছে মাসুদ রানা, ছবি তোলার নামগন্ধও নেই, অথচ নিয়মিত তাদের 'সীলড্ ক্যান' রুমানিয়ায় পাঠায় তারা ডিপ্লোম্যাটিক ব্যাগের নিরাপদ আবরণে মুড়ে, এর অর্থ কি? আয় নেই, অথচ বছরে কয়েক লাখ ডলার খরচ করে এস্টাবলিশমেন্টের পিছনে! কোত্থেকে আসে এ টাকা? কে বা কারা জোগান দেয়?

এদিকে শওকতের রিপোর্টে দেখা যাচ্ছে, রোটা ফিলমস প্রশ্নাতীতভাবে সলভেন্ট। ওদের ব্যাংক স্টেটমেন্ট সেরকমই বলে। ভারিক স্ট্রীটের সানফ্লাওয়ার ভবন বিশাল এক বিল্ডিং। তার দুটো সম্পূর্ণ ফ্লোর দখল করে আছে রোটা—একটা তাদের 'অফিস,' অন্যটায় 'স্টোর'। কিসের অফিস? কিসের স্টোর?

অবধারিতভাবে জ্যাকবাস ওরফে সেগেই সোলাভস্কির প্রসঙ্গ এল রানার ভাবনায়। কে এই লোক? কার হয়ে কাজ করে সে? আর্থার স্যান্ডলার? কিন্তু··· এসব হচ্ছে কি? আর্থার স্যান্ডলার অফিশিয়ালি 'মৃত', অথচ দেখা যাচ্ছে বেঁচে আছে সে। অন্তত অবস্থা পর্যালোচনা করলে সেরকমই মনে হয়। লেসলি ম্যাকঅ্যাডাম অফিশিয়ালি 'মৃত', অথচ সে-ও বেঁচে আছে। তার সঙ্গে যোগ হয়েছে আরেক মৃত, সেগেই সোলাভস্কি। অফিশিয়ালি ১৯৬৫ সালে আঙ্কারায় যে লোকের মৃত্যু হয়েছে, সে-ও দেখা যাচ্ছে বেঁচে আছে জ্যাকবাস নাম নিয়ে।

শুধু আছে তা-ই নয়, বরং মাসুদ রানাকে হত্যা করতেও চেয়েছিল সে। ব্যর্থ হয়েছে অল্পের জন্যে। আর্থার স্যান্ডলারের নির্দেশে কাজটা ঘটাতে গিয়েছিল সে! ওদিকে গ্রেভারের ধারণা, লেসলি ম্যাকঅ্যাডামও ওকে হত্যা করতে চায়। কেবল উপযুক্ত সময়ের অপেক্ষায় আছে।

তিন মৃত, জ্যান্ত হয়ে আচমকা সওয়ার হয়েছে মাসুদ রানার ঘাড়ে। কি করবে ও এখন? কি করা উচিত?

'জ্যাকবাস ডিউটি করছে?' মুখ তুলল মাসুদ রানা।

'জ্বি,' মাথা দোলাল শওকত। 'করছে।'

'নিয়মিত করছে,' যোগ করল ইউনুস। 'তবে গত দু'দিন একটু যেন মনমরা লাগছে লোকটাকে।'

'স্বাভাবিক,' মন্তব্য করল মাসুদ রানা। 'ব্যর্থতার জন্যে চাপ এসেছে নিয়ন্ত্রণকারীর তরফ থেকে।'

'সেই সাথে হয়তো অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করার জোর তাগিদও এসেছে,' বলল শওকত।

মাথা দোলাল রানা, 'সম্ভব।'

'পুরো বিষয়টা আমার কেমন এলোমেলো মনে হচ্ছে, মাসুদ ভাই।'

'আমারও,' সরল স্বীকারোক্তি করল ও। 'ভীষণ এলোমেলো।' একটু ভাবল। 'এক কাজ করো। জানা তো হলো, এখন শুধুই জ্যাকবাসের ওপর চোখ রাখো তোমরা। রোটা ফিলম্‌স বাদ।'

'জ্বি, আচ্ছা।'

জ্যাকবাসের কথা ভাবতে লাগল মাসুদ রানা।

আট

আবার নোট। দরজা খুলতে সামনেই সাদা একটা খাম দেখে তুলল মাসুদ রানা। দরজা লাগিয়ে আলো জ্বেলে দিল ও, খামের ভেতর থেকে বের করল ছোট্ট একটা চিরকুট। চোখ কোঁচকাল মাসুদ রানা, চিরকুটের বক্তব্য পড়ল।

> রানা,
> জরুরী প্রয়োজনে শহরের বাইরে গিয়েছিলাম। এইমাত্র ফিরেছি। তোমার সাথে খুব গুরুত্বপূর্ণ কথা আছে। ইস্ট ফিফটি সেকেন্ড স্ট্রীটের সুজান'স-এ রাত বারোটায় অপেক্ষা করব আমি তোমার জন্যে। অবশ্যই এসো।
>
> লেসলি ম্যাকঅ্যাডাম।

এখনও চোখ কুঁচকে আছে রানার। বাইরে কোথায় গিয়েছিল ও? কেন? ঘড়ি দেখল মাসুদ রানা, সময় নেই বেশি। সাড়ে এগারোটা বাজে। একটা দীর্ঘশ্বাস মোচন করল ও। বিছানায় ওঠার যে খায়েশ ছিল, আপাতত মুলতবি রাখতে হচ্ছে সেটা। এই প্রথম এত রাতে দেখা করার অনুরোধ জানিয়েছে লেসলি, অতএব ব্যাপারটা নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ।

লাল, নীল, সবুজ, হলুদ ইত্যাদি কড়া রঙের নিয়ন আলোয় ঝলমল করছে সুজান'স। ভেতরে ঠাসা ভিড়। যেন সবে সন্ধে হলো। মেয়ে-পুরুষের কথা, হাসি আর গ্লাস ঠোকাঠুকির আওয়াজ শ্রবণ যন্ত্রকে পীড়া দেয় খুব। নির্ধারিত সময়ের দু'মিনিট আগে বারে পা রাখল মাসুদ রানা। বার কাউন্টারের কাছে আলোর

মাতামাতি কম দেখে সেদিকে এগোল ও। জায়গাটা মৃদু আলোয় আলোকিত। একটা টুলে বসল রানা। এখান থেকে বারের প্রবেশ পথ ও ডান্স ফ্লোর, দুটোর ওপর-ই নজর রাখা যায়।

উদ্দাম নৃত্য চলছে ফ্লোরে। পায়ের নিচের ফ্লোর ক্ষণে ক্ষণে রং বদলাচ্ছে স্বয়ংক্রিয়ভাবে, তার সঙ্গে মাথার ওপরের হেন-লাইট তেন- লাইট তো রয়েইছে। রঙের বন্যায় যেন ভাসছে সুজান'স বার। সিলিঙের অসংখ্য কনসিলড মাইক্রোফোন থেকে ভেসে আসছে মিউজিক। হৈ-হুল্লোড়ের মাঝে ট্রে হাতে ছোটাছুটি করে পানীয় পরিবেশন করছে আধা-ন্যাংটো অল্প বয়সী ওয়েট্রেসরা।

কারও কাছে স্বপ্নের মত, কারও কাছে দুঃস্বপ্নের মত মনে হবে সুজান'স-কে, ভাবল মাসুদ রানা, কে কি ভাবে গ্রহণ করবে, তার ওপর নির্ভর করে ব্যাপারটা।

বসে আছে রানা। প্রবেশ পথ আর ডান্স ফ্লোরে নেচে বেড়াচ্ছে নজর। ধৈর্য হারাতে শুরু করেছে একটু একটু করে। চিন্তাও বাড়ছে। সোয়া বারোটা পেরিয়ে গেছে, এখনও লেসলির দেখা নেই। একেবারে ওর গা ঘেঁষে দাঁড়াল কে একজন। মনোযোগ বিচ্ছিন্ন হলো মাসুদ রানার। ঘুরে লোকটার দিকে তাকাল। না, লেসলি নয়। আবার দরজার দিকে ফিরল ও।

'লুকিং ফর সাম অ্যাকশন?' মুখ রানার কানের কাছে এনে বলল লোকটা।

প্রশ্নবোধক চোখে ঘুরে চাইল ও। শুনতে পায়নি। 'সরি?'

আবার বলল সে। তার কথার টান ব্রিটিশ। যদিও অল্প, তবুও মাসুদ রানার জন্যে ওটুকুই যথেষ্ট। সরাসরি লোকটার মুখের দিকে তাকাল ও এবার। নিশ্চিত হলো, আগে কখনও দেখেনি ও একে। কিন্তু কে ব্যাটা?

'না,' বলল রানা। 'একজনের অপেক্ষায় আছি।'

হাসল লোকটা। 'ও, আচ্ছা।' নড়ল না সে। ঠিক ওর পিছনে দাঁড়িয়ে থাকল বারে হেলান দিয়ে। বীয়ার গিলছে।

নিজের কাজে মন দিল মাসুদ রানা। ভেতরে ভেতরে পূর্ণ সচেতন লোকটার ব্যাপারে। কয়েক মুহূর্ত পর কাঁধে তার কনুইয়ের মৃদু খোঁচা খেলো রানা। বিরক্ত চোখে ঘুরে তাকাতে ফ্লোরের কাছে অপেক্ষমাণ কয়েকজন সঙ্গীহীন তরুণীকে দেখাল সে। 'অপেক্ষা করার কি দরকার? এখানেই তো কত আছে। যান না, বেছে নিয়ে লেগে পড়ুন কাজে। যার অপেক্ষায় আছেন, সে না এলে শেষ পর্যন্ত এ-কূল ও-কূল দু'কূলই যাবে আপনার।'

চোখ গরম করে তাকাল মাসুদ রানা। কড়া গলায় বলল, 'আমার কূল রক্ষার জন্যে আপনাকে মাথা ঘামাতে হবে না, মিস্টার! নিজের কাজ করুন, অল রাইট?'

চোখ বড় করে ওকে দেখল লোকটা কয়েক মুহূর্ত। মুখে হাসি ফুটিয়ে আত্মসমর্পণের ভঙ্গিতে দু'হাত তুলে বলল, 'অল রাইট, স্যার! অল রাইট!' হাত নামাল সে। চুপ করে থাকল খানিক। তারপর আবার কথা বলে উঠল। 'আমি জানি আপনি কেন এসেছেন এখানে।'

পাত্তা দিল না মাসুদ রানা। ওর ধারণা এ নিশ্চই মেয়ের দালাল। ব্যবসার আশায় পিছু ছাড়তে চাইছে না। প্রবেশপথের দিকে তাকাল আবার রানা। নাহ, পাত্তা নেই লেসলির। এদিকে প্রায় সাড়ে বারোটা বাজতে চলল। আরেকটা

কনুইয়ের গুঁতো খেলো মাসুদ রানা। চড়াৎ করে রক্ত উঠে গেল মাথায়। এর একটা বিহিত না করলেই নয়। আসন ছাড়ল ও। ঘুরে লোকটার মুখোমুখি হলো।

'নাক-নকশা আস্ত নিয়ে বাড়ি ফেরার ইচ্ছে আছে?' চিবিয়ে চিবিয়ে বলল রানা।

জবাবে আবারও হাসল লোকটা। 'আপনি মাসুদ রানা, ঠিক? এসেছেন আমার বন্ধু লেসলির সঙ্গে দেখা করতে, ঠিক?'

তাজ্জব হয়ে তার মুখের দিকে তাকাল ও। কে এই লোক? কেমন বন্ধু লেসলির? যেমন-ই হোক, নিজে না এসে একে কেন পাঠাল সে? 'আপনি কে?'

'বললাম তো, লেসলির বন্ধু।'

'লেসলি কোথায়?'

'আছে। একটু ঝামেলা হয়ে গেছে।' বারের শেষ মাথার দুই চেয়ার বিশিষ্ট ছোট একটা টেবিল ইঙ্গিত করল সে। 'চলুন, ওখানে বসে কথা বলি।' ঘুরে দাঁড়াল লোকটা। 'খুব জরুরী।'

লোকটাকে বিশ্বাস করবে না অবিশ্বাস করবে, বুঝে উঠতে পারল না মাসুদ রানা। তবে ভাব চক্করে তাকে বেশ আস্থাশীল মনে হচ্ছে। হয়তো সত্যিই···ভাবতে ভাবতে এগোল ও। মুখোমুখি বসল দু'জন। সতর্ক চোখে লোকটাকে দেখছে রানা। 'বলুন।'

'বলছি।' সিগারেট ধরাল সে। 'এত ব্যস্ত হলে চলে?'

'বাজে কথা রাখুন! কি বলার আছে তাড়াতাড়ি বলে ফেলুন। সারারাত এখানে বসে থাকতে আসিনি আমি।'

'দুঃখিত। আমি আসলে···'

টেবিলের ওপর দুটো ছায়া পড়ল। ঝট করে মুখ তুলল মাসুদ রানা, এবং চমকে উঠল। দু'জন এসে দাঁড়িয়েছে ওর পিছনে, দু'জনেই পরিচিত। ফাঁদটা চিনে ফেলল রানা। বুঝল, আসলে লেসলি নয়, লেসলির হাতের লেখা জাল করে এরাই রেখে এসেছিল নোটটা। দ্রুত উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করল মাসুদ রানা, কিন্তু দু'দিক থেকে দু'জোড়া হাত ঠেসে রাখল ওকে চেয়ারের সাথে। দু'দিক থেকে দুটো পা জুতোসহ মাড়িয়ে ধরল ওর পা, সর্বশক্তি ব্যয় করেও নিজেকে মুক্ত করতে পারল না রানা।

ওর কানের কাছে মুখ নিয়ে এল হান্টার রজার্স। 'শান্ত হোন, মিস্টার। নিজের বিপদ আর বাড়াবেন না দয়া করে।'

পরমুহূর্তে ওপাশে দাঁড়ানো জোনাথন গ্রোভার রুমাল ঠেসে ধরল রানার নাকে। মিষ্টি একটা গন্ধ নাকে গেল, ঝাঁকি মেরে মাথা পিছিয়ে নেয়ার চেষ্টা করল ও, বাঁ হাতে চাঁদির চুল মুঠো করে ধরে সে প্রচেষ্টাও বানচাল করে দিল হান্টার। কাজের কাজ কিছুই করতে পারল না রানা। সুযোগই পেল না। দম বন্ধ করে রাখতে চাইল, সেটাও ব্যর্থ হলো। প্রথমজন ঝুঁকে পড়ে মাঝারি এক ঘুসি চালাল ওর বুকে, ভুশ করে বেরিয়ে গেল ভেতরের সব বাতাস। দু'বার কেশে উঠল মাসুদ রানা, দম নিতে বাধ্য হলো প্রকৃতির তাগিদে।

ঝিম ঝিম করে উঠল মাথার মধ্যে। চোখের সামনে অস্পষ্ট হয়ে আসতে শুরু করেছে বার। প্রথমজন নিজের হ্যাটটা চাপিয়ে দিল ওর মাথায়। বাধা দেয়ার

ক্ষমতা ততক্ষণে ছেড়ে গেছে রানাকে। শিথিল হয়ে পড়েছে দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ। ভীষণ দুর্বল বোধ হচ্ছে। নিজের পা জোড়া যেন আর কারও, মনে হলো রানার, হাত দুটোও। এবং রক্তমাংসের নয়, রাবারের তৈরি।

দৃষ্টিশক্তির সাথে পাল্লা দিয়ে শ্রবণশক্তিও কমে আসছে মাসুদ রানার। শব্দ বা আলোর অত্যাচার, দুটোকেই এখন বড়ই মধুর মনে হচ্ছে। চমৎকার ঘুম ঘুম একটা ভাব অনুভব হচ্ছে। বাহ্, কী মজা!

প্রায় অজ্ঞান রানাকে টেনে দাঁড় করানো হলো নিজের পায়ে, হাঁটিয়ে নিয়ে যেতে শুরু করল হান্টার ও গ্রোভার। রাবারের পা দুটো কাজ করছে না ঠিকমত। একবার এদিক যায় একবার ওদিক যায়। মাথা ঝুঁকে আছে রানার নিচের দিকে। হাঁটার ছন্দে দুলছে ডানে-বাঁয়ে। স্বাধীন হয়ে গেছে যেন মাথাটা, ঘাড়-গলার শাসন মানতে চাইছে না। সিগারেটের ধোঁয়ায় ভরা সুজান'স-এর দূষিত বাতাস থেকে বাইরের মুক্ত, ঠাণ্ডা বাতাসে নিয়ে আসা হয়েছে ওকে, টের পেল মাসুদ রানা। কিন্তু কোথায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, তাকিয়ে দেখার বিন্দুমাত্র আগ্রহ জাগল না ভেতরে।

'না হে, আর থাকা গেল না,' কারও উদ্দেশে হান্টারকে বলতে শুনল মাসুদ রানা। 'বন্ধু বড় বেশি গিলে ফেলেছে এর মধ্যেই। যা-তা অবস্থা একেবারে।'

অনেক, অ-নে-ক দূরে কে যেন হেসে উঠল। কথা বলার চেষ্টা করল রানা, স্বর ফুটল না ঠিকমত। গলা দিয়ে যা বেরুল, শোনাল কোলা ব্যাঙের বেসুরো ডাকের মত।

আবার হাসি।

ওদিকে দূর থেকে পুরোটা ঘটনা অবলোকন করল পুলিস ডিটেকটিভ ম্যাকগোয়ান। মাসুদ রানাকে অনুসরণ করে এখানে এসেছে সে। ভিড়ের ভেতর সুবিধে হবে না বুঝে বাথরুমের দিকে ছুটল সে, ওয়াকি-টকির সাহায্যে সাশাদকে ঘটনা জানাবে। জায়গামত পৌঁছে সেটটা মুখের সামনে তুলল ম্যাকগোয়ান, পরমুহূর্তে ঘাড়ে ঠাণ্ডা কিছু একটার স্পর্শ পেয়ে জমে গেল সে।

পিছন থেকে একটা হাত এগিয়ে এসে সেটটা কেড়ে নিল তার হাত থেকে। পরক্ষণে মাথায় প্রচণ্ড এক আঘাত পেয়ে জ্ঞান হারাল ম্যাকগোয়ান। তার পতনোন্মুখ দেহটা চট করে পিছন থেকে ধরে ফেলল গ্রোভার। রানাকে গাড়িতে তুলে দিয়ে সে আর প্রথমজন ফিরে এসেছে সঙ্গে সঙ্গে। গতকাল থেকে মাসুদ রানার ফ্ল্যাট এবং অফিসের ওপর নজর রাখছিল সে আর হান্টার। ম্যাকগোয়ানকে আজ-ই গ্রোভার স্পট করেছে, ওর বাসার কাছে অহেতুক ঘণ্টার পর ঘণ্টা গাড়ি নিয়ে বসে থাকতে দেখে।

দু'জনে ধরাধরি করে বাঁ দিকের এক সারি কিউবিকল-এর কাছে নিয়ে এল তারা অজ্ঞান গোয়েন্দাকে। বসিয়ে দিল একটা কমোডে। তারপর ওয়্যারলেস সেটটা তার কোটের সাইড পকেটে রেখে দরজা টেনে দিয়ে সটকে পড়ল দ্রুত। ম্যাকগোয়ান তখন ঘুমাচ্ছে থুতনি বুকে ঠেকিয়ে। অল্প অল্প নাকও ডাকছে তার।

কয়েকটা কণ্ঠস্বর। ভেসে আসছে দূর থেকে। কি যেন বলছে কারা। একটু একটু

করে এগিয়ে আসছে কণ্ঠগুলো।

পাশ ফিরল মাসুদ রানা। আড়মোড়া ভাঙল। ধীরে ধীরে জ্ঞান ফিরে আসছে, পরিবর্তনটা টের পাচ্ছে ও, যদিও সচেতনভাবে নয়। আবার নড়ে উঠল রানা। চিৎ হয়ে শুলো। চোখ মেলল, তাকিয়ে থাকল সিলিঙের দিকে। চাউনি অন্তঃসারশূন্য।

ওর ডানদিকে একটা ভেনিশিয়ান ব্লাইন্ড ঝোলানো জানালা। ঘরের ভেতর সূর্যের আলো আসছে ব্লাইন্ডের ফাঁক গলে। মাথা সামান্য তুলল মাসুদ রানা। বোঝার চেষ্টা করছে সকালের সূর্য না বিকেলের? জবাবটা পাওয়া গেল না। একটা নির্জন রাস্তা, রাস্তার পাশে কাঠের একটা বেঞ্চ এবং কয়েকটা ন্যাড়া গাছ দেখতে পেল রানা জানালার ওপাশে।

পাশের ঘর থেকে আবার কথাবার্তার আওয়াজ আসছে। কয়েকজন কথা বলছে। সব ক'টা পুরুষ কণ্ঠ। কয়েকটা কণ্ঠ কথা বলছে ব্রিটিশ অ্যাকসেন্টে, একটা কেবল আমেরিকান অ্যাকসেন্টে। আস্তে করে উঠে বসল রানা। সাথে সাথে চেহারা বিকৃত হয়ে উঠল, আচমকা সাঙ্ঘাতিক যন্ত্রণা শুরু হয়ে গেছে মাথায়। চার আঙুলে কপালের দুই পাশ টিপে ধরল। ক্রমেই বাড়ছে ব্যথা। আবার শুয়ে পড়ল ও।

কোথায় আছি আমি? ভাবছে মাসুদ রানা। এটা তো আমার বেডরুম নয়, তাহলে? এখানে এলাম কি করে আমি? এ কার ঘর?

কি যেন মনে পড়ব পড়ব করছে, ভেবে পাচ্ছে না ও সেটা কি হতে পারে। ঘটনাটা প্রায় হঠাৎ করেই মনে পড়ল ওর। লেসলির চিঠি···সুজান'স···তারপর সেই লোকটা··· তারপর···তারপর। মনে পড়ল সব। কি ভাবে এখানে এসেছে রানা, সেটাও বুঝে ফেলল। আবছাভাবে মনে পড়ছে, কয়েকজন মিলে একটা গাড়িতে তুলে দিয়েছিল ওকে কাল রাতে। কাল রাতে? নাকি পরশু রাতে? সে যাই হোক, এটা কোন জায়গা?

বেশ কয়েক মিনিট চুপচাপ শুয়ে থাকল মাসুদ রানা। উঠে দাঁড়াবার, হাঁটার শক্তি সঞ্চয় করছে। জানালার কাছে গিয়ে বাইরেটা দেখে বুঝতে চায় কোথায় আছে ও। আবার ও ঘরে কথা শোনা গেল। অ্যাকসেন্ট বোঝা যায় ঠিকই, কিন্তু কে কি বলছে বুঝতে পারছে না।

বিছানা থেকে পা নামিয়ে দিল মাসুদ রানা। আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়াল। টলে উঠে আপনা থেকেই এক পা এগিয়ে গেল ও। হঠাৎ করে চোখের সামনে আঁধার হয়ে গেছে সবকিছু। চোখ মেলে রেখেও কিছুই দেখতে পাচ্ছে না। মাতালের মত দু'পা এগিয়ে গেল ও, অন্ধের মত হাত বাড়াল খাটের বেডপোস্ট ধরে পতন ঠেকানোর জন্যে, কিন্তু পারল না। একটা কাঠের চেয়ার নিয়ে হুড়মুড় করে পড়ে গেল রানা, কেঁপে উঠল ঘরদোর। পড়েছে ঠিকই, তবে জ্ঞান হারায়নি।

পতনের আওয়াজে পাশের ঘরে কথাবার্তা থেমে গেল। দড়াম করে খুলে গেল দুই রুমের মাঝের দরজাটা। মুখে-বুকে ঘন কালো বন-জঙ্গল নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে সেখানে হান্টার রজার্স। রানাকে এক পলক দেখল সে। তারপর নিজের পিছনে তাকাল।

'ঘুম ভেঙেছে ওর,' বলল সে।

কিছু বলতে চাইল রানা, স্বর ফুটল না। মাথার মধ্যে চক্কর খাচ্ছে ঘিলু, চোখের সামনে বন বন করে ঘুরছে সবকিছু। মুখ দিয়ে ঠেলে উঠে আসছে টক স্বাদের পানি। মাঝের দরজায় আরও কয়েক জোড়া পায়ের শব্দ শুনে চোখ ভরা পানি নিয়ে ঘুরে তাকাল রানা। তিন জোড়া পা এগিয়ে আসছে ওর দিকে। প্রথম জোড়া হান্টারের, তার পরের জোড়া গ্রোভারের।

শেষের পা জোড়ার মালিকের ওপর থমকে গেল মাসুদ রানার দৃষ্টি। মানুষটা বয়স্ক, দীর্ঘদেহী, ঋজু। মুখে চুরুট। ঝাপসা চোখে দেখছে ও লোকটাকে। গাঢ় রঙের দামী সেভিল রো সুট পরে আছে সে। গম্ভীর। প্রথম দু'জনকে পিছনে ফেলে এগিয়ে এল লোকটা। ঝুঁকে মাসুদ রানার চোখের দিকে তাকাল। চেহারাটা পরিচিত।

'হোয়াইটসাইড!' বিস্মিত কণ্ঠে উচ্চারণ করল রানা। থুতনি মেঝে স্পর্শ করল ওর। মাথা তুলে রাখতে পারছে না। -

'হ্যাঁ,' চিন্তিত কণ্ঠে বলল প্রাক্তন ব্রিটিশ এম. আই-সিক্স-এর ট্রেজারি সেকশন প্রধান পিটার হোয়াইটসাইড। 'হ্যাঁ, আমি।' নিথর মাসুদ রানাকে দেখল সে কিছুক্ষণ। মুখ তুলে হান্টার আর গ্রোভারের দিকে তাকাল। 'করেছ কি! জলদি সুস্থ করে তোলো একে!' তীক্ষ্ণ গলায় নির্দেশ দিল সে। 'মুভ!'

দু'জোড়া পায়ের শব্দ শুনল রানা, দেহে কয়েকটা হাতের স্পর্শ অনুভব করল। টেনে বসানো হলো ওকে, ঝাঁকি দেয়া হলো কয়েকটা। এর এক মুহূর্ত পর খেয়াল করল, দাঁড়িয়ে আছে সে। কেউ একজন কানের কাছে মুখ এনে নড়াচড়া করতে বা বাধা দিতে নিষেধ করল। প্রয়োজন ছিল না, কারণ দেহে শক্তি একেবারেই নেই ওর। শুধু জাঙিয়া বাদে আর সব খুলে ফেলা হলো রানার। ঠেলে পাশের রুম সংলগ্ন বাথরুমে এনে ঢোকানো হলো। পরক্ষণে মাথার ওপর ঠাণ্ডা পানির শাওয়ার খুলে দিল কেউ একজন।

আচমকা পানিতে পড়া কুকুরের মত শিউরে উঠে গা ঝাড়া দিল মাসুদ রানা। সরে আসতে চাইল, কিন্তু পারল না। ঠেসে ধরে রেখেছে ওকে হান্টার ও গ্রোভার।

পঁয়তাল্লিশ মিনিট পর। একটা নরম সোফায় বসে আছে মাসুদ রানা। মাথায় ব্যথার আভাস পর্যন্ত নেই। দেহের শক্তিও প্রায় সবটুকুই ফিরে পেয়েছে ও এর মধ্যে। ঠিক শহর নয় এ জায়গাটা, আরেক জানালা দিয়ে বাইরের দৃশ্য দেখে অন্তত এটুকু বুঝে গেছে রানা। হয়তো শহরের কাছের কোন গ্রাম হবে এটা। যে বাড়িতে রয়েছে ও এখন, সেটাকে একটা গ্রাম্য বাড়ি বলেই মনে হচ্ছে।

আগুনের মত গরম কালো কফিতে চুমুক দিল রানা। ওর ডানে বসেছে হান্টার, বাঁয়ে গ্রোভার। আর মুখোমুখি একটা আর্মচেয়ারে হোয়াইটসাইড।

'আপনার এই পরিণতির জন্যে আমি দুঃখিত, মিস্টার রানা,' বলল বৃদ্ধ। 'কিন্তু শুনেছি এর জন্যে আপনিই আসলে দায়ী। আপনিই বাধ্য করেছেন এদের কঠোর হতে।' রানার চোখে চোখ রাখল বৃদ্ধ। 'সেদিন পালিয়ে গেলেন। কাল আবার হান্টারের সঙ্গে বেশ কোস্তাকুস্তিও করেছেন। আপসে এলে এসবের কোন দরকার হত না।'

নাক টানল হোয়াইটসাইড। 'বড্ড ত্যাড়া মানুষ আপনি। সময় থাকতে পথে আসতে চান না। ব্যাড। ভেরি ব্যাড।'

এক চুমুক কফি গিলে বসে আছে মাসুদ রানা। চেহারা ত্যাড়া হয়ে গেছে। এটা কফি না ব্যাটারির অ্যাসিড ভেবে পাচ্ছে না। তা-ও হয়তো এতটা বাজে লাগত না।

'কোথায় নিয়ে আসা হয়েছে আমাকে?' প্রশ্ন করল ও।

'নিরাপদ জায়গায়,' বলল হোয়াইটসাইড। 'বেশ নিরাপদ জায়গা এটা, অন্তত আপনার জন্যে।'

'নিরাপদ?' কাপটা সেন্টার টেবিলে রেখে দিল মাসুদ রানা। হান্টার ও গ্রোভারকে ইঙ্গিত করল, 'এই দুই বনমানুষ সাথে থাকলে দুনিয়ার কোন জায়গা...'

ঘোঁৎ করে উঠল হান্টার।

অমায়িক হাসি ফুটল বৃদ্ধের মুখে। 'ভুল। হান্টারের মত ভদ্র, নির্বিরোধী মানুষ খুব কমই হয়। আপনিই বরং তাকে...সে যাক। সে রাতে আপনার সাথে দৌড় প্রতিযোগিতায় হেরে গিয়ে বেশ কষ্ট পেয়েছে হান্টার। মুখে অবশ্য বলেনি, কিন্তু আমি টের পাই। ছাত্র জীবন থেকেই ও একজন কৃতি অ্যাথলেট। কয়েক বছর আগেও ইংল্যান্ডের নাম করা এক ফুটবল টীমের মিডফিল্ডার ছিল। কি নাম ছিল যেন তোমার টীমের, হান্টার? আরসেনাল, না সান্ডারল্যান্ড?'

'সাউদাম্পটন, স্যার,' গর্বের সাথে বলল দাড়িওয়ালা।

'ওই হলো!' আবার নাক টানল বৃদ্ধ।

'ডিফেন্ডার হিসেবেও কিছুদিন খেলেছে ও,' বলল জোনাথন গ্রোভার উত্তর ইংল্যান্ডের অ্যাকসেন্টে। 'নিউ ক্যাসল আর লীডস ইউনাইটেডের হয়ে।'

'বোঝেন তাহলে!' রানার উদ্দেশে চোখ পাকাল হোয়াইটসাইড। 'এমন এক অ্যাথলেট দৌড়ে পরাজিত হলো, মনে মনে দুঃখ পেলে দোষ দেয়া যায়? তারওপর আপনার গত রাতের অসহযোগিতা। সব মিলিয়ে...হয়তো খুব একটা ভাল ব্যবহার করেনি সে আপনার সাথে কাল। তবে আমি বলব এ জন্যে আপনিই দায়ী। অতএব, অন্তত হান্টারের ব্যাপারে আর একটু উদার করুন আপনার মনোভাব।'

দৃষ্টি কঠোর হয়ে উঠল রানার। 'বন্ধ করুন আপনার প্যাচাল। আমাকে কেন এখানে নিয়ে আসা হয়েছে তাই বলুন।'

'সরি।' কয়েক মুহূর্তের নীরবতা। 'আপনি বুঝতে পারছেন না—কেন?'

'না।'

'আমরা কেন ছুটে এসেছি ইংল্যান্ড থেকে, তা-ও বুঝতে পারছেন না?'

'না।'

'অবাক করলেন!' সত্যিই বিস্মিত মনে হলো বৃদ্ধকে। 'এতদিন ভেবে এসেছি আপনি খুব চালাক চতুর মানুষ। পিছলে পিছলে চলেন। এখন দেখছি...'

'কেন এসেছেন আপনারা?' জানতে চাইল মাসুদ রানা।

'জোনাথন গ্রোভারকে সর্বশেষ যে প্রশ্নটি করেছিলেন, অথচ জবাব পাননি, সে বিষয়ে খানিকটা আলোকপাত করতে। আপনি আপনার প্রশ্নের উত্তর পাবেন।

আর আমাদের একটা প্রশ্নের উত্তর জানাবেন, অ্যাকচুয়ালি। জেনে তবে জানাবেন আর কি!' নতুন একটা ক্যানারি আইল্যান্ড চুরুট ধরাল হোয়াইটসাইড।

'বুঝলাম না।'

'ট্র্যাশ কালেকশন কি জানতে চাইছিলেন না? সেটার কথাই বলছি। আর রিক্রুটিং সার্জেন্ট। ওটাও আছে আমাদের আলোচ্যসূচিতে।'

একে একে তিনজনকেই দেখল মাসুদ রানা। চোখে সন্দেহ। 'আপনার কথা কিছুই বুঝতে পারছি না আমি।'

'ওয়েল দেন,' নিচু গলায় বলল বৃদ্ধ। 'এটাই আপনার সবকিছু বোঝার-শেখার উপযুক্ত সময় তাহলে। বুঝে নিন, শিখে নিন। বিনিময়ে আমাদের ছোট্ট একটা উপকার করে দিন।'

'কিসের উপকার?'

'উঁহুঁ! ওটা পরের বিষয়। আগের কাজ আগে।' জোনাথন গ্রোভারের দিকে ফিরল হোয়াইটসাইড। 'শুরু করো। কোন্ বছর, ট্র্যাশ কালেকশনে নেমেছিলে তুমি?' বলে হেলান দিয়ে বসল লোকটা।

'১৯৩৮ সালে।'

'বিস্তারিত শোনাও আমাদের গোয়েন্দা বন্ধুকে। কয়েকটা বিস্তারিত ঘটনা অন্তত বলো।'

রানার দিকে ফিরল জোনাথন গ্রোভার। চাউনি অনিশ্চিত। বিস্ময় ফুটব ফুটব করছে চোখের তারায়। 'আপনি সত্যিই কিছু জানেন না ট্র্যাশ কালেকশনের ব্যাপারে?'

উত্তর দেয়ার প্রয়োজন মনে করল না রানা। তাকিয়ে থাকল লোকটার দিকে।

'ওয়েল,' কাঁধ ঝাঁকাল গ্রোভার। 'আমরা ভেবেছি স্যান্ডলার প্রোপারটির সমস্ত দলিল তুলে দেয়ার সময় ড্যানিয়েলস এসব নিয়ে কথা বলেছে আপনার সঙ্গে।' বোধহয় বেখেয়ালেই হবে, আবার আমেরিকান অ্যাকসেন্টে বলতে শুরু করেছে লোকটা। একদম খাঁটি নিউ ইয়র্কের অ্যাকসেন্টে।

'আমার কাজ ছিল আক্ষরিক অর্থেই আবর্জনা সংগ্রহ এবং তা সরিয়ে ফেলা। সাধারণ বর্জ্য নয় অবশ্য। মানুষ বর্জ্য।'

'কি!'

চোখ মেলল হোয়াইটসাইড। 'প্রথম থেকে, গ্রোভার। সংক্ষেপে অবশ্যই। তবে শুরু থেকে হলে বুঝতে সুবিধে হবে এর।'

হান্টারও হেলান দিল নিজের চেয়ারে। দুই ভীম বাহু প্রশস্ত বুকের ওপর ভাঁজ করে বসে আছে আধবোজা চোখে। জানা কাহিনী শোনায় আগ্রহ নেই বিশেষ। দু'পা আর পিঠের চাপে চেয়ারের সামনের দুই পায়া শূন্যে তুলে ফেলছে সে থেকে থেকে, মেঝেতে পড়ে ঠক ঠক মৃদু আওয়াজ তুলছে ও দুটো। পালা করে ঘরের অন্য তিনজনের ওপর নেচে বেড়াচ্ছে হান্টারের দৃষ্টি।

'আপনি জানেন,' রানার উদ্দেশে বলল গ্রোভার, 'কি কাজে বিশেষজ্ঞ ছিলাম আমি। তো, ১৯৩৮ এবং ১৯৩৯, পরপর এই দুই বছর বেশ কয়েকটা মামলায় জড়িয়ে পড়লাম ওই করতে গিয়ে।'

বাধা দিল হোয়াইটসাইড। 'খুব ওস্তাদ জালিয়াত ছিল গ্রোভার।'

'আমি তার ক্রিমিনাল ক্যারিয়ার সম্পর্কে জানি ভাল করেই,' রসকষহীন কণ্ঠে বলল মাসুদ রানা। 'তার সঙ্গে ট্র্যাশের কি সম্পর্ক সেটা বলুন।' শেষ বাক্যটা গ্রোভারের দিকে তাকিয়ে বলল ও।

'ঠিক আছে। ১৯৪০ সালে, আগেরগুলোর চাইতেও অনেক শক্ত কেসে ফেলে দিল আমাকে মার্কিন সরকার। কয়েকটা ক্লাসিফায়েড সই জাল করেছিলাম। কিন্তু পরে ফাঁস হয়ে গেল তা কি করে যেন। এক সেট ট্রেজারি বিলে সইগুলো করেছিলাম।'

'এর সঙ্গে আর্থারের কোন সম্পর্ক ছিল?' প্রশ্ন করল রানা।

হাসল গ্রোভার। যেন বাহবা জানাল ওকে। 'হ্যাঁ, ছিল।' হোয়াইটসাইডের দিকে এক পলক তাকাল লোকটা। 'ছিল। আপনি জানেন আমি ছিলাম সই জালকারী, এনগ্রেভার নয়। বুঝলেন কিছু?'

নড়েচড়ে বসল মাসুদ রানা। ঠাণ্ডা চোখে তাকিয়ে থাকল গ্রোভারের দিকে। কিছু একটা যেন অনুমান করার চেষ্টা করছে। 'স্যান্ডলার ছিল এনগ্রেভার।'

'হ্যাঁ, তাই। পৃথিবীতে কোনও কালেও এতবড় এনগ্রেভার আর জন্মায়নি। ভবিষ্যতে কখনও জন্মাবে বলেও আমি মনে করি না। উপযুক্ত যন্ত্রপাতি পেলে আরেকটা অরিজিনাল ক্লিওপেট্রার নিডল এনগ্রেভ করে দিতে পারবে স্যান্ডলার। ওটা যার নামে, সেই ক্লিওপেট্রাকে পর্যন্ত এনগ্রেভ করার ক্ষমতা আছে তার। দুটোর একটাকেও নকল বলার উপায় থাকবে না কারও। এতবড় ওস্তাদ এনগ্রেভার ছিল আর্থার স্যান্ডলার।'

'বলে যান। ট্রেজারি বিলগুলো জাল ছিল, এই তো?'

'ঠিক ধরেছেন। ওগুলো আমি জাল করেছি, এই অভিযোগে আমাকে গ্রেফতার করা হলো। এমনভাবে ফেঁসে গিয়েছিলাম, সেবার সত্যিই রেহাই পাওয়ার কোন উপায় ছিল না। কম করেও বিশ বছর ঘানি টানার জন্যে ভেতরে ভেতরে তৈরি হয়ে অপেক্ষা করছি আমি, এই সময় সরকার একটা প্রস্তাব দিল আমাকে। তাতে যদি রাজি হই, বলা হলো ছেড়ে দেয়া হবে আমাকে।

'আমাকে জানানো হলো দেশে-বিদেশে প্রচুর ট্র্যাশ আছে, ওগুলো সরিয়ে ফেলতে হবে আমাকে। সরকার জানে আমি ইটালিয়ান, ওই ভাষায় কথা বলতে পারি নেটিভ ইটালিয়ানদের মত। সেই সাথে ইংরেজি তো আছেই। আমি রাজি হলে ওদের সুবিধে, সহজে কেউ বুঝতে পারবে না আমি আমেরিকানদের হয়ে কাজ করছি। এসব ট্র্যাশ ছিল আসলে মানুষ। ভিনদেশী স্পাই, কাজ করছে যুক্তরাষ্ট্রের স্বার্থের বিরুদ্ধে।

'কাজটা না করে উপায় নেই। অতএব রাজি হয়ে গেলাম আমি। সরকার আর আমার মধ্যে মৌখিক চুক্তি হলো। এবং কাজে লেগে পড়লাম।'

'এবং দেশপ্রেমিক বনে গেলেন,' মুখ বাঁকাল মাসুদ রানা।

'ঠিক। একদম ঠিক। যে দেশের কাজ করে, সে-ই তো দেশ-প্রেমিক, তাই না?'

'আর আপনাদের মত দেশপ্রেমিকদের রিক্রুটিং এজেন্ট ছিলেন উইলিয়াম

ওয়ার্ড ড্যানিয়েলস? একজন অ্যাটর্নি?'

'এগজ্যাক্টলি!' হেসে উঠল জোনাথন গ্রোভার। 'স্মোক করলে কিছু মনে করবেন আপনি?' নির্দিষ্টভাবে কাউকে করেনি সে প্রশ্নটা, জবাবের জন্যে অপেক্ষাও করেনি। সিগারেট ধরিয়ে টানতে লেগে গেছে।

'কতজনকে হত্যা করার নির্দেশ দেয়া হয় আপনাকে?' মাসুদ রানাও সিগারেট ধরাল।

'চারজনকে।' নাকের ডগা চুলকাল সে। 'তবে শেষ পর্যন্ত তিনজনকে কালেক্ট করে রেহাই পেয়ে যাই। প্রাথমিক পর্যায়ে আর কি। একজনকে এই শহরে হত্যা করি আমি। দ্বিতীয়জনকে ফিলাডেলফিয়ায়। তারপর ক্যালাব্রিয়ায়, ১৯৪৪ সালে।'

চতুর্থজনের ব্যাপারটা ভাবল মাসুদ রানা। জিজ্ঞেস করতে যাচ্ছিল, এই সময় কথা বলে উঠল পিটার হোয়াইটসাইড। 'এবার নিশ্চই বুঝেছেন ট্র্যাশ কালেকশন কথাটার অর্থ? এবং জোনাথন গ্রোভার কি ছিল?'

মাথা দোলাল মাসুদ রানা। 'হ্যাঁ। কিন্তু আরও কিছু বলা বোধহয় বাকি রয়ে গেছে। এটুকুই নিশ্চই সব নয়?'

'অবশ্যই আছে,' হাসল হোয়াইটসাইড। 'কিছু নয়, অনেক আছে। সবে তো শুরু হলো কেচ্ছা। ধীরে ধীরে সবই জানবেন। এ তো শুধুই জোনাথন গ্রোভারের উপাখ্যান নয়। এর সঙ্গে আমাদের মহান এনগ্রেভার বন্ধু আর্থার স্যান্ডলার আছে, আছে আরও একজন...।' নাটুকে ভঙ্গিতে থেমে গেল বৃদ্ধ। দু'হাত চিত করে এমন এক ভ্রূভঙ্গি করল, যেন বলতে চায় 'বলুন তো কে সে'?

'উইলিয়াম ওয়ার্ড ড্যানিয়েলস।'

হান্টার আর গ্রোভার মাথা ঝাঁকাল এক যোগে।

'হ্যাঁ, তাই।' নিভে যাওয়া চুরুট ধরাল বৃদ্ধ। 'দা গ্রেট গ্রেট রিক্রুটিং সার্জেন্ট, উইলিয়াম ওয়ার্ড ড্যানিয়েলস। এবার খানিকটা আমার মুখ থেকে শুনুন। ক্যালাব্রিয়ায় তৃতীয় কালেকশন শেষ হলে গ্রোভারকে স্থানীয় পার্টিজান মুভমেন্ট তাদের আন্ডারগ্রাউন্ড আশ্রয়কেন্দ্রে নিয়ে গেল। ওখানে এক জার্মান কাউন্টার স্পাইকে হত্যা করে সে। যাই হোক, সাগর ও রেলপথে বিশেষ ব্যবস্থায় জিব্রাল্টারে নিয়ে এল তারা গ্রোভারকে। সেখানে ওকে সমর্পণ করা হয় লিস্টার গ্রেগরি নামে একজনের কাছে।

'গ্রেগরি ছিল ব্রিটিশ সেনাবাহিনীর ক্যাপ্টেন। কখন জার্মানি আক্রমণ করে বসে জিব্রাল্টার, সেই আশঙ্কায় আগে থেকেই আমাদের বাহিনী মোতায়েন ছিল ওখানে। আফটার অল, কার্যক্ষেত্রে নিরপেক্ষ থাকলেও ফ্র্যাঙ্কো ছিল আমাদের, আই মীন, ব্রিটেনের সমর্থক। আমাদের সেনা মোতায়েনকে স্বাগত জানিয়েছিল সে। যা বলছিলাম, গ্রেগরি এম আই-সিক্স-এর একজন টপ এজেন্টও ছিল।

'অ্যাংলো-আমেরিকান যৌথ ইন্টেলিজেন্স নেটওয়ার্কের রিপোর্টের সুবাদে গ্রেগরি আগেই গ্রোভার সম্পর্কে জানত। তার অ্যাসাইনমেন্ট, তার রেপুটেশন, আসল নাম ইত্যাদি হেন-তেন সব কিছুই জানত গ্রেগরি। লন্ডনের গোপন নির্দেশে গ্রোভারকে নতুন একটা কাজের প্রস্তাব দিল ক্যাপ্টেন গ্রেগরি। এ জন্যে প্রচুর অর্থ দেয়া হলো তাকে। খুশি মনে কাজটা নিল জোনাথন গ্রোভার।'

লোকটার দিকে তাকাল মাসুদ রানা। এই অপেক্ষাতেই যেন ছিল গ্রোভার, ওর সাথে চোখাচোখি হতেই মাথা দোলাল। হোয়াইট-সাইডের বক্তব্যের সমর্থনে।

'ওটা ছিল আমেরিকায় বসে ব্রিটিশদের পক্ষে তথ্য সংগ্রহ করা এবং সময়মত সে সব লন্ডনে ডেসপ্যাচ করা।'

'স্পাইং,' মন্তব্য করল রানা।

মুখ বিকৃত করল বৃদ্ধ। 'স্পাই কথাটা কেমন যেন শোনায়, মিস্টার মাসুদ রানা। তার চেয়ে "চোখ এবং কান" অনেক ভদ্রোচিত মনে হয়। গ্রোভার ছিলও আসলে তাই। আমেরিকার মাটিতে একজন বিট্রিশ অপারেটিভ, "আই অ্যান্ড ইয়ার"। আমাদের অসৎ কোন উদ্দেশ্য ছিল না এর পিছনে। আমরা পরস্পরের বন্ধু ছিলাম। এখনও আছি। গ্রোভারকে দায়িত্ব দেয়া হয় ব্রিটিশ সরকারের আগ্রহ জন্মাতে পারে, তার স্বার্থে কাজে লাগানো যেতে পারে, তেমন সংবাদ-ই কেবল ডেসপ্যাচ করতে। আমেরিকার বিরুদ্ধে গোয়েন্দাগিরি ধরনের কোন দায়িত্ব দেয়া হয়নি তাকে।'

'তারপর?'

'তারপর,' নড়েচড়ে বসল হোয়াইটসাইড। 'এই পর্যায়ে দুটো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের ওপর নজর রাখতে হবে আপনাকে। এক, ডি সেপিটো ওরফে জোনাথন গ্রোভার ছিল আমেরিকান "ট্র্যাশ কালেক্টর", এবং প্রায় একই সময়ে একজন ব্রিটিশ লো-প্রোফাইলড "আই অ্যান্ড ইয়ার"। এবং দুই,' তর্জনী আর মধ্যমা তুলল বৃদ্ধ। 'আপনি নিজেই আবিষ্কার করেছেন, সমসাময়িক বছরগুলোতে আর্থার স্যান্ডলারের সাথে বেশ ভাল সম্পর্ক ছিল গ্রোভারের। একজন জাল ট্রেজারি বিল এনগ্রেভ করত, অন্যজন তাতে জাল সই করে টাকা ওঠাত।'

'দুই রিক্রুটেড এজেন্ট।'

'ইয়েস,' দ্রুত মাথা ঝাঁকাল হোয়াইটসাইড। 'এখন আমরা জানি ওরা দু'জন কি ছিল। এ-ও জানি কে ওদের "রিক্রুট" করে। রাইট?'

'হ্যাঁ,' বলল মাসুদ রানা।

'বিশেষ এক ধরনের লোককে বলা হত "রিক্রুটিং সার্জেন্ট"। যারা বাধ্যতামূলক যুদ্ধে যোগদানের নির্দেশকে ভয় পেয়ে বিভিন্ন উপায়ে সরকারকে সন্তুষ্ট করার চেষ্টা করত। অবশ্য যাদের সে ধরনের সুযোগ ছিল, তারাই আর কি। ভীতু ছিল তারা, কাপুরুষ ছিল। যুদ্ধকে যমের মত ভয় করত। তাদেরই একজন ছিল ড্যানিয়েলস। সুযোগ ছিল তার। কিছু লোককে দেশের হয়ে কাজ করতে ছলে-বলে বাধ্য করে সে, এবং সরকারকে খুশি করে যুদ্ধে যাওয়া থেকে নিজেকে রক্ষা করে।

'ক্রিমিনাল লইয়ার হিসেবে দেশের পয়সাওয়ালা ক্রিমিনালদের প্রায় সবার সাথে যোগাযোগ ছিল ড্যানিয়েলসের। বিশেষ করে স্যান্ডলার-গ্রোভারদের মত সম্মানিত ক্রিমিনালদের সমাজে সে ছিল ত্রাণকর্তার মত। আরেক গুরুত্বপূর্ণ সরকারী কর্মকর্তা, ফেডারেল প্রসিকিউটর আর্চিবল্ড ম্যাকফেড্রিসের সাথেও যথেষ্ট দহরম-মহরম ছিল তার। সেই লোকের মাধ্যমে স্যান্ডলার-গ্রোভারকে সামনে ঠেলে দেয়ার আয়োজন পাকা করে ড্যানিয়েলস। ইনজিনিয়াস, রিয়েলি।

'ওদের ফেডারেল প্রিজন এড়ানোর কোন পথ ছিল না। নিজ মক্কেলদের ভবিষ্যৎ খুব ভালই জানত ড্যানিয়েলস, অতএব দেশপ্রেমিক হওয়ার পরামর্শ দিল সে ওদের। নাকের সামনে মূলা ঝুলিয়ে—হয় রাজি হও, নয় জেলে যাও। অবশ্য নিজে দেয়নি। ম্যাকফেড্রিসকে দিয়ে প্রস্তাব দেয়াল সে ওদের দু'জনকে, আগে থেকে প্রস্তুত নাটকের মঞ্চে। রাজি হওয়া ছাড়া উপায় ছিল না স্যান্ডলার-গ্রোভারের ক্রিমিনালরা বেঁচে গেল জেল-জরিমানা থেকে, ড্যানিয়েলস রেহাই পেল যুদ্ধে যাওয়ার হাত থেকে, আর সরকারও খুশি হলো দারুণ দুই ওস্তাদ স্পাই পেয়ে।'

অনেকক্ষণ চুপ করে থাকল মাসুদ রানা। অন্যরাও কেউ নীরবতা ভঙ্গ করল না। সবাই ডুবে আছে যে যার চিন্তায়। ড্যানিয়েলসের মুখটা চোখের সামনে ভেসে উঠছে রানার বার বার। দলিলগুলো গচ্ছিত রাখার প্রস্তাব ও সবিনয়ে প্রত্যাখ্যান করার পর দীর্ঘসময় করুণ মুখে বসে ছিল বৃদ্ধ অ্যাটর্নি। বিড় বিড় করে বলেছিল, 'সারা জীবন পাপ করেছি আমি। মহাপাপ করেছি। আশা করেছিলাম, মৃত্যুর আগে অন্তত একটা ভাল কাজ করেছি, এই সান্ত্বনা নিয়ে চোখ বুজব। তা বোধহয় আর হলো না।'

বৃদ্ধের মন্তব্য, করুণ চেহারা দেখে খুব খারাপ লেগেছিল ওর। জটিল এক আইনগত বিষয়ে অতীতে তার সাহায্য অনেক বড় ঝামেলা থেকে বাঁচিয়ে দিয়েছিল মাসুদ রানাকে। সে কথা ভেবে, মৃত্যু পথযাত্রী একজন মানুষকে আশ্বস্ত করার জন্যেই দায়িত্বটা নিয়েছিল ও। তখন কে জানত ওর মধ্যে এত ঝামেলার বীজ বোনা ছিল?

'জেঙ্গার জানত এসব?' প্রশ্ন করল রানা।

হেসে উঠল হোয়াইটসাইড। 'জানত না মানে? খুব ভাল জানত। সে-ও একই কম্ম করেছে ওই সময়ে। যদিও ড্যানিয়েলসের মত সাফল্য দেখাতে পারেনি।'

আবার ভাবতে বসল মাসুদ রানা। গ্রোভার-হোয়াইটসাইডের মুখে শোনা কাহিনীর কোথাও কোন ফাঁক আছে কি না খুঁজছে। এমন একটা ফাঁক, যাতে অবিশ্বাস জন্মে ওর। এ সব মিথ্যে বলে উড়িয়ে দিতে পারে ও। কিন্তু পেল না খুঁজে রানা। যে শূন্য স্থানগুলো ছিল, হোয়াইটসাইড-গ্রোভার পূরণ করে দিয়েছে তার অনেকগুলো। নিখুঁতভাবে। তবু, আরেকটু বাজিয়ে দেখা দরকার।

'আপনি আসল পিটার হোয়াইটসাইড কি না সে ব্যাপারে যথেষ্ট সন্দেহ আছে আমার,' বলল মাসুদ রানা। 'আমার জানামতে ১৯৮১ সালের জুন মাসে মৃত্যু হয়েছে তার।'

কৌতুকপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকাল বৃদ্ধ। ভুরু নাচাল। '১৪ জুনের কারাকাস-মায়ামি অ্যাভিয়াঙ্কা ফ্লাইট বিধ্বস্ত হওয়ার ফলে?' হাসল লোকটা। 'বুঝতে পারছি। স্যান্ডলারের মেয়ে বলে নিজেকে দাবি করছে যে ইমপোস্টার, সে আপনার মাথাটা গুলিয়ে দিয়েছে, মাসুদ রানা। উল্টোপাল্টা বলে।'

চুপ করে গেল রানা। ভেবে পাচ্ছে না কি বলবে। পাকস্থলীতে কেমন এক অনুভূতি। মনে হচ্ছে যেন ডুবে যাচ্ছে ও।

'হুঁম! ঠিক ধরেছি।' মাথা দোলাল বৃদ্ধ। 'ওই মেয়েটিই করেছে তাহলে একাজ। তাই না?' রানা উত্তর দিচ্ছে না দেখে আবার মাথা দোলাল। 'শুনুন

তাহলে। লেসলি ম্যাকঅ্যাডামের পালক পিতা, জর্জ ম্যাকঅ্যাডাম ছিল এক...'

'জানি আমি সে কি ছিল।'

'ওয়েল, দেন। আমি আর জর্জ গুরুত্বপূর্ণ কাজে কারাকাস গিয়েছিলাম সে বছর। কাজ সেরে ১৪ তারিখের অ্যাভিয়াঙ্কা ফ্লাইটে মায়ামি যাওয়ার কথা ছিল আমাদের ঠিকই। কিন্তু শেষ মুহূর্তে যাত্রা বাতিল করে দিই আমরা। কারণ আমাদের কাছে সংবাদ আসে, আমাদের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের নমুনা হিসেবে ওই বিমানে বোমা পেতে রেখেছে কেজিবি-র চরেরা। আমরা যাত্রা বিরতি করলেও বোমা তার কাজ বন্ধ রাখেনি। সময়মত ফাটে বোমা, ধ্বংস হয়ে যায় বিমান।

'যাত্রা বাতিল করে ছদ্মবেশে বিমান বন্দর ত্যাগ করি আমি আর জর্জ। তারপর দুর্ঘটনার খবর পাই। এবং কারাকাস এয়ারপোর্টের উঁচু পদের লোকজনের সঙ্গে খানিকটা লেন-দেন করে নিহত যাত্রীদের তালিকায় আমাদের নাম দুটো তুলে দেই। খুব সহজ কাজ, সত্যি। অফিশিয়ালি মরে গেলাম আমরা। আমরাও খুশি, ওদিকে যারা বোমাটা পেতেছিল, তারাও খুশি। ভেতরের খবর জানলাম শুধু আমরা।'

ঘোঁৎ করে নাক টানল লোকটা। 'এখন আপনিই ভেবে ঠিক করুন, কার কথা বিশ্বাস করবেন। আমার কথা, না কাউন্টারফেইট লেসলির কথা?'

'ও নকল বলেই সেদিন আমার বাড়ির ভেতরে ঢোকেনি,' বলে উঠল জোনাথন গ্রোভার। 'ওর ভয় ছিল ওকে চিনে ফেলব আমি। আসল লেসলি যে বেঁচে নেই, আর কেউ না জানুক, আমরা তো জানি।'

'অথবা এমনও হতে পারে,' ফোড়ন কাটল মাসুদ রানা, 'বাপের মত তারই এককালের ঘনিষ্ঠ সহযোগী আরেক পেটি ক্রিমিনালের মুখোমুখি হতে রুচিতে বেধেছে বলেই ভেতরে যায়নি মেয়েটি, হতে পারে না? ভাল কথা, ডি সেপিটোর ক্যারিয়ার ছেড়ে কবে থেকে জোনাথন গ্রোভার হলেন আপনি?'

'নভেম্বর তেরো, চৌষট্টি। ঠিক যেদিন গান ডাউন করা হলো আর্থার স্যান্ডলারকে, সেদিন থেকে।'

'স্যান্ডলারের যুদ্ধ পরবর্তী ব্যাপার-স্যাপার সম্পর্কে আপনাকে আমি আগেই কিছু কিছু বলেছি,' বলল হোয়াইটসাইড। 'যুদ্ধ শেষে পশ্চিমে না এসে তার পুবে সরে পড়া, তারপর দীর্ঘ সময় নিয়ে সেখান থেকে তার আমেরিকায় প্রত্যাবর্তন, ইত্যাদি বহুদিন যাবৎ তার মার্কিন ইন্টেলিজেন্স কর্মকর্তাদের যথেষ্ট ভাবিয়েছে। এই ভাবনা ক্রমে দুর্ভাবনায় মোড় নেয়। সঙ্গে যোগ হয় টাকার প্রশ্ন। যুদ্ধ থেকে ফিরেই এত নগদ টাকা পেল কোথায় সে এটাও ছিল তাদের আরেক মাথা ব্যথার কারণ। ভিক্টোরিয়া স্যান্ডলারের এক ডলার বিলের প্রতি আসক্তিও সন্দেহের চোখে দেখতে শুরু করে এফবিআই।

'অতঃপর একসময় সন্দেহ দৃঢ় হয় তাদের, লাইনে কোথাও কোন গণ্ডগোল ঘটে গেছে সবার অজান্তে। বুঝে ফেলে সবাই এখন আর আমেরিকার মুঠোয় নেই স্যান্ডলার, রাশিয়ার কাছে নিজের আত্মা বেচে দিয়ে এসেছে সে। অবশ্য কবে, কখন, কোথায় বা কার দ্বারা ব্যাপারটা ঘটেছে জানত না ওরা। আজও জানে কি না সন্দেহ।'

'গ্রেফতার করা হলো না কেন লোকটাকে?'

'এত সহজ?' হাতের তালু চিৎ করে কাঁধ ঝাঁকাল বৃদ্ধ। 'প্রমাণ কই? প্রমাণ করতে হবে না ব্যাপারটা কোর্টে? আমেরিকান কোর্টে এসব অপরাধীকে সাজা দিতে হলে যে ধরনের প্রমাণ প্রয়োজন, তার প্রায় কিছুই ছিল না এফবিআই-এর হাতে। তাছাড়া আরও একটা ঝুঁকিও ছিল। কোর্টে স্যান্ডলারকে তোলা হলে মামলার স্বার্থেই আরও অনেক আন্ডারকভার এজেন্টের নাম আলোচনায় উঠে আসত, রেফারেন্স বা সাক্ষী হিসেবে। এক্সপোজড হয়ে যেত তারা। তাই সে ঝুঁকি নেয়নি মার্কিন সরকার।'

'তারপর কি হলো?' মট্ করে হাতের আঙুল ফোটাল হোয়াইটসাইড। 'পাউন্ড জাল করে বাজার সয়লাব করে ফেলার অপরাধে স্যান্ডলারকে আমরা খুঁজছিলাম, শায়েস্তা করব বলে। আই মীন, "স্পুট ডাউন" করার জন্যে। আমেরিকানরাও রুশদের দলে ভেড়ার অপরাধে তার একটা বিহিত করতে চাইছিল। সেই সময়, অর্থাৎ ১৯৬৪ সালে, আপনি জানেন, গ্রোভার আরেক মামলায় ফেঁসে গিয়ে জেলে ঢোকার অপেক্ষায় ছিল। ওর উকিল, ড্যানিয়েলস উীল করছিল ওর কেস।

'তো, সে-ই ম্যাকফেড্রিসের সাথে এ নিয়ে আলোচনায় বসল। ট্র্যাশ কালেকশনের কোর্স পুরো করতে আর একটা পদক্ষেপ বাকি রয়ে গেছে গ্রোভারের, স্যান্ডলারকে হত্যার মাধ্যমে সেটা সে পুরো করতে পারে, ব্যাপারটা স্মরণ করিয়ে দিল ড্যানিয়েলস ম্যাকফেড্রিসকে। খুব খুশি হলো স্পেশাল প্রসিকিউটর। রাজি হয়ে গেল। জানিয়ে দিল, যদি কাজটা করে দেয় গ্রোভার, তাহলে তার বিরুদ্ধে দায়ের করা অতীত এবং বর্তমানের সমস্ত মামলা প্রত্যাহার করে নেয়া হবে। সরকারী ডিক্রিবলে চিরদিনের জন্যে ক্ষমা করে দেয়া হবে তাকে। প্লাস নিউ ইয়র্কের বাইরে আর কোথাও গিয়ে বসবাসের জন্যে সরকার অর্থ, নতুন পরিচয়পত্র ইত্যাদি দিয়ে তাকে সহায়তা করবে।'

'সঙ্গে সঙ্গে সে প্রস্তাবে রাজি হয়ে গেলাম আমি,' বলে উঠল গ্রোভার। 'ওদের জানিয়ে দিলাম, কাজটা আমাকে নিজের মত করে করতে দিতে হবে। আমার নিজের ঘনিষ্ঠ সঙ্গীদের নিয়ে করব আমি ও কাজ।'

'সাথে আরও দু'জন ছিল আপনার,' মন্তব্য করল মাসুদ রানা।

'হ্যাঁ, তাই।'

'ওয়েল,' মৃদু কণ্ঠে বলল হোয়াইটসাইড। 'লন্ডন এবং ওয়াশিংটন, উভয়ই এরকম এক সুযোগের অপেক্ষায় ছিল। খবর শুনে খুশি হয়ে উঠলাম আমি। সানন্দে এসে যোগ দিলাম গ্রোভারের সঙ্গী হিসেবে। কারণ স্যান্ডলারকে আমি মৃত দেখতে চাইছিলাম।'

বিস্মিত চোখে বৃদ্ধকে দেখল রানা কয়েক মুহূর্ত। 'আপনি নিজে?'

'হ্যাঁ,' দুই আঙুলে নাকের ডগা ডলল লোকটা। 'আর আমাদের আরেক সঙ্গী ছিল রজার্স হান্টার।'

লোকটার দিকে তাকাল মাসুদ রানা। তার কুচকুচে কালো দাড়ির ভেতর ঝকঝকে সাদা, সুগঠিত দুই সারি দাঁত দেখা গেল। হাসছে হান্টার।

'বুকে-পেটে কম করেও এক ডজন বুলেট ঢুকিয়ে দিয়ে এসেছিলাম আমরা

স্যান্ডলারের,' বলল গ্রোভার।

'তার ডবলের,' সংশোধন করে দিল রানা।

'হ্যাঁ,' বলল হোয়াইটসাইড। 'কিন্তু কার দোষে ঘটল এমন একটা ঘটনা?'

'আপনার।'

'ভুল!' চোখ লাল করে তাকাল সে। 'একদম ভুল। কার পরিকল্পনা ছিল এটা এর মধ্যেই ভুলে গেলেন? কে সাজিয়েছিল এ নাটক? কি করে স্যান্ডলারের জায়গায় তার "ডবল" স্থান পেল, কার বুদ্ধিতে সময়মত তাকে সামনে ঠেলে দিয়ে পালিয়ে গেল সে? মাথা খাটান। নিজেই উত্তর পেয়ে যাবেন। অনুমান করার চেষ্টা করুন, কোন দেশ আর্থার স্যান্ডলারের নিখুঁত "ডবল" সরবরাহ করল?'

চুপ করে গেল মাসুদ রানা। বুঝতে পেরেছে।

'ড্যানিয়েলস!' গলায় রাগ রাগ ভাব ফুটল বৃদ্ধের। 'ব্লাডি ড্যানিয়েলস! কায়দা করে আরেকজনকে তোপের মুখে ঠেলে দিয়েছে সে। কেন? দীর্ঘদিনের বন্ধু, মক্কেলকে রক্ষা করার জন্যে। এমনই চাল চেলেছিল সে যে প্রায় আড়াই দশক ধরে দুনিয়ার সবাই জানত মরে গেছে আর্থার। দিনে-দুপুরে খুন হয়েছে সে নিউ ইয়র্কের রাস্তায়।'

'অর্থাৎ এখন আপনারা নিশ্চিত জানেন বেঁচে আছে আর্থার?' পায়ের ওপর পা তুলে বসল মাসুদ রানা।

'হ্যাঁ। বেঁচে আছে সে।'

'কি করে জানলেন?'

'আপনি যেদিন আমার বাসায় যান,' বলল গ্রোভার। 'একটা নীল পন্টিয়াক দেখেছেন, সামনে পার্ক করা ছিল?'

'দেখেছি।'

'ওটার আরোহীকে?'

'হ্যাঁ।'

'লোকটার নাম পল হ্যামন্ড। আমাকে কিছু জাল ডলার বিল দেখাতে গিয়েছিল সে। এফ.বি.আই-এর ট্রেজারি এজেন্ট লোকটা। তার আগেও একদিন এসেছিল সে।

'এক থেকে একশো ডলার বিলের বেশ কিছু জাল নোট দেখায় সে আমাকে। এতই নিখুঁত নোটগুলো, ধরা খুব শক্ত। আমি জানি এমন নিখুঁত কাজ কেবল একজনই করতে পারে। কেবল একজনই। সে আর্থার স্যান্ডলার।'

'শুধু ওগুলো দেখাতেই আসে হ্যামন্ড? না আর কোন কারণও ছিল?'

'জানতে এসেছিল কাজটা কার হতে পারে বলে আমার সন্দেহ।' আবার সিগারেট ধরাল গ্রোভার। 'নোটগুলো নতুন। মানে, সাম্প্রতিক-কালের তৈরি।'

'কি উত্তর দিয়েছেন আপনি?'

'একই কথা। আপনাকে যা বললাম এইমাত্র।'

হোয়াইটসাইডের দিকে তাকাল মাসুদ রানা। 'গ্রোভারের মুখে তার সঙ্গে হ্যামন্ডের প্রথমবার সাক্ষাতের খবর পেয়ে এ দেশে আসি আমি,' বলল বৃদ্ধ। 'আমার ধারণা, নতুন করে আবার যখন ডলার জাল করতে শুরু করেছে আর্থার,

তখন এ দেশেই সে আছে। লোকটাকে ট্রেস করার সম্ভাব্য পাঁচটা পথ ছিল। অন্তত কিছুদিন আগে পর্যন্ত, এখন একটাও নেই।' হতাশ দেখাল বৃদ্ধকে।

'যেমন?'

'এক ছিল ভিক্টোরিয়া স্যান্ডলার। নেই সে। মরে গেছে। তার কয়েক বছর আগে ছিল ড্যানিয়েলস, সে-ও নেই। তার কবর খুঁড়লে এখন হাড়গোড় হয়তো পাওয়া যাবে। গেল দুই। তৃতীয়, ড্যানিয়েলস অ্যান্ড জেঙ্গার অ্যাসোসিয়েটসের আর্থার স্যান্ডলার সংক্রান্ত ফাইলগুলো পেলে হয়তো কিছু একটা করা যেত, তা-ও নেই। মরার আগে সে সমস্ত ধ্বংস করে দিয়ে গেছে ড্যানিয়েলস। কিচ্ছু রেখে যায়নি হারামীর হাড়টা। আর ছিল আপনার কাছে রেখে যাওয়া তার কাগজপত্র। ওগুলোর মধ্যে নিঃসন্দেহে কোন না কোন সূত্র ছিল।' থামল বৃদ্ধ। চিন্তিত মুখে দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল। 'আর যদি কয়েকটা বছর আগে নাক তুলত ব্যাটা।'

'পঞ্চম সম্ভাব্য সূত্র? জেঙ্গার?'

'না। তার সাথে ড্যানিয়েলসের মত অন্তরঙ্গ সম্পর্ক ছিল না স্যান্ডলারের।'

'তো?'

'আপনি,' নির্বিকার চেহারায় বলল বৃদ্ধ।

'কি বললেন?' সোজা হয়ে বসল মাসুদ রানা।

'ঠিকই বলেছি। আপনি-ই পঞ্চম এবং শেষ সূত্র আমাদের।'

'বুঝলাম না। তার মানে?'

মনে হলো শুনতে পায়নি বৃদ্ধ ওর প্রশ্ন। আপনমনে বলে চলেছে মৃদু গলায়, 'কালো খাতায় আপনার নাম আগে থেকেই উঠে আছে, মাসুদ রানা। মৃত্যুর খাতায়। সে রাতে আপনি মরতেন যদি হত্যাকারীরা বেচারী মার্ক রাইডারকে আপনি ভেবে ভুলটা করে না বসত। আপনার সৌভাগ্য যে আপনার "বদলে" আরেকজন মরেছে।'

'জানি। কিন্তু আমাকে কে হত্যা করতে চাইবে, আর্থার স্যান্ডলার? কেন? ড্যানিয়েলসের ফাইলে কি ছিল, আমি তার কিছুই জানি না। ওটা যেভাবে দিয়ে গিয়েছে সে, সেভাবেই পড়ে ছিল। ভুলেই গিয়েছিলাম আমি ওটার কথা। তাহলে...'

'একটা পয়েন্ট মিস করছেন আপনি, মিস্টার রানা। আপনি সে ফাইল পড়েছেন কি পড়েননি, খুনী তা জানে না। জানতে চায়ও না। সে ধরে নিয়েছে আপনি ওর বিষয়বস্তু জানেন, দ্যাট'স অল। সেজন্যেই মৃত্যুদণ্ডের খাঁড়া ঝুলিয়েছে ওরা আপনার মাথার ওপর।'

'কিন্তু আর্থার...' আবার বাধা পড়ায় থেমে গেল রানা।

'আর্থার নয়।'

'তাহলে?' চোখ কোঁচকাল ও।

'লেসলি ম্যাকঅ্যাডাম,' দৃঢ় কণ্ঠে বলল হোয়াইটসাইড। 'ওই মেয়েই খুন করবে আপনাকে। যে কোন মুহূর্তে।'

'লেসলি! কেন এমন মনে হচ্ছে আপনাদের?'

নাক টানল বৃদ্ধ। 'আমার বিশ্বাস লেসলি এবং তার বন্ধুরা চব্বিশ ঘণ্টার

জন্যে মাইক্রোস্কোপের নিচে রেখেছে আপনাকে। আপনার প্রতিটি পদক্ষেপের ওপর নজর রাখছে ওরা। আপনার মত অভিজ্ঞ এক এসপিওনাজ এজেন্টকে সে এরই মধ্যে প্রায় বিশ্বাস করিয়ে ফেলেছে যে সে-ই আসল লেসলি। স্যান্ডলারের বিশাল সম্পত্তির একমাত্র ওয়ারিশ। সে-ক্ষেত্রে খাটা-খাটনি করে আইনের কাছেও কোন একদিন নিজেকে হয়তো সে ওই পরিচয়ে দাঁড় করিয়ে ফেলতে পারবে। পারবে-ই এমন কথা বলছি না। বলছি, হয়তো পারবে। এবং সে জন্যে স্যান্ডলার সম্পর্কে কিছু গুরুত্বপূর্ণ, যাকে বলে কী-কোয়েশ্চেনের উত্তর খুঁজে বের করার উদ্দেশ্যে হন্যে হয়ে লেগেছে সে।

'ওসব না জানলে চলবে না তার। যেইমাত্র সে-সব জেনে তাকে জানাবেন আপনি, অমনি হত্যা করবে আপনাকে লেসলি।'

মুচকে হাসল রানা। 'এত সহজে পৌঁছে গেলেন সিদ্ধান্তে?'

'মানে?' চোখ কোঁচকাল হোয়াইটসাইড।

'লেসলির প্রশ্নের উত্তরের জন্যে যদি এ মুহূর্তে আমার বেঁচে থাকা জরুরী-ই হয়ে থাকে, তাহলে সে-রাতে আমাকে কেন হত্যা করার উদ্যোগ নিয়েছিল সে? আমি মরে গেলে কে তাকে এনে দিত উত্তর?'

'না। আমি প্রথম অ্যাটেম্পট-এর কথা বোঝাচ্ছি না। ওটা সম্ভবত স্যান্ডলার নিয়েছিল। আপনি ড্যানিয়েলসের ফাইল খোয়া যাওয়া নিয়ে যাতে বাতাসে সন্দেহ ছড়াবার সুযোগ না পান, সে জন্যে প্রথম চান্সটা সে-ই নিয়েছিল বলে আমার বিশ্বাস। যাতে আপনি ওইসব কাগজে চোখ বোলাবার সুযোগ না পান, কী কোয়েশ্চেনগুলোর উত্তর জানতে না পারেন। মানলাম, আপনি পড়েননি ওসব, ভেতরের কিছুই জানেন না, কিন্তু স্যান্ডলার কি তা জানত? না, জানত না।

'তবে যেহেতু আপনাকে শেষ করার প্রথম সুযোগটা হারিয়েছে সে, সেহেতু আর না এগোনোই বুদ্ধিমানের কাজ হবে ভেবে সরে পড়েছে। গোপন যা ছিল, তা যাতে গোপনেই থাকে, সেই ব্যবস্থা করেছে ফাইলটা সরিয়ে। এখন এই নকল লেসলি জানতে চাইছে কি ছিল ওতে। জানা হয়ে গেলেই তার কাছে আপনার প্রয়োজন ফুরিয়ে যাবে।'

কয়েক মুহূর্ত ভাবল মাসুদ রানা। 'আপনাদের এ দেশে আসার কারণ কি? স্যান্ডলারকে হত্যা করা?'

'সেটা এখনই বলতে পারছি না আপনাকে। দুঃখিত। তবে কথা দিচ্ছি, সময় হলেই জানাব। এবার, মিস্টার মাসুদ রানা, এতক্ষণ আপনার অনেক অজানা প্রশ্নের জবাব আমরা দিয়েছি। আমাদের কেবল একটা প্রশ্নের উত্তর জানা নেই স্যান্ডলার সম্পর্কে। দয়া করে সে ব্যাপারে সাহায্য করুন আমাদের।'

'কোন্ প্রশ্ন?'

'কাদের হয়ে কাজ করত আসলে স্যান্ডলার, হানস? বলশেভিক? নাকি কাউবয়দের হয়ে? মেয়েটি জানে সব। ওকে জিজ্ঞেস করুন। উত্তর পেয়ে যাবেন। প্লীজ, এই কাজটা অন্তত করে দিন আমাদের।'

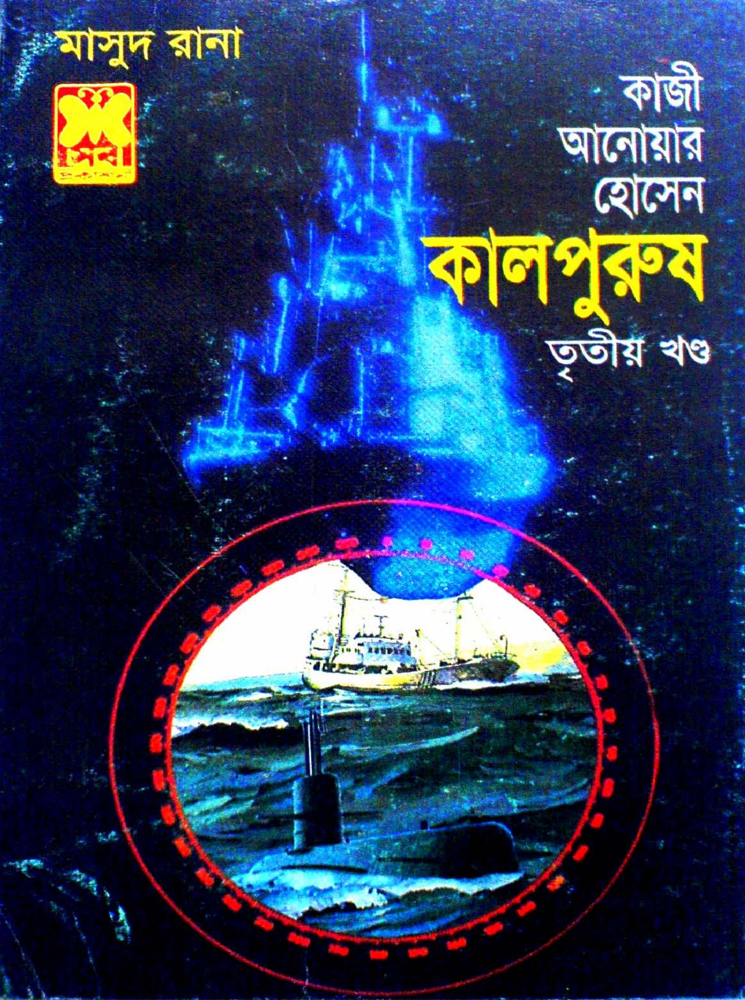
মাসুদ রানা
কাজী
আনোয়ার
হোসেন
কালপুরুষ
তৃতীয় খণ্ড

মাসুদ রানা

কালপুরুষ

তৃতীয় খণ্ড

কাজী আনোয়ার হোসেন

বুঝতে পারছে মাসুদ রানা, ডবল নয়, আসলে 'ট্রিপল এজেন্ট' ছিল আর্থার স্যাণ্ডলার। সত্যিই কি তাই?
পুলিসের ডিটেকটিভ সাশাদের ধারণা, যে-কোন মুহূর্তে খুন হতে যাচ্ছে মাসুদ রানা। ওর ওপর কড়া নজর রাখল সে। কিন্তু তারপরও...। কে হত্যা করল জ্যাকবাসকে? রুমানিয়ান রোটা ফিল্মসের গার্ডটিকে?
অবশেষে যখন আর্থার স্যাণ্ডলারের খোঁজ পেল মাসুদ রানা, দেরি হয়ে গেছে তখন।

সাগরে মাথা তুলেছে এক রুশ সাবমেরিন। তুলে নিয়ে যেতে এসেছে লোকটিকে। মাঝ সাগরে বোটের তেল ফুরিয়ে গেল রানার। চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছে, সাবমেরিনে উঠে পড়েছে স্যাণ্ডলার।
তারপর? শেষ রক্ষা করতে পারবে কি মাসুদ রানা?

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

সেবা প্রকাশনী, ২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
শো-রুম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
শো-রুম: ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

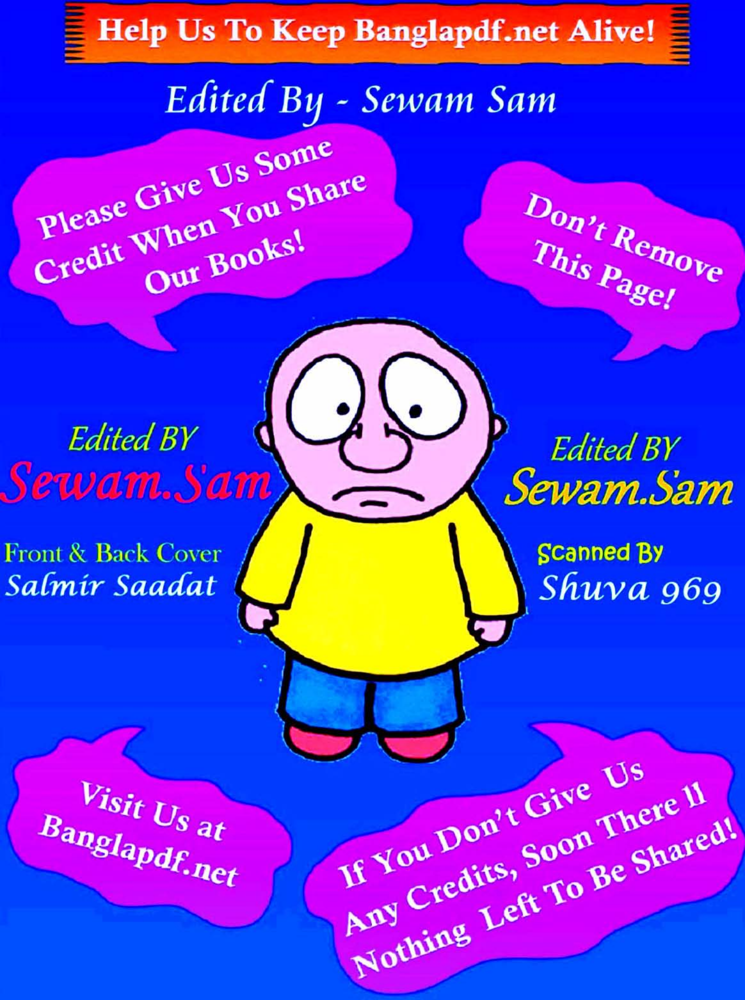
Help Us To Keep Banglapdf.net Alive!
Edited By - Sewam Sam
Please Give Us Some Credit When You Share Our Books!
Don't Remove This Page!
Edited BY
Sewam.Sam
Front & Back Cover
Salmir Saadat
Edited BY
Sewam.Sam
Scanned By
Shuva 969
Visit Us at Banglapdf.net
If You Don't Give Us Any Credits, Soon There ll Nothing Left To Be Shared!

কাল পুরুষ-৩

প্রথম প্রকাশ: ১৯৯৬

এক

সকাল আটটা। অ্যাস্টোরিয়া, কুইনস। নিজের দোতলা অ্যাপার্টমেন্ট ভবনের সামনে পুরানো ফোর্ডটা দাঁড় করাল জ্যাকবাস। চোখেমুখে রাত জাগার ছাপ। স্টার্ট বন্ধ করল সে, চাবির গোছা নিয়ে বেরিয়ে এসে দড়াম করে লাগিয়ে দিল দরজা। ক্লান্তি আর দুশ্চিন্তা, দুইয়ে মিলে বেশ কাহিল করে ফেলেছে জ্যাকবাসকে।

এত বছর শত্রু দেশে, শত্রু পরিবেষ্টিত হয়ে সাফল্যের সাথে নিজের ওপর অর্পিত দায়িত্ব পালন করে এসেছে জ্যাকবাস, অন্তত এতদিন পর্যন্ত সে রকমই ছিল তার ধারণা। শেষ সময়ে দেখা গেল ব্যর্থ হয়েছে সে। যে দায়িত্ব পালনের জন্যে রানা এজেন্সির কাঁধে চাপিয়ে দেয়া হয়েছিল তাকে, তা করতে ভীষণভাবে ব্যর্থ হয়েছে জ্যাকবাস। পরিকল্পনা অনুযায়ী আগুন সে ঠিকই লাগিয়েছিল, কিন্তু যার জন্যে এত সব, সেই স্যান্ডলার ফাইল সময়মত খুঁজে পায়নি। তার আগেই ওটা কে যে হাতিয়ে নিয়েছে, মাথায় খেলছে না জ্যাকবাসের। নাকে ঝামেলা, বিপদ ইত্যাদির গন্ধ পাচ্ছে সে গত ক'দিন থেকে।

ভোর রাতে পথের মাঝে সিটি পুলিসের হাতে সন্দেহজনক গতিবিধির কারণে ধরা খেয়েছে বোগদান বেলিয়া, তার মানে লোকটার ওপর নজর রাখা হচ্ছিল ইদানীং। কেন? আসলেই তার ওপর নজর রাখছিল ওরা, নাকি জ্যাকবাসের ওপর? তাকে অনুসরণ করতে গিয়ে বেলিয়ার খোঁজ পেয়েছে পুলিস? ওদিকে গত দু'দিন ধরে রোটা ফিলমসের ওপর নজর রাখছে পুলিস এবং রানা এজেন্সি। ব্যাপারটা জায়গামত রিপোর্ট করেছে জ্যাকবাস।

জবাবে তাকে 'রেড লাইট অ্যালার্ট' সঙ্কেত জানিয়েছে মস্কো। যতক্ষণ না 'অল ক্লীয়ার' সঙ্কেত আসছে, আর কিছু করার নেই তার। একদম সোজা পথে সোজা হয়ে চলতে হবে। সামান্য এদিক-ওদিক হলেই ফেঁসে যেতে হবে জনমের মত।

স্যান্ডলার ফাইলের নিখোঁজ রহস্য নিয়ে খানিক মাথা ঘামাল জ্যাকবাস, এগিয়ে এসে দরজার তালায় চাবি ঢোকাল। পুরানো একটা টুইন ডুপ্লেক্স অ্যাপার্টমেন্ট হাউস এটা। নিচতলায় বড়সড় লিভিংরূম আর একটা বাথরূম ছাড়া কিছু নেই। বেডরূম ইত্যাদি সব ওপরতলায়। পাশের ফ্ল্যাটে থাকে বাড়িওয়ালা। ভেতরে ঢুকে সশব্দে দরজা বন্ধ করল জ্যাকবাস। নিজেকে জঘন্য এক রুশ গাল দিল। যে ভাষা এ দেশে পা রাখার পর বলতে গেলে উচ্চারণই করেনি সে, আজ করল। একটা গালে সন্তুষ্ট হতে পারল না, তাই আরেকটা দিল জ্যাকবাস। এটা আরও নোংরা।

সিঁড়িগোড়ায় দণ্ডায়মান এক ভাস স্ট্যান্ডে হাতের কালো রঙের ধাতব লাঞ্চ বক্সটা আছড়ে রাখল সে। দরজার ভেতরদিকের হুকে ঝুলিয়ে রাখল ওভারকোট। ঘুমে চোখ বুজে আসছে জ্যাকবাসের। ওপরে উঠতে ইচ্ছে করছে না। তাই সরু

হলওয়ে পেরিয়ে লিভিংরুমে চলে এল সে, এখানেই খানিক ঘুমিয়ে নেবে সোফার ওপর। কয়েক পা এগিয়ে এল সে, এবং জমে গেল মূর্তির মত।

চোখে দেখার আগেই বুঝে ফেলল জ্যাকবাস ঘরে আর কেউ আছে। চর্কির মত ঘুরে দাঁড়াল সে, ওর দশ হাতের মধ্যে বসে আছে আরেক মূর্তি। একেবারে বাঁ কোণের এক আর্মচেয়ারে পায়ের ওপর পা তুলে বসে আছে সে। হাতে খুদে একটা পিস্তল। মুখে বিদ্রূপের বাঁকা হাসি।

আঁতকে উঠল জ্যাকবাস। আরেকটা গাল বকল নিজের উদ্দেশে, তবে এবার নিঃশব্দে, ঠোঁট না নাড়িয়ে। বিস্মিত চোখে তার বুক সই করে ধরা ভোঁতা নাকের পিস্তলটা দেখল জ্যাকবাস, তারপর তাকাল ওটা যে ধরে আছে, তার নিষ্পলক চোখের দিকে। খুনীর দৃষ্টি চিনতে ভুল হলো না জ্যাকবাসের, শিউরে উঠল সে ভেতরে ভেতরে। বরফ শীতল একটা হাত মুঠো করে চেপে ধরেছে যেন হৃৎপিণ্ড, দম নিতে কষ্ট হচ্ছে তার।

'হ্যালো, সের্গেই সোলাভস্কি!' মৃদু কণ্ঠে, আলাপের সুরে বলে উঠল মূর্তি। 'নোড়ো না যেন। আমি খুব দুর্বল চিত্তের মানুষ, ঘাবড়ে গেলে গুলি করে বসতে পারি।'

'কে আপনি?' গলায় রাগ রাগ একটা ভাব ফোটাতে গিয়ে ব্যর্থ হলো জ্যাকবাস। বুঝে গেছে ও যে-ই হোক, তাকে খুব ভাল করেই চেনে। নইলে নিজের যে নাম সে নিজেই ভুলতে বসেছে সে নামে সম্বোধন করত না। 'কি চান আমার কাছে? টাকা-পয়সা? আমি গরীব মানুষ, ডাকাতি করার...'

'থামো থামো,' নড়ে উঠল মূর্তি। 'তুমি বেশি কথা বলো। চুপ করো। ক্লাসিক্যাল মিউজিক কেমন লাগে তোমার?'

'কি?' হতভম্ব চেহারা হলো জ্যাকবাসের।

'স্টারভিনস্কি?' হাসল মূর্তিটা। 'নিশ্চই পছন্দ করো? করা উচিত। আফটার অল, তোমার দেশী মিউজিশিয়ান।'

'কি যা-তা বকছেন? কে আপনি?'

হাসি বহাল রেখে গ্লাভস পরা বাঁ হাত বাড়াল অনাহূত আগন্তুক। তার নাগালের মধ্যেই রয়েছে জ্যাকবাসের দামী সিডি প্লেয়ারটা। 'তোমার পছন্দ ভেবে ভদ্রলোকের একটা ডিস্ক ভরেই রেখেছি আমি এর ভেতর। ফায়ারবার্ড স্যুইট। শোনো!'

প্লে বাটন টিপে দিল আগন্তুক। ভল্যুম বাড়িয়ে দিল অনেকটা, গমগমে আওয়াজে ভরে উঠল লিভিংরুম, চাপা পড়ে গেল আর সব।

ধারণাটা বদ্ধমূল হলো জ্যাকবাসের, জীবন-মৃত্যুর একেবারে মাঝ সীমানায় দাঁড়িয়ে আছে সে। যে কোন মুহূর্তে ঠেলা দিয়ে সীমারেখাটা পার করে দেবে ওকে আগন্তুক। খুব সহজ যুক্তি। গুলি করতে যাচ্ছে সে এখন তাকে, আওয়াজ চাপা দেয়ার জন্যেই স্টারভিনস্কির প্রয়োজন পড়েছে। কান ফাটানো শব্দে বেজে চলেছে অর্কেস্ট্রা। স্টারভিনস্কি হারামজাদা কি জানত তার সৃষ্টি জ্যাকবাসের জন্যে কী অনাসৃষ্টি বয়ে আনবে একদিন? ভাবল, খুব দ্রুত যদি লাফ দেয় সে, চোখের পলকে, পারবে না আগন্তুকের লাইন অভ ফায়ারের সামনে থেকে সরে যেতে? এক লাফে হলওয়ে, তারপর সেখান থেকে দরজা...। পারবে সে আগন্তুককে

ট্রিগার টানার সময় না দিয়ে নিরাপদে আড়ালে সরে যেতে?

মিউজিকের লয় দ্রুত থেকে দ্রুততর হচ্ছে। ড্রাম আর সিম্বলের আলাপ চূড়ান্ত পরিণতির প্রায় কাছাকাছি পৌঁছে গেছে। এই সময়, ঠিক যে মুহূর্তে জ্যাকবাসের মনে হলো তার হবু হত্যাকারী সামান্য ঢিল দিয়েছে পেশীতে, লাফ দিল সে।

কিন্তু হিসেবে ভুল ছিল তার, পেশীতে ঢিল আদৌ দেয়নি খুনী। হিসেবের ব্যাপারটা যখন টের পেল জ্যাকবাস, তখন দেরি হয়ে গেছে, ভুল শোধরাবার আর কোন পথ ছিল না সামনে। লাফটা দেয়ার সঙ্গে সঙ্গে আগুনের ঝলক উদ্গিরণ করল আগন্তুকের ভোঁতা পিস্তল, বুকের ঠিক মাঝখানে মুগুরের ভয়ঙ্কর এক ঘা খেয়ে শূন্যে থাকা অবস্থায়ই কয়েক ফুট পিছিয়ে গেল বিশালদেহী জ্যাকবাস।

নিজের কানেই শুনতে পেল সে বুকের হাড়গোড় চুরমার হওয়ার আওয়াজ। ভেতরে ঢুকে আকাশমুখো ছুটল বুলেটটা। পরমুহূর্তে দ্বিতীয় ও শেষবারের মত অগ্ন্যুৎপাত ঘটাল পিস্তল, প্রথমটার মাত্র সিকি সেকেন্ড পর, বাঁ পাঁজরের দুই রিব বোনের মাঝের নরম চামড়া-চর্বির স্তর ছেঁদা করে ঢুকে গেল ওটাও, সোজা গিয়ে তার হৃৎপিণ্ডের রাইট ভেন্ট্রিকল ছিঁড়েখুঁড়ে তছনছ করে দিল। বুকের ঠিক মাঝখানে অবর্ণনীয় এক তীব্র বেদনা অনুভব করে আপনাআপনি কুঁকড়ে গেল জ্যাকবাসের দেহ। মনে হলো কেউ যেন তীক্ষ্ণধার, ছুঁচোল এক তরবারি সেঁধিয়ে দিয়েছে কলজের ভেতর। টের পেল জ্যাকবাস, পড়ে যাচ্ছে সে।

ওই পর্যন্তই। আর কিছু অনুভব করার সুযোগ হলো না জ্যাকবাসের। ঘরদোর কাঁপিয়ে আছড়ে পড়ল সে মেঝেতে, অথচ অভিজ্ঞতাটা অর্জন করার সময় হলো না। সংঘর্ষটা টের পেল কেবল তার দেহ, এত বছর যে ওটায় ভর করে চরে বেড়িয়েছে, সে কিছুই জানল না। তার আগেই নিজের চারণভূমি ত্যাগ করে গেছে সে।

বাঁকাচোরা ভঙ্গিতে কাত হয়ে পড়ল জ্যাকবাস। তার নিতম্বের চাপে কাঠের তৈরি মোটা ছাতার স্ট্যান্ডটা মট্ করে ভেঙে গেল মাঝখান থেকে। একটা হাত দেহের নিচে চাপা পড়ে আছে জ্যাকবাসের, অন্য হাত সামনে প্রসারিত। আতঙ্কিত দু'চোখ বিস্ফারিত, নিবদ্ধ রয়েছে সামনের দেয়ালে।

ধীরে ধীরে কমে আসছে মিউজিকের আওয়াজ, শেষ হয়ে আসছে। শিকারের প্রাণহীন চোখে চোখ রেখে সিডি রেকর্ডারটা অফ করে দিল শিকারী। অলস ভঙ্গিতে আসন ছাড়ল সে। পিস্তলটা ওভারকোটের পকেটে ভরে রাখল। পায়ে পায়ে মৃতদেহটার কাছে এসে দাঁড়াল। চেহারায় রাজ্যের বিতৃষ্ণা আর ঘৃণা। লাথি মেরে দেহটা চিত করতে চাইল সে, কিন্তু পুরোপুরি সফল হলো না। কোমরের ওপরের অংশটা সামান্য পাশ ফিরল কেবল। হাঁটু মুড়ে বসল অনুপ্রবেশকারী তার পাশে। শিথিল বাঁ হাতের কবজি, গলার পাশে আঙুল রেখে জ্যাকবাসের পালস পরীক্ষা করে দেখল।

নেই।

'আমি একটা কবর খুঁড়ে রেখে গেলাম,' বলল বৃদ্ধ। মাসুদ রানার মুখোমুখি বসা

সে। বয়সের ভারে যত না কাহিল সে, তারচেয়ে বহু গুণ কাহিল রোগ-শোকে। মুখের-কপালের চামড়া কুঁচকে বিচ্ছিরি অবস্থা তার। চোখের মণি অস্বচ্ছ, জমিন ঘোলাটে। দৃষ্টি অস্থির।

'কবর! কার জন্যে?' প্রশ্ন করল রানা সবিস্ময়ে।

'তা জানি না। তোমারও হতে পারে, আবার...'

'আমার কবর!'

'বললাম তো, জানি না। তোমারও হতে পারে, অন্য কারও হতে পারে। ব্যাপারটা নির্ভর করবে তোমরা কে কতটা বুদ্ধিমান, তার ওপর।'

' "তোমরা" বলতে?'

রেগে উঠল বৃদ্ধ। 'এই সহজ কথাটা বুঝছ না? তোমরা মানে তুমি আর সে। যার সাথে বুদ্ধির প্রতিযোগিতায় নামতে হবে তোমাকে।'

'তাই তো জানতে চাইছি আমি, "সে"টা কে? তার সাথে কোন্ বুদ্ধির প্রতিযোগিতায় নামতে হবে আমাকে? কেন?'

একটু ভাবল বৃদ্ধ। 'তার পরিচয়টা পরে শুনো। প্রথমে বরং তোমার "কেন"র উত্তরটা বলি, ঠিক আছে?'

মাথা দোলাল মাসুদ রানা। 'তাই না হয় বলুন।'

'কারণ তুমি ভাল মানুষ।'

কান চুলকাল ও। কথাটা ঠিক শুনেছে কি না ভেবে সন্দেহ জেগেছে মনে। 'কি বললেন, ভাল মানুষ?'

'হ্যাঁ।' হাসি ফুটল বৃদ্ধের কোঁচকানো মুখে।

'আমি ভাল মানুষ?'

'নিশ্চই!'

'তাই আমার জন্যে কবর খুঁড়েছেন আপনি?' দু'চোখে বাঁধ ভাঙা বিস্ময় নিয়ে লোকটাকে দেখছে মাসুদ রানা।

'হ্যাঁ!'

গম্ভীর হয়ে গেল রানা। 'ঠাট্টা করছেন?'

'কেন, ঠাট্টা করব কেন?'

'নয়তো কি? ভাল মানুষের জন্যে কবর খুঁড়ে রেখেছেন, আর বলছেন ঠাট্টা করব কেন? পেয়েছেন কি আপনি আমাকে?'

মিটিমিটি হাসছে বৃদ্ধ, যেন খুব মজা পাচ্ছে ওর ছেলেমানুষী দেখে। 'এই দেখো, তুমি কিন্তু রেগে যাচ্ছ আমার ওপর।'

'রাগব না? আপনি যত রাজ্যের...'

'না, রাগবে না। কারণ আমার কথা এখনও শেষ হয়নি।'

'ও। তো ঠিক আছে, শেষ করুন কথা।'

'কবর যে তোমার জন্যেই খুঁড়েছি, তা কিন্তু একবারও বলিনি আমি, মানে, নিশ্চিত করে আর কি। আমি যা বলেছি, তার আসল অর্থ হচ্ছে যেহেতু তুমি ভাল মানুষ, সেহেতু আমার মানবিক অনুরোধটা ফেলতে পারবে না তুমি। এবং তা রক্ষা করতে গিয়ে বুদ্ধির দৌড়ে যদি বাই চান্স হেরে যাও, তখন ওই কবরে শেষ

আশ্রয় জুটবে তোমার। কিন্তু আমি জানি…' ইচ্ছে করে থেমে গেল বৃদ্ধ।

'কি?'

'তুমি হারবে না।'

'তাই?'

'হ্যা। তুমি জিতবে। বুদ্ধির দৌড়ে হেরে যাওয়ার পাত্র তুমি নও, আমি খুব ভাল করে জানি তা। জানি বলেই তোমার সাহায্য চাইতে এসেছি। যদি একটু সতর্ক থাকো, চোখকান খোলা রাখো, তুমি জিতে যাবে। সে হেরে যাবে। তখন কবরটা তার কাজে লাগবে। এবার বুঝলে?'

'বুঝলাম। কিন্তু "সে" কে, তা তো বললেন না?'

নিম পাতার রস খাওয়া চেহারা হলো বৃদ্ধের। 'এই তো দিলে বিপদে ফেলে। নাম বলে ফেললে তো সব বলা হয়ে গেল। তাহলে এর মধ্যে বুদ্ধির প্রতিযোগিতা বলে কিছু থাকবে না।'

'কার সাথে প্রতিযোগিতায় নামতে হবে আমাকে, তাকে চিনতে হবে না? নইলে কি বাতাসের সাথে…'

'এই তো বুঝেছ!'

'কি?'

'প্রতিযোগিতা প্রথমে হবে তোমার বাতাসের সাথেই। বাতাসই এক সময় বলে দেবে কে তোমার প্রতিযোগী, মানে আসল প্রতিযোগী। বাতাসের ভাষা যদি সময়মত বুঝতে সক্ষম হও, গ্যারান্টি দিয়ে বলতে পারি তুমি জয়ী হবে। এবং ওই কবর তোমার প্রতিদ্বন্দ্বীর জন্যে নির্ধারিত হয়ে যাবে।'

অনেকক্ষণ কথা বলল না মাসুদ রানা। ভাবছে আকাশ-পাতাল। 'বেশ, ঠিক আছে। এবার তাহলে শোনা যাক আপনার মানবিক অনুরোধটা কি?'

'ফেললে আরেক নতুন বিপদে,' বিড়বিড় করে বলল বৃদ্ধ।

'মানে?'

'ওটাও এ মুহূর্তে বলা যাবে না।'

অপলক চোখে লোকটার দিকে তাকিয়ে থাকল মাসুদ রানা, লোকটা ঠাট্টা করছে কি না বুঝতে চায়। কিন্তু না, তার মুখ দেখে সেরকম কিছু বোঝার উপায় নেই। আসলেই সিরিয়াস মনে হচ্ছে।

'আমি আগেই বলেছি,' বলে উঠল বৃদ্ধ। 'তুমি ভাল মানুষ, তাই খালি হাতে আমাকে ফিরিয়ে দিতে পারবে না তুমি। আর তাই যাওয়ার আগে তোমাকে পথ দেখিয়ে দিয়ে যাব আমি, যে পথে চললে জয় তোমার অনিবার্য। আসলে,' আনমনা হয়ে গেল বৃদ্ধ। হাতের ছড়ির হাতল এদিক-ওদিক ঘোরাতে লাগল। 'তোমাকে হেরে গেলে চলবে না, ইয়াং ম্যান। তোমাকে জয়ী হতেই হবে, যে কোন মূল্যে। মিথ্যে, অশুভকে পরাজিত করতে না পারলে সত্য আর শুভ কি করে টিকে থাকবে পৃথিবীতে? আর ওসব যদি না-ই থাকে, পৃথিবী-ই বা…' আচমকা থেমে গেল মানুষটা।

'জানো, খুব ইচ্ছে ছিল আমি নিজেই করব লড়াই, জয়ী হয়ে বীরের মত মরব। কিন্তু পারলাম না।'

'কেন পারলেন না?'

উত্তরটা একটু ঘুরিয়ে দিল বৃদ্ধ। 'পারলে তোমার সাহায্য চাইতাম না।'

'বুঝলাম,' বলল মাসুদ রানা। 'কিন্তু পারলেন না কেন? বাধা ছিল কোথায়?'

'বাধা?' করুণ হাসি দিল লোকটা। 'আমিই যে আমার সবচে' বড় বাধা।'

'বুঝলাম না।'

'ও আমার নিজের হাতের সৃষ্টি, মাসুদ রানা। কোন্ প্রাণে ওকে ধ্বংস করি আমি, তুমিই বলো?'

বিস্মিত হলো ও। 'কার কথা বলছেন?'

ফোঁস করে দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল লোকটা। 'তোমার শত্রুর কথা, যাকে ধ্বংস করে তোমাকে সত্য প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। সে যাক, যা বলছিলাম। আমার দেখানো পথে চললে তুমি জয়ী হবে, আমি জানি। তুমি সাহসী, সৎ। তুমি...'

'থাক থাক,' অস্বস্তি বোধ করল মাসুদ রানা। 'এখন বলুন আমাকে কি করতে হবে, কোন্ পথে এগুতে হবে?'

রহস্যময় হাসি ফুটল তার মুখে। 'সে পথ তুমি চেনো, মাসুদ রানা। তোমার চেয়ে বেশি কেউ জানে না তার হদিস। সময়মত তোমার অবচেতন মন বলে দেবে কোন পথে এগোতে হবে তোমাকে। শুধু একটু মাথা খাটিয়ো, পরিষ্কার বুঝতে পারবে সব। আর একটা কথা, শত্রু কিন্তু তোমার আশেপাশেই আছে।' আসন ছাড়ল বৃদ্ধ। 'চলি, অনেক বিরক্ত করলাম তোমাকে।'

'কী আশ্চর্য! এত কথার মধ্যে আসল কথা তো বললেন না কিছুই! সাহায্য কাকে করব, কে আমার শত্রু, কোন পথে চলতে হবে আমাকে, লড়াই করে কোন সত্য প্রতিষ্ঠিত করব, কিছু না বলেই চলে যাচ্ছেন!'

'বুঝতে ভুল হচ্ছে তোমার। আমি আসলে সবই বলেছি।'

রেগে গেল মাসুদ রানা। ঘুমটাও ভেঙে গেল সাথে সাথে। চোখ মেলতেই পায়ের দিকে দেয়াল ঘড়ির ওপর চোখ পড়ল–সকাল সাতটা। একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে উঠে বসল ও। উইলিয়াম ওয়ার্ড ড্যানিয়েলসের চেহারা এখনও ভাসছে চোখে। স্বপ্নেও হেঁয়ালি করে গেল মানুষটা!

ভাবনার গোলকধাঁধায় ঘুরে মরতে লাগল রানা। ড্যানিয়েলস সম্পর্কে ওর যে সীমিত জ্ঞান, বিশ্বাস ছিল, পিটার হোয়াইটসাইডের প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিতে দোল খেতে শুরু করেছে তা। মানুষটা আসলে কি ছিল, তাই নিয়ে মারাত্মক বিভ্রান্তিতে পড়েছে মাসুদ রানা। ওর জানামতে আজীবন প্রচণ্ড দেশ প্রেমিক ছিলেন ড্যানিয়েলস। ব্যাপারটা এতদিন ছিল প্রশ্নাতীত। অথচ তাই নিয়ে আজ প্রশ্ন তুলেছে হোয়াইটসাইড, প্রশ্ন তুলেছে তাঁর কর্মকাণ্ড নিয়ে। সত্যিই কি পর্দার আড়ালে অন্য ধরনের কোন কিছুতে নিয়োজিত ছিলেন ড্যানিয়েলস?

কি হতে পারে তা? নিজ দেশের স্বার্থ বিরোধী কিছু? তাই যদি হয়, সে ক্ষেত্রে ম্যাকফেড্রিস কেন সহযোগিতা করবে তাঁকে তাঁর লক্ষ্যে পৌছুতে? কোন কিছু নজর এড়িয়ে যাচ্ছে না তো ওর? ভাবল মাসুদ রানা। এমন কিছু, যা চোখের সামনে ভাসছে, অথচ গুরুত্ব দিচ্ছে না ও? একটার পর একটা সিগারেট ধ্বংস করতে লাগল মাসুদ রানা। কিন্তু কাজ হয় না, মাথায় খেলে না কিছু।

কেন প্রশ্ন উঠল ড্যানিয়েলসের সততা নিয়ে, দেশপ্রেম নিয়ে? কেন উঠল? এর পিছনে আদতেই কি কোন কারণ আছে? আর্থার স্যান্ডলারকে কায়দা করে যে মানুষ আমেরিকার পক্ষের স্পাইয়ে পরিণত করেছিল, তার দেশপ্রেম নিয়ে প্রশ্ন তোলা...হাস্যকর নয়? স্যান্ডলার যদি ভেতরে ভেতরে পক্ষ বদল করেও থাকে, সে জন্যে ড্যানিয়েলসকে সন্দেহের তালিকায় ফেলা...

আচমকা টেলিফোনের বেলের আওয়াজে বাস্তবে ফিরল মাসুদ রানা। ঘাড় ঘুরিয়ে সেটের দিকে চেয়ে থাকল ও, উঠে ধরতে ইচ্ছে করছে না। কিন্তু সে দিকে ও ব্যাটার লক্ষ আছে বলে মনে হয় না, বেজেই চলেছে। পঞ্চম রিঙে হাল ছেড়ে উঠে এল মাসুদ রানা, কানে লাগাল রিসিভার। 'ইয়েস!'

'রানা?' লেসলি ম্যাকঅ্যাডামের কণ্ঠস্বর।

'হ্যাঁ, বলো।' মেয়েটির গলা শুনে আবার সেই পুরানো প্রশ্নটা জাগল মনে, সত্যিই কি এ আসল লেসলি?

'মন দিয়ে শোনো,' চাপা উত্তেজনা টের পাওয়া গেল তার বলার মধ্যে। 'ব্যাপারটা খুব গুরুত্বপূর্ণ।'

'তোমাকে খুব আপসেট মনে হচ্ছে।'

'আপসেট নয়, সতর্ক।'

'খারাপ কিছু ঘটেছে?'

'ঘটতে যাচ্ছে।'

'কি সেটা?' ভুরু কোঁচকাল মাসুদ রানা।

'যারা আমার পিছু লেগেছে, তারা হঠাৎ করে খুব কাছিয়ে এসেছে বলে মনে হচ্ছে আমার। একেবারে ঘাড়ের ওপর চলে এসেছে।'

'হঠাৎ করে?'

'অবস্থাদৃষ্টে সেরকমই মনে হচ্ছে।'

'কি করে বুঝলে?'

'আছে,' অসহিষ্ণু কণ্ঠে বলল লেসলি। 'কারণ আছে। আমি তোমাকে জানাব পরে। এখন সময় নেই।'

'ঠিক আছে।' একটু ভাবল মাসুদ রানা। 'বলো, আর কি বলবে? এই খবর দেয়ার জন্যে নিশ্চই ফোন করোনি তুমি?'

'না, অন্য কারণ আছে।'

'বলে যাও।'

'এই মুহূর্তে অ্যাপার্টমেন্ট ত্যাগ করো তুমি।'

'বুঝলাম না,' চোখ কোঁচকালে ও।

'বলছি, এই মুহূর্তে তুমি তোমার অ্যাপার্টমেন্ট ত্যাগ করো। এই মুহূর্তে। প্রস্তুত হয়ে বের হও, কারণ দিনটা বাইরেই থাকতে হবে তোমাকে।'

'তোমার কথা কিছুই বুঝতে পারছি না আমি, লেসলি,' চিন্তিত গলায় বলল রানা। 'আমাকে কেন ঘরছাড়া হতে হবে তোমার...'

'রানা, প্লীজ! আমার কথা শোনো। আমি তো বলেছি পরে সব জানাব। তোমার যে-কোন প্রশ্নের উত্তর দেব। কিন্তু এখন সে সবের সময় নেই, পরিস্থিতি

গুরুতর।'

কী এমন ঘটল এর মধ্যে পরিস্থিতির বুঝে উঠতে পারল না মাসুদ রানা। চিন্তা আরও বেড়ে গেল। 'আচ্ছা, ঠিক আছে, বলে যাও।'

'ধন্যবাদ। এখনই বেরিয়ে পড়ো বাসা থেকে, অন্তত আজকের দিনের জন্যে। পরিচিত কোথাও নয়, এমন কোথাও চলে যাও যেখানে তোমাকে খুঁজে পাওয়া ওদের জন্যে মুশকিল হবে। দিনটা ভালয় ভালয় কাটানো গেলে রাতে কোথাও মিলিত হব আমরা। সেখানে বসে সব কথা হবে।'

'ঠিক আছে,' খানিক ইতস্তত করে ব্যাপারটা মেনে নিল ও। 'যাচ্ছি আমি। কিন্তু রাতে কোথায় দেখা হচ্ছে আমাদের? ক'টার সময়?'

'যে কোন জায়গায়, মাঝরাতের পর অবশ্য। এবং জনশূন্যও হতে হবে সে জায়গা। রাত বারোটার পর এরকম উপযুক্ত নির্জন জায়গা কোথায় আছে এখানে, বলতে পারো?'

'সেন্ট্রাল পার্ক। ভোর চারটের দিকে। তুমি যা চাইছ তাতে ওটাই সবদিক থেকে উপযুক্ত।'

'ঠিক আছে। ওখানেই আসব আমি।'

গম্ভীর হয়ে গেল রানা। 'পাগলের মত কথা বলছ তুমি। ওই সময় সেন্ট্রাল পার্কে একা একা যাওয়ার কথা কোন ছেলেও ভাবে না, মেয়ে তো পরের কথা। ওর মত বাজে জায়গা দুনিয়ায় দ্বিতীয়টি নেই।'

মোটেই ঘাবড়াল না লেসলি। দৃঢ়তার সাথে বলল, 'ওখানেই আসব আমি, রানা।'

'লেসলি, জায়গাটা…'

'আমি পরোয়া করি না। সেন্ট্রাল পার্কের কোন অংশ? তাড়াতাড়ি বলো হাতে সময় কম। কোথায় অপেক্ষা করব আমি?'

লেসলির গলায় ব্যস্ততা ও অসহিষ্ণুতা, দুটোই টের পাচ্ছে মাসুদ রানা। দম ফেলছে সে কাঁপা কাঁপা, উত্তেজনার লক্ষণ। কোন রোডসাইড বুদ থেকে ফোন করছে লেসলি, গাড়ির হর্ন, এবং এঞ্জিনের, রাস্তার সাথে টায়ার ঘর্ষণের আওয়াজ ইত্যাদি শুনতে পাচ্ছে রানা। 'পার্কের গ্রেট লন চেনো?'

'না। তবে চিনে নেব।'

'বেশ। গ্রেট লনের পুব দিকে পাথরের স্তম্ভ ধরনের আছে একটা। এইটি থার্ড এবং এইটি ফোর্থের মাঝামাঝি জায়গায়। ওখানটায় আসতে পারো তুমি।'

একটু ভাবল লেসলি। 'তুমি আগে পৌঁছে যেয়ো। আমি খুঁজে নেব তোমাকে।'

'ক'টায়?'

'চারটায় না বললে তুমি?'

'তাই বলে সত্যি সত্যি…'

'ওটাই উপযুক্ত সময় হবে।'

'ঠিক আছে। তুমি যখন বলছ।'

'তাহলে চারটাই ঠিক থাকল।'

'ঠিক আছে। কিন্তু লেসলি, ব্যাপারটা আসলে কি নিয়ে…?'
'তোমার প্রাণ নিয়ে, রানা।'
'কি?'
'আমার ওপর আস্থা যদি রাখতে পারো, তোমারই ভাল হবে, রানা। নইলে যে কোন মুহূর্তে মৃত্যু হতে পারে তোমার। অন্তত এইবারটি বিনা প্রশ্নে আমার কথামত কাজ করো, বিশ্বাস করো আমাকে।'
ফোঁস করে দম ছাড়ল মাসুদ রানা। 'অল রাইট।'
ও প্রান্তে অপারেটরের রেকর্ড করা গলা শোনা গেল, সময় শেষ হওয়ার সতর্কবাণী শোনাচ্ছে সে লেসলিকে। পটে কয়েন ফেলল লেসলি, থেমে গেল রেকর্ড। 'রানা?'
'এদিক-ওদিক ছোটাছুটি না করে দিনটা আমি আমার অফিসে কাটাতে পারি না? ওখানে নিরাপত্তা আছে। ইচ্ছে করলে…'
'এইমাত্র তুমিই বললে আজ আমার কথামত চলবে, বলোনি?'
'আচ্ছা, ঠিক আছে। কথাটা উইথড্র করে নিলাম।'
'গুড। ওই কথাই থাকল তাহলে, কেমন? রাখলাম।'

জ্যাকবাসের হলওয়েতে দাঁড়িয়ে আছে ডিটেকটিভ অ্যারাম সাশাদ। ঝুঁকে পড়ে দেখছে লাশ। ওটার চারদিকে ক্যামেরা নিয়ে মাছির মত ভন ভন করছে দুই ফটোগ্রাফার। একজন পুলিসের, অন্যজন মেডিক্যাল এক্সামিনার'স অফিসের।
অনেকগুলো স্ন্যাপ নিল ওরা মৃতদেহের, নানান অ্যাঙ্গেল থেকে। আরেক ডিটেকটিভ, জ্যাক গ্রিমাল্ডি দাঁড়িয়ে আছে মৃতদেহের ওপাশে। চেহারায় দুঃখ দুঃখ ভাব। একসময় চোখ তুলে সাশাদের দিকে তাকাল সে। এই অপেক্ষায়ই ছিল যেন সাশাদ।
'দিলে তো সব বরবাদ করে?' খেঁকিয়ে উঠল সে।
চোখ নামিয়ে নিল লোকটা। 'দুঃখিত। বুঝতে পারিনি আমরা।'
'আমরা! আমরাটা আবার কে শুনি? তোমার পালা চলার সময় তোমারই ভোঁতা নাকের ডগায় মারা গেল লোকটা, এর মধ্যে আমরা এল কোত্থেকে?' হতাশ ভঙ্গিতে মাথা দোলাল সাশাদ। 'তোমাকে প্রফেশনাল ভেবেছিলাম। এখন দেখছি তুমি কাব স্কাউট। তোমাকে পালা প্রধান করে এখন আমাকে আক্কেল সেলামী না দিতে হয়।'
আমসত্ত্বের মত শুকনো মুখ করে দাঁড়িয়ে থাকল গ্রিমাল্ডি। নিজেকে আড়াল করার জন্যে যুক্তির গর্ত খুঁজল খানিক, না পেয়ে চোখ নামিয়ে নিল। কথা নেই মুখে। তার সঙ্গী, এড ব্রুকারের অবস্থাও এক।
পায়ের শব্দে ঘুরে তাকাল সাশাদ। শওকত আর ইউনুস এসে দাঁড়িয়েছে ঘরের মধ্যে। ওদের এক নজর দেখে মুখ ঘুরিয়ে নিল সে। পাত্তা দিল না। ফরেনসিক ডিটেকটিভদের দিকে তাকাল। সারা ঘরে তন্ন তন্ন করে হত্যাকারীর হাতের ছাপ খুঁজছে তারা। প্যাটি হেরেন রয়েছে তাদের সাথে। এক কোণে চুপচাপ দাঁড়িয়ে পুলিসী তৎপরতা দেখতে লাগল শওকত-ইউনুস।

'এনি লাক?'

মাথা দোলাল হেরেন। চেহারায় হতাশা। 'নাহ্! যা পাওয়া গেছে সবই এই ব্যাটার,' মৃতদেহটা ইঙ্গিত করল সে।

'খুনী সম্ভবত গ্লাভস পরে ছিল,' মন্তব্য করল এক ফরেনসিক ডিটেকটিভ।

চোখমুখ কোঁচকাল সাশাদ। 'ক্রাইস্ট!' কাঁচা গিলে ফেলার দৃষ্টিতে গ্রিমাল্ডিকে দেখল এক পলক। মাথা ঝাঁকাল। 'ঠিক আছে। আরেকবার শোনা যাক তোমার বক্তব্য। একদম প্রথম থেকে শুরু করো।'

লম্বা করে দম নিল গ্রিমাল্ডি। প্রতিটি শব্দ গুছিয়ে নিল মনে মনে। যথেষ্ট হয়েছে। এত লোকজনের সামনে আর বকাঝকা খেতে চায় না। শুরু করল সে।

আজ ভোর ছ'টায় শুরু হয় গ্রিমাল্ডি ও ব্লকারের বারো ঘণ্টার ডিউটি। ওই সময়ে ইস্ট থার্টিয়েথ স্ট্রীট ও পার্ক অ্যাভিনিউর সংযোগ-স্থলে এসে অবস্থান নেয় তারা আগের শিফটের দু'জনকে বিদায় দিয়ে। দু'ঘণ্টা পর, সকাল আটটায় জ্যাকবাসকে অনুসরণ করে এখানে পৌঁছায় তারা। খানিকটা দূর থেকে দেখতে পায়, তালা খুলে ঘরে ঢুকছে লোকটা। সেই তাকে জীবিত শেষ দেখা।

'এক ব্লক দূরে গাড়ি পার্ক করি আমি,' বলল গ্রিমাল্ডি। 'নজর রাখতে থাকি এই বাড়ির প্রবেশপথের ওপর, আই মীন, বন্ধ দরজার ওপর। বাড়ির পিছনদিকে নজর রাখার জন্যে পাঁচ মিনিট পর এডকে পাঠাই আমি।'

'পিছনদিকে?' এডের দিকে ঘুরল সাশাদ।

'এই বাড়ির পিছনে একটা পেটিওমত আছে,' গলা খাঁকারি দিয়ে শুরু করল এডওয়ার্ড। নার্ভাস। 'সাইড স্ট্রীট থেকে দেখা যায় পরিষ্কার। সাইড স্ট্রীটের এ মাথা ও মাথা পায়চারি করার ফাঁকে পেটিওর ওপর নজর রাখতে থাকি আমি।'

'তারপর?'

'সোয়া আটটার দিকে দেখি সেই মেয়েটি বেরিয়ে আসছে।'

'সেই মেয়েটি?' চোখ কোঁচকাল সাশাদ। ওদের আলাপ মন দিয়ে শুনছে শওকত ও ইউনুস। ওদের চেহারা অভিব্যক্তিহীন। এড যা দেখেছে, ওরাও তাই দেখেছে। তবে 'সেই' শব্দটা কানে বেজেছে দু'জনেরই, আগ্রহী চোখে এডকে দেখছে তাই ওরা।

'যে মেয়েটা সেদিন আইস হকি খেলা দেখতে গিয়েছিল গার্ডেনে, মাসুদ রানার সাথে।'

শক্ত হয়ে গেল ওরা। ওটা যে মেয়ে ছিল, তাতে সন্দেহ নেই শওকত-ইউনুসের। তবে তার পিছনদিকে ছিল বলে মেয়েটির চেহারা দেখতে পায়নি ওরা কেউ। দৃষ্টি বিনিময় হলো দু'জনের। এর মধ্যে লেসলি ম্যাকঅ্যাডাম কেন মাথায় খেলছে না।

ঠাণ্ডা দৃষ্টিতে এডওয়ার্ডের পা থেকে মাথা পর্যন্ত চোখ বোলাল সাশাদ। 'কোন ভুল হচ্ছে না তো তোমার?' অগ্নিদৃষ্টি হানল সে মাসুদ রানার দুই চ্যালার দিকে।

'জ্বি না। আমি ঠিকই দেখেছি।'

'সে এল কোত্থেকে?' প্রশ্নটা এমনভাবে করল সাশাদ, যেন এর উত্তর একমাত্র এডেরই জানার কথা। ভাঙা ছাতার স্ট্যান্ড হয়ে জ্যাকবাসের নিষ্প্রাণ

চোখে স্থির হলো শওকতের দৃষ্টি। চেহারায় কোনরকম ভাবের ছায়া নেই। যদিও কান খাড়া, প্রতিটি শব্দ গিলছে এডের। আর কোন নতুন তথ্য পাওয়া যায় কি না তার অপেক্ষায় আছে।

'জ্যাকবাসের অ্যাপার্টমেন্টের ভেতরে ছিল সে, আমি শিওর। কারণ ও ফ্ল্যাটের পিছন সিঁড়ি দিয়েই তাকে বের হতে দেখেছি আমি।'

'আচ্ছা!'

'জ্বি। বেরিয়ে ঘন ঘন এদিক-ওদিক তাকাচ্ছিল মেয়েটি। আমি তার প্রায় একশো ফুট দূরে ছিলাম। প্রথমে ওই দু'জনকে দেখতে পায় মেয়েটি,' শওকত ও ইউনুসকে দেখাল সে। 'তারপর চোখ পড়ে আমার ওপর। অমনি খুব দ্রুত হাঁটতে আরম্ভ করে সে। বোধহয় আমাকে সন্দেহ করেছিল মেয়েটি।'

'কেন? তোমার কোটের ল্যাপেলে কোন ব্যাজ ছিল? না তুমি তাকে ডেকে বলেছিলে, "দাঁড়াও, আমি পুলিস"?'

সাশাদ ব্যঙ্গ করছে বুঝতে পেরে নজর নামিয়ে নিল এড।

'ওদের সন্দেহ করল না, তোমাকে কেন করল?'

উত্তর নেই।

'তারপর কি?' রাগ গিলে ফেলতে বাধ্য হলো সাশাদ। এখন রাগ করা নিরর্থক। যা হওয়ার হয়ে গেছে। 'বলে যাও।'

'আমি মেয়েটিকে অনুসরণ করতে শুরু করি। কিন্তু বেশি এগোতে পারিনি, কারণ সে এক ছুটে এই বিল্ডিঙের পাশ ঘেঁষে সামনের দিকে চলে যায়। আমিও তাই করতে চেয়েছিলাম, কিন্তু একটা উঁচু ফেন্সের কারণে আটকে যাই। সাইড স্ট্রীট ঘুরে আসতে সময় বেশি লেগে গেল, এসে আর দেখতে পাইনি তাকে। তবে...'

'তবে?'

'আমার বিশ্বাস, একটা নীল পন্টিয়াকে চড়ে পালিয়ে যায় মেয়েটি। সেই গাড়িটা। যেটা সেদিন সেই কার পার্কে আটকেছিলাম আমরা। হকি খেলার দিন।'

'নাম্বার দেখতে পেয়েছিলে গাড়িটার?'

'না। তবে ওটা নিউ ইয়র্ক স্টেটের নয়, এটুকু দেখার সুযোগ হয়েছে।'

'চমৎকার!' দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করল সাশাদ। 'আমারই ভুল হয়েছে। তোমাদের সাথে পুরো পুলিস ফোর্স দিয়ে দেয়া উচিত ছিল আমার।'

'মেয়েটা এ কাজে খুব এক্সপার্ট,' চামড়া বাঁচাবার শেষ চেষ্টা করল গ্রিমাল্ডি। 'যে ভাবে চোখের পলকে হাওয়া হয়ে গেল, এক্সপার্ট না হলে কোনমতেই তা সম্ভব ছিল না।'

'শিওর!' তেতো খাওয়া চেহারা করল সাশাদ। 'যেহেতু তোমরা দুই গ্রেট গ্রেট ডিটেকটিভ পিছু নিয়েছ, এক্সপার্ট না হলে কি আর রক্ষে ছিল তার?'

'সময় কিছুটা বেশি লাগলেও দৌড়ে বিল্ডিঙের সামনে চলে এসেছিলাম আমি,' গায়ে মাখল না এড চীফের টিটকিরি। 'বড়জোর কয়েক সেকেন্ড পিছনে ফেলতে পেরেছিল মেয়েটি আমাকে। অথচ এসে তাকে পেলাম না। শুধু দূরে সেই নীল গাড়িটা মুহূর্তের জন্যে দেখতে পেয়েছি আমি। খুব জোরে অ্যাভিনিউর ও

মাথার দিকে ছুটছিল ওটা।'

'তুমি বলছ মেয়েটা এই বিল্ডিঙের সামনে থেকে গাড়িতে উঠেছে?' সিগারেট ধরাতে গিয়েও থেমে গেল সাশাদ।

'জ্বি।'

গ্রিমাল্ডির দিকে ফিরল সে। 'অথচ সামনে থেকেও তাকে দেখোনি তুমি?'

'জ্বি,' মাথা দোলাল গ্রিমাল্ডি।

'কি জ্বি?' খ্যাঁক করে উঠল সাশাদ। 'দেখেছ, কি দেখোনি?'

'দেখিনি। আসলে এক্সপার্ট ছিল মেয়েটা।'

ওপর নিচে মাথা দোলাল সে। 'বটে। অথচ তোমাদের আমি এক্সপার্ট ভাবতাম এতদিন।' 'খুট' করে গ্যাস লাইটার জ্বালল সাশাদ। সিগারেট ধরিয়ে টান দিল জোরে। হেরেনের দিকে তাকাল। দৃষ্টিতে 'এইসব গাধা কি করে পুলিস অ্যাকাডেমি থেকে পাস করে' ধরনের জিজ্ঞাসা।

পরের ঘটনা ওদের হয়ে হেরেন ব্যাখ্যা করল সাশাদকে। মেয়েটিকে হারানোর পর সারাক্ষণ এখানেই ছিল গ্রিমাল্ডি-এডওয়ার্ড। ভেতরে জ্যাকবাস যে খুন হয়েছে বুঝতে পারেনি। এই পর্যায়ে এসে মাথা দোলাল শওকত-ইউনুস, ওরাও বুঝতে পারেনি কিছু। মেয়েটি যে এই অ্যাপার্টমেন্ট থেকেই বেরিয়েছে, আন্দাজও করেনি ওরা। ভেবেছে পাশের বিল্ডিং থেকে বেরিয়েছে। দুই বাড়ির দুই ব্যাক স্টেয়ার কেসের অবস্থান প্রায় পাশাপাশি।

তারপর, জানাল হেরেন, সন্ধেয় যখন তাকে, মানে জ্যাকবাসকে, রোজকার মত অফিসে যাওয়ার উদ্দেশে বের হতে দেখা গেল না, লোকটা হয়তো ঘুমিয়ে আছে ভেবে তাকে ডেকে দিতে গেল বিল্ডিং ম্যানেজার। দরজা ভেতর থেকে বন্ধ, অথচ বারবার বেল বাজিয়েও জ্যাকবাসের সাড়া পাওয়া যাচ্ছে না দেখে সন্দেহ হলো ম্যানেজারের। বাড়ির মালিককে খবর দিল লোকটা।

সে এসে ডুপ্লিকেট চাবি দিয়ে সামনের দরজা খুলে দেখে ভেতরে এই অবস্থা। রক্তের জমাট পুকুরে কাত হয়ে পড়ে আছে তার ভাড়াটিয়া।

'টে-রিফ-ফিক!' চিবিয়ে চিবিয়ে বলল সাশাদ। চিন্তায় চিন্তায় মাথা ধরে গেছে তার। মেজাজ পুরো টং।

'এখন কি করতে চাও?' প্রশ্ন করল হেরেন।

'মাসুদ রানাকে ধরতে হবে,' প্রায় ফিস ফিস করে বলল সে তার দুই চ্যালার কথা স্মরণ রেখে। ঘড়ি দেখল। সোয়া ছয়টা। 'ওই মেয়েটাকে চাই আমার। মাসুদ রানা জানে কোথায় তাকে পাওয়া যাবে। ভেবেছিলাম ওদের আর ঘাঁটানোর প্রয়োজন হবে না। কিন্তু এখন সে ভাবনা বাদ। ওদের দুটোকেই বেশি বেশি ঘাঁটাতে হবে।'

'আমরা এখন কি করব?' সাশাদ আর হেরেনকে পালা করে দেখল গ্রিমাল্ডি। 'আর কোন নতুন কাজ...'

'হ্যাঁ,' মাথা ঝাঁকাল সাশাদ। 'একটা কাজ আছে। সোজা প্রিসিঙ্কটে চলে যাও। খেয়েদেয়ে ঘুম লাগাও ব্যাকরুমে ঢুকে। যাও।'

'চলো যাই,' তাড়া লাগাল হেরেন। 'দেখি পাই কি না ব্যাটাকে।'

চোখ কুঁচকে সহকর্মীর দিকে তাকাল সাশাদ। 'পাব না কেন?'
কাঁধ ঝাঁকাল সে। 'এমনি বলেছি। মুখ ফসকে বেরিয়ে গেছে।'
পঁয়ত্রিশ মিনিট পর মাসুদ রানার অ্যাপার্টমেন্টের দরজায় নক করল সাশাদ। খুলল না কেউ দরজা। নেই মাসুদ রানা। 'কোথায় গেল ব্যাটা?'
'কে জানে?'
সন্দেহের দৃষ্টিতে হেরেনকে দেখল সে। 'তুমি তখন ওকথা কেন বললে, "দেখি, পাই কি না ব্যাটাকে"?'
হেসে উঠল হেরেন। 'বিশ্বাস করো, বন্ধু। কথাটা মুখ ফসকে বলে ফেলেছি।'
'সত্যি?' তবু সন্দেহ যায় না তার।
'সত্যি। যিশুর কসম।'
বন্ধ দরজার দিকে অন্যমনস্কের মত তাকিয়ে থাকল সাশাদ। 'গেল কোথায়? নাকি আবার ওরা তুলে নিয়ে গেল লোকটাকে?'
'না বোধহয়। আবার তুলে নেয়ার হলে সেবার তাকে ছাড়ত না নিশ্চই ওরা।'
'হ্যাঁ। তাও তো একটা কথা।'

দুই

অদ্ভুত এক সমস্যায় পড়েছে মাসুদ রানা। না পারছে লেসলিকে অবিশ্বাস করতে, না পারছে হোয়াইটসাইডকে উড়িয়ে দিতে। এ লাইনে কোনটা যে সত্যি আর কোনটা মিথ্যে, কে সত্যি বলে কে মিথ্যে বলে, নাটকের একেবারে শেষ মুহূর্তে না পৌঁছানো পর্যন্ত বোঝা খুবই মুশকিল। ভীষণ মুশকিল।

হোয়াইটসাইডের সাথে দ্বিতীয় দফা আলোচনার আগ পর্যন্ত লেসলি ম্যাকঅ্যাডামকে প্রায় পুরোপুরি বিশ্বাস করে ফেলেছিল মাসুদ রানা, অথচ এ মুহূর্তে নতুন করে দোল খেতে আরম্ভ করেছে ওর আস্থা-অনাস্থার পেন্ডুলাম। তবে এটাও ঠিক, সহজাত ইনট্যুইশন রানাকে বলছে লেসলিকে বিশ্বাস করতে। যদিও সারাদিনের এই লুকোচুরির ব্যাপারটা যেন কেমন কেমন লাগছে। ঠিক পছন্দ হচ্ছে না ওর।

কিন্তু কিছু করার নেই। নাটক জমে উঠেছে। যা যা রানা জানতে চায়, কে কোন দলের হয়ে খেলছে, জানার সময় উপস্থিত। ওকে তা জানতে হবে, ঝুঁকি নিয়ে হলেও। জীবনে ঝুঁকি কম নেয়নি মাসুদ রানা। খুব শিগগিরই আরও একটা নিতে হবে। ঠিক করেছে রানা, কায়দা করে লেসলি ও হোয়াইটসাইডকে মুখোমুখি দাঁড় করাবে সে। যেভাবে হোক। একজনকে দিয়ে সনাক্ত করাবে অন্যজনকে। এতে আসল সত্য উদ্ধার করা সহজ ও দ্রুত হবে।

যেভাবেই হোক নিজেকে অত্যন্ত কৌতূহলোদ্দীপক এক অ্যাসাইন-মেন্টে জড়িয়ে ফেলেছে মাসুদ রানা, কোথায় এর শেষ জানতে হবে ওকে। জানতে হবে এতবড় আন্তর্জাতিক এক চক্রান্তের পরিণতি কি হয়। এ থেকে আসলে সরে দাঁড়ানোর কোন উপায়ও নেই এখন ওর। লেগে থাকতে হবে। অতএব, যাচ্ছে ও

আজ রাতে সেন্ট্রাল পার্কে। শঙ্কা যতই থাকুক।

উঠল মাসুদ রানা। নিজেকে যাত্রাদলের অভিনেতা মনে হচ্ছে ওর। বাইরে প্রচণ্ড ঠাণ্ডা, কাজেই নিজেকে সেজন্যে পুরোপুরি প্রস্তুত করে নিল রানা অল্প সময়ের মধ্যে। কোথায় যাবে, সারাদিন কি করে কাটাবে ভাবতে লাগল। এমন কোথাও যেতে হবে, যেখানে 'ওরা' তার নাগাল না পায়। 'ওরা' জানে না মাসুদ রানার আজকের রুটিন, লেসলি জানে। কারণ সে-ই নির্ধারণ করে দিয়েছে কি করতে হবে ওকে আজ। সে কি নজর রাখার ব্যবস্থা করবে ওর ওপর? মাসুদ রানা তার কথামত চলছে কি না বোঝার জন্যে? করতে পারে। কাজেই অন্তত আজকের দিনটা লেসলির ইচ্ছে অনুযায়ী নাচবে রানা। তার 'বন্ধুরা' যদি নজর রাখে রানার গতিবিধির ওপর, দেখবে লেসলির কথামতই চলছে ও।

সাড়ে দশটায় বেরিয়ে পড়ল রানা অ্যাপার্টমেন্ট ছেড়ে। গাড়ি নিল না, ট্যাক্সিতে চেপে রওনা হলো ফোর্টি থার্ড স্ট্রীট, নিউ ইয়র্ক টাইমস আর্কাইভের উদ্দেশে। ইচ্ছে, অকাজে দিনটা মাঠে না মেরে ইতিহাস সম্পর্কে কিঞ্চিৎ জ্ঞান সঞ্চয় করা, ঠাণ্ডার হাত থেকে রেহাই পাওয়া এবং জ্ঞানবৃদ্ধি দুটোই হবে। কপাল ভাল থাকলে ড্যানিয়েলস সম্পর্কে এক আধটা নতুন তথ্যও হয়তো পাওয়া যাবে তাতে। যদিও তেমন আশা খুব কম, তবু চেষ্টা করে দেখা আর কি!

কোন দিক দিয়ে দুপুর গড়িয়ে গেল টেরই পেল না মাসুদ রানা। খিদে চেগিয়ে উঠতে বেরিয়ে পড়ল। কাছের এক রেস্তোরাঁয় খেয়ে তৎক্ষণাৎ ফিরে এল আবার। সন্ধে গড়িয়ে গেল কখন, তাও জানা হলো না। সাড়ে সাতটায় ক্ষ্যান্ত দিল রানা। অনেক হয়েছে। অ্যাটেনডেন্ট ছোকরাকে আরেক প্রস্থ বকশিশ দিয়ে আর্কাইভ ত্যাগ করল ও। পথচারীদের ভিড়ে নিজেকে আড়াল করে ঘণ্টাখানেক হাঁটাহাঁটি করে গরম করে নিল শরীর। তারপর ডিনার। এবার?

রাস্তার ওপারে এক সিনেমা হল দেখে পা বাড়াল মাসুদ রানা। অকারণ ধুম ধাম আর ঢাঁই ঢুঁই দেখে কাটাল দেড় ঘণ্টা। ছবি শেষ হতে বেরিয়ে এসে আনমনে হাঁটতে হাঁটতে ইস্ট ফর্টি সেকেন্ডে চলে এল। ঘড়ি দেখল, মাত্র সাড়ে নয়টা, ইয়াল্লা! আঁতকে উঠল রানা মনে মনে। এখনও সাড়ে ছয় ঘণ্টা বাকি? কি হচ্ছে এসব? নিজেকে প্রশ্ন করল মাসুদ রানা, কি করছি আমি? এর কি কোন প্রয়োজন সত্যিই ছিল?

কার কাছ থেকে নিজেকে লুকিয়ে বেড়াচ্ছি আমি? 'ওদের' কাছ থেকে? 'ওরা' কারা? শীত করছে। ওভারকোটের কলার তুলে দিল মাসুদ রানা, হাঁটতে লাগল দ্রুত পায়ে। গন্তব্য অনিশ্চিত। সাবওয়ে ধরে সেভেন্টি সেভেনথ ও লেক্সিংটনের দিকে রওনা হলো ও। তারপর দীর্ঘ সেভেন্টি সেভেনথ স্ট্রীট হেঁটে অতিক্রম করল, ফার্স্ট অ্যাভিনিউ ছাড়িয়ে সেকেন্ড অ্যাভিনিউতে পড়ল। কয়েক পা যেতে না যেতে বুঝে ফেলল রানা, ধরা পড়ে গেছে ও। ব্যাপারটা এমন এক সময় টের পেল, যখন করার কিছু নেই, একেবারে ওর তিন হাতের মধ্যে এসে দাঁড়িয়েছে তখন সাশাদ ও হেরেন।

প্রথমে সন্দেহ হয় সাশাদের, মাসুদ রানা বিপদে পড়তে যাচ্ছে। হয়তো মৃত্যুও হতে পারে তার। যে কারণে ওর পিছনে ডিটেকটিভ লাগায় সে। কিন্তু

যখন দেখা গেল, শত্রুর হাতে ধরা পড়ে পুরো এক রাত এক দিন গায়েব থাকার পর আবার রানা নাক জাগিয়েছে, হেঁটে-চলে বেড়াচ্ছে, তখন ভয়ের আর কিছু নেই ভেবে সার্ভেইলেন্স প্রত্যাহার করে নিয়েছিল সে।

কাল রাতে নাক জাগিয়েছিল মাসুদ রানা। মাত্র এক রাত পর আবার গায়েব হয়ে যায়। এমনটি ঘটতে পারে কল্পনাই করেনি সে। তাছাড়া অন্যান্য কেস নিয়ে ব্যস্ত ছিল সে, এদিকে খুব একটা খেয়াল দিতে পারেনি। এই ফাঁকে ফের কাটি মেরেছে মাসুদ রানা। স্বেচ্ছায় না আর কারও হাত আছে এতে কে জানে? জ্যাকবাসের বাসা থেকে ফিরে যখন ওকে পেল না সাশাদ, সঙ্গে সঙ্গে আবার ডিটেকটিভ লাগাল সে। রাত দশটায় রানাকে স্পট করে তারা, সাবওয়েতে।

এই আপদের ব্যাপারে একেবারেই উদাসীন ছিল মাসুদ রানা। থাকারই কথা। এমনিতেই কানের ঘায়ে কুত্তা পাগল দশা, তারওপর কে জানত পিছনে ঠোলাও লেগেছে?

'হ্যালো, মাসুদ রানা!' যেন হারানো মাণিক খুঁজে পেয়েছে, এমন এক হাসি দিল অ্যারাম সাশাদ। 'আফটার ডিনার ওয়াক আ মাইল করছিলেন বুঝি?'

চোখ কুঁচকে দুই ডিটেকটিভকে দেখল ও। 'আপনারা?'

'হ্যাঁ, আমরা। কেন, সন্দেহ আছে?'

'মাফ করবেন, অফিসার। আমি একটু ব্যস্ত আছি।'

'আমরাও ব্যস্ত, স্যার।' পাশ কাটিয়ে পা বাড়াতে যাচ্ছিল রানা, চট করে সরে পথরোধ করল ওর সাশাদ। 'এ মুহূর্তে মাফ করা যাচ্ছে না আপনাকে।'

'কি চান আপনারা?' কঠোরতা ফুটল রানার স্বরে।

হাসল ডিটেকটিভ। 'খানিক গল্প করতে চাই আপনার সাথে।' হেরেন একভাবে তাকিয়ে আছে ওর দিকে। কিছু বলছে না।

খানিক ভাবল ও। 'জরুরী কিছু?'

'খু-উ-ব!'

'কাল হলে হয় না?'

'আজ হলে ক্ষতি কি?'

'যদি আপনাদের অনুরোধ রক্ষা করতে রাজি না হই?'

চেহারা করুণ করে তুলল সাশাদ। 'সে বড় দুর্ভাগ্য হবে আমাদের।'

'আপনি হয়তো ভুলে যাচ্ছেন আমি আমার অধিকার সম্পর্কে পুরোপুরি সচেতন। নির্দিষ্ট কোন অভিযোগ যদি আমার বিরুদ্ধে না থেকে থাকে, তাহলে আমাকে বাধ্য করতে পারেন না আপনি, অফিসার।'

বাঁকা হাসি ফুটল সাশাদের মুখে। 'আপনি হয়তো জানেন না, আজ সন্ধেবেলা আপনার অফিসের নাইটগার্ড জ্যাকবাসকে মৃত পাওয়া গেছে তার বাসায়। হত্যা করা হয়েছে লোকটাকে।'

'কি বললেন?' থমকে গেল মাসুদ রানা।

'ঠিকই বলেছি। সম্ভবত সকালে হত্যা করা হয়েছে তাকে। আমরা জেনেছি সন্ধেয়। ওখানে আপনার লোক ছিল, তারাও দেখেছে লাশ।'

চুপ করে থাকল রানা। কি বলবে ভেবে পাচ্ছে না।

'হত্যাকারীকে সনাক্ত করতে পেরেছি আমরা, খুব সম্ভব,' বলে উঠল হেরেন। 'আপনার সেই মেয়ে বান্ধবী, যার সঙ্গে আইস হকি দেখতে গিয়েছিলেন আপনি, হত্যাকাণ্ডটা তার দ্বারাই ঘটেছে। সকালে তাকে জ্যাকবাসের ব্যাক স্টেয়ার দিয়ে বের হতে দেখা গেছে।'

'মেয়েটিকে আমাদের চাই,' বলল সাশাদ। 'আপনি জানেন কোথায় পাওয়া যেতে পারে তাকে। থাকে কোথায় সে?'

অনুসন্ধানী দৃষ্টিতে দুই ডিটেকটিভকে দেখল মাসুদ রানা। 'আমি বিশ্বাস করি না আপনাদের কথা।'

হেরেনের দিকে তাকাল সাশাদ, তারপর আবার রানার দিকে। 'আমরা মিথ্যে বলতে পারি, কিন্তু জ্যাকবাসের মৃতদেহ নিশ্চই সত্যি কথাই বলবে।' হাত তুলে গজ দশেক তফাতে দাঁড়ানো নিজেদের গাড়িটা দেখাল সে। 'বি আওয়ার গেস্ট। চলুন, ঘুরে আসা যাক মেডিক্যাল এগজামিনারের অফিস থেকে।'

আরেকটা কথা কি যেন বলেছিল লেসলি? ভাবল মাসুদ রানা। 'আমার সাথে দেখা না হওয়া পর্যন্ত পরিচিত কারও সামনে কোন ব্যাপারেই মুখ খুলো না'। তাই তো, নাকি? আর কি যেন? 'অন্তত এইবারটি বিনা প্রশ্নে আমার কথামত কাজ করো'। 'আমার ওপর আস্থা যদি রাখতে পারো, তোমারই ভাল হবে'।

'দুঃখিত, অফিসার। আমি যাচ্ছি না।'

'আপনি যাচ্ছেন।'

আগুন ঝরা চোখে ওদের দেখল মাসুদ রানা। তারপর পাশ কাটিয়ে দ্রুত পা বাড়াল নিজের পথে। ঘুরে দাঁড়িয়েই ওর কলার মুঠো করে ধরে ফেলল সাশাদ। 'দুঃখিত। আমরা সোজা পথ দেখাতে চাইলেও বাঁকা পথই দেখছি আপনার পছন্দ। অল রাইট, আমরাও ওই পথেই চলব এখন থেকে। আপনাকে গ্রেফতার করা হলো।'

'আমার অপরাধ?' শান্ত কণ্ঠে জানতে চাইল ও।

'পুলিসের সাথে অসহযোগিতা করা।' হেরেনকে ইশারা করল সে মাসুদ রানাকে সার্চ করতে।

এগিয়ে গেল সে। হোলস্টার থেকে রানার ওয়ালথার এবং কবজির সাথে বাঁধা খাপ থেকে চার ইঞ্চি ব্লেডের তীক্ষ্ণধার এক স্টীলেটো বের করে নিল। তুলে দিল সাশাদের হাতে। আগ্নেয়াস্ত্রটা নেড়েচেড়ে দেখল সে। 'ধরে নিচ্ছি এটা বহন করবার অনুমতি আছে আপনার। কিন্তু এটার নিশ্চই নেই?' ছুরিটা দোলাল সে।

চুপ করে থাকল মাসুদ রানা।

'হুম! ঠিক ধরেছি। এটা মারাত্মক এক অস্ত্র, জানেন তো?'

রানা চুপ।

'এটা সঙ্গে কেন আপনার? এমন মারাত্মক ছুরি?'

'নিউ ইয়র্ক মারাত্মক এক শহর,' থমথমে গলায় বলল ও।

'জানি। সে জন্যে তো পিস্তলই যথেষ্ট। এটা আবার কেন?' রানাকে নীরব দেখে মুখে হাসি ফুটল সাশাদের। 'আগের অভিযোগটা বাদ। এটা বয়ে বেড়ানোর অপরাধে গ্রেফতার করছি আমি আপনাকে।'

শীতল চোখে লোকটাকে দেখল মাসুদ রানা। 'তাহলে আর দেরি কেন? চলুন. কোথায় নিয়ে যাবেন আমাকে। দেখি কত ক্ষমতা আপনার।'

চোখ কোঁচকাল লোকটা। 'আমি কি ধরে নেব আপনি আমাকে ভয় দেখাচ্ছেন, স্যার?'

'আমি যা বললাম, আপনি শুনেছেন। ওর মধ্যে আপনি কি ধরবেন কি ছাড়বেন আপনার ব্যাপার।'

'অল রাইট। চলুন যাওয়া যাক।'

পিছনের সীটে ওঠানো হলো মাসুদ রানাকে। অ্যারাম সাশাদ বসল ওর পাশে। হেরেন গাড়ি ছাড়ল। নাইনটিনথ প্রিসিঙ্কটে নিয়ে আসা হলো ওকে। বসানো হলো সাশাদ ও হেরেনের অফিস রুমে। সোয়া এগারোটা বাজে তখন।

চুপ করে বসে থাকল মাসুদ রানা। চোখ নেচে বেড়াচ্ছে রুমের সর্বত্র। গম্ভীর। লেসলি ম্যাকঅ্যাডামের কথা ভাবছে। আর পৌনে পাঁচ ঘণ্টা পর তার সাথে দেখা হওয়ার কথা ওর। চেয়ারের আর্ত চিৎকারে সামনে তাকাল রানা। হেলান দিয়ে বসল সাশাদ। তার মুখোমুখি বসানো হয়েছে ওকে। পাশের টেবিলটা হেরেনের। সে-ও বসা নিজের চেয়ারে। দু'জনেই দেখছে মাসুদ রানাকে। মুখ খোলাবার চেষ্টা করছে ওর। তাদের একটা দুটো প্রশ্নের জবাব দিচ্ছে ও মাঝেমধ্যে, কিন্তু লেসলি প্রসঙ্গ উঠলেই ঠোঁটে তালা মেরে বসে থাকছে। ঘড়ির কাঁটা ঘুরতে ঘুরতে দেড়টায় এসে পৌঁছল। তার সাথে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে সাশাদের মেজাজ।

'ঠিক আছে,' বলল সে। 'আরেকবার প্রথম থেকে শুনব আমরা ঘটনাটা।'

'কোনটা?' রানাও তেতে উঠেছে ভেতরে ভেতরে। সময় দ্রুত বয়ে যাচ্ছে। লেসলির সাথে দেখা করতে পারবে কি না আজ, সন্দেহ আছে। অথচ ওটা জরুরী।

'আজ, মানে গতকাল সকাল আটটায় কোথায় ছিলেন আপনি?'

'অনেকবার বলেছি সে কথা।'

'আমি শুনেছি। আরেকবার নতুন করে বলুন।'

'একবার কেন, হাজারবারেও আগের বক্তব্য একচুল নড়চড় হবে না আমার। ওই সময় বিছানায় ছিলাম আমি।'

'পরশু রাতে সুজান'স গিয়েছিলেন আপনি, ঠিক?'

রানা নিরুত্তর।

'ওখান থেকে কারা কোথায় নিয়ে গিয়েছিল আপনাকে?'

উত্তর নেই। এ ব্যাটা তা কি করে জানল, ভাবছে।

'অল রাইট। কাল সকালে যে বাসায় ছিলেন, কোন সাক্ষী আছে তার?'

'না।'

'বড়ই দুর্ভাগ্য। সেই মেয়েটির সাথে শেষ দেখা কখন হয়েছে আপনার?'

'দেখা হয়নি, কথা হয়েছে। গতকাল সকালে আমি বিছানা ছাড়ার আগে আমাকে টেলিফোন করে সে।'

'কেন টেলিফোন করেছিল? মানে, বিশেষ কোন কিছু বলতে?'

'হ্যাঁ।'

'কি সেটা?'

'মেয়েটি আমার মক্কেল। আমি তার বিশেষ একটা কেস ডীল করছি। তার মীমাংসা না হওয়া পর্যন্ত এ বিষয়ে কিছু বলা যাবে না।'

'কোথায় থাকে সে?'

রানার মুখে তালা।

'বলুন!'

'আগেই বলেছি জানি না।'

'কোথায় থাকে জানেন না, অথচ সে আপনার মক্কেল?'

'হ্যাঁ।'

'আরেকটু ভেবে উত্তর দিন।'

'অফিসার, বলেইছি তো আমার বক্তব্যের কোন হেরফের হবে না।' সিগারেট ধরাল মাসুদ রানা। চোখ জ্বালা করতে লাগল ধোঁয়া যেতে। হাত ঘুরিয়ে চোখ ডলল ও।

টেবিলে কনুইয়ের ভর রেখে ঝুঁকে এল ডিটেকটিভ। চেহারা রাগে লাল। 'ড্যাম ইট!' হুঙ্কার ছাড়ল সে। মুষ্টিবদ্ধ ডান হাত উল্কার মত বেগে আছড়ে পড়ল টেবিলে। ফাইল, কলমদানি, টেলিফোন সব লাফিয়ে উঠল। 'কোথায় থাকে সে? নাম কি মেয়েটির?'

মাসুদ রানা নিরুত্তর। দু'হাত বুকে বেঁধে সাশাদের জবা ফুলের মত লাল চোখের দিকে অপলক তাকিয়ে আছে।

'কোথায় থাকে সে? বলুন!'

তথৈবচ।

'ড্যামিট! ড্যামিট! ড্যামিট!' মুখ পিছিয়ে নিল মাসুদ রানা। লোকটার ক্রমাগত সিংহের গর্জনে কানের পর্দা ফেটে যাওয়ার অবস্থা। নিতম্বে বিছার কামড় খেয়েছে যেন, এমন ভাবে তড়াক করে লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল সাশাদ। হাঁটুর পিছনে ধাক্কা খেয়ে ছিটকে চলে গেল তার রিভলভিং চেয়ার, আছড়ে পড়ল গিয়ে পিছনের দেয়াল ও স্টীলের ফাইল কেবিনেটের ওপর। কেঁপে উঠল ঘর।

'ফাজলামো হচ্ছে, না?' আরেক ঘুসি বসাল সে টেবিলে। 'রসিকতা করছেন আমার সাথে? দাঁড়ান, বের করছি আপনার রসিকতা!'

ঝড়ের বেগে রুম ত্যাগ করল ডিটেকটিভ। দরজা এত জোরে আছড়ে লাগাল সে মনে হলো পুরো প্রিসিঙ্কট ভবন নড়ে উঠল বুঝি। যেমন বেরিয়ে গেল, দশ সেকেন্ডের মধ্যে তেমনি হুড়মুড় করে আবার ফিরেও এল সে। হাতে প্লাস্টিকের ছোট একটা ব্যাগ। ওটার মুখ সীল করা। ভেতরে মাসুদ রানার ছুরিটা দেখা যাচ্ছে।

'এটা দেখেছেন?' আবার হুঙ্কার ছাড়ল সাশাদ। 'দেখেছেন এটা? আপনি যা- আমাকে সহযোগিতা না করেন, আমিও আপনাকে সহযোগিতা করব না। কি হ- এখন যদি সত্যি সত্যি ফ্রন্ট ডেস্ক সার্জেন্টের হাতে তুলে দেই আপনাকে সীজ করা এই ছুরিসহ? তার মানে রাতটা অন্তত জেল আপনার নিশ্চিত। তাই চান আপনি?'

রাগে অধৈর্য ডিটেকটিভকে দেখল মাসুদ রানা। তারপর মৃদু গলায় বলল, 'মেয়েটি আমার ক্লায়েন্ট। তার কেস সুরাহা না হওয়া পর্যন্ত তার সম্পর্কে কোন কথাই আমি বলব না। আমাকে এ ব্যাপারে বাধ্য করার কোন ক্ষমতা আপনার নেই।' ঘড়ি দেখল ও। 'আমি আইন জানি।'

চেয়ারটা টেনে বসল সাশাদ। গলা খাদে নামাল। 'ঘড়ি দেখছেন যে? কি ব্যাপার? ট্রেন ধরার তাড়া আছে নাকি?'

'কি বললেন?'

'কিছু না।'

'আপনি যদি এই ছুরি বহন করার অপরাধে চার্জ আনতে চান আমার বিরুদ্ধে, দেরি না করে তাড়াতাড়ি সেরে ফেলুন কাজটা,' বলল মাসুদ রানা। 'কোর্ট থেকে বেরিয়ে আপনি গাড়িতে ওঠার আগেই জামিন পেয়ে যাব আমি।'

চোখ দিয়ে ভস্ম করতে ব্যর্থ হলো সাশাদ রানাকে। আবার উঠে দাঁড়াল লাফিয়ে। থাবা দিয়ে ছুরির ব্যাগটা নিয়ে চলে গেল। যাওয়ার আগে চার অক্ষরের নোংরা একটা শব্দ উচ্চারণ করল। মাসুদ রানার উদ্দেশে না নিজের কপালের উদ্দেশে সেটা অবশ্য বোঝা গেল না।

এতক্ষণ একটা কথাও বলেনি প্যাটি হেরেন, বসে ছিল স্থির হয়ে। এইবার নড়ে উঠল সে। মধ্যস্থতাকারীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হলো। 'দেখুন মিস্টার,' নরম গলায় বলল সে। 'আমাদের সহযোগিতা করাই বুদ্ধিমানের কাজ হবে আপনার জন্যে। আমরা আপনার শত্রু নই, বন্ধু, আপনাকে আমরা সাহায্য করতে চাই। বলে ফেলুন না মেয়েটি কোথায় থাকে। তাতে আমাদের উভয় পক্ষেরই লাভ হবে।'

কিছুই বলল না মাসুদ রানা।

'না হয় মেয়েটিকে এখানে ডাকুন আপনি। আমরা কথা বলি ওর সাথে। আপনিও সে সময় উপস্থিত থাকতে পারবেন। কোন অসুবিধে নেই। মেয়েটি যদি জ্যাকবাসকে হত্যা করেই থাকে, শুধু শুধু করেনি নিশ্চই! কেন কি ঘটেছে জানতে তো পারি আমরা। সে কতই বা পালিয়ে বেড়াবে? তাকে যদি আমাদের ধরেই আনতে হয়, তখনকার পরিস্থিতি নিশ্চই এখনকার মত হবে না। কি বলেন?'

কাঁধ ঝাঁকাল মাসুদ রানা। কথা বলল না এবারও।

কিছু সময় অপেক্ষা করল হেরেন। তারপর সে-ও কাঁধ ঝাঁকাল। 'দেখুন ভেবে। আমি বুদ্ধিটা খারাপ দেইনি।'

নীরবে বসে থাকল মাসুদ রানা। ধৈর্যের প্রতিমূর্তি যেন। যদিও ক্লান্তিতে ভেঙে পড়তে চাইছে শরীর। চোখ টেনে কাঁহাতক আর খুলে রাখা যায়? ঘড়ি দেখল ও আবার। দুটো দশ। নির্নিমেষ চোখে রানাকে দেখছে হেরেন। এই সময় ফিরে এল সাশাদ।

'আপনি এখন যেতে পারেন,' গম্ভীর গলায় বলল সে।

'কি বললেন?'

'ইংরেজি ভুলে গেলেন মনে হয়?' বিরক্তিতে চেহারা বিগড়ে গেল ডিটেকটিভের। 'বলছি এখন আপনি যেতে পারেন। প্যাটি,' সঙ্গীর দিকে ফিরল

সে। 'রুশ-জার্মান যে ভাষা বোঝে সেই ভাষায় অনুবাদ করে শোনাও একে, এই মুহূর্তে বেরিয়ে যেতে বলো এখান থেকে, আমি মত পাল্টাবার আগেই। এইসব কুট ঝামেলা নিয়ে নাইট কোর্টে দৌড়াদৌড়ি করার ইচ্ছে নেই আমার।' ফের চলে গেল সে। যাওয়ার আগে রানার দিকে একবার অগ্নিদৃষ্টি হানতে ভুলল না।

'আর বসে আছেন কি করতে?' বলল হেরেন। 'চলে যান। তবে ছুরিটা পাচ্ছেন না, দুঃখিত।'

'ধন্যবাদ। ও আরেকটা ম্যানেজ করে নেব।' হেরেনের বাড়িয়ে ধরা হাত থেকে ওয়ালথারটা নিয়ে জায়গামত রাখল মাসুদ রানা।

'এখন থেকে বুঝে-শুনে পা ফেলবেন, মিস্টার,' ঠাণ্ডা অনুত্তেজিত স্বরে বলল গোয়েন্দা অফিসার। 'সাশাদকে চটিয়ে ভাল কাজ করেননি আপনি। ও আপনার শুভাকাঙ্ক্ষী ছিল। যান। খুব শিগ্‌গিরি আবার দেখা হবে আমাদের।'

বেরিয়ে এল রানা কনকনে শীতের মধ্যে। এত তাড়াতাড়ি ছাড়া পেয়ে যাবে ভাবেনি ও। এবার? নিশ্চই আবার পুলিসের চর পিছনে লাগবে ওর? আবার ঘড়ি দেখল মাসুদ রানা। এখনও দেড় ঘণ্টা। এতক্ষণ তবু কাটছিল সময়, এখন কি করা যায়? পায়ে পায়ে সেকেন্ড অ্যাভিনিউর দিকে চলল ও। অন্তত এক ঘণ্টা কোন বারে বসে কাটাবে ঠিক করল রানা। পুলিসের চর পিছে লাগে লাগুক। এখন ও সতর্ক আছে, সময়মত খসিয়ে ফেলতে পারবে। পা চালাল মাসুদ রানা। ঢুকে পড়ল এক অল নাইট বারে।

প্রায় নির্জন রাস্তায় বেরিয়ে এল ও এক ঘণ্টা পর। পনেরো মিনিটে তিনবার পিছনে তাকিয়েছে রানা, প্রতিবারই দেখেছে তাদের। দু'জন আছে তারা দলে। টিকটিকি। ওর এক থেকে দেড় ব্লক পিছনে সেঁটে আছে। হাসল মাসুদ রানা। একটা নাদানও বুঝবে ব্যাপারটা। ওকে পুলিস এতই বোকা ভাবে? নাকি এটা ওর নজর অন্যদিকে ব্যস্ত রাখার প্রচেষ্টা? সামনেও আছে কেউ?

সামনে নজর দিল মাসুদ রানা। নাহ্, তেমন কোন আলামত চোখে পড়ল না। রাস্তায় এমনিতেও মানুষ খুব কমই আছে। তার মধ্যে ওদের কেউ আছে বলে মনে হয় না।

লম্বা লম্বা পা ফেলতে লাগল ও। দেখা যাক, সাপ-ব্যাঙ আর কিছু বের হয় কি না। না, বের হলো না শেষ পর্যন্ত। এক সময় পিছনের দু'জনকেও আর দেখতে পেল না মাসুদ রানা। হঠাৎ করে হাওয়া হয়ে গেছে লোক দুটো। চিন্তিত হয়ে উঠল রানা, বিষয়টা কি? গেল কোথায় ব্যাটারা? ওর ধারণা কি ভুল ছিল তাহলে?

একটু পর সেভেন্টি এইটথ ও লেক্সিংটন অ্যাভিনিউর সংযোগস্থলে পরিচিত নিয়ন সাইনটা চোখে পড়ল মাসুদ রানার। 'মাদাম ডাইয়েন বার অ্যান্ড রেস্টুরেন্ট'। এটাও আরেক অল ডে-নাইট বার। ওটার সামনে পৌঁছল মাসুদ রানা। শেষবারের মত চট করে পিছনটা দেখে নিয়ে ঢুকে পড়ল ভেতরে। এত রাতে পরিচিত এক খদ্দেরকে দেখে স্বয়ং মাদাম এগিয়ে এল তাকে আপ্যায়নের জন্যে। কিন্তু তার দিকে তাকালই না মাসুদ রানা। তার কোঁচকানো দৃষ্টির সামনে দিয়ে হন হন করে বারের পিছনদিকে চলে এল ও, তারপর ব্যাক এগজিট দিয়ে বেরিয়ে ওপাশের রাস্তায় পড়ল।

ও বেরিয়ে যাওয়ার মিনিট তিনেক পর ভেতরে ঢুকল সেই দুই লোক। ভীত সন্ত্রস্ত চেহারা। তাদের প্রশ্নের উত্তরে মাথা দোলাল মাদাম। না, এক ঘণ্টার মধ্যে কোন খদ্দের ঢোকেনি তার বারে। না, সামনে দিয়েও কাউকে যেতে দেখেনি সে। ভূতের তাড়া খাওয়া চেহারা হলো এবার লোক দুটোর। ছিটকে বেরিয়ে গেল তারা বার থেকে।

মাসুদ রানা ততক্ষণে প্রায় দুই ব্লক পথ মেরে দিয়েছে। সোজা উত্তরে চলেছে সে, সেন্ট্রাল পার্কের নির্দিষ্ট স্থানের দিকে। চারটা বাজে তখন। হাঁটতে হাঁটতে লেসলির কথা ভাবছে মাসুদ রানা। মেয়েটা কি পৌঁছেছে জায়গামত? আছে এখনও, না ওর দেরি দেখে ফিরে গেছে? এইটি ফার্স্ট স্ট্রীটের পার্কের গেটে এসে থামল রানা। ঘুরে পিছনে তাকাল। কেউ নেই। লোক দুটোর ব্যাপারে তাহলে হয়তো ভুলই হয়েছে ওর। ঢুকে পড়ল রানা পার্কে। উত্তর দিকেই চলল আবার ওদিকেই আছে সেই স্তম্ভ।

সতর্ক পায়ে এগোচ্ছে মাসুদ রানা। ঘন ঘন এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে। সেন্ট্রাল পার্ক এর নাম। এর মত বদ জায়গা দুনিয়ায় আর আছে বলে জানা নেই ওর। বিশেষ করে রাতের বেলা; সে সন্ধে রাত বা ভোররাত যাই হোক, কত ধরনের বিপদ যে হাঁ করে থাকে এখানে পদে পদে, কল্পনাও করা যায় না। তার ওপর হালকা কুয়াশা পড়ছে এখন।

গন্তব্যের কাছে এসে পড়েছে মাসুদ রানা। ওর কয়েকশো গজ সামনেই সেই স্তম্ভ দেখা যাচ্ছে। গোপন বৈঠকের জন্যে চমৎকার উপযুক্ত জায়গা। হত্যাকাণ্ডের জন্যেও বটে। থেমে পড়ল ও। ভাল করে আবার চারদিক দেখে নিল। কোন শব্দ নেই। কোন নড়াচড়াও নেই। চোখের সামনে নিজের নিঃশ্বাসের সৃষ্টি ধোঁয়ার মেঘ ছাড়া আর কিছুই চোখে পড়ছে না মাসুদ রানার। দম ছাড়লেই দেখা যায় মেঘটা, মুহূর্ত পরে নেই হয়ে যায় আবার। দম বন্ধ করে কান পাতল ও।

পা টিপে টিপে আরও কয়েক কদম এগোল স্তম্ভটার দিকে। চোখ সঙ্কুচিত করে তাকাল। সাথে সাথে একটা মনুষ্যমূর্তির ওপর চোখ পড়ল রানার। বসে আছে স্থির, স্তম্ভটার বেদীর ওপর।

'রানা?' নড়ে উঠল ছায়াটা।

স্বস্তির দম ছাড়ল ও। 'লেসলি?'

'কোন অসুবিধে হয়নি তো?'

'এখানে আসার পথে না সারাদিনে, কোনটার কথা বলছ?'

হেসে উঠল মেয়েটি। 'দুটোর কথাই।'

'না, হয়নি,' তিক্ত কণ্ঠে বলল মাসুদ রানা। পায়ে পায়ে লেসলির মুখোমুখি এসে দাঁড়াল। উঠল মেয়েটি। মুখ বাড়িয়ে আলতো করে চুমু খেলো ওর গালে। নড়ল না মাসুদ রানা।

'কি হলো, রানা?' প্রশ্ন করল লেসলি। 'তুমি আড়ষ্ট হয়ে আছ কেন?'

'কয়েকটা বিষয় পরিষ্কার না হওয়া পর্যন্ত স্বস্তি পাচ্ছি না, দ্যাট'স অল।'

'যেমন?'

'জ্যাকবাস।'

খানিক ইতস্তত করল লেসলি। 'জ্যাকবাসের ব্যাপারে কি জানতে চাও?'
'সে তো তুমিই ভাল জানো।'
চুপ করে থাকল লেসলি।
'কেন হত্যা করলে জ্যাকবাসকে?'
'কারণ সে তোমাকে হত্যা করতে চাইছিল!' দৃঢ়স্বরে বলল লেসলি। 'সে আর তার সঙ্গীরা। সে-জন্যেই তাকে হত্যা করেছি।'
'আমি এর ব্যাখ্যা চাই, লেসলি,' দৃঢ় কণ্ঠে বলল ও।
'আমি বলেছি, তোমাকে সব জানাব আমি। সব জানাব। তুমি যা যা জানতে চাও, সবই জানতে পারবে সময় হলে।'
'এবং সত্যি কথাই বলবে আশা করি?'
'অবশ্যই। আমি তোমার কাছে মিথ্যে বলিনি কখনও।'
'কেবল পিটার হোয়াইটসাইড আর জর্জ ম্যাকঅ্যাডামের ব্যাপারটা ছাড়া, এই তো?' তিক্ততা ফুটল ওর কণ্ঠে।
ইতস্তত ভঙ্গিতে মাথা দোলাল লেসলি। 'হ্যাঁ। ওই ব্যাপারটায় আমি মিথ্যে বলেছি, স্বীকার করি।'
'তুমি জানতে ওরা আসলে মরেনি?'
'জানতাম।'
'তাহলে?'
'আমি চেয়েছি ওদের সাথে তোমার দেখা না হোক।'
'তাহলে আমি সত্যিকার লেসলির কথা জেনে যাব, এই জন্যে?'
নীরবে মাথা দোলাল লেসলি।
'তার মানে তুমি আসল লেসলি নও?' বিস্ময়ের জোরাল এক ধাক্কা খেল রানা।
মুখ তুলল মেয়েটি। 'খুব শিগ্‌গির তা জানতে পারবে তুমি, রানা।'
'কখন?'
'খুব শিগ্‌গিরই।' পিছন থেকে একটা মার্জিত পুরুষ কণ্ঠ ভেসে এল। ঘুরে দাঁড়াল মাসুদ রানা। সেই লোক, নীল পন্টিয়াকের চালক। পল হ্যামন্ড! একটা সাইলেন্সার লাগানো পিস্তল ধরে আছে লোকটা ওর হৃৎপিণ্ড বরাবর। 'দয়া করে হিরো হওয়ার চেষ্টা করবেন না, মিস্টার রানা।'
'বাহ্!' বিকৃত কণ্ঠে বলল ও। ভাবল, একটা সুযোগ কি পাওয়া যাবে না? যদি একবার ওয়ালথার··· 'এই বুঝি উপকারের প্রতিদান?'
'দুঃখিত, মিস্টার রানা,' বলল হ্যামন্ড। 'ঠিকই ধরেছেন আপনি। এটাই হচ্ছে আপনার উপকারের প্রতিদান। আমাদের ধারণা আপনার পাওনা মিটিয়ে দেয়ার এটাই উপযুক্ত সময়। আশা করি ভুল বুঝবেন না আপনি।'
'সত্যি, রানা। ভুল বুঝো না। এবং আমাদের কাজে বাধা দেয়ারও চেষ্টা কোরো না দয়া করে।'
এক পা এগোল পল হ্যামন্ড। হাতের অস্ত্রটা ঠেসে ধরল মাসুদ রানার পিঠে ওর কাঁধের ওপর দিয়ে বাঁ হাতটা সামনে বাড়াল। 'আপনার অস্ত্রটা দিন।'

তিন

বেলের আওয়াজে রিসিভার লক্ষ্য করে থাবা চালাল অ্যারাম সাশাদ। মেজাজ মর্জি ভাল নেই তার পুলিস সার্ভেইল্যান্স টীমকে ফাঁকি দিয়ে মাসুদ রানা পালিয়ে যাওয়ার পর থেকে। সারাক্ষণ কপাল কুঁচকে আছে। 'হ্যালো!'

'সার্জেন্ট সাশাদ?'

'ডি-টেক-টিভ!' দাঁতে দাঁত চাপল সে। গলা শুনেই চিনে ফেলেছে সে ও প্রান্তের কণ্ঠধারীকে। গ্যারি ডেভমারশ, সিটি মর্গের ল্যাব সহকারী। 'বলো কি বলবে!'

'অনুমান করতে পারেন কেন ফোন করেছি?'

'দেখো, গ্যারি, এখন খেলার সময় নেই। মাথায় অনেক চিন্তা। তাড়াতাড়ি বলে ফেলো।'

'আপনার পরিচিত কাউকে পানিতে পাওয়া গেছে ভাসমান অবস্থায়।'

'এত তাড়াতাড়ি প্রয়োজন নেই। গুছিয়ে বলো।'

'থ্যাঙ্কস। হাডসন নদীতে ভাসমান একটা মৃতদেহ দেখে টেলিফোন করে ওখানকার...'

'তারপর?' থামিয়ে দিল গ্যারিকে সাশাদ। গুছিয়ে বলতে গিয়ে গল্প আরম্ভ করে দিয়েছে লোকটা স্বভাব অনুযায়ী। 'ওটার বর্ণনা?' সামনের দেয়াল ঘড়ির দিকে তাকিয়ে আছে সাশাদ, আনমনে থুতনি ডলছে।

'লম্বা-চওড়া। বয়স বছর ত্রিশেক হবে, পুরুষ।'

'হুঁম! আর?'

'তার পকেটে আপনার নাম টেলিফোন নম্বর লেখা একটা কাগজের টুকরো পাওয়া গেছে, সার...ইয়ে, ডিক। ভাবলাম আপনি হয়তো দেহটা দেখতে আগ্রহী হবেন।'

কেন যেন মাসুদ রানার চেহারা ভেসে উঠল সাশাদের চোখের সামনে। ও ব্যাটা নয়তো? 'চেহারা চেনা যায়?'

'হ্যাঁ। একদম অক্ষত আছে মুখটা।'

'ঠিক আছে। আমি আসছি এখনই।' রিসিভার রেখে আরও খানিক চিন্তা করল সে। মাসুদ রানার কাছে তার নাম-টেলিফোন নম্বর থাকার কথা নয়। কে তাহলে এ লোক? ঠিক আছে, আসন ছাড়তে ছাড়তে ভাবল সে, গিয়েই দেখা যাক।

হেরেনকে খুব একটা আগ্রহী মনে হলো না লাশের ব্যাপারে, অতএব একাই গাড়ি নিয়ে ছুটল অ্যারাম সাশাদ। দশ মিনিট পর থার্টিয়েথ স্ট্রীটের সিটি মর্গে পৌঁছল সে। টেবিলের ওপর দুই পা তুলে প্রবল বেগে নাচাতে নাচাতে ঘোড়দৌড়ের বুলেটিন পড়ছিল গ্যারি মারশ। অফিসারকে দেখে উঠে দাঁড়াল সে অবাক চোখে। অন্তত এত জলদি তাকে আশা করেনি সে।

'এখান থেকেও আবার ভেসে যায় কি না কোনদিকে, তাই তাড়াতাড়ি চলে এলাম,' গ্যারির ভাবনার উত্তরে বলল সাশাদ। 'কোথায়-ওটা?' যে কারণেই হোক,

মৃতকে কখনোই মৃত বা সে বা লাশ বলে না সাশাদ। বলে এটা বা ওটা।

'আসুন আমার সাথে।'

করিডর ধরে লাশ রাখার ঘরের দিকে তাকে নিয়ে চলল গ্যারি মারশ। ভেতরে ঢোকার মুখে ছোট এক টেবিলে রাখা একটা খাতা খুলল সে, নম্বর দেখল। তারপর আবার তাকাল সাশাদের দিকে। চোখে নীরব আহ্বান।

রিফ্রিজারেটেড রুমে ঢুকল ওরা। কোমর সমান উঁচু লম্বা টেবিলে শুয়ে আছে সাদা চাদর ঢাকা একটা দেহ। আস্তে করে চাদরটা নামিয়ে দিল মারশ। বুকের মাঝে বড়সড় একটা গর্ত লাশের। হেভি ক্যালিবার বুলেটের কীর্তি। পানিতে ভেসে থাকার ফলে কেমন ভীতিকর ফ্যাকাসে রং পেয়েছে দেহটা।

লাশের মুখের দিকে ভাল করে তাকাল সাশাদ। নিশ্চিত হলো যেন, বিস্মিতও হলো কিছুটা। 'গড!'

'অবাক হলেন মনে হয়?'

'হ্যাঁ।'

'চেনেন একে?'

'চিনি।'

'কে?'

'রুমানিয়ান এক ফিল্ম্ কোম্পানির গার্ড। ভারিক স্ট্রীটে এদের অফিস।'

'আপনার নেম কার্ড এর কাছে কেন?'

'এর মাঝে ওদের অফিসে ঢুঁ মারতে গিয়েছিলাম একদিন অনেক রাতে। গোপনে। দেখে ফেলে ব্যাটা, চ্যালেঞ্জ করে বসে। বাধ্য হয়ে তখন কার্ডটা দিই একে।'

'কফি?' মুখ তুলে মাসুদ রানাকে দেখল পল হ্যামন্ড। লেসলির দিকে তাকাল। 'তুমি?'

দু'জনেই মাথা ঝাঁকাল ওরা। তিন কাপ ধূমায়িত কালো কফি ঢেলে টেবিলে এসে বসল ইউ.এস.ট্রেজারি এজেন্ট। সামনে এগিয়ে দিল যার যার কাপ। নিঃশব্দে চুমুক দিল সবাই। ইস্ট নাইন্টি সেকেন্ডের এক বিচ্ছিন্ন, স্বতন্ত্র একতলা ভবনে আছে ওরা এ মুহূর্তে। সন্ধে হতে চলেছে। ভোরবেলা সেন্ট্রাল পার্ক থেকে এখানে নিয়ে আসা হয়েছে রানাকে, লেসলি-হ্যামন্ডের ভাষায় 'প্রোটেকশন' দেয়ার জন্যে। কিসের জন্যে 'প্রোটেকশন' তা অবশ্য এখনও বলেনি তারা কেউ।

এখনও পিস্তলটা ফেরত পায়নি মাসুদ রানা। ওটা পরে দেয়া হবে বলে জানিয়েছে পল হ্যামন্ড। এ-বাড়ি ইউ.এস. ট্রেজারি কর্তৃপক্ষের ভাড়া বাড়ি। হোস্ট এখানে হ্যামন্ড। খাতির যত্ন কম করছে না সে মাসুদ রানাকে, শুধু বাইরে বেরুতে দিচ্ছে না, এই যা অসুবিধে। বের হতে তো দিচ্ছেই না, বরং এ রুমের বাইরে দুই সশস্ত্র গার্ড-ও বসানো হয়েছে। 'প্রোটেকশন' দিচ্ছে তারা মাসুদ রানাকে। লেসলি ম্যাকঅ্যাডাম কথা দিয়েছে, হাতের ঝামেলা শেষ হলেই তুলে নেয়া হবে প্রোটেকশন।

'কতক্ষণ লাগবে ঝামেলা শেষ হতে?'

'ঠিক নেই,' উত্তর দিয়েছে হ্যামন্ড। 'ট্র্যাশ-কালেকশন কমপ্লিট হলেই।'
আবার সেই ট্র্যাশ!
টেলিফোন এল। ধরল পল হ্যামন্ড, কার সঙ্গে যেন খুব দ্রুত বাক্যালাপ হলো তার। আলাপটা ট্র্যাশ সম্পর্কিত, বুঝল মাসুদ রানা। একটা নির্দেশ দু'বার উচ্চারণ করল হ্যামন্ড—শেষ ব্যাগটা উইলিয়ামসবার্গ ব্রিজ থেকে ফেলে দিতে হবে। রিসিভার রেখে মাসুদ রানার দিকে ফিরল সে। 'এত কিছু কেন ঘটছে আপনি জানেন।'
'মোটামুটি।'
'আরও কিছু জানা গেলে মন্দ হয় না, কি বলেন? অন্তত চুপচাপ বসে থাকার চেয়ে গল্প করা অনেক ভাল।'
মাথা দোলাল মাসুদ রানা।
'আসুন তাহলে, গল্প করা যাক।' একটু ভাবল হ্যামন্ড। 'কোত্থেকে শুরু করা যায়?' 'এর বাবা,' পাশ ফিরে লেসলিকে দেখাল, 'আর্থার স্যান্ডলারের সম্পর্কেও তো জানেন নিশ্চই?'
'কিছু কিছু।' লেসলিকে দেখল মাসুদ রানা। কী যেন গভীর চিন্তায় মগ্ন মেয়েটি।
'শুনুন তাহলে।' আরম্ভ করল পল হ্যামন্ড। একটার পর একটা সিগারেট টেনে চলেছে মাসুদ রানা। আগে একই কাহিনী শুনেছে পিটার হোয়াইটসাইডের মুখে, স্বভাবতই তার বক্তব্য ছিল ব্রিটিশ পক্ষ ঘেঁষা। পল হ্যামন্ডের কাহিনীও তেমনি, মার্কিন পক্ষ ঘেঁষা। শুনতে লাগল রানা।
'...তারপর ১৯৬৪ সালে হত্যা করা হলো স্যান্ডলারকে।'
মাথা দুলিয়ে বাধা দিল ও। 'তাকে নয়, আর কাউকে।'
'ঠিক, তবে আমরা তা জেনেছি অনেক পরে। আর কেউ মারা গেল। কিন্তু যেহেতু পাউন্ড জালিয়াতি থেমে গেল, ব্রিটিশরাও কানের কাছে ভনভনানি বন্ধ করে দিল, অতএব আমরাও ধরে নিলাম যে সে সত্যিই মরেছে। কিন্তু মাত্র কয়েক বছর আগে ফের নতুন করে শুরু হলো একই কাজ। জালিয়াতি। তবে এবার পাউন্ড নয়, ডলার জাল শুরু হলো। একই কায়দায়। নোটের ছাপ মুছে কাগজকে পাল্প, পাল্প থেকে ফের কাগজে রূপান্তরিত করে ছাপা হতে লাগল মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার।'
'ওদিকে, চৌষট্টিতে ব্রিটিশরা যে সঠিক লোককে হত্যা করতে ব্যর্থ হয়েছে, লন্ডন কিন্তু তা জানত। বিষয়টা ওরা অনেকবার জানিয়েছে। বলেছে, লোকটা তার মেয়ে লেসলিকে হত্যা করার জন্যে হন্যে হয়ে পড়েছে। তাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। ওই কথা স্মরণ রেখে, যে সময় ডলার জাল হতে শুরু করল, আমরাও লাগলাম স্যান্ডলারকে খুঁজে বের করার কাজে।'
'এমন সময় ডলারের ব্যাপারটা প্রকাশ হলো,' বলল লেসলি, 'যখন পিটার হোয়াইটসাইডকে বাধ্যতামূলক অবসর দেয়া হলো চাকরি থেকে। আমার ওপর থেকে প্রোটেকশন তুলে নিল ব্রিটিশ সরকার।'
'এবং সুযোগটা লুফে নিল ওয়াশিংটন,' বলল রানা।

হেসে উঠল পল হ্যামন্ড। 'ঠিক।'

'আমার লেখাপড়া তখন মাঝপথে, জীবনের বিন্দুমাত্র নিশ্চয়তা নেই, কাজেই বাধ্য হয়েই ওয়াশিংটনের সাহায্যের প্রস্তাবে রাজি হয়ে যাই আমি,' লেসলি বলল। 'প্রতিজ্ঞা করি, যে ভাবেই হোক আর্থার স্যান্ডলারকে খুঁজে বের করবই। নিজ হাতে হত্যা করব তাকে আমি। কারণ, দু'দু'বার তার হাতে মরতে মরতে বেঁচে গেছি আমি। স্যান্ডলারকে মৃত না দেখা পর্যন্ত বিশ্রাম না নেয়ার শপথ নেই আমি সে সময়ে।'

'সে যা হোক,' বলল হ্যামন্ড। 'ব্যাপারটা নিয়ে উইলিয়াম ওয়ার্ড ড্যানিয়েলসের সঙ্গে বহুবার যোগাযোগ করি আমি। আর্থার সম্পর্কে সে কিছু জানে কি না, জানার চেষ্টা করি। আফটার অল সে ছিল স্যান্ডলারের রিক্রুটার। কিন্তু মানুষটা আমাদের কোন সাহায্যই করল না। বলে দিল আমি ওর ব্যাপারে যা জানি, তা হচ্ছে সে নিহত হয়েছে। আমরা বুঝে গেলাম, সে আসলে আমাদের আর সাহায্য করবে না। হলোও তাই।'

'আর্থার ভেবে যাকে হত্যা করা হয়, কবর খুঁড়ে তার মৃতদেহ পরীক্ষা করলে লোকটা আসলে কে ছিল জানা যেত।' মন্তব্যের সুরে বলল মাসুদ রানা।

'সম্ভব ছিল না,' মাথা দোলাল পল হ্যামন্ড। 'নিজের মৃতদেহ দাহ করার ইচ্ছে ছিল স্যান্ডলারের। অতএব তাই করা হয়। মৃতদেহ সনাক্ত করার সবচে' সহজ উপায় হচ্ছে তার ডেন্টাল চার্ট পরীক্ষা করা। বুঝতেই পারছেন।'

'এখন তাহলে কি দাঁড়াল?' বলল মাসুদ রানা।

'নতুন করে কিছু দাঁড়ায়নি। আগের সিদ্ধান্তই বহাল আছে। স্যাণ্ডলার মরেনি, বেঁচে আছে সে। এবং ডলার জাল করার নোংরা কাজ এখনও চালিয়ে যাচ্ছে। রুমানিয়ান এক ফিলম কোম্পানির ফিলম ক্যানে ভরে আটলান্টিকের ওপারে নিয়মিত পাচার করছে সে কাউন্টারফেইট ডলার। পরে আবার নানান হাতে ঘুরে ফিরে এদেশেই ফিরে আসছে তা, আমাদের অর্থনীতির গোড়ার মাটি খুঁড়ে খুঁড়ে আলগা করে চলেছে। রোটা ফিলমসের প্রায় প্রত্যেকে কেজিবি অপারেটিভ। জ্যাকবাস তাদের একজন। এবং ওরা আপনাকে মৃত দেখতে চায়।'

ভুল হয়ে গেছে, ভাবছে মাসুদ রানা। শওকত-ইউনুসের তদন্তের বিষয়টাকে আরও গুরুত্ব দেয়া উচিত ছিল ওর। এসব তথ্য তাহলে ও নিজেই খুঁজে বের করতে পারত।

'জ্যাকবাস আর তার দুই সঙ্গী অপেক্ষায় ছিল সঠিক মুহূর্তের,' বলল হ্যামন্ড। 'আপনাকে হত্যা করার চেষ্টাও করেছে ওরা। কিন্তু দুর্ভাগ্য, পারেনি।'

সে রাতের কথা ভাবল মাসুদ রানা, যে রাতে আগুন লাগে রানা এজেন্সিতে। ওকে সশরীরে অফিসে পৌঁছতে দেখে বেশ বিস্মিত হয়েছিল জ্যাকবাস, মনে আছে ওর। চেহারা দেখে মনে হয়েছে যেন সে রানাকে ওই সময়ে আশা করেনি। অথচ সে-ই তাকে টেলিফোনে অফিসে আগুন লাগার খবর দিয়েছিল।

'এ সব তোমার অবিশ্বাস্য মনে হতে পারে,' বলল লেসলি ম্যাকঅ্যাডাম। 'কিন্তু এটাই সত্যি। জ্যাকবাসই আগুন লাগিয়েছে তোমার অফিসে। ওই সময়ে একমাত্র সে-ই ছিল অফিসে। এবং আগুন যে টাইমিং ফিউজের সাহায্যে লাগানো

হয়, সে তো তুমিও জানো।'

'আগুনটা আসলে লাগায় সে শুধুই আপনাকে বাসা থেকে বের করার জন্যে,' বলল পল হ্যামন্ড। সিগারেট ধরাল সে। 'এর পিছনে আর কোন কারণ ছিল না। বের হলেই,' আঙুল দিয়ে গলায় ছুরি চালানোর ভঙ্গি করল সে।

'তাহলে ড্যানিয়েলস যে ফাইল গচ্ছিত রেখে গিয়েছিলেন, সেটা উধাও হওয়ার ব্যাখ্যাটা কি?' অন্যমনস্কের মত প্রশ্ন করল মাসুদ রানা।

চোখাচোখি হলো লেসলি ও হ্যামন্ডের। দু'জনেই হাসল ওরা। হ্যামন্ড বলল, 'ওটা বহু আগে থেকেই আমার হেফাজতে আছে।'

'হোয়াট!'

'হ্যাঁ। যেদিন ড্যানিয়েলস মারা যায়, তার কদিন পর আমিই চুরি করেছি ওটা আপনার অফিস থেকে। আপনি তখন ছিলেন না।'

'কিন্তু...?'

'ভেবেছিলাম ওর মধ্যে বোধহয় আর্থার স্যান্ডলারের বর্তমান পরিচয়, অবস্থান ইত্যাদি পাওয়া যাবে। তাই সরিয়েছিলাম ওটা। কিন্তু তেমন কিছু ছিল না ওতে।'

অপলক হ্যামন্ডকে দেখছে মাসুদ রানা। 'কি ছিল তাহলে?'

'স্রেফ একগাদা সাদা কাগজ আর আপনাকে লেখা একটা চিঠি। তাতেও তেমন কিছু ছিল না। খামে কাগজ ভরে দিয়েছিল যাতে আপনি ওজন দেখে ভাবেন সত্যিই বুঝি দলিল ওগুলো। আসলে ফক্কা।'

'চিঠিটা কোথায়?' কঠোর হয়ে উঠল রানার চাউনি।

'আছে। দেব আপনাকে।' একটু বিরতি। 'ওতে যা আছে এতদিনে তা আপনি জেনে গেছেন।'

'আরেকটু খুলে বলুন,' লেসলি বলল হ্যামন্ডকে। 'ওর বুঝতে সুবিধে হবে।'

'ঠিক আছে। বলছি।' উপচে ওঠা অ্যাশট্রেতে সিগারেট জোর করে গুঁজে দিল ট্রেজারি এজেন্ট। সোজা হয়ে বসল। 'চিঠির মোদ্দা বক্তব্য ছিল, সারাজীবন আমি অসংখ্য পাপ করেছি। তাই আমার ইচ্ছে, মরার আগে একটা ভাল কাজ করে যাওয়া। লেসলি ম্যাকঅ্যাডাম সত্যি সত্যি আর্থার স্যান্ডলারের মেয়ে। কিন্তু সেটা আইনের কাছে গ্রহণযোগ্য করে তোলার মত পর্যাপ্ত ডকুমেন্টস নেই। আপনাকে খেটেপিটে সেটা প্রমাণ করার অনুরোধ জানিয়েছিল ড্যানিয়েলস ওই চিঠিতে।'

'প্রমাণ-ই নেই যার, তাকে কি করে সত্যি বলে প্রমাণ করব আমি?'

'ঠিক যে ভাবে এতদিন করে এসেছেন, প্রায় প্রতিষ্ঠিত করে ফেলেছেন সে সত্য।'

'বুঝলাম না।' নড়েচড়ে বসল মাসুদ রানা।

'সে অনুরোধ করেছিল আপনাকে, তার মৃত্যুর পর যেন ওই খাম খোলেন আপনি, তাই তো?'

'হ্যাঁ।'

'খুললে কেবল চিঠিটাই পেতেন আপনি।'

'তারপর?'

'ওতে ছিল, লেসলি ম্যাকঅ্যাডাম আপনার সাথে যোগাযোগ করলে আপনি

প্রথমেই ওর কাছ থেকে ওর জীবনী শুনবেন। তারপর দেখা করবেন তার পুরানো পার্টনার জেঙ্গারের সাথে। এই দু'জনের সাথে কথা বললেই আপনি আরও কিছু সূত্র হাতে পেয়ে যাবেন, এবং মাথা খাটিয়ে সে-সব সূত্রের সঙ্গে যোগাযোগ করে আরও বিস্তারিত জানতে পারবেন। ইন ফ্যাক্ট, ড্যানিয়েলসের চিঠিটা না পড়লেও আপনি কিন্তু এতদিন ঠিক তার নির্দেশিত পথেই এগোচ্ছিলেন, মিস্টার মাসুদ রানা। আপনার রেপুটেশন সম্পর্কে খুব ভাল জ্ঞান ছিল ড্যানিয়েলসের। যে কারণে এমন একটা দায়িত্ব সে আপনাকে দিয়ে গিয়েছিল।

'তার বিশ্বাস ছিল জেঙ্গার আর লেসলির দেয়া সূত্র ধরে এগোলে আপনি পিটার হোয়াইটসাইড, লেসলির পালক পিতা জর্জ ম্যাকঅ্যাডাম, এদের খোঁজ পাবেন, এদের সঙ্গে বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করবেন, একটু একটু করে সত্য জানতে পারবেন। এতে আরও একটা কাজ হবে বলে আশা ছিল তার, দীর্ঘদিন ধরে চাপা পড়ে থাকা স্যান্ডলার অধ্যায় নড়েচড়ে উঠবে, আলোয় বেরিয়ে আসবে পিটার, জর্জ। তখন সত্যটা প্রতিষ্ঠিত করা সহজ হবে আপনার জন্যে। দেখুন, হয়েছেও তাই। পুরোটা না হলেও সিদ্ধান্তের অনেক কাছে পৌঁছে গেছেন আপনি। আপনার ঢিল জায়গামতই পড়েছে, যে কারণে দেশ ছেড়ে ছুটে আসতে বাধ্য হয়েছে পিটার।

'আর হ্যাঁ, দলিলের কথা বলে খামে কাগজ ভরে দেয়ার জন্যে ড্যানিয়েলস ক্ষমা প্রার্থনা করেছে আপনার কাছে। তার ভয় ছিল, ওইটুকু ছলনার আশ্রয় না নিলে আপনি হয়তো তার অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করতেন। আর···আরেকটা কথা, ড্যানিয়েলসের বিশ্বাস, যদি চোখ-কান খোলা রাখেন, এক সময় স্যান্ডলারকে আপনি নিজেই খুঁজে বের করতে পারবেন। আমাদের আশেপাশেই আছে সে। আই মীন, আপনার আশেপাশে।'

দীর্ঘ নীরবতা। গভীর চিন্তায় ডুবে আছে মাসুদ রানা। হ্যামন্ডের শেষ কথাটা ভাবনার ঘূর্ণিতে ফেলে দিয়েছে ওকে।

'ভদ্রলোক আমার সাথে যোগাযোগ করেছেন, আমাকে খামটা দিয়ে গেছেন, আপনারা জানেন কি ভাবে?' অনেকক্ষণ পর মুখ খুলল ও।

'আর্থারকে ট্রেস করার ব্যাপারে আমাদের অনুরোধ পাশ কাটিয়ে যাওয়ার পর থেকেই লোকটার ওপর কড়া নজর রাখতে শুরু করি আমরা।'

'তো?'

'আগে থেকেই ড্যানিয়েলসের ফোন-ট্যাপ করা হচ্ছিল। সে যখন টেলিফোনে আপনার সাথে "খুব জরুরী" বিষয়ে আলোচনার জন্যে অ্যাপয়েনমেন্ট চাইল, তখনই···।' থেমে গেল পল হ্যামন্ড।

'তখনই কি?' চোখ কোঁচকাল মাসুদ রানা।

'আপনার অফিসে লিসনিং ডিভাইস প্ল্যান্ট করি আমি।'

তাজ্জব হয়ে লোকটার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকল মাসুদ রানা।

'হ্যাঁ,' মাথা দোলাল ট্রেজারি এজেন্ট। 'ওটার সাহায্যে আপনাদের দু'জনের সমস্ত আলোচনা শুনি আমি।' কাঁধ ঝাঁকাল সে। 'সরি। এর যে প্রয়োজন ছিল আশা করি আপনি তা অস্বীকার করবেন না।'

আবার নীরবতা।

'ড্যানিয়েলসের চিঠিটা তো আপনার কাছেই ছিল,' বলল মাসুদ রানা। 'আপনি নিজেই কেন কাজটা করলেন না?'

'নিজের অস্তিত্ব ফাঁস হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা ছিল, তাই। এখনও তা করতে পারি না আমি। আমি আসলে ডীপ কভার এজেন্ট, মিস্টার রানা।'

'তাহলে জ্যাকবাস...'

'ও জানত সত্যিই বুঝি ওই খামে এমন কিছু অকাট্য তথ্য-প্রমাণ ছিল যা আর্থার স্যান্ডলারের পরিচয় ফাঁস করে দেবে। তাই সম্ভবত ওটা আমার মত সে-ও লোপাট করতে চেয়েছিল। কিন্তু যখন ফাইলটা খুঁজে পেল না, তখন ও ধরে নেয় ওটা আপনি খুলেছেন। ভেতরে কি আছে জানা হয়ে গেছে আপনার। অতএব, আপনি যাতে সময় হলেই মুখ খোলার সুযোগ না পান সে জন্যে আপনাকে হত্যা করার পরিকল্পনা করে জ্যাকবাস। একটা ব্যাপার নিশ্চই মনে আছে আপনার, ড্যানিয়েলস আপনার সাথে যোগাযোগ করে যাওয়ার পর আপনার এজেন্সিতে চাকরি নেয় লোকটা?'

আনমনে ইতিবাচক মাথা দোলাল রানা। ঠিকই বলেছে হ্যামন্ড।

'তাহলেই বুঝুন। শুধু আমরাই নয়, কেজিবি-ও নিশ্চই ট্যাপ করেছিল অ্যাটর্নির টেলিফোন। এবং অবশ্যই ওরাও আপনার অফিসে ছারপোকা প্ল্যান্ট করেছিল। সব জেনেশুনেই এসেছিল সে।'

স্তব্ধ হয়ে বসে থাকল মাসুদ রানা। এত বড় এক আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্র দীর্ঘ ছয় বছর ধরে ওকে ঘিরেই আবর্তিত হয়ে আসছে, অথচ রানা তার বিন্দু-বিসর্গও জানে না! কোন ধারণা পর্যন্ত ছিল না এ সম্পর্কে!

'বলতে চাইছেন লেসলিকে সাহায্য করার কাজে আমি ছাড়া যোগ্য আর কাউকে খুঁজে পাননি উইলিয়াম ড্যানিয়েলস?'

আত্মসমর্পণের ভঙ্গিতে হাত তুলল লোকটা। 'আমি জানি না। এ প্রশ্নের উত্তর সেই ভাল দিতে পারত, মিস্টার রানা।'

হ্যামন্ডের আরেকটা মন্তব্য মনে মনে নাড়াচাড়া করতে লাগল ও। চোখ কান খোলা রাখলে এক সময় ও নিজেই সনাক্ত করতে পারবে আর্থার স্যান্ডলারকে? ওর আশেপাশেই আছে সে? বিষয়টা নিয়ে একটু মাথা খাটানো প্রয়োজন। 'আমাকে এখানে কেন নিয়ে এসেছেন আপনারা?' প্রশ্ন করল ও। 'কেন আটকে রেখেছেন?'

'আটকে রেখেছি কথাটা ঠিক নয়, মিস্টার রানা। বরং কিছু সময়ের জন্যে সবার চোখের আড়ালে লুকিয়ে রেখেছি বলতে পারেন। যে-কোন মুহূর্তে একটা ফোন কল আশা করছি আমি। ওটা এলেই স্বচ্ছন্দে চলে যেতে পারবেন আপনি। কেউ বাধা দেবে না। আমি আপনার ক্ষমতাকে ছোট করে দেখছি ভাববেন না। আমি জানি এর চেয়ে অনেকগুণ কঠিন সমস্যাও সমাধান করতে পারেন আপনি। অতীতে বহুবার করেছেন। কিন্তু এটা সম্পূর্ণ আলাদা কেস। আপনি জানেনই না কি চলছে আপনার চারদিকে। আর, যেহেতু আপনি আমাদের কাছে এ মুহূর্তে মহামূল্যবান, তাই কোনরকম ঝুঁকিতে আমরা যেতে চাই না বলেই এখানে নিয়ে

এসেছি আপনাকে।'

মনে মনে নিজেকে ধুমসে অভিসম্পাত করছে মাসুদ রানা। হ্যামন্ড ঠিকই বলেছে, এত কিছুর কেন্দ্র ও স্বয়ং, অথচ সে-সম্পর্কে কোন ধারণাই ছিল না রানার এতদিন। শওকতের সতর্কবাণীকে খুব একটা পাত্তা দেয়নি রানা, এবং সেটা হয়েছে মারাত্মক ভুল। মহা অন্যায় করে ফেলেছে মাসুদ রানা। এ ভাবে হেলাফেলা করা উচিত হয়নি ওর বিষয়টা। সত্যিই তো, যে-কোন মুহূর্তে ওর যা-খুশি তাই ঘটে যেতে পারত।

টেলিফোনের আওয়াজে সচকিত হলো মাসুদ রানা। একবার রিং হতেই রিসিভার তুলল ট্রেজারি এজেন্ট। নীরবে ও প্রান্তের বক্তব্য শুনল সে, তারপর 'গুড,' বলে বিচ্ছিন্ন করে দিল সংযোগ। হাসিমুখে রানার দিকে তাকাল। 'ইচ্ছে করলে এখনই আপনি চলে যেতে পারেন, মিস্টার রানা,' বলল সে। 'ঝামেলা শেষ।'

কিন্তু নড়ার কোন লক্ষণ দেখা গেল না ওর মধ্যে। আরেক ধ্যানে ডুবে আছে। অনেকক্ষণ পর চোখ তুলল রানা, হ্যামন্ডের উদ্দেশে বলল, 'স্যান্ডলার ম্যানসনে ঢুকতে চাই আমি। অবশ্যই সবার অলক্ষে। ব্যবস্থা করতে পারেন?'

'পারি। কি করবেন ঢুকে?' নাকের পাশ চুলকাল সে।

'জানি না। হয়তো দেখব, হয়তো কিছু খুঁজব।'

'খুঁজবেন? কি খুঁজবেন?'

'তাও জানি না।'

কয়েক মুহূর্ত ওর দিকে তাকিয়ে থাকল দু'জনেই। তারপর মাথা ঝাঁকাল ট্রেজারি এজেন্ট। 'ঠিক আছে। আয়োজন পাকা করে খবর দেব আমি আপনাকে।'

চার

গভীর রাত। লেক্সিংটন সাবওয়ে স্টেশনের প্ল্যাটফর্মের কিনারায়, টানেল প্রান্তে দাঁড়িয়ে আছে মাসুদ রানা, লেসলি ম্যাকঅ্যাডাম ও পল হ্যামন্ড। ওদের চার হাত নিচে দিয়ে বয়ে গেছে রেললাইন। যাত্রীদের তেমন একটা ভিড় নেই স্টেশনে। বাঁ দিকে তাকাল রানা, আন্ডারগ্রাউন্ড ট্রেন টানেলের হাঁ করা মুখের দিকে। ও মাথায় পাশাপাশি দুটো জোরাল হেডলাইট দেখা গেল, ট্রেন আসছে।

ইউনিফর্ম পরা এক ট্রানজিট পেট্রলম্যান পাশ ঘেঁষে যাওয়ার সময় বিচ্ছিন্নভাবে দাঁড়িয়ে থাকা ওদের তিনজনকে দেখল এক নজর। এখানে যাত্রীদের দাঁড়িয়ে থাকার কথা নয়। কিন্তু তবু কিছু জিজ্ঞেস করল না লোকটা। চলে গেল ধীর পায়ে।

টানেল থেকে বেরিয়ে এল ট্রেন। ওদের ছাড়িয়ে বেশ কিছুটা এগিয়ে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। সাবওয়ের বিদ্যুৎ নিয়ন্ত্রিত দরজা খুলে গেল ঝটপট। যাত্রী-পোর্টার সবাই ব্যস্ত হয়ে উঠল। হুড়োহুড়ি পড়ে গেল রীতিমত। চট করে এদিক-ওদিক দেখে নিল হ্যামন্ড, তারপর রানার উদ্দেশে মাথা ঝাঁকাল। 'জাম্প!' প্রায় একযোগে ঝুপ করে লাফিয়ে নামল ওরা লাইনের ওপর। হ্যামন্ডকে অনুসরণ করে

সামনে ঝুঁকে ছুটল টানেলের দিকে। গজ পঞ্চাশেক মত ভেতরদিকে এগিয়ে থামল পথ প্রদর্শক, ঘুরে অনুসরণকারীদের দিকে তাকাল।

তার প্রায় ঘাড়ের ওপর রয়েছে মাসুদ রানা। ওর পিছনে লেসলি। বেশ খানিকটা পিছনে পড়ে গেছে মেয়েটি। 'জলদি এসো!' তাড়া লাগাল হ্যামন্ড।

আবার ছুটল ওরা। উত্তরদিকে এগোচ্ছে, এইটি সিক্সথ স্ট্রীটের দিকে। পুরো দুই ব্লক পথ পেরিয়ে এসে আবার থামল হ্যামন্ড। ওদের পিছনে, উল্টোদিকে আরেক জোড়া হেডলাইট দেখা দিয়েছে। ট্রেন আসছে আবার। ডানের দেয়ালে কয়েকজন দাঁড়ানোর মত চৌকো একটা বুদ দেখাল সে। 'ওটার মধ্যে দাঁড়াই চলুন।'

নেমে পড়ল ওরা লাইন ছেড়ে। ঢুকে পড়ল বুদে। ট্র্যাক কর্মীদের জন্যে তৈরি এসব বুদ, কাজ করার সময় গাড়ি এসে পড়লে এর মধ্যে আশ্রয় নেয় তারা। বৃদ্ধ টানেলে বিকট আওয়াজ তুলে ছুটে আসছে সাবওয়ে। বাতাসের তোড়ে চোখমুখ জোর করে টিপে বুজে দাঁড়িয়ে থাকল ওরা। হুশ করে বেরিয়ে গেল দীর্ঘ গাড়িটা, ওটার আলোয় আলোকিত হয়ে উঠেছে সামনের এইটি সিক্সথ স্ট্রীট স্টেশন। বুদ ছেড়ে আবার পা চালাল ওরা। হেঁটে এগোল এবার।

এইটি নাইনথ স্ট্রীটের সামান্য আগে ডানের এক সাইড করিডরে ঢুকে পড়ল হ্যামন্ড। ওভারকোটের পকেট থেকে একটা ফ্ল্যাশলাইট বের করে সামনে আলো ফেলল। ঢালু হয়ে ধীরে ধীরে উঠে গেছে প্যাসেজটা। ভীষণরকম নোংরা। বিশ্রী গন্ধ বাতাসে। প্রস্রাবের ঝাঁঝে চোখে পানি এসে গেল ওদের সবার।

'সহ্য করে নিন কষ্ট করে,' বলে উঠল হ্যামন্ড। 'আমরা সুয়্যার লাইনের ওপরে আছি এ মুহূর্তে।'

'তাও ভাল,' স্বস্তির সুরে বলল মাসুদ রানা। 'ওর মধ্যে নিয়ে ফেলেননি।'

ঢাল পেরিয়ে উঠে এল ওরা, তারপর আচমকা খোলা জায়গায় বেরিয়ে এল। সামনেই স্যান্ডলার ম্যানসনের পিছন দিকের উঁচু দেয়াল। অযত্ন অবহেলার ফলে বেড়ে ওঠা ঝোপঝাড়ে প্রায় জঙ্গল হয়ে গেছে জায়গাটা।

দেয়ালের গায়ে বড়সড় একটা গর্ত। তার দু'পাশে নিউ ইয়র্ক সিটি মেট্রোপলিটান ট্রানজিট অথরিটির নীল ইউনিফর্ম পরা দুই লোক দাঁড়িয়ে। হ্যামন্ডের উদ্দেশে নড করল লোক দুটো। গর্তটা দেখল মাসুদ রানা, উবু হয়ে একজন ঢোকার জন্যে যথেষ্ট। ফাঁক দিয়ে আলো আসছে ভেতর থেকে, ব্যাটারিচালিত ল্যান্টার্নের আলো। ভেতরে আরও লোক আছে সম্ভবত। গর্তটা দেখাল ওকে হ্যামন্ড। 'চলুন।'

চোখে প্রশ্ন নিয়ে তাকে দেখল মাসুদ রানা।

'না, আমি এখনও ঢুকিনি ভেতরে। এরা ছাড়া আর কেউ ঢোকেনি এখনও.' ইঙ্গিতে নীল ইউনিফর্ম দেখাল লোকটা। 'আপনি গাইড করবেন, সেই অপেক্ষায় আছি। চলুন, প্লীজ।'

তখনই নড়ল না মাসুদ রানা। ভাল করে দেয়ালের গর্তটা দেখল। কম করেও চার ফুট চওড়া হবে দেয়ালটা। ভেতরে স্যান্ডলার ম্যানসনের প্যানট্রির দেয়াল দেখা যায়, বড় দুটো ল্যান্টার্ন মাটিতে রাখা আছে ওখানে। অ্যাডলফ

জেঙ্গারের কথা ভাবল মাসুদ রানা। বহু বছর আগে, যখন এ শহরের শীর্ষস্থানীয় আইনজীবীদের মধ্যেও সেরা বলে নাম ডাক ছিল তার আর উইলিয়াম ওয়ার্ড ড্যানিয়েলসের, এই বাড়ি থেকে বেরিয়ে গিয়েই আচমকা অবসর গ্রহণের কথা ঘোষণা করেছিল লোকটি। ড্যানিয়েলসের শত অনুরোধও তাকে তার সিদ্ধান্ত থেকে টলাতে পারেনি।

'মিস্টার রানা!'

'হ্যাঁ, চলুন।'

'আলোটা নিন।' মাটি থেকে একটা হেভি ডিউটি ল্যান্টার্ন ওর হাতে তুলে দিল পল হ্যামন্ড। 'লেসলি, তুমি নাও এটা।'

দুই ইউনিফর্ম ঢুকল আগে, পিছনে ওরা। হ্যামন্ড আগে আগে গিয়ে প্যানট্রির কাছে দাঁড়াল। এখানে আছে আরও দুই ইউনিফর্ম। একটা খোলা জানালার পাশে দাঁড়িয়ে আছে এ দু'জন। জানালা গলে টপাটপ ম্যানসনের ভেতরে ঢুকে পড়ল সবাই। রানা সাহায্য করল লেসলিকে। এদের দু'জনের ওপর খুব রেগে ছিল ও, যখন জানা গেল ড্যানিয়েলসের রেখে যাওয়া খাম এরাই সরিয়েছে। সেই সঙ্গে আরও কিছু অপকর্ম ঘটেছে এদের দ্বারা।

পরে অবশ্য মেনে নিয়েছে রানা ব্যাপারটা। যা-ই করেছে ওরা, ভেবে দেখেছে মাসুদ রানা, একজন করেছে প্রাণের দায়ে, অপরজন দেশের স্বার্থে। এ নিয়ে রাগ পুষে রাখা অনর্থক। এ জাতীয় অপকর্ম রানাকেও হরদম করতে হয়। ও যদি এ সবে সফল হতে পারে, অন্যের হতে দোষ কোথায়? নিজেকে সান্ত্বনা দিয়েছে মাসুদ রানা। তারপরও অবশ্য কিছুটা খুঁতখুঁতি রয়েই গেছে মনে। হাজার হোক, কে-ই বা বেকুব বনতে চায়? ব্যাপারটা এখনও থেকে থেকে খোঁচাচ্ছে।

ভেতরে পা রাখতেই কেমন এক অনুভূতি হলো মাসুদ রানার। বর্তমান থেকে হঠাৎ যেন কয়েক দশক পিছিয়ে এসেছে ও, এখানকার বাতাসে অতীতের গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে। কেমন পুরানো পুরানো বাতাস যেন, বাইরের মত তাজা নয়। চার দেয়ালে সাঁটা ওয়ালপেপার এক কালে যে খুব দামী ছিল, ঝলমলে ছিল, দেখলেই বোঝা যায়। এখন ফ্যাকাসে, যৌবন হারিয়ে মিইয়ে পড়েছে। হলদেটে হয়ে গেছে রং। চারদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে মূল্যবান কাঠের তৈরি প্রচুর ভারি আসবাব, সব ধুলোয় একাকার। মেঝে পর্যন্ত ঝুলানো পুরু ভেলভেটের পর্দা ফেসে গেছে কোথাও কোথাও। জমাট ধুলোর স্তরের নিচে হারিয়ে গেছে ওর আসল রং।

লেসলি পাশ থেকে মুঠো করে ধরল রানার কবজি। ঘন ঘন ঢোক গিলছে। কেমন এক অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাকাচ্ছে চারদিকে। খুব দ্রুত নড়ছে তার চোখের মণি। কবজি ছাড়িয়ে নিয়ে ওর হাত ধরল মাসুদ রানা। আশ্বস্ত করার ভঙ্গিতে মৃদু চাপ দিল।

এককালের মহামূল্য কার্পেটের ছাল-চামড়া বর্তমানে প্রায় কিছুই অবশিষ্ট নেই দেখা গেল। তার এক জায়গায় একটা জায়গা অনেকটা পায়ে চলা মেঠো পথের মত লাগছে। নিশ্চয়ই ভিক্টোরিয়া স্যান্ডলারের আসা-যাওয়ার পথ ছিল এটা। ঘুরে ঘুরে নিচতলাটা দেখতে লাগল ওরা। সব ঘরের অবস্থাই এক। দামী দামী নকশা করা ভিক্টোরিয়ান ডিজাইনের ফার্নিচারে ঠাসা। তার ওপর এক ইঞ্চি পুরু ধুলো

একটা টেবিলের ওপর প্রাচীন একটা ঘড়ি দেখল ওরা। সাড়ে দশটায় বন্ধ হয়ে আছে। কবে হয়েছে, কোন কালে, দিনে না রাতে কে জানে? প্রায় প্রতিটি রুমেই একটা করে বিশাল আয়না বসানো ড্রেসিং টেবিল আছে। চেহারা দেখার উপায় নেই ওর একটাতেও। সর্বত্র প্রাচীন একটা গন্ধ বিরাজ করছে। পরিবেশটাও বাইরের তুলনায় বেশ ঠাণ্ডা।

'কিছু খুঁজবেন বলছিলেন আপনি, মিস্টার মাসুদ রানা।' থেমে দাঁড়াল হ্যামন্ড।

'আগে সবটা দেখা হোক,' অন্যমনস্ক গলায় বলল ও।

'কি খুঁজবেন? নির্দিষ্ট কিছু?'

'বলতে পারছি না। চোখে পড়লে বুঝতে পারব।'

'ও।' হতাশ হলো যেন লোকটা। 'তাহলে চলুন ওপর থেকে ঘুরে আসি।'

'না, আগে নিচতলা। তারপর বেজমেন্ট।'

মাথা দোলাল ট্রেজারি এজেন্ট। ম্যানসনের মূল ফ্লোর হচ্ছে ফার্স্ট ফ্লোর, ব্যাখ্যা করল সে, স্ট্রীট লেভেলের ওপরে। আর এখন যে ফ্লোরে আছে ওরা, গ্রাউণ্ড ফ্লোর, সাইডওয়াক লেভেল থেকে অনেক নিচু। এর নিচে বেজমেন্ট। 'বেজমেন্ট কেন?' যেন হঠাৎ খেয়াল হলো, এমনভাবে প্রশ্ন করল সে।

'আমার ধারণা ওখানেই ভিক্টোরিয়ার মৃত অ্যাভিদের কঙ্কালগুলো পাওয়া যাবে,' গম্ভীর গলায় উত্তর দিল মাসুদ রানা।

'ওসব দিয়ে কি করবে?' প্রশ্ন করল তাজ্জব লেসলি।

'নেড়েচেড়ে দেখব।'

'এ মা!' শিউরে উঠল মেয়েটি।

হ্যামন্ড এমন চোখে তাকাল ওর দিকে, যেন বলতে চায়, এমন গুরুত্বপূর্ণ সময়ে এ ধরনের ঠাট্টা করা ঠিক নয়। একটু পর ওদের থেকে আলাদা হয়ে গেল সে, ওপরের বাকি চার ফ্লোর ঘুরে দেখতে গেছে। লেসলি থেকে গেল রানার সাথে। ঘুরতে ঘুরতে বড় এক লাইব্রেরি রুমে এসে দাঁড়াল ওরা। তিন দেয়াল জুড়ে দাঁড়িয়ে আছে উঁচু উঁচু বুক কেস। শূন্য সব। একটা বইও নেই। আরেকবার মেয়েটিকে শিউরে উঠতে দেখে তাকাল মাসুদ রানা। 'ভয় লাগে?'

'ঠিক ভয় না, রানা। কেমন যেন লাগছে, তোমাকে বোঝাতে পারব না।'

'আগে কখনও এসেছ এখানে?'

'পাগল নাকি? কি করে আসব?' একটু থামল সে। 'তবে এ বাড়ির আর্কিটেকচারাল ডিজাইন দেখেছি আমি। কোথায় কি আছে মোটামুটি জানি।'

'গুড। বেজমেন্টের রাস্তা দেখাও তাহলে।'

'এসো।' যার যার লণ্ঠন উঁচু করে ধরে এগোল ওরা।

প্রায় হাঁটু পর্যন্ত ধুলো মেখে, পিছনে ধোঁয়াটে মেঘ রেখে বেজমেন্টে নামার সিঁড়ির মাথায় এসে দাঁড়াল মাসুদ রানা। সরু কাঠের সিঁড়ি। অবস্থা খুব একটা সুবিধেজনক নয়। আল্লার নাম নিয়ে এক পা রাখল ও ধাপে। এমন ভাবে কাৎরে উঠল সিঁড়ি যে চমকে উঠল রানা। ভয় হলো এখনই বুঝি ভেঙে পড়বে। কিন্তু পড়ল না শেষ পর্যন্ত। একজন একজন করে নেমে গেল ওরা প্রচুর সময় ব্যয় করে।

আলো উঁচু করে তাকাল চারদিক। হালকা ধুলোর এক চাদর, আর মেঝে থেকে সিলিং পর্যন্ত উঁচু মাকড়সার জালের কারণে বেশি কিছু দেখার উপায় নেই। লণ্ঠনের আলোয় ওদের বড় বড় ছায়া ক্যারিক্যাচার দেখাচ্ছে যেন দেয়ালে দেয়ালে। এগোল ওরা অনিশ্চিত পায়ে, সর্বত্র ছড়ানো-ছিটানো স্যান্ডলার পরিবারের দুই পুরুষের ব্যবহৃত হাজারো জিনিসপত্রের মাঝ দিয়ে। ডান হাতে একটা লম্বা পর্দার স্ট্যান্ড তুলে নিয়েছে লেসলি ম্যাকঅ্যাডাম, ওটা দিয়ে মাকড়সার জাল ছিঁড়ে ছিঁড়ে পরিষ্কার করছে রাস্তা।

দেয়ালে বড় বড় কয়েকটা পোর্ট্রেট দেখে এগোল মাসুদ রানা। আলো উঁচু করে দেখল ওগুলো। জার্মান মেয়ে-পুরুষের পোর্ট্রেট, অনেক পুরানো। খুব সম্ভব অষ্টাদশ শতাব্দীর। নিশ্চয়ই স্যান্ডলার ওরফে কিন্ডার পরিবারের পূর্ব-পুরুষ-নারী এরা। বিস্মৃত ইতিহাসের পাত্র-পাত্রী। প্রাচীন ইতিহাসের।

রুমের অন্য প্রান্তে কেমন খসখস আওয়াজ উঠল। অন্ধকারে জ্বলে উঠল এক জোড়া লাল চোখ।

'রানা!' আঁতকে উঠল লেসলি।

তার আগেই চরকির মত ঘুরে দাঁড়িয়েছে ও। হাতে বেরিয়ে এসেছে ওয়ালথার। ওর লণ্ঠনের আলোয় মোটামুটি দৃশ্যমান হয়ে উঠল নির্দিষ্ট প্রান্ত। আওয়াজের উৎসটা চোখে পড়ল ওদের। প্রায় বেড়াল সাইজের বিশাল এক ধেড়ে ইঁদুর, একটা বড় স্টীমার ট্রাঙ্কের ওপর বসে কৌতূহলী চোখে ওদের দেখছে। ট্রাঙ্কের গায়ে ইংরেজিতে লেখা ভিলমহেলম ফন ড্রেইসেন স্যান্ডলার। ১৮৬১।

মানুষ দেখেও ধেড়েটা বিন্দুমাত্র ঘাবড়েছে বলে মনে হলো না। গ্যাঁট হয়ে বসে আছে একভাবে। নিজের সাম্রাজ্যে ওদের অনুপ্রবেশ পছন্দ করছে না হয়তো ওটা। 'ওফ!' ফোঁস করে স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়ল মেয়েটি। 'কী যে ভয় পেয়েছিলাম!'

মুখ দিয়ে একটা আওয়াজ করল মাসুদ রানা। খুব একটা গুরুত্ব দিল না ইঁদুরটা, তবে পিছনের দু'পায়ে ভর দিয়ে উঠে দাঁড়াল। ওদের দুজনকে দেখল ভাল করে। নাক চুলকাল। তারপর হেলেদুলে নেমে পড়ল ট্রাঙ্ক থেকে, গায়েব হয়ে গেল। আবার পা চালাল ওরা। সামনের দিকে এখন তেমন নজর দিচ্ছে না লেসলি, থেকে থেকে নিজের পায়ের চারদিকে তাকাচ্ছে। সামনে একটা প্যাসেজওয়ে চোখে পড়তে থেমে দাঁড়াল মাসুদ রানা। 'কি ওটা?' প্যাসেজের ও প্রান্তে আরেকটা রুমও দেখা যাচ্ছে।

'কি জানি!' আনমনে বলল লেসলি। 'ঠিক মনে করতে পারছি না।'

'ফার্নেস রুম নয় তো?'

'না। ফার্নেস রুম আমরা যে সিঁড়ি দিয়ে নেমেছি, তার পিছনে।'

'চলো দেখা যাক।' এগোল মাসুদ রানা। জোর পায়ে ওর পাশে চলে এল লেসলি। প্যাসেজ পেরিয়ে রুমটার খোলা দরজার কাছে এসে দাঁড়াল ও। 'আমি আগে যাই। তুমি পিছনে থাকো।'

'আচ্ছা,' মাথা দোলাল মেয়েটি।

ঢুকে পড়ল রানা রুমে। পিছন থেকে ওর এক হাত মুঠো করে ধরে রেখেছে লেসলি। গায়ে গায়ে ঘেঁষে এগোচ্ছে। দম ফেলছে কাঁপা কাঁপা। মনে মনে হাসল

মাসুদ রানা। কে বলবে এ মেয়ে কয়েকদিনের ব্যবধানে দু'দুটো খুন করেছে? কিসের ভয় করছে লেসলি? অশরীরী কিছুর? নিজের পূর্ব পুরুষদের প্রেতাত্মার মুখোমুখি হতে হয় কি না, সেই ভয়?

রুমটা বড়সড় এক মুসোলিয়াম–সমাধিক্ষেত্র। বেশ জাঁকাল ছিল এক সময় বুঝতে অসুবিধে হয় না। পিতলের তৈরি বেশ কয়েকটা ফলক আছে সরাসরি ওদের উল্টোদিকের দেয়ালে। কিছু লেখা আছে ওগুলোয় কালো অক্ষরে, এখান থেকে বোঝা যায় না। কোন আসবাব নেই এ ঘরে।

'কি ওগুলো?' চিন্তিত গলায় প্রশ্ন করল লেসলি। 'ওই বেদীটা কিসের?' বলতে বলতে রানাকে পিছনে ফেলে এগিয়ে গেল কয়েক পা। ভয় ভুলে গেছে।

রানাও এগোল। কাছে গিয়ে বুঝল পিতলের নয়, ফলকগুলো সোনার তৈরি। ওগুলোর সামনে মেঝেতে ছোট একটা বেদী, হাঁটু সমান উঁচু। তার ওপর দাঁড়িয়ে আছে বেশ কিছু মোমবাতি। কোনটা সম্পূর্ণ পোড়া, কোনটা আধপোড়া। আর আছে কিছু শুকিয়ে কাঠ হয়ে যাওয়া ফুলের তোড়া। কত বছর আগের ফুল অনুমান করতেও ব্যর্থ হলো রানা। কোন ধ্বংসপ্রাপ্ত জনপদের পরিত্যক্ত এক মন্দিরে এসে দাঁড়িয়েছে যেন ওরা। বিগ্রহ নেই, পূজারী নেই, পড়ে আছে শুধু নৈবেদ্য। ওর পাশে কুকুরের একটা ব্রোঞ্জ প্রতিমূর্তিও আছে।

লণ্ঠন উঁচু করে ফলকগুলো দেখল মাসুদ রানা। মুখ এগিয়ে নিয়ে জোরে ফুঁ দিয়ে ধুলো পরিষ্কার করল একটার।

'কুকুরের নাম ফলক,' বলল লেসলি। 'ঠিক ভিক্টোরিয়ার কাজ।'

ওগুলো পড়ল মাসুদ রানা। নামগুলো একই, শুধু সন তারিখ আলাদা। ১৯৩২ সাল থেকে শুরু করে মোট চারটা অ্যান্ডির স্মৃতি ফলক। প্রথমটা ১৯৩২ থেকে ১৯৩৯, দ্বিতীয়টা ১৯৩৯ থেকে ১৯৪৫, তারপরেরটা ১৯৪৫ থেকে ১৯৭৬। সব শেষেরটা ১৯৭৬ থেকে ১৯৮৮। এক অ্যান্ডির মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে আরেক অ্যান্ডি স্থান পেয়েছে তার স্থলে।

বিতৃষ্ণায় নাক কোঁচকাল লেসলি ম্যাকঅ্যাডাম। 'ভীমরতি আর কাকে বলে! উন্মাদ বুড়ি! কাজ আর পায়নি খুঁজে।'

এই হচ্ছে ভিক্টোরিয়া স্যান্ডলারের আরেক জগৎ, ভাবছে মাসুদ রানা। অন্যগুলোর থেকে এ রুমটা আরও ঠাণ্ডা। কখনও কখনও হাতের আলো নড়ে উঠলেই দেয়ালে ওদের ছায়া দুটোও আড়মোড়া ভেঙে দুলে, কেঁপে উঠছে। কখনও দৈর্ঘ্যে বাড়ছে, কখনও প্রস্থে। কুকুরের মূর্তিটার ছায়াও পড়েছে দেয়ালে। সামনে-পিছনে দুলছে ওটা একটু একটু। যেন ঝাঁপিয়ে পড়তে যাচ্ছে ওদের ওপর। ঘাড়ের পিছনে কেমন এক শিরশিরে অনুভূতি হলো মাসুদ রানার। মনে হলো ওর ছায়ার আড়ালে নিজেকে লুকিয়ে ওদের দেখছে ভিক্টোরিয়া স্যান্ডলার।

'কি আজব, তাই না, রানা?'

'হ্যাঁ।'

'এমন পাগলামি আর কেউ কখনও করেছে বলে শুনিনি।'

মাথা দুলিয়ে সমর্থন জানাল ওকে মাসুদ রানা। সরে এল বেদীর সামনে থেকে। এদিক ওদিক তাকাচ্ছে। অন্যমনস্ক। কিছু খুঁজছে মনে হলো। যদিও রানা

নিজেও জানে না কি খুঁজছে ও। কি আশা করছে কুকুরের সমাধিক্ষেত্রে।

'কিছু পেলেন?' পিছন থেকে মোটা পুরুষ কণ্ঠের অপ্রত্যাশিত প্রশ্নটা চমকে দিল ওদের। কখন নিঃশব্দে রুমের দরজায় এসে দাঁড়িয়েছে পল হ্যামন্ড, টেরই পায়নি কেউ।

আঁতকে উঠে সবেগে ঘুরে দাঁড়াল মেয়েটি। মাসুদ রানাও। আপন ভাবনায় এতটাই ডুবে ছিল, ওদের সঙ্গে যে আরও কেউ এসেছে মনেই ছিল না। ঝট করে পিস্তল তুলল ও কণ্ঠস্বর লক্ষ্য করে।

'ডোন্ট শূট! ডোন্ট শূট!!' চেঁচিয়ে সমাধিক্ষেত্র মাথায় তুলল সে। 'আমি, আমি! আমি হ্যামন্ড!' ওদের দেখার সুবিধের জন্যে নিজের লণ্ঠন মুখের সামনে তুলে ধরেছে লোকটা। জ্বলন্ত চোখে তাকে দেখল রানা কয়েক মুহূর্ত, তারপর নামিয়ে নিল অস্ত্র। 'আরেকবার এমন হলে ডোন্ট শূট বলার সময়ও পাবেন না আপনি।'

ফ্যাকাসে চেহারায় শুকনো এক টুকরো হাসি দিল ট্রেজারি এজেন্ট। 'সত্যি, দুঃখিত। এমন হতে পারে চিন্তাই করিনি।'

মনে মনে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল রানাও। আরেকটু হলেই ঘটে যেত সর্বনাশটা। ট্রিগারে আঙুল প্রায় চেপে বসেছিল ওর, নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পেয়েছে বোকা লোকটা এইমাত্র। গুলিটা নিঃসন্দেহে বুকে খেত ব্যাটা। ওয়ালথার শোল্ডার হোলস্টারে ভরে রাখল মাসুদ রানা। আর কিছু বলার প্রয়োজন মনে করল না। নিজেকে সামলে নিয়ে হ্যামন্ডের দিকে এগিয়ে গেল লেসলি, কথা বলতে লাগল নিচু গলায়।

অনিশ্চিত পায়ে পুরো ঘরটা এক চক্কর দিয়ে এল মাসুদ রানা। নাহ্, আগ্রহ সৃষ্টি করতে পারে এমন আর কিছু পড়ল না চোখে। বেদীটা রুমের ঠিক মাঝখানে। ওটার সামনে দাঁড়িয়ে শেষবারের মত আরেকবার চারদিকে তাকাল ও, তারপর বেরিয়ে যাওয়ার উদ্দেশে পা বাড়াল। কিন্তু দু'পা এগিয়েই জমে গেল মাসুদ রানা। এ রুমে ঢোকার দরজার এক পাশে, আট-দশ হাত তফাতে, মেঝেতে সেঁটে আছে ওর দৃষ্টি। তাতে কিছুটা বিস্ময়, কিছুটা অচেনাকে চেনার চেষ্টা। এক চুল নড়ল না মাসুদ রানা।

রানাকে দরজার দিকে এগোতে দেখে আগে আগে সিঁড়ির উদ্দেশে পা বাড়িয়েছিল লেসলি ও হ্যামন্ড। খানিকটা গিয়ে থেমে দাঁড়াল তারা। ঘুরে তাকাল নিশ্চল মাসুদ রানার দিকে।

'কি, রানা?'

জবাব দিল না ও। দ্রুত পায়ে দরজার মুখ থেকে আড়ালে সরে গেল। অবাক হয়ে মুখ চাওয়াচাওয়ি করল লেসলি-হ্যামন্ড, তাড়াতাড়ি ফিরে এল রুমে। ওদের বাঁ দিকে, কয়েক হাত দূরে, মেঝেতে হাঁটু গেড়ে বসে আছে মাসুদ রানা। নিবিষ্ট মনে মেঝে পরখ করছে। হাতে ধরা লণ্ঠন ঘন ঘন ডানে-বাঁয়ে করছে ওর।

'কি দেখছ?'

এবারও উত্তর দিল না রানা। শোনেইনি লেসলির প্রশ্ন। ওর সামনে মেঝের একটা অংশ খানিকটা উঁচু। নয় ফুট চার ফুট হবে জায়গাটা, অনুমান করল মাসুদ

রানা। মেঝের অন্যান্য জায়গার চেয়ে সিকি ইঞ্চিখানেক উঁচু এখানটা, এবং কিছুটা অমসৃণও। ভাল করে তাকালেই বোঝা যায়, জায়গাটা সম্ভবত মেরামত করা হয়েছিল কোন এক সময়ে। এবং বেশ তাড়াহুড়ো করে সারা হয়েছে কাজ, ফাইনাল টাচের সময় তেমন যত্ন নেয়া হয়নি।

'ওহ্, গড!' বলে উঠল হ্যামন্ড। 'এখানটা এরকম কেন?'

স্তব্ধ হয়ে বসে আছে মাসুদ রানা। এতক্ষণ জানত না, কিন্তু এখন জানে কি আবিষ্কার করতে চেয়েছিল ও এখানে। কেন ওকে এখানে নিয়ে এসেছে ওর অবচেতন মন।

'এই অংশটা রিফিনিশ করা হয়েছে,' বলল রানা। 'তাও কম করেও বিশ-পঁচিশ বছর আগে, সম্ভবত।'

'তার মানে···তার মানে···' কথা হাতড়াতে লাগল হ্যামন্ড।

মাথা দোলাল মাসুদ রানা। অন্য দু'জন আগ্রহের সাথে ওকে দেখছে, বুঝতে পেরেও মুখ তুলল না। ওরা বুঝে গেছে কি খোঁজার জন্যে স্যান্ডলার ম্যানসনে আসতে চেয়েছিল মাসুদ রানা। আপন মনে মাথা দোলাতে লাগল পল হ্যামন্ড। লেসলি ম্যাকঅ্যাডাম পলকহীন চোখে জায়গাটা দেখছে। এরকম একটা জায়গায় কি থাকতে পারে দেখামাত্র বুঝে নিয়েছে সে।

'কবর!' লেসলির চিন্তা শব্দ হয়ে বেরুল হ্যামন্ডের গলা দিয়ে।

'কার?' গুঙিয়ে উঠল প্রায় লেসলি।

'খুব বড় কোন কুকুর ছিল কখনও ভিক্টোরিয়ার?' প্রশ্ন করল মাসুদ রানা।

হ্যামন্ড-লেসলি একযোগে মাথা নাড়ল। 'না,' বলল লেসলি। 'তার কুকুর কোনটাই লম্বায় তিন ফুটের বেশি ছিল না।'

'জায়গাটা খুঁড়তে হবে।' উঠে দাঁড়িয়ে ধুলো ঝাড়তে লাগল মাসুদ রানা।

'খুব কঠিন কাজ,' বলল হ্যামন্ড।

'তার চেয়েও কঠিন।' সিগারেট ধরাল ও। 'ড্রিল চলবে না। ভীষণ আওয়াজ হবে।'

'তাহলে? এত শক্ত কাজ ড্রিল ছাড়া···!'

'উপায় নেই। আওয়াজ চাপা দেয়া যাবে না ড্রিলের। শুধু বাটালি আর হাতুড়ি দিয়ে কাজ সারতে হবে।'

'লোক লাগবে অনেক।'

'লাগান। ভেতরে কার লাশ দেখতে হবে।'

একটু ভাবল হ্যামন্ড। তারপর মাথা দোলাল। 'ঠিক আছে।'

'তাড়াতাড়ি ব্যবস্থা করুন।' লম্বা করে চুমুক দিল রানা সিগারেটে। 'এই মুহূর্তে হাত লাগালেও আঠারো থেকে চব্বিশ ঘণ্টা সময় লাগবে কাজ সারতে। কম করেও।'

চোখ কপালে উঠল লেসলির। 'মাই গড! এত?'

'আরও বেশিও লাগতে পারে।' বিস্বাদ লেগে ওঠায় সিগারেট পায়ের তলায় পিষে দিল মাসুদ রানা।

জায়গাটা আবার ভাল করে দেখল ট্রেজারি এজেন্ট। 'তা ঠিক। কংক্রিটের

মেঝে খুঁড়ে কফিন বের করা সহজ কথা নাকি?'

'তাহলে তাড়াতাড়ি লোকের ব্যবস্থা করুন,' বলল লেসলি হ্যামন্ডের উদ্দেশে।

'যাচ্ছি,' বলে বেরিয়ে যাচ্ছিল লোকটা। ডেকে থামাল মাসুদ রানা। গম্ভীর। 'আমার কিছু বলার আছে।'

'নিশ্চই, বলুন!'

'আমার তরফ থেকে দু'জন লোককে এখানে উপস্থিত রাখতে চাই আমি।'

কপাল কুঁচকে উঠল হ্যামন্ডের। জিজ্ঞাসা ফুটল লেসলির চাউনিতেও। 'বুঝলাম না।' রানার মুখোমুখি এসে দাঁড়াল লোকটা।

বোঝাল মাসুদ রানা। সঙ্গে সঙ্গে তীব্র আপত্তি প্রকাশ করল হ্যামন্ড। কিন্তু ও অটল। 'আপনারা আর্থার স্যান্ডলারকে চান, তাই না?' ভরাট, থমথমে গলায় বলল রানা। 'হাতের মুঠোয় পেতে চান?'

'অবশ্যই চাই।'

'নকল ডলারের উৎস বন্ধ করতে চান?'

'চাই। কিন্তু…'

হাত তুলে হ্যামন্ডকে বাধা দিল লেসলি। 'কাদের এখানে আনতে চাও তুমি, রানা?'

'এলে নিজ চোখেই দেখতে পাবে। এখানে আসার আগেই সিদ্ধান্ত নিয়ে এসেছি আমি তাদের ডেকে আনার ব্যাপারে। হয় আমাকে আমার মত করে কাজ করতে দিতে হবে, নয় তোমাদের অন্য ব্যবস্থা করতে হবে। ডলার পাউণ্ডের সমস্যা তোমাদের, আমার নয়।'

'সুযোগ পেয়ে ব্ল্যাকমেইল করছেন?' গোমড়া মুখে প্রশ্ন করল হ্যামন্ড।

'আপনি যদি তাই বুঝে থাকেন, তাহলে তাই। আমি বুঝি, জটিল স্যান্ডলার সমস্যা সমাধানের একেবারে কাছে এসে পৌঁছে গেছি আমরা। একেবারে কাছে।'

নীরবে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে আছে হ্যামন্ড-লেসলি। দু'জনেই চিন্তিত। 'কাদের নিয়ে আসতে চাইছেন, কেন চাইছেন, বললে ক্ষতি কি?' বলল ট্রেজারি এজেন্ট।

'একটা গল্পের কিছুটা শুনেছি আমি লেসলির মুখে, কিছুটা আপনার মুখে, এবং শেষটা আরেকজনের মুখে। গল্পটা একই, অথচ কোথায় যেন একটা শূন্যস্থান রয়ে গেছে। শেষ হয়েও হয়নি, ওই শূন্যটা আমি পূরণ করতে চাই। সেই জন্যেই ওই দু'জনকে আনতে চাইছি।'

বিষম দ্বিধায় পড়ে গেল পল হ্যামন্ড। ঠিক করতে পারছে না কি করবে।

শেষ ঢিলটা ছুঁড়ল মাসুদ রানা। 'যদি সে সুযোগ না দেয়া হয় আমাকে,' হ্যামন্ডকে লক্ষ করে বলল, 'খালি হাতে ওয়াশিংটন ফিরে যেতে হবে আপনাকে, ব্যর্থতার বোঝা কাঁধে নিয়ে। আর তোমার বেলায়,' মেয়েটির দিকে তাকাল রানা। 'যে মানুষটি সম্ভবত আজও খুঁজে ফিরছে তোমাকে হত্যা করার জন্যে, এই সুযোগ হারালে তার নাগাল কোনদিনও আর পাবে না তুমি। তাড়াতাড়ি ভেবে ঠিক করো তোমরা কোনটা চাও।'

একে অন্যের মুখের দিকে তাকাল ওরা দু'জন।

'আমার ওপর আস্থা রাখাই তোমাদের জন্যে ভাল হবে। কারণ সেক্ষেত্রে, ভাগ্য যদি ভাল হয় আর্থার স্যান্ডলারকে গর্ত থেকে বের করে আনতে পারব আমি। জীবিত অবস্থায়, এবং আগামী চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে।'

নতুন দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকাল ট্রেজারি এজেন্ট। 'এত নিশ্চিত হচ্ছেন কি করে?'

'তুমি চেনো তাকে?' কঠিন গলায় বলল লেসলি।

'না, চিনি না। তবে অনুমানে চোখের সামনেই তাকে দেখতে পাচ্ছি আমি এ মুহূর্তে।'

আবার নীরবতা।

'তারা কোথায়, যাদের আনতে চাইছেন?'

'বেশি দূরে নয়। একটা টেলিফোন করলেই পৌঁছে যাবে।'

'অল রাইট। ডাকুন তাদের।'

পাঁচ

এইটি সিক্সথ স্ট্রীট সাবওয়ে প্ল্যাটফর্মের প্রবেশ পথে দাঁড়িয়ে আছে মাসুদ রানা সকাল সাড়ে সাতটা। আকাশ মেঘলা। থেকে থেকে দমকা ঠাণ্ডা বাতাস হাড়-মজ্জা কাঁপিয়ে দিয়ে যাচ্ছে। কিছুক্ষণ পর পর ঘড়ি দেখছে রানা, চেহারায় দুশ্চিন্তার ছাপ। চোখ টকটকে লাল। এর মধ্যে দুটো সাবওয়ে ইন করেছে স্টেশনে, চলেও গেছে। কিন্তু ও যে দু'জনের অপেক্ষায় আছে তাদের দেখা নেই।

আধঘণ্টা ধরে অপেক্ষা করছে রানা এই জঘন্য আবহাওয়ার মধ্যে, উন্মুক্ত জায়গায়। টেলিফোন সেরেই এখানে এসে দাঁড়িয়েছে ও। সঙ্গে সঙ্গে রওনা হলে এতক্ষণে তাদের এসে পড়ার কথা, অথচ···। কোন গণ্ডগোল হয়ে যায়নি তো? ভাবল মাসুদ রানা, বা কোন দুর্ঘটনা? জলদি! মনে মনে বলল ও, জলদি। আবার ঘড়ি দেখল ও। মুখ তুলে ডানে-বাঁয়ে ভাল করে নজর বোলাল। খবর নেই।

উপশহরমুখী একটা এক্সপ্রেস ট্রেন ঝড়ের গতিতে এসে দাঁড়াল স্টেশনে নির্দিষ্ট সময় ছেড়েও গেল মাটি কাঁপিয়ে। ওটার একেবারে শেষ কারে বসা দুই তরুণী অবাক চোখে দেখল মাসুদ রানাকে। লোকটা পাগল নাকি? ভাবল ওরা, এই ঠাণ্ডায় খোলা জায়গায় কেউ দাঁড়িয়ে থাকে ওভাবে? সময়মত ছেড়ে গেল ট্রেন। যতদূর দেখা যায় ওটার দিকে তাকিয়ে থাকল মাসুদ রানা। তারপর আবার রাস্তার দিকে নজর দিল।

সময় কাটানো সমস্যা হয়ে দেখা দিয়েছে। স্টেশনের শেডের নিচে চলে এল রানা। পায়ে পায়ে একটা পত্রিকা স্টলের সামনে এসে দাঁড়াল। জায়গায় জায়গায় স্তূপ হয়ে আছে বিভিন্ন পত্রিকা। একটা কিনে চোখ বোলাবে কি না ভাবছে, এই সময় একটা পত্রিকার ব্যানার হেডিং চোখে পড়ল। বিশাল এক সোভিয়েত ফিশিং ফ্লীট ম্যাসাচুসেটসের উপকূল চষে বেড়াচ্ছে, বলা হয়েছে ওতে। মুহূর্তে আগ্রহ

হারিয়ে ফেলল মাসুদ রানা। দ্রুত পায়ে ফিরে গেল আগের জায়গায়। 'তাড়াতাড়ি!' বিড়বিড় করে বলে উঠল ও, 'খোদার কসম লাগে, তাড়াতাড়ি!'

ওকে ভাবিয়ে এবং ঘামিয়ে আরও দশ মিনিট কেটে গেল। অবশেষে তাদের দেখা মিলল। গাড়ি বড় রাস্তায় রেখে জোর পায়ে হেঁটে আসছে। বাতাসের কারণে সামনে ঝুঁকে হাঁটছে লোক দুজন।

পিটার হোয়াইটসাইড ও হান্টার রজার্স।

বাতাসের তোড়ে বুক ফর্সা হান্টারের, লম্বা দাড়ি দু'ভাগ হয়ে দুই কাঁধে গিয়ে আসন গেড়ে বসে আছে।

'খুব অবাক হয়েছেন লাগছে?' প্রশ্ন করল হোয়াইটসাইড।

'ঠিক বলেছেন। আপনাদের খুব সময়-সচেতন বলে সুনাম আছে জানতাম,' তিক্ত স্বরে বলে উঠল রানা। 'সেটা যে আসলে ভুল, জেনে অবাক হয়েছি।'

'সরি, কিছু মনে করবেন না। কোথায় স্যান্ডলার?'

'আর মেয়েটা?' প্রশ্ন করল হান্টার।

'আছে। ধারেকাছেই।'

'দয়া করে অহেতুক সময় নষ্ট করবেন না আমাদের, মিস্টার মাসুদ রানা,' বলল হোয়াইটসাইড। এক পা থেকে আরেক পায়ে দেহের ভর চাপাল সে, বাতাসের সরাসরি আক্রমণ থেকে বাঁচার জন্যে মুখটা ফেরাল এক পাশে। 'কেন আসতে বলেছেন আমাদের?'

'সে বিষয়ে টেলিফোনেই বলেছি। আমি আপনাকে এক "নতুন" লেসলি ম্যাকঅ্যাডাম উপহার দিতে যাচ্ছি। তারপর জানাতে যাচ্ছি আপনাদের বহু আকাঙ্ক্ষিত পাউণ্ড স্টার্লিং জালকারী আর্থার স্যান্ডলারের বর্তমান পরিচয় ও অবস্থানের সন্ধান। বিনিময়ে আপনি আমাকে জানাবেন স্যান্ডলার পর্বের যেটুকু আমি এখনও জানি না, সেটুকু। একটা দাঁড়ি কমাও যেন বাদ না থাকে।'

'আমি রাজি,' ধূর্ত এক টুকরো হাসি ফুটল লোকটার মুখে। 'স্যান্ডলারের বিনিময়ে আমি আরও অনেক কিছুই করতে রাজি আছি, আপনাকে তখনই বলেছি আমি ফোনে।'

হান্টারকে কিছুটা যেন চিন্তিত মনে হলো। একভাবে তাকিয়ে আছে মাসুদ রানার দিকে। চোখাচোখি হতেই মুখ ঘুরিয়ে প্ল্যাটফর্মের এ মাথা ও মাথা দেখতে লাগল সে। পরিবেশটা খুব সম্ভব পছন্দ হচ্ছে না।

'মনে আছে,' হোয়াইটসাইডকে বলল রানা। 'তবু আরেকবার আমাদের যার যার স্মৃতিশক্তি যাচাই করে নিলাম, উভয়েরই স্বার্থে। এ সব ব্যাপারে যে "ভদ্রলোকের চুক্তি" আপনা আপনি বলবৎ হয়ে থাকে, তাও নিশ্চই জানা আছে আপনার?'

'নিশ্চই জানা আছে,' অধৈর্য ভঙ্গিতে নাক টানল লোকটা। 'নইলে কি আর এই অজায়গায় ছুটে আসি এই আবহাওয়ায়? তাও বিদেশে?'

'দ্যাটস গুড, স্যার।'

পনেরো মিনিট পর। টানেলের অন্ধকার রেইল ট্র্যাক ধরে হাঁটছে ওরা তিনজন। মাসুদ রানা পথ দেখাচ্ছে আগন্তুকদের। প্রথমে খানিকটা উত্তরে

এগোল দলটা, তারপর টানেলের সঙ্গে পশ্চিমে বাঁক নিল। ম্যানহাটনের তলা দিয়ে হেঁটে চলল নির্দিষ্ট স্থানের দিকে। বিশ মিনিট পর স্যান্ডলার ম্যানসনের ভাঙা সীমানা দেয়ালের সামনে পৌঁছল ওরা।

দেয়াল গলে প্যানট্রির জানালা, তারপর জানালা টপকে ভেতরে। হোয়াইটসাইডকে বিরক্ত মুখে গায়ের ধুলো ঝাড়তে দেখা গেল। ওদিকে হান্টারের নজর ঘন ঘন স্থান বদল করছে। অস্থির চোখে নিজেদের চারদিকে তাকাচ্ছে লোকটা। উত্তেজনায় টান টান। এটা কোন ফাঁদ কি না, সময় শেষ হয়ে যাওয়ার আগেই টের পেতে চায় সে। বেজমেন্টের মেঝেতে হাতুড়ি ও বাটালির সংঘর্ষের আওয়াজ বেশ জোরেশোরেই কানে বাজছে।

ডাইনিং রুম পেরিয়ে এল ওরা। সবার অজান্তে ইচ্ছে করেই হোয়াইটসাইডকে সামনে পাঠিয়ে দিয়েছে মাসুদ রানা, তার এবং হান্টারের মাঝখানে অবস্থান নিয়েছে নিজে। পিছন থেকে ওর নির্দেশে হাঁটছে হোয়াইটসাইড। রুমের শেষ মাথায় পৌঁছে থমকে গেল লোকটা। তার দম আটকে যাওয়ার শব্দ পরিষ্কার শুনতে পেল মাসুদ রানা। জমে গেছে পিটারের চেহারার অভিব্যক্তি। সামনে চেয়ে আছে হাঁ করে।

'বলুন, মিস্টার হোয়াইটসাইড,' বলল রানা। 'হ্যাঁ, কি না?'

তার চার হাতের মধ্যে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে লেসলি ম্যাকঅ্যাডাম, নির্বিকার। তার পিছনে পল হ্যামন্ড। পরস্পরের দিকে মূর্তির মত তাকিয়ে আছে লেসলি ও হোয়াইটসাইড।

'হ্যাঁ, তাই না?' নরম গলায় আবার প্রশ্ন করল ও।

'হ্যাঁ,' মন্ত্রমুগ্ধের মত মাথা দোলাল লোকটা। চেপে রাখা দম ছাড়ল সশব্দে। 'নিশ্চই! নিশ্চই!' মাথা দোলাল বারকয়েক। 'এই তো সে!'

পলক ফেলল লেসলি। মৃদু হাসির ভঙ্গি করল। 'হ্যালো, পিটার! ব্রুকলিন হাইটস প্রমিনেডে মনে হয় আমাকে চিনতে অসুবিধে হয়েছিল সেদিন, তাই না?'

দ্রুত মাথা ঝাঁকাল হোয়াইটসাইড। 'হ্যাঁ হ্যাঁ, সত্যিই চিনতে পারিনি। অবশ্য তোমাকে পালিয়ে যেতে দেখে অনুমান করেছিলাম যে...।' থেমে কি যেন ভাবল সে। 'বেচারী! লণ্ডনে তোমার কবরে যাকে কবর দিয়েছি, দেখতে সে অনেকটাই তোমার মত ছিল।'

'অনেকটাই এর মত,' বলে উঠল মাসুদ রানা। 'তবে সে অন্য আরেকজন। খুব জবর এক ধাঁধার খেলা, কি বলেন?'

ঘুরে তাকাল হোয়াইটসাইড। প্রশ্নটা বুঝতে পারেনি। 'স্যার?'

'আপনাদের "ডাবল" খেলার কথা বলছিলাম। অথবা ডাবল ডাবলস, যা-ই বলেন।'

উত্তর না দিয়ে লেসলিকে দেখল বৃদ্ধ আগ্রহী দৃষ্টিতে। 'তুমি কোথায় ছিলে, কি ভাবে দিন কেটেছে তোমার এতবছর, কিছুই জানতাম না আমি।'

কাঁধ ঝাঁকাল মেয়েটি। 'পথের মাঝে অসহায় অবস্থায় ফেলে রেখে গেল আমাকে ব্রিটিশ সরকার,' গলায় কিছুটা কাঠিন্য ফুটল তার। 'আমেরিকানরা চাইল আমাকে সাহায্য করতে, রাজি হয়ে গেলাম বিনা দ্বিধায়।'

চিন্তিত মুখে মাথা দোলাল হোয়াইটসাইড। 'এত সংক্ষেপে না সেরে পুরোটা যদি আরেকটু খুলে...'

বাধা দিল মাসুদ রানা। 'এখনও আসেনি সে সময়।'

'মাফ করবেন?' বিস্মিত হলো হোয়াইটসাইড।

'আমরা এখানে মিলিত হয়েছি তথ্য বিনিময় করতে, এক তরফা বলতে বা শুনতে নয়। দুই তরফকেই বলতে হবে যার যার রোল সম্পর্কে। এবং আমি তা শুনব।'

'আপনি শুনবেন?' চোখ কোঁচকাল পিটার। কণ্ঠে বৈরিতার আভাস। 'জানতে পারি কেন আপনি শুনবেন?'

হাসল মাসুদ রানা। 'এই কারণে যে যতক্ষণ আপনি স্যান্ডলার উপাখ্যানের আপনার জানা সমস্ত তথ্য প্রকাশ না করছেন, ততক্ষণ স্যান্ডলারের অবস্থান জানানো হবে না আপনাকে। আপনি চান না লোকটার খোঁজ?'

'নিশ্চই চাই!' প্রায় হাউমাউ করে উঠল সে। 'একশোবার চাই!'

'তাহলে বলে ফেলুন, পিটার, প্লীজ,' অনুনয় করে লেসলি।

'যে সব এতদিন সযত্নে চেপে রেখেছেন আপনি,' বলল মাসুদ রানা। 'সব বলতে হবে। কিছুই চেপে যাওয়া চলবে না।'

'ওসব এম.আই. সিক্সের ক্লাসিফায়েড তথ্য,' হতাশ ভঙ্গিতে মাথা দোলাল হোয়াইটসাইড। 'প্রকাশ করার ক্ষমতা আমার নেই।'

'সময় নেই, মিস্টার পিটার,' বলল মাসুদ রানা।

'কিসের?'

'আপনারা দু'পক্ষই যাকে কয়েক দশক ধরে মুঠোয় পেতে এত আগ্রহী, আর বড়জোর একদিন, এরপর হাতছাড়া হয়ে যাবে সে। চিরদিনের মত পিছলে বেরিয়ে যাবে আর্থার স্যান্ডলার। যদি লোকটাকে পেতে চান, মুখ খুলতে হবে আপনাকে। এবং এখনই। কাজেই আরেকবার ভেবে দেখুন, মুখ খুলবেন কি খুলবেন না। বিনিময়ে কি অর্জন করবেন, সে তো বলেইছি আমি।' একটু থামল ও। 'বোধহয় মুখ খোলাই ভাল হবে আপনার জন্যে। নইলে স্যান্ডলারকে সরে পড়তে সাহায্য করা হবে পরোক্ষে। আপনি তা চাইবেন বলে মনে করি না আমি।'

নার্ভাস লাগছে হ্যামন্ডকে। প্রত্যাশা নিয়ে পিটারকে দেখছে সে।

'বুঝলাম,' বলল পিটার। 'কিন্তু সে জন্যে হোয়াইটহলের অনুমতি নিতে হবে আমাকে। সেটাই নিয়ম।'

মাথা দোলাল মাসুদ রানা। 'আমি বলছি সময় নেই। হয় নিয়ম ভাঙুন, নয়তো...'

'প্লীজ, পিটার,' আকুতি জানাল লেসলি। 'প্লীজ!'

আনমনে তার গলার কাটা দাগটার দিকে চেয়ে থাকল লোকটা। লড়াই করছে নিজের সাথে। মুখ ঘুরিয়ে হান্টারকে দেখল। লোকটা চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে, চেহারা অভিব্যক্তিহীন। চোখ নামিয়ে নিজের পায়ের দিকে তাকিয়ে থাকল পিটার। দীর্ঘ দু'মিনিট পার করে মুখ খুলল সে। 'অল রাইট। চলুন তাহলে কোথাও বসা যাক।'

ডাইনিং রুমেই বসল সবাই, ডাইনিং টেবিলে। একটা ব্যাটারিচালিত লণ্ঠন আর হ্যামন্ডের জোগাড় করা দু'তিনটে কেরোসিন ল্যাম্পের আলোয় বড়সড় রুমটা আলোকিত করা হয়েছে। মুখোমুখি বসা লেসলিকে আরও ভাল করে লক্ষ করল হোয়াইটসাইড। তারপর মাথা দোলাল আপনমনে। 'আওয়াজটা কিসের?' প্রশ্ন করল সে।

'বেজমেন্টে কিছু খোঁড়াখুঁড়ির কাজ চলছে,' বলল রানা। 'পরে দেখতে পাবেন। এখন আসল কাজ শুরু করা যাক। লেসলি, তুমি প্রথম।'

খোলা চুল দুই কানের পিছনে গুঁজল মেয়েটি। 'আমার আসল পরিচয় সম্পর্কে কারও মনে আর কোন দ্বিধা নেই, ঠিক?' সবার মুখের ওপর দিয়ে ঘুরে এল ওর দৃষ্টি। প্রথমে পিটার, তারপর হ্যামন্ড সম্মতিসূচক মাথা দোলাল। 'গুড।' সবার জানা নিজের জন্ম ইতিহাস সংক্ষেপে এবং দ্রুত বলে গেল মেয়েটি। এরপর ১৯৭৮ সালে ছুটিতে তার ইংল্যান্ড আসার প্রসঙ্গ এল আলোচনায়।

'সেই সময়,' পিটারের চোখে চোখ রেখে বলল লেসলি, 'আমাকে দিয়ে আসা "প্রোটেকশন" প্রত্যাহার করে নিল ব্রিটিশ ইন্টেলিজেন্স।'

'আমি খুব দুঃখিত, লেসলি,' বলল লোকটা। 'সিদ্ধান্তটা ওপর মহলের ছিল। আমার সেখানে কিছু...'

'পরে বলার সুযোগ পাবেন আপনি,' কড়া গলায় বাধা দিল মেয়েটি। 'আগে আমাকে বলতে দিন।'

মাথা দোলাল হোয়াইটসাইড।

'আমাকে আর পাহারা দেয়ার প্রয়োজন মনে করল না ওরা। অনেক বছর হলো নিরাপদেই কেটে গেছে আমার। পাউণ্ড জাল হয় না, আর্থার স্যান্ডলারেরও কোন খোঁজ নেই, অতএব...।' কাঁধ ঝাঁকিয়ে থেমে গেল লেসলি।

নীরবে ওদের দু'জনকে পর্যবেক্ষণ করছে মাসুদ রানা। হান্টারের চোখ রানা ও হ্যামন্ডের ওপর। নিচের আওয়াজটা বেড়ে গেছে আগের থেকে।

'আমি মূল্যহীন হয়ে পড়েছি ভেবে কেটে পড়ল ওরা,' আবার শুরু করল লেসলি। 'এই সময় রবার্ট ল্যাসিটার নামে এক আমেরিকান দেখা করতে এল আমার সাথে।' হ্যামন্ডের স্তিমিত চাউনি জ্যান্ত হয়ে উঠল এই পর্যায়ে। এ ঘরে একমাত্র সে-ই জানে রবার্ট ল্যাসিটার কে। 'বলল, ওয়াশিংটন থেকে এসেছে সে, ইউনাইটেড স্টেটস ট্রেজারি ডিপার্টমেন্ট থেকে। মেরিট নামে এক ভদ্রলোক পাঠিয়েছে তাকে আমার সঙ্গে দেখা করতে। ইউ. এস. ট্রেজারি ইন্টেলিজেন্সের প্রধান ছিলেন তিনি, ল্যাসিটারের বক্তব্য অনুযায়ী।'

চোখ কুঁচকে উঠল পিটার হোয়াইটসাইডের, হতভম্ব। পল হ্যামন্ড মাথা দোলাল। হান্টারের মধ্যে কোন পরিবর্তন দেখা গেল না, আগের মতই রানা ও হ্যামন্ডকে পর্যবেক্ষণ করছে।

'সে রাতে চীপসাইডের এক রেস্টুরেন্টে কফি খেতে গিয়েছিলাম আমি। সেখানেই সে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে। এবং কথায় কথায় বুঝলাম, আমার সম্পর্কে কোন কিছুই অজানা নেই তার। ল্যাসিটার আমাকে নিরাপত্তার বিনিময়ে তাদের সাহায্য করা, অর্থাৎ স্যান্ডলারকে ট্রেস করার একটা সুযোগ করে দেয়ার

অনুরোধ জানায়।

'কোন উপায় ছিল না। দুইবার আমাকে হত্যা করতে চেয়েছে স্যান্ডলার, সে স্মৃতি কি ভোলা যায়? সে বেঁচে আছে, সুযোগ পেলে আবারও সেই একই চেষ্টা করবে, অতএব নিজেকে রক্ষা করার জন্যে নিরাপদ আশ্রয় চাই আমার। তৃতীয়বার যেন সে নাগাল না পায় আমার গলার। এক কথায় রাজি হয়ে গেলাম।'

'ঠিক কি ছিল ল্যাসিটারের প্রস্তাব?' জানতে চাইল পিটার।

'আমার জীবনের নিরাপত্তা, জীবনধারণের যাবতীয় খরচাদি বহন করা সহ এক কথায় তারা আমার নতুন গার্জেন হতে আগ্রহ প্রকাশ করল। আমিও পাল্টা প্রস্তাব দিলাম, যদি মার্কিন সরকার আমাকে আর্থার স্যান্ডলারের লাশ দেখাব বলে কথা দেয়, সাহায্য করব আমি। ল্যাসিটার জানাল, আমি যদি তাদের আর্থার স্যান্ডলারকে ট্রেস করার একটা সুযোগ করে দিতে পারি, তাহলে ওয়াশিংটনও আমার ইচ্ছে পূরণ করবে।

'তার প্রস্তাবে রাজি না হয়ে কোন উপায়ও আসলে ছিল না। তার আগেই টের পেয়ে যাই আমি, আমার ব্যাপারে ব্রিটিশ ইন্টেলিজেন্সের আগ্রহ কমে আসতে শুরু করেছে। কেন, সে কথা তারাই ভাল বলতে পারবে,' আরেকবার হোয়াইটসাইডের নত মুখের দিকে তাকাল লেসলি। 'আমার চারদিকে ওদের যে বেষ্টনী ছিল, তা ক্রমেই শিথিল হয়ে পড়তে শুরু করেছে। সেই পরিস্থিতিতে অমুক কি তমুক বড় ছিল না আমার কাছে, বড় ছিল শুধু নিরাপদ এক আশ্রয়।

'এই সময় স্যান্ডলারকে নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ মারাত্মক এক ভুল করে বসল। লন্ডনের ফরেন অফিসের এক মেয়ে টাইপিস্ট, বয়সে এবং আকারে-গঠনে অনেকটা আমারই মত দেখতে, তাকে আমি ভেবে বসল তারা। ভেবেছে আমিই বোধহয় তার নাম গ্রহণ করে চাকরি করছি ওখানে। একদিন খুব ভোরে হতভাগ্য মেয়েটির ওপর চড়াও হলো আর্থার স্যান্ডলার, তার প্রিয় অস্ত্র পিয়ানোর তার নিয়ে। জবাই করে রেখে গেল লিন্ডা নামের মেয়েটিকে। মাথা প্রায় আলাদা হয়ে গিয়েছিল বেচারীর দেহ থেকে।

'নিজের এই ভুল সম্পর্কে কোন ধারণাই ছিল না স্যান্ডলার বা তার নিয়ন্ত্রকের। অন্তত ভিক্টোরিয়া স্যান্ডলারের মৃত্যুর পর আমি মাথা তোলার আগ পর্যন্ত।'

বিড়বিড় করে বলে উঠল প্রাক্তন এম. আই-সিক্স কর্মকর্তা, 'এই ঘটনায় বোকা বনে যাই আমরা। জানতাম লিন্ডা দেখতে লেসলির মত, এবং তার হত্যাকাণ্ডের ধরনটাও আমাদের খুবই পরিচিত, তাই বুঝে নিলাম কি ঘটে গেছে। আলোচনা করে তাই লেসলি নামেই লিন্ডাকে কবর দিই আমরা। সে সময় লেসলি কোথায় কোন ধারণাই ছিল না আমাদের। যেদিন আপনার সাথে,' রানার দিকে তাকাল সে, 'লন্ডনে প্রথম কথা হয় আমার, সেদিন পর্যন্ত এর ব্যাপারে পুরোপুরি অন্ধকারে ছিলাম আমি। আমরা চেয়েছি আর্থার যেন বোঝে যে সত্যিকার লেসলিকেই হত্যা করতে সক্ষম হয়েছে সে। শুধু তাকেই নয়, যতজনকে সম্ভব একই কথা বিশ্বাস করাতে চেষ্টা করেছি আমরা।'

'আমাকেও,' মৃদু কণ্ঠে বলল মাসুদ রানা।

'হ্যাঁ, নিশ্চই! কারণ আপনার উদ্দেশ্য অজানা ছিল আমাদের। তবে আপনার ইনফর্মেশন সোর্স যে ভাল ছিল, তাতেও সন্দেহ ছিল না কোন।' সামান্য বিরতি। 'আমরা যথাসাধ্য সবাইকে বিশ্বাস করাতে চেয়েছি লেসলি ম্যাকঅ্যাডাম মারা গেছে। তার প্রমাণও দেখেছেন আপনি আর্ল'স কোর্টের সেই গির্জার পিছনে। যদিও তখন থেকেই আপনাকে অনুসরণ করতে থাকি আমরা। ইচ্ছে ছিল আর কেউ দেখার আগেই "আপনার" লেসলিকে কাছে থেকে এক নজর দেখব।'

'অর্থাৎ "ভুয়া" লেসলিকে!'

'কথাটা বলেছিলাম এই জন্যে, যাতে আপনি লেসলির ওপর আস্থা হারিয়ে ফেলেন। এ নিয়ে যাকে-তাকে প্রশ্ন করা থেকে বিরত হন।' লেসলির দিকে ফিরল সে। 'লিন্ডার নিহত হওয়ার রাতে কোথায় ছিলে তুমি, লেসলি?'

'লন্ডনেই। পরদিন মেয়েটিকে কবর দেয়ার সময় আমি যেতে চেয়েছিলাম কবরস্থানে। কিন্তু ল্যাসিটারের জন্যে পারিনি। যা হোক, সেইদিনই মনট্রিয়ল চলে যাই আমি। লিন্ডার জন্যে দুঃখ হয়েছে ঠিকই। আবার স্বস্তিও পেয়েছি এই ভেবে যে এই প্রথম সত্যি সত্যি সবাই জানল অবশেষে মৃত্যু হয়েছে লেসলি ম্যাকঅ্যাডামের। সারাক্ষণ মৃত্যু ভয়ের তাড়া খেয়ে বেড়াতে হবে না আর আমাকে। আর কিছু না হোক অন্তত পড়াশুনাটা শেষ করতে পারব নিশ্চিন্তে।'

মাথা দোলাল মাসুদ রানা। দু'হাত বুকে ভাঁজ করে হেলান দিয়ে বসল। লেসলির চোখে চোখ রেখে চেয়ে আছে। বেজমেন্ট থেকে ক্রমাগত হাতুড়ি-বাটালির আওয়াজ আসছে। আর কয় ঘণ্টা লাগবে? ভাবছে ও। কতক্ষণে পর্দাটা সরাতে সক্ষম হবে ও চোখের সামনে থেকে?

'তবু কিছুদিন সতর্ক থাকতে হয়েছে আমাকে,' আগের কথার খেই ধরল মেয়েটি। 'ল্যাসিটারের নির্দেশে। মাস ছ'য়েক পর সব ধরনের বিধিনিষেধ তুলে নেয়া হলো আমার ওপর থেকে। বলা হলো আমি খোলামেলা চলাফেরা করতে পারি।'

দেয়ালে ঝোলানো কয়েক দশকের পুরানো ভিক্টোরিয়া স্যান্ডলারের একটা পোর্ট্রেটের দিকে তাকাল মাসুদ রানা। দু'চোখে রাজ্যের ঘৃণা নিয়ে ওকেই দেখছে মহিলা। পাতলা ঠোঁটে ক্রূর হাসি বিস্তার লাভ করছে যেন একটু একটু করে।

'ইউ. এস. ট্রেজারি ইন্টেলিজেন্স ভিক্টোরিয়া স্যান্ডলারের মৃত্যুর অপেক্ষায় দিন গুণতে থাকে। এর মধ্যে জাল ডলার প্রচুর ক্ষতি করে ফেলে মার্কিন অর্থনীতির। তারা ভালভাবেই জানত কোত্থেকে আসছে এ টাকা, কার কাজ এ সব। তো, ভিক্টোরিয়ার মৃত্যুর পর ল্যাসিটার আমাকে আড়াল ছেড়ে বেরিয়ে আসার নির্দেশ দিল। দলিলপত্র কিছু নেই জেনেও মাসুদ রানার সাথে যোগাযোগ করতে পরামর্শ দিল আমাকে।' এই পর্যায়ে এসে মাসুদ রানার সাথে ড্যানিয়েলসের সম্পর্কের বিষয়টা পিটারকে ব্যাখ্যা করল লেসলি।

'দলিল না থাকলেও আমার কাছে স্যাণ্ডলার আর আমার মায়ের বিয়ের সার্টিফিকেট, আমার বার্থ সার্টিফিকেট আছে, এসব দেখিয়ে মাসুদ রানার সাহায্যে নিজের পরিচয় প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হতাম আমি। এবং এ নিয়ে মামলা ঠুকে দেয়ার কথা ছিল আমার সময়মত। সে-ক্ষেত্রে এই ম্যানসনসহ স্যান্ডলার এস্টেটের

যাবতীয় কার্যক্রম বন্ধ করে দিত কোর্ট, বাধ্য হত স্যান্ডলার নাক বের করতে।

'ড্যানিয়েলস মৃত্যুর আগে যদি মাসুদ রানাকে এর সঙ্গে না জড়াত, তাহলে তাকে নিয়ে টানাটানির কোন প্রয়োজন পড়ত না। যা হোক, জড়িয়ে যখন ফেলেছেই: আমাকে বলা হলো, যথাসম্ভব রানার কাছাকাছি থাকার।'

'এক মিনিট,' বাধা দিল মাসুদ রানা। 'লিন্ডার মৃত্যুর পর সবাই জানত তুমিই মারা গেছ, তাই তো?'

মাথা দোলাল লেসলি। 'হ্যাঁ।'

'তাহলে ড্যানিয়েলস অন্যরকম কেন জানল? সে কি করে বুঝল তোমার মৃত্যু হয়নি? কি করে জানল তুমি কানাডায় আছ?'

'ভিভিতে আমার ইটালিয়ান প্রেমিকের কথা তোমাকে বলেছি আমি, রবার্টো জিসারেল্লির কথা। মনে আছে?'

'হ্যাঁ।'

'আমাদের অ্যাফেয়ারের সময়ে নিজের ক্যামেরায় আমার প্রচুর ছবি তুলেছিল সে। তার প্রায় সবগুলোই স্যান্ডলারের হাত ঘুরে ড্যানিয়েলসের কাছে জমা হয়। আমাকে জিসারেল্লি হত্যা করতে ব্যর্থ হওয়ার পর ওই ছবির সাহায্যে স্যান্ডলারকে দিয়েই সে আমাদের পারিবারিক ডেন্টাল সার্জনের কাছ থেকে আমার ডেন্টাল চার্ট বের করে নেয়। পরে লন্ডনে লিন্ডার মৃত্যুর কয়েক মাস পর তার কবর খোঁড়ে ড্যানিয়েলস। তার সাথে আমার ডেন্টাল চার্ট মিলিয়ে নিশ্চিত হয় যে আমি আসলে মরিনি। বেঁচে আছি।

'তারপর সে কি ভাবে আমার সন্ধান পায়, আমার টেলিফোন নম্বর জোগাড় করে, জানি না আমি। সে যেদিন ফোন করে আমাকে, কসম করে বলেছে, আমার বিষয়ে কারও সামনে মুখ খোলেনি সে। স্যান্ডলারের কাছেও পুরোপুরি গোপন রেখেছে ব্যাপারটা। একমাত্র সে ছাড়া আর কেউ জানে না।'

'জিসারেল্লির ছবি তোলা ইত্যাদি ড্যানিয়েলস বলেছেন তোমাকে?'

'হ্যাঁ। জীবনে ওই একবারই কথা হয় আমার তার সঙ্গে। সেদিনই সব জানায় সে আমাকে। এবং সময়মত তোমার সাথে যোগাযোগ করতে বলে।'

আনমনা হয়ে পড়ল মাসুদ রানা। ড্যানিয়েলসের সেই আকুতি মাখা চাউনি এখনও চোখে ভাসছে। কথাগুলোও বাজছে কানে। 'মরার আগে একটা ভাল...' হোয়াইটসাইডের দিকে ফিরল ও। 'সন্তুষ্ট?'

'হ্যাঁ।'

'তাহলে এবার শোনা যাক আপনার উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত। আমার সাথে দু'বার মোলাকাত এবং দু'বার বাতচিতের সময় যে একটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য আপনি সযত্নে চেপে গেছেন, এবার সেটা ঝেড়ে দিন। তথ্যটা পেলেই শূন্যস্থানটা পূরণ করে ফেলতে পারব আমি আশা করি। ধাঁধার অবসান হবে।'

ভুরু কোঁচকাল লোকটা। তারপর মাথা ঝাঁকাল। 'নিশ্চই। সম্মত যখন হয়েছি, তখন বলব অবশ্যই। স্যান্ডলারকে পাওয়া নিয়ে কথা আমার।'

'আগেই বলেছি, তাকে আপনি পাবেন,' দৃঢ় আস্থার সঙ্গে বলল মাসুদ রানা।

হান্টারের দিকে তাকাল হোয়াইটসাইড। তেমনি অভিব্যক্তিহীন, নির্বিকার

লোকটা। মনের মধ্যে কি আছে বোঝার কোন উপায় নেই। টেবিলে উপস্থিত অন্য তিনজনকেও দেখল পিটার। একটা ক্যানারি আইল্যান্ড চুরুট ধরাল সময় নিয়ে। 'ঠিক আছে, শুনুন তাহলে। গল্পটা ভালই লাগবে সবার।'

'এ ধরনের ডাবল-ডাবল খেলা আগেও খেলেছি আমি,' কেশে গলা পরিষ্কার করে বলতে আরম্ভ করল পিটার হোয়াইটসাইড। 'এমনকি ট্রিপল-ট্রিপল খেলাও খেলতে হয়েছে কখনও কখনও। কিন্তু আর্থার স্যান্ডলারের বিষয়টা তার সবগুলোকে হার মানিয়েছে।' হান্টারের দিকে তাকিয়ে দাঁত বের করল সে।

আরেক টুকরো হাসি উপহার দিল সে মাসুদ রানাকে। চেহারা দেখে মনে হয় ব্রিজ চ্যাম্পিয়নশিপ টুর্নামেন্টের চূড়ান্ত খেলায় চূড়ান্ত চাল দিতে যাচ্ছে লোকটা। ভাল করেই জানে, হাতের কার্ডগুলো ফেললে তার চ্যাম্পিয়নশিপ ঠেকানোর সাধ্য কারও নেই।

'এত যাকে নিয়ে হৈ-চৈ, লাফঝাঁপ, সে কিন্তু মারা গেছে বহু বছর আগে।'

'হোয়াট!'

'কি বললেন?'

'ওহ গড!'

পরিস্থিতি স্বাভাবিক হওয়ার জন্যে খানিক সময় দিয়ে আবার শুরু করল লোকটা। 'হ্যাঁ, ঠিকই শুনেছেন আপনারা। অনেক আগে মৃত্যু হয়েছে আর্থার স্যান্ডলারের, আই মীন, আসল আর্থার স্যান্ডলারের। এখন যাকে গরুখোঁজা করছি আমরা সবাই মিলে, সে নকল আর্থার।'

'তার মানে?' আর সবার মত বোকা-বোকা চেহারা হয়েছে রানারও। 'খুলে বলুন।'

'ধৈর্য ধরুন। বলছি।' পল হ্যামন্ডের দিকে ফিরল হোয়াইটসাইড। '১৯৫৯ সালে এলিজাবেথ চ্যাটসওয়ার্থকে বিয়ে করার কয়েকদিন পর সেই যে গেল আর্থার, সেটাই তার শেষ যাওয়া। এক্সিটার থেকে সোজা মস্কো রওনা হয়েছিল সে অস্ট্রিয়া হয়ে। কিন্তু সে পর্যন্ত যাওয়ার সুযোগ হয়নি দুর্ভাগ্যবশত, পথের মাঝেই নিহত হয় আর্থার স্যান্ডলার। সোজা কথায় হত্যা করা হয় তাকে। আমি বুঝি না, আপনাদের সেন্ট্রাল ইন্টেলিজেন্স সার্ভিস, দুঃখিত, এজেন্সি, এতবড় একটা ঘটনা সম্পর্কে আজ পর্যন্ত কিছুই জানতে পারল না কেন।'

পা দুটো সামনে ছড়িয়ে হেলান দিয়ে বসে আছে হান্টার। হাত দুটো বুকে বাঁধা। মুখ নিচু করে চেয়ে আছে পেটের দিকে। ব্যাটা আস্ত একটা ভাল্লুক, ভাবল মাসুদ রানা। আবার গলা খাঁকারি দিল হোয়াইটসাইড, নাক টানল। সবার মনের অবস্থা চিন্তা করে তৃপ্তি পাচ্ছে যেন লোকটা।

'দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষ দিকে প্রথম পাউণ্ড জাল করতে আরম্ভ করে আর্থার স্যান্ডলার, আপনারা প্রত্যেকেই তা মোটামুটি জানেন। ইউরোপের বিভিন্ন দেশ থেকে স্রোতের মত সে টাকা ঢুকতে থাকে ব্রিটেনে। কোত্থেকে আসছে এসব ভেবে কূল পাচ্ছিলাম না আমরা। সে যা হোক, ১৯৪৫ সালের শেষদিকে টাকা জাল করার মেশিনপত্র নিয়ে পালাবার সময় এক দুর্ঘটনায় পড়ে স্যান্ডলারের ট্রাক.

এবং আমরা জেনে গেলাম এ ষড়যন্ত্রের পিছনে কে কে আছে। তখনই স্যান্ডলারের পিছু লাগি আমরা, কিন্তু বারবার চেষ্টা করেও তাকে আটক করতে ব্যর্থ হই। বিপদ অনুধাবন করার বোধহয় বারোটা ইন্দ্রিয় ছিল তার, কিছু সন্দেহ হলেই গা ঢাকা দিত। এমন সমস্ত জায়গায় গিয়ে লুকিয়ে থাকত, নিজে থেকে বেরিয়ে না আসা পর্যন্ত আঙুল চোষা ছাড়া কোন পথ থাকত না আমাদের।

'যেহেতু যুদ্ধের পর পরই আর্থার পুবে গিয়েছিল বলে জানতে পারি, তাই ওদিকেই আরেকটু বেশি করে নজর দিলাম। রাশিয়ানদের রিক্রুট করতে শুরু করলাম আমরা। সাথে পোলিস, হাঙ্গেরিয়ান ও চেকও ছিল কিছু কিছু। এই করতেই কেটে গেল বেশ কয়েক বছর। বেশ কয়েকজনকে রিক্রুট করে মস্কো পাঠানো হলো আর্থার স্যান্ডলারের খোঁজ পাওয়া যাবে এই আশায়। কিন্তু লাভ হলো না, কেউ কোন খবর দিতে পারল না তার। অবশেষে ১৯৫৭ সালে এক হাঙ্গেরিয়ানকে রিক্রুট করা হলো। যুদ্ধের সময় অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরিতে নন কমিউনিস্টদের সঙ্গে যোগ দিয়ে লড়েছে সে রুশদের বিরুদ্ধে। নাম ওয়ালটার যেজিক।

'১৯৪৮ সালে "প্রতিরোধ যুদ্ধের" এক পর্যায়ে রুশ বাহিনীর হাতে ধরা পড়ে যেজিক। প্রথম দুই বছর হাঙ্গেরিতেই আটক রাখা হয় তাকে, তারপর নিয়ে যাওয়া হয় মস্কোয়। সেখানে মস্তিষ্ক ধোলাই করা হয় তার। কিন্তু যে বিশেষজ্ঞ যেজিকের মস্তিষ্ক ধোলাই করে, পরে জানা গেল সে ছিল আসলে বিশেষ অজ্ঞ। কাজ হয়নি কিছুই তার ধোলাইয়ে। কিন্তু যেহেতু মস্কো জানে হয়েছে, তাকে ওরা মুক্তি দিল, দেশে ফিরে আসার অনুমতি দিল। এবং সে হাঙ্গেরিতে আসার সাথে সাথে...'

'তাকেও আপনারা রিক্রুট করলেন,' বাধা দিল মাসুদ রানা।

'হ্যাঁ।'

'তারপর?'

'তারপর তার মুখে শুনলাম অদ্ভুত এক কাহিনী। মস্কোর বাইরে যে কেন্দ্রে তাকে ধোলাইয়ের কাজ চালানো হয়েছে, সেখানে একই সময়ে আরও একজনকে ধোলাই করা হচ্ছিল। কেজিবির এক এজেন্ট সে, ইয়েভগেনি প্রেমাকভ। তাকে তৈরি করা হচ্ছিল আমেরিকার অভ্যন্তরে কর্মরত আরেক কেজিবি এজেন্ট, কোন এক জার্মান-আমেরিকান ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্টের রিপ্লেসমেন্ট হিসেবে পাঠানোর জন্যে।' একটু থামল হোয়াইটসাইড। সবাইকে দেখল। 'বুঝতে পেরেছেন তো?'

চোখে বাঁধ ভাঙা বিস্ময় নিয়ে একযোগে মাথা দোলাল সবাই। পেরেছে।

'ওয়েল। স্যান্ডলারের জীবনী মুখস্থ করানো হচ্ছিল তখন প্রেমাকভকে। তার আগে মস্কোর এক বিখ্যাত ক্লিনিকে প্লাস্টিক সার্জারি করা হয় লোকটির। সেখানে হুবহু আর্থার স্যান্ডলারের চেহারা, কণ্ঠস্বর লাভ করে প্রেমাকভ। জীবনী মুখস্থ করানোর সঙ্গে সঙ্গে তাকে শেখানো হয় কে স্যান্ডলারের আত্মীয়, কে বন্ধু, কবে কার সঙ্গে কোথায় পরিচয় হয় তার ইত্যাদি হাজারো খুঁটিনাটি। বুঝুন তাহলে আমাদের কি অবস্থা তখন! একজনের ঠেলায় বাঁচি না, ওদিকে তৈরি হচ্ছে আরেকজন।

'মরিয়া হয়ে স্যান্ডলারকে ধরার জন্যে জাল পাতলাম আমরা। ইচ্ছে ছিল যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তাকে হত্যা করা। তাতে কেজিবির এদিকও যেত ওদিকও যেত।

কিন্তু ব্যর্থ হলাম আমরা। ১৯৫৯ সালের ৩১ অক্টোবর আমাদের জাল ছিঁড়ে পালিয়ে গেল স্যান্ডলার। তার রিক্রুটিং এজেন্ট, দেশপ্রেমিক আমেরিকান উইলিয়াম ওয়ার্ড ড্যানিয়েলসের নির্দেশে অবশ্যই। মস্কো থেকে সতর্ক সঙ্কেত পেয়ে আমাদের তৎপরতার কথা জানতে পারে ড্যানিয়েলস, এবং সরে পড়ার নির্দেশ দেয় স্যান্ডলারকে। তারপর, অস্ট্রিয়ায় পৌঁছানোমাত্র তাকে হত্যা করে রাশিয়ানরা। তার স্থান দখল করে ইয়েভগেনি প্রেমাকভ।

'সে দেশেই কবর দেয়া হয় স্যান্ডলারকে,' নাক টানল হোয়াইটসাইড চুরুট ধরাল আবার। ধোঁয়ার অভাবে বুকটা খাই-খাই করে উঠতে মাসুদ রানাও একটা সিগারেট ধরাল। 'কিন্তু মরেও শান্তি হলো না বেচারীর।' সুগন্ধি ধোঁয়া ছাড়ল পিটার।

'যেমন?' প্রশ্ন করল মাসুদ রানা।

'এক ডবলকে জায়গা দিতে গিয়ে দুনিয়া ছাড়তে হলো আর্থার স্যান্ডলারকে, আবার মাটির নিচে গিয়েও আরেক ডবল জুটে গেল তার। মানে, জুটিয়ে দিল আর কি রুশরা।'

'সে কি রকম?'

'রুশরা তার জন্যে এক স্পেশাল কফিন তৈরি করল। দোতলা কফিন। নিচের ডেকে রাখা হলো আর্থারকে, ওপরের ডেকে তাদের স্থানীয় দূতাবাসের এক কর্মীকে। আপার ডেক ভরার স্বার্থে লোকটাকে বিষ প্রয়োগের মাধ্যমে হত্যা করেছিল ওরা। এক বাক্সে দু'জনকে কবর দেয়া,' থেমে আপনমনে মাথা দোলাল হোয়াইটসাইড। 'কী বুদ্ধি লাল ভায়াদের! নিখোঁজ একজন মানুষকে কে খুঁজতে যাবে আরেকজনের কফিনের মধ্যে? কেনই বা যাবে?'

স্থির হয়ে বসে আছে মাসুদ রানা। চোখে পলক পড়ছে না। ওদিকে চোখ কপালে স্থায়ী হয়ে আসন নিয়েছে ট্রেজারি এজেন্টের। লেসলির মুখ দেখে মন বোঝার উপায় নেই। হয়তো সেই আর্থার স্যান্ডলারের কথা ভাবছে, যে তার সত্যিকার জন্মদাতা ছিল, ছিল এলিজাবেথ চ্যাটসওয়ার্থের প্রেমিক-স্বামী। যাকে সে চোখের দেখাও দেখতে পায়নি কোনদিন। অথবা হয়তো এই আর্থার স্যান্ডলারের কথা ভাবছে, যে তার পিতার নকল হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। যে দু'-দু'বার হত্যা করতে চেয়েছে তাকে।

'যা হোক,' আবার শুরু করল হোয়াইটসাইড। 'পরে আমরা একদিন রাতের আঁধারে খুঁড়লাম আর্থারের কবর। তার মৃতদেহ বের করে অন্য দেহটা সেখানেই সমাধিস্থ করলাম। এবং আর্থারের দেহ নিয়ে এলাম লন্ডনে, নতুন করে কবর দেয়ার জন্যে। ড্যানিয়েলস যেমন লিন্ডার ডেন্টাল চার্ট মেলাতে গিয়ে বুঝতে পেরেছে যে মেয়েটি লেসলি নয়, আমরাও ঠিক সেভাবে আর্থার স্যান্ডলার সম্পর্কে নিশ্চিত হলাম। এবং তারপর একটা বহুল কর্মময় ইতিহাসকে মাটিচাপা দিয়ে রাখলাম চিরদিনের জন্যে।'

'লন্ডনে কোথায় কবর দেয়া হয়েছে আর্থারকে?' জানতে চাইল হ্যামন্ড।

'আর্ল'স কোর্টে,' রানার দিকে তাকিয়ে বলল পিটার। 'আপনি দেখেছেন সে কবর। লিন্ডার কবরের ঠিক পাশেরটা। বেনামী, অবশ্যই।'

কি যেন ভাবল মাসুদ রানা। 'গির্জার ভেতরে যে লোকটা নজর রাখছিল আমার ওপর, প্রার্থনা করার ছলে, সে কে ছিল?'

'সাজ্ঞাতিক চোখ আপনার,' মুচকি হাসি ফুটল তার মুখে। 'সেই লোকই হচ্ছে যেজিক। ওয়াল্টার যেজিক।'

'কিন্তু লন্ডনে যাকে কবর দিয়েছেন আপনারা অস্ট্রিয়া থেকে বয়ে নিয়ে, সে-ই যে আসল স্যান্ডলার, তার কি প্রমাণ?' বলল হ্যামন্ড।

'নিউ ইয়র্কে স্যান্ডলারের যে দাঁতের ডাক্তার ছিল, তার সাথে আলাপ করলেই প্রমাণ পেয়ে যাবেন। বেশ বয়স হয়ে গেছে তার, কিন্তু প্র্যাকটিস ছাড়েনি এখনও। সে যা হোক, গুরুত্বপূর্ণ একটা পয়েন্ট এখনও উল্লেখ করিনি আমি। সেটা হলো, আর্থার স্যান্ডলারকে দিয়েই যখন কাজ চলছিল, তখন প্রেমাকভকে কেন তার রিপ্লেসমেন্ট হিসেবে পাঠানো হলো? কি প্রয়োজন ছিল তার?

'কারণ একটাই। অবিশ্বাস। আর্থার প্রথমে ছিল জার্মান, পরে হয়েছে আমেরিকান। সে যে কখনও রাশিয়ার প্রতি আনুগত্য ছেড়ে আর কোনদিকে ঝুঁকবে না, তার কোন নিশ্চয়তা ছিল না বলেই ওই পথ বেছে নেয় মস্কো। ওরা নিজেদের মাস্টার এনগ্রেভারের সাহায্যে নিজেদের ইচ্ছেমত কাজ করবে বলেই এই প্ল্যান বাস্তবায়নে হাত দেয়।

'আমেরিকার মাটিতে বসে প্রথম যখন আবার পাউণ্ড তৈরির কারখানা চালু করে স্যান্ডলার, সঙ্গে সঙ্গে মার্কিন সরকারকে অনুরোধ করি আমরা তাকে আমাদের হাতে তুলে দিতে। কিন্তু দিল না ওয়াশিংটন। আমরা বারবার অনুরোধ করা সত্ত্বেও। কি বলেন, মিস্টার হ্যামন্ড? ঠিক কি না?'

'হ্যাঁ হ্যাঁ,' দ্রুত মাথা ঝাঁকাল ট্রেজারি এজেন্ট।

'অতএব বাধ্য হয়ে এ সমস্যা সমাধানের ভার আমরা নিজেদের কাঁধে তুলে নিলাম। কিন্তু সমস্যা হয়ে গেল অন্যদিকে। নিউ ইয়র্কে আর্থারের পরিচালক, তার রিক্রুটিং সার্জেন্ট, কি ভাবে যেন টের পেয়ে গেল আমাদের এ তৎপরতার কথা। সতর্ক করে দিল সে প্রেমাকভকে, গা ঢাকা দিতে বলল। এবং তার জায়গায় দ্বিতীয় ডবল খাড়া করে ফেলল সে প্রায় রাতারাতি। এসব অবশ্য তখন জানতাম না আমরা। কাজেই ভুল করে প্রেমাকভের ডবলকে গান ডাউন করলাম আমরা ১৯৬৪ সালের ১৩ নভেম্বর।'

'অর্থাৎ তাকে হত্যা করলেন,' বলল হ্যামন্ড মন্তব্যের সুরে।

লোকটার দিকে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে থাকল হোয়াইটসাইড। 'আমরা যখন যার যার পিস্তলের ম্যাগাজিন তার বুকে খালি করে ফিরে গিয়ে গাড়িতে উঠি, তখন প্রাণ ছিল না লোকটার,' অনুত্তেজিত কণ্ঠে বলল সে। তারপর লেসলির দিকে ফিরল।

'এরপর দেখা দিল নতুন আরেক সমস্যা। তোমাদের পরিবারকে ঘিরে তোমার বাবা নিজের একান্ত ব্যক্তিগত বিষয়গুলো আজীবন গোপন রেখেছিল, জানায়নি কাউকেই। এমনকি ড্যানিয়েলসকে পর্যন্ত না। অতএব কারও পক্ষে কল্পনা করাও সম্ভব ছিল না যে আর্থার স্যান্ডলার এক্সিটারে তোমার মার প্রেমে পড়েছে, এমনকি বিয়ে পর্যন্ত করে ফেলেছে এলিজাবেথকে। তার হত্যাকাণ্ডের

কয়েক বছর পর স্যান্ডলার এস্টেটে তোমার মার লেখা একের পর এক চিঠি আসতে আরম্ভ করে, আর্থার স্যান্ডলারের নামে। তখনই নিজের বিপদ টের পেয়ে যায় ছদ্মবেশী স্যান্ডলার। বুঝে ফেলে দ্রুত এর একটা বিহিত করা না গেলে ফেঁসে যাবে সে। তার সাধের এস্টেট চলে যাবে তোমার মার দখলে।

'অতএব প্রথম সুযোগেই ইউরোপ এসে হাজির হয় সে। হত্যা করে তোমার মাকে। ঘটনাটা দেখে ফেলে এক ছোট্ট মেয়ে। তার মেয়ে নয়, যার পরিচয়ের আড়ালে নিজেকে লুকিয়ে রেখেছে সে, সেই আসল স্যান্ডলারের মেয়ে। তাকেও হত্যা করতে চেয়েছিল সে, কিন্তু ব্যর্থ হয় অল্পের জন্যে। বাধ্য হয় পালিয়ে যেতে। কিন্তু মেয়েটিকে শেষ করার আশা হয়তো এখনও রাখে সে। কে জানে!'

চুপ করে আছে প্রত্যেকে। যার যার চিন্তায় ডুবে আছে। বেজমেন্টের আওয়াজ আগের থেকে আরও জোরাল শোনাচ্ছে এখন।

একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল পিটার হোয়াইটসাইড। 'রাশিয়ানদের পরিকল্পনা ছিল এক কথায় অতুলনীয়। আমাদের সেরা এনগ্রেভারকে দুনিয়া থেকে সরিয়ে দিয়ে নিজেদের সেরা এনগ্রেভারকে প্রতিষ্ঠিত করে ওরা। আমাদের একজনের ভেতর ঢুকিয়ে দেয় ওদের একজনকে। আফসোস! তার চেয়েও বড় আফসোস, আমেরিকার মাটিতে বসে বছরের পর বছর তাদের রিক্রুটিং সার্জেন্টের অভিনয় করে গেছে যে মানুষটি, সে যে আসলে রুশ রিক্রুটিং সার্জেন্ট ছিল, সিআইএ ঘুণাক্ষরেও তা টের পায়নি। আজও পর্যন্ত জানে না ওরা সে খবর।'

মাথা আপনাআপনি নত হয়ে এল পল হ্যামন্ডের। লজ্জা রাখার জায়গা পাচ্ছে না বোধহয়। লাল চেহারা আরও লাল দেখাচ্ছে।

'কেমন লাগল গল্পটা, মিস্টার রানা?'

'আমি অন্য একটা কথা ভাবছি।'

'কি?'

'যে মানুষ ডবল স্থাপন করে বাঁচিয়ে দিল প্রেমাকভকে, সে কেন লেসলির বেঁচে থাকার কথা গোপন করে গেল সবার কাছে? এমনকি লেসলি যার প্রাণের শত্রু, সেই প্রেমাকভের কাছে পর্যন্ত?'

ঠোঁট মুড়ে ভাবল হোয়াইটসাইড কয়েক মুহূর্ত। মাথা দোলাল। 'সত্যি! ভেবে দেখার মত বিষয় বটে। কি হতে পারে এর কারণ, ভালবাসা? অথবা করুণা?'

উত্তর দিল না মাসুদ রানা। ভাবছে।

'আমার ডিপার্টমেন্ট আপনার "কনফার্মেশন ম্যাটেরিয়াল" দেখতে চাইতে পারে, মিস্টার পিটার,' অনেকক্ষণ পর মিনমিনে কণ্ঠে বলল হ্যামন্ড।

'আমি প্রস্তুত।'

ছয়

মাসুদ রানার প্রশ্নটা মনের মধ্যে নাড়াচাড়া করল খানিক লেসলি ম্যাকঅ্যাডাম। আগেও বহুবার ভেবেছে সে এ নিয়ে, কিন্তু জবাব খুঁজে পায়নি। সত্যিই তো, কেন

এমন কাজ করল মানুষটা? কেন নিজহাতে গড়া স্যান্ডলাররূপী প্রেমাকভকে এক্সপোজ করার আয়োজন করে রেখে গেল সে মরার আগে? তার মৃত্যুর পর নিশ্চই প্রেমাকভের ওপরই বর্তেছিল কেজিবির নিউ ইয়র্ক রিক্রুটিং সার্জেন্টের দায়িত্ব, সেই নেটওয়ার্ককেও ধ্বংসের মুখে দাঁড় করিয়ে রেখে গেল ড্যানিয়েলস, কেন? প্রতিশোধ নেয়ার জন্যে? তার ওপর কোন অবিচার করেছিল মস্কো কখনও? এ প্রশ্নের উত্তর কি পাওয়া যাবে কোনদিন? কে জানে!

'যাক,' বলে উঠল ট্রেজারি এজেন্ট। 'স্যান্ডলার সমস্যা মিটল তাহলে।'

'মোটেই না,' তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলল লেসলি। 'তার প্রেতাত্মা প্রেমাকভ রয়ে গেছে এখনও। স্যান্ডলার নয়, গত দুই দশকেরও বেশি সময় প্রেমাকভই পালন করে গেছে তার দায়িত্ব, দু'বার তার হাতেই মরতে মরতে বেঁচে গেছি আমি।'

'সে তো বটেই, সে তো বটেই,' মেয়েটি রেগে গেছে বুঝতে পেরে তাড়াতাড়ি বলল সে। 'আমি সে ভাবে মীন করিনি আসলে।'

হোয়াইটসাইড মুখ খুলল। 'তাহলে আমরা এখন সবাই জানি, আমরা কাকে খুঁজব। কে তৈরি করছে নকল ডলার, কে হত্যা করতে চায় লেসলিকে, আই মীন চেয়েছিল। তার বদলে হত্যা করেছে নিরপরাধ একটি মেয়ে লিন্ডাকে, এবং এলিজাবেথকে। আর্থার স্যান্ডলার নয়, সে হচ্ছে তার পরিচয়ধারী আরেক স্পাই, ইয়েভগেনি প্রেমাকভ।'

'শিওর,' মাথা ঝাঁকাল হ্যামন্ড।

সবাইকে একযোগে ওর দিকে ঘুরে তাকাতে দেখে মুখ খুলতে যাচ্ছিল মাসুদ রানা, এই সময় নিচের মেঝে খোঁড়ার আওয়াজ থেমে গেল। অস্বাভাবিক নীরবতা নেমে এল স্যান্ডলার ম্যানসনে। হ্যামন্ডের কর্মীদের একজন সেলারের সিঁড়ি বেয়ে উঠে এল গ্রাউন্ড ফ্লোরে। ধুলোবালিতে চেহারা দর্শনযোগ্যতা হারিয়েছে তার, প্রচণ্ড ক্লান্তিতে লোকটার সোজা হয়ে দাঁড়াতেও কষ্ট হচ্ছে। যদিও তা চেপে রাখার ব্যাপারে যথেষ্ট সচেতন সে।

'একটা কাঠের বাক্স পেয়েছি আমরা, স্যার,' বলল লোকটা। 'কফিনের মত লাগছে। নয় ফুট বাই তিন ফুট।'

সবাই আগ্রহ নিয়ে তাকিয়ে থাকল তার দিকে। একটা নোংরা রুমাল বের করে মুখ মুছল সে, জিভ দিয়ে ঠোঁট ভেজাল।

'আর?' বলল হ্যামন্ড।

'ওটা বের করতে আরও এক ঘণ্টা সময় লাগবে।'

'অল রাইট। চালিয়ে যাও।'

লোকটা চলে যেতে রানার দিকে ফিরল হোয়াইটসাইড। 'ব্যাপারটা কি?'

সংক্ষেপে বলল মাসুদ রানা।

'আই সী।' নাক টানল লোকটা।

আবার নীরবতা নেমে এল ডাইনিংরূমে। ওদিকে বেজমেন্টে আবার নতুন করে শুরু হলো খোঁড়াখুঁড়ি। লেসলির দিকে তাকাল মাসুদ রানা, ওর কথা ভাবল। ভাবল নিজের কথা। হোয়াইটসাইড, হ্যামন্ড, হান্টারসহ অন্য সবার কথা ভাবল, স্নায়ুযুদ্ধের কথা ভাবল। কী অদ্ভুত যোগাযোগ! স্নায়ুযুদ্ধ নামের অদৃশ্য এক দানব

ওদের এবং আরও অনেকের জীবনকে এভাবে বেঁধে ফেলবে এক সুতোয়, কে জানত? কে ভেবেছে ওদের সবাইকে একদিন পোড়ো স্যান্ডলার ম্যানসনের ডাইনিংরুমে বসে ভবিষ্যৎ নিয়ে মাথা ঘামাতে হবে? মানুষ ভাবে সে-ই নিজের জীবন নিয়ন্ত্রণ করে বুঝি, অথচ···।

বেজমেন্টের বিরতিহীন কংক্রিটের সাথে ইস্পাতের সংঘর্ষের আওয়াজ শুনতে শুনতে বিষয়টা নিয়ে আরও গভীরভাবে ভাবল মাসুদ রানা। স্নায়ুযুদ্ধ এবং তার পরিণতি–কোরিয়া, ম্যাকারথিজম, বার্লিন ওয়াল, হাঙ্গেরি, চেকপোভাকিয়া, রুডলফ অ্যাবেল। কিউবা, ইউ-টু ফ্লাইট আর ভিয়েতনাম। তার সাথে যোগ হয়েছে মাসুদ রানা ও লেসলি ম্যাকঅ্যাডাম অধ্যায়। নিজেরা নিজেদের জড়িত করেনি ওরা এর সাথে। জড়িত হয়ে গেছে ইতিহাসের ধারাবাহিকতায়। স্রেফ দুই পরাশক্তির ইজমের কারণে।

উঠে দাঁড়াল মাসুদ রানা। 'অন্য ফ্লোরগুলোয় চোখ বোলাতে যাচ্ছি আমি।'

'আমিও যাব,' বলল লেসলি। আসন ছেড়ে পিছু নিল সে রানার। হোয়াইটসাইডের দিকে তাকাল হান্টার। চোখে নীরব অনুমতি প্রার্থনা। 'তুমিও যেতে চাও?' বলল পিটার। 'যাও তাহলে।'

দোতলা সফর শেষ করে তিনতলায় উঠে এল রানা-লেসলি। আসবাব আর জিনিসপত্রে ঠাসা প্রতিটি রুম। ঘুরে ঘুরে দেখার ফাঁকে দেয়াল আর হলওয়ে প্যানেলগুলোর ওপর তীক্ষ্ণ নজর বোলাল মাসুদ রানা। যদি কোন কিছু চোখে পড়ে, যদি কিছু আবিষ্কার করা যায়, সেই আশায়। প্রতিটি রুমেই দেয়াল ঘড়ি আছে একটা করে, কোনটিই এ শতকের নয়। অসম্ভব দামী একেক চীনা মাটির সেট, চেয়ে দেখার মত জিনিস, তারও কোনটা এ শতকের বলে মনে হয় না দেখে। ওপরের ফ্লোরে ভারি পায়ের আওয়াজ শুনে উঠে এল রানা ও লেসলি। হান্টার। দু'চোখে রাজ্যের বিস্ময় নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে লোকটা।

যা দেখে, তার সামনেই দু'এক মিনিট ব্যয় করছে সে থেমে দাঁড়িয়ে। পিছনে পায়ের আওয়াজ শুনে ঘুরে তাকাল। ওদের দেখে দাঁত দেখাল বন-জঙ্গলের ফাঁক দিয়ে। 'একেবারে নিচ থেকে ওপর পর্যন্ত,' প্রথমে অনির্দিষ্ট লক্ষ্যের উদ্দেশে, তারপর মাসুদ রানার দিকে তাকিয়ে বলল লোকটা। 'প্রতিটি ইঞ্চি সার্চ করতে হবে এ বাড়ির।'

ওরা কোন মন্তব্য করল না। তবে মতামত আশা করছিল সে ওদের, বোঝা গেল হান্টারকে হতাশা প্রকাশের ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকাতে দেখে। ঘুরে ম্যানসনের শেষ ফ্লোর, পাঁচতলার দিকে চলল সে। চারতলা ঘুরে দেখে রানা আর লেসলিও উঠে এল ওপরে। প্রশস্ত সিঁড়ির শেষ ল্যান্ডিঙে দুই কোমরে হাত রেখে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা গেল লোকটাকে। নজর আকাশে। তার সামনেই কাঠের সিঁড়ি, সরু তবে অস্বাভাবিক দীর্ঘ। সোজা চিলেকোঠায় গিয়ে ঠেকেছে প্রায় খাড়া সিঁড়িটা।

'ওপরটা একবার দেখা দরকার,' রানার দিকে তাকিয়ে বলল হান্টার 'যাবেন?'

জিজ্ঞাসু চোখে লেসলির দিকে তাকাল মাসুদ রানা। নেতিবাচক মাথা দোলাল সে। 'এখন থাক। পরে যাব।' হান্টারকে কিছু বলার প্রয়োজন মনে করল না রানা

'ঠিক আছে। আমি একাই যাচ্ছি।' প্রথম ধাপে গোদা ডান পা তুলে দিল হান্টার। তীব্র প্রতিবাদ জানাল পুরানো কাঠের সিঁড়ি। পাত্তা না দিয়ে দেহের সমস্ত ভার চাপাল সে ওটার ওপর। তারপর অন্য পা তুলল পরের ধাপে। তারপর তৃতীয় ধাপে। ত্রিশ ধাপের সিঁড়ি, গুণে দেখল মাসুদ রানা। অস্বাভাবিক।

লিভিংরুমে যাওয়ার জন্যে পা চালাল ওরা। হান্টার ততক্ষণে দশ-বারো ধাপ উঠে গেছে। একটু পর পল হ্যামন্ডও এসে যোগ দিল ওদের সাথে। চোখ তুলে হান্টারকে দেখল সে, তারপর রানাকে কিছু বলার জন্যে মুখ খুলল, এই সময় শব্দটা কানে এল মাসুদ রনার। কেমন এক কড়কড় শব্দ, গোড়া কাটা গাছ মাটিতে পড়ার আগে যেমন আওয়াজ করে তেমনি। পরক্ষণেই বেড়ে গেল আওয়াজটা। প্রথমে বুঝতে পারল না রানা কোনদিক থেকে আসছে ওটা, অনিশ্চিত ভঙ্গিতে হান্টারের দিকে তাকাল, সঙ্গে সঙ্গে ঘটতে শুরু করল ব্যাপারটা।

প্রতিটি সংযোগ খুলে গেছে কাঠের সিঁড়িটার, ধাপগুলো খসে পড়তে আরম্ভ করেছে, সেই সাথে চার মণ ওজনের হান্টারও সবেগে রওনা হয়েছে নিচের দিকে। কার্ডবোর্ডের তৈরি সিঁড়ি ছিল যেন ওটা, শূন্যে পাক খেতে খেতে নেমে আসছে ধাপগুলো। সতেরো-আঠারো ধাপ পর্যন্ত উঠে গিয়েছিল হান্টার। ধাপগুলোকে জায়গায় ধরে রাখার অসংখ্য কাঠের খিল বাতাসে উড়ছে দেখতে পেল মাসুদ রানা। তার মানে সিঁড়িটা ছিল ফাঁদ।

কেবল সিঁড়িই নয়, তার সাথে ওপরের কাঠের সাপোর্টিং, বেশ কিছু ভারি বরগা ইত্যাদিও খসে পড়তে শুরু করেছে দেখা গেল। এক মুহূর্ত মাত্র, ওজনদার দেহ নিয়ে ধড়াস করে আছড়ে পড়ল হান্টার, সংঘর্ষের প্রচণ্ড ঝাঁকুনিতে থর থর করে কেঁপে উঠল পুরো বাড়ি, শব্দটা হলো অসম্ভব জোরাল, ওটা যে কংক্রীটের সাথে হাড়-মাংসের, বিশ্বাস করা কঠিন। ভাবাই যায় না।

প্রথমে পড়ল হান্টার, তার ওপর এক এক করে বীম, ধাপ, সিঁড়ির অবশিষ্ট অংশ এবং ধুলোবালি ইত্যাদি। প্রায় জ্যান্ত কবর হয়ে যাওয়ার জোগাড় হলো তার। বিশ ফুট দূরে দাঁড়িয়ে ঘটনার আকস্মিকতায় জমে গিয়ে দেখল ওরা পুরো দৃশ্যটা। ঘটতে যত সময় লাগল, আসলে তার চাইতে অনেক বেশি লেগেছে বলে মনে হলো সবার। অনেকটা স্লো-মোশন ছায়াছবির মত।

হান্টারেরও একই অনুভূতি হলো। পুরোটা ঘটতে সময় লাগল মাত্র তিন সেকেন্ড, কি তারও কিছু কম। অথচ মনে হলো যেন কয়েক মিনিট। এবং সিঁড়ি ভেঙে পড়ার আগমুহূর্তে সে-ও বুঝতে পারে যে ওটা আসলেই ফাঁদ ছিল, তার মতই অনুসন্ধানী বহিরাগতের জন্যে সযত্নে পেতে রাখা। অবশ্য পরমুহূর্তের অনুভূতিটা অন্য রকম হলো তার। সারা দেহে অসহ্য তীব্র বেদনা পাগল করে ফেলল তাকে। খসে পড়া কাঠ-বীমের আঘাত দুই পায়ের ব্যথার তুলনায় যেন কিছুই নয়।

দুই পায়েরই গোড়ালি আর থাই বোন চুরমার হয়ে গেছে হান্টারের। অকল্পনীয় যন্ত্রণায় চোখ ভেসে যাচ্ছে তার পানিতে। আহত বাঘের মত চেঁচাচ্ছে সে ঘরদোর ফাটিয়ে। দেহের নিচে দুই পা অসম্ভব এক ভঙ্গিতে দুমড়ে মুচড়ে আছে। দেখতে দেখতে মেঝেতে রক্তের পুকুর তৈরি হয়ে গেল হান্টারকে ঘিরে।

তার চিৎকার আর গোঙানিতে ভারি হয়ে উঠল ঘরের পরিবেশ। অনবরত চেঁচিয়ে চলেছে মানুষটা। ভাঙাচোরা এক পুতুলের মত লাগছে তাকে। ছুটে এল মাসুদ রানা। পিছন পিছন হ্যামন্ড ও লেসলি।

ব্যস্ত হাতে ওপরের জঞ্জাল সরাতে আরম্ভ করল রানা, হ্যামন্ডও হাত লাগাল সাথে। এই সময় হাঁপাতে হাঁপাতে নিচ থেকে উঠে এল হোয়াইটসাইড। সামনের দৃশ্য দেখে চোখ কপালে উঠল তার। 'কি ব্যাপার? কি হয়েছে?'

জবাব না দিয়ে যে যার কাজ করে যেতে লাগল ওরা। রানা-হ্যামন্ডের তুলে আনা কাঠ ইত্যাদি একটু দূরে নিয়ে রেখে আসছে লেসলি।

'ও মাই গড!' সামনে মুখ থুবড়ে পড়ে থাকা ওটা হান্টার বুঝতে পেরে আঁতকে উঠল হোয়াইটসাইড। এত রক্ত দেখে চক্কর দিয়ে উঠল মাথার মধ্যে। 'কেমন করে ঘটল...?'

'সিঁড়ি ধসে,' ইঙ্গিতে তাকে ব্যাপারটা বোঝাবার চেষ্টা করল লেসলি।

পাশে রাখা একটা লণ্ঠন নিয়ে তাড়াতাড়ি হান্টারের কাছে গিয়ে দাঁড়াল বৃদ্ধ। তার ফ্যাকাসে চেহারা আর নাকেমুখে অসংখ্য রক্তাক্ত কাটাকুটির দাগ দেখে থ মেরে গেল। কি করবে বুঝতে পারছে না।

'একে এখনই হাসপাতালে নেয়া দরকার,' লোকটার পা দুটোর ওপর সংক্ষিপ্ত নজর বুলিয়ে ঘোষণা করল মাসুদ রানা। 'এক্ষুণি।'

'পা ভেঙে গেছে নাকি?' ব্যগ্র গলায় জানতে চাইল হোয়াইটসাইড।

'গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে গেছে।'

হান্টারের মুখ দেখে শিউরে উঠল লেসলি, ভয়ঙ্কর চেহারা হয়েছে লোকটার। তার ফাঁদে পড়া আহত পশুর মত গোঙানি শুনে গায়ের পশম দাঁড়িয়ে গেল ওর। এত রক্ত থাকতে পারে মানুষের দেহে, ছোট বেলায় একবার দেখেছে লেসলি, বাথরুমে জবাই হওয়া তার মায়ের রক্ত। আর দেখল আজ। কলজে হিম হয়ে এল ওর। লোকটার দুই পা আর কোনদিন স্বাভাবিক কাজ করবে বলে মনে হলো না।

'কিন্তু এই অবস্থায় একে নিচে নামানো যায় কি করে?' রানার দিকে তাকাল পল হ্যামন্ড। 'ঝাঁকি লাগলে...'

'স্ট্রেচার তৈরি করতে হবে।' উঠে গেল মাসুদ রানা। ভেতরের দিকের কয়েকটা জানালার পর্দা ছিঁড়ে নামিয়ে আনল। খসে পড়া প্যানেলিঙের কাঠ থেকে দুটো সরু, লম্বা দেখে খণ্ড বেছে নিয়ে লেগে পড়ল কাজে। 'আপনি নিচে যান,' হ্যামন্ডকে বলল ও। 'কাউকে বাইরে পাঠিয়ে দিন। টেলিফোন করে অ্যাম্বুলেন্স আনান তাড়াতাড়ি।'

'ঠিক আছে, যাচ্ছি,' পড়িমরি করে ছুটল ট্রেজারি এজেন্ট।

হান্টারের গোঙানির আওয়াজ অনেক কমে এসেছে। চেঁচানোর শক্তি নেই। যন্ত্রণায় ছটফট করছে সে। সারামুখ রক্ত, ঘাম আর ধুলোবালি মেখে যাচ্ছেতাই হয়েছে দেখতে। তার পাশে অসহায়ের মত হাঁটু মুড়ে বসে আছে হোয়াইটসাইড।

ওপর থেকে কি যেন একটা পড়ল রানার মাথার ওপর। হালকা। হাত তুলে ধরল ওটা রানা, নিয়ে এল চোখের সামনে। কাগজ! চোখ কোঁচকাল রানা, চার কিনারা সুন্দর করে ছাঁটা ছোট এক খণ্ড কাগজ। সাধারণ কাগজ নয়, ধরামাত্র টের

পেল ও, অসাধারণ। কোত্থেকে এল? হতভম্ব হয়ে ওপরদিকে তাকাল মাসুদ রানা। সঙ্গে সঙ্গে চক্ষুস্থির হয়ে গেল। আরও কয়েকটা কাগজের টুকরো ভেসে ভেসে, পাক খেয়ে খেয়ে নেমে আসছে ঝরা পাতার মত। চিলেকোঠা থেকে।

'কি ওটা, রানা?' জানতে চাইল লেসলি।

উত্তর দিল না ও, হাঁ করে চেয়ে থাকল ওপরদিকে। টুকরোগুলো মেঝেতে পড়ল। ওগুলোও সাদা। দামী, টেক্সচারড কাগজ। বিভিন্ন মুদ্রামানের ডলার বিল আকারের, ছাপানোর জন্যে প্রস্তুত। চিলেকোঠার ফ্লোরবোর্ড ধসে পড়া অংশ গলে বেরিয়ে এসেছে ওগুলো।

খানিক বিরতি দিয়ে আবার আরম্ভ হলো। বৃষ্টির মত ঝরে পড়তে লাগল হাজার হাজার কাগজের টকুরো। এগুলোর বেশির ভাগের একদিক ছাপা, অন্য পিঠ ধপধপে সাদা, তুলে ফেলা হয়েছে বেমালুম। একটু একটু করে পতনের বেগ এবং কাগজের পরিমাণ বেড়েই চলেছে। ওরা সবাই, এমন কি হান্টার পর্যন্ত ব্যথা ভুলে হাঁ করে চেয়ে আছে সেদিকে। সবার চোখ চিলেকোঠার দিকে আঠা দিয়ে সেঁটে রেখেছে কেউ যেন। শ্বাস নিতেও ভুলে গেছে ওরা।

'হোয়াট ইন হেভেন...!' বাক্যটা শেষ করতে পারল না হোয়াইটসাইড।

দু'দিক ছাপা দশ, বিশ, পঞ্চাশ ও একশো ডলারের বিল। পড়ছে তো পড়ছেই। এর যেন কোন শেষ নেই। ঝকঝকে পরিষ্কার ছাপা, কড়কড়ে নোট। সদ্য বাজারে ছাড়া ট্রেজারি নোট যেন। পুরো ল্যান্ডিং, সিঁড়ি, লিভিংরুমের একাংশ ছেয়ে গেছে ডলারে ডলারে। এরমধ্যে নিচের কাজ সেরে উপরে ফিরে এল হ্যামন্ড। সিঁড়িগোড়ায় বজ্রাহতের মত দাঁড়িয়ে পড়ল সে সামনের অবিশ্বাস্য দৃশ্য দেখে। বুকের ভেতর হাতুড়ির ঘা পড়ছে তার।

একটা নোট তুলে চোখের সামনে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখল হ্যামন্ড। হ্যাঁ, এই সেই জাল ডলার, যার নমুনা তাকে দেয়া হয়েছিল ট্রেজারি ডিপার্টমেন্ট থেকে। এতদিনে, ভাবল সে, এতদিনে তাহলে উৎসের সন্ধান পাওয়া গেল। বোঝা গেল কোত্থেকে বাজারে বের হয় এসব। আবার চোখ তুলল হ্যামন্ড, এখনও ঝরছে ডলার, ধীরগতি তুষারপাতের মত।

'জলদি করুন,' রানার কথায় ধ্যান ভাঙল ওদের। 'তাড়াতাড়ি নিচে নামানো দরকার একে। আমাকে সাহায্য করুন।'

এক ঘণ্টা নয়, প্রায় তিন ঘণ্টা লেগে গেল বাক্সটা গর্ত থেকে বের করতেই। এমনভাবে ঢালাই করা হয়েছিল ওটার চারপাশ এবং ওপরটা, জোর খাটিয়ে বের করতে গেলে ক্ষতি হতে পারত বাক্সের, গায়ে কোন গুরুত্বপূর্ণ মার্কিং থাকলে ঘষা লেগে নষ্ট হয়ে যাওয়ার ঝুঁকি ছিল। তাই বিশেষ করে ওটার চারপাশ কংক্রীটের বাঁধনমুক্ত করতে দু'ঘণ্টা সময় বাড়তি নষ্ট হলো।

এরমধ্যে হান্টারের অসম্ভব ভারি দেহটা বহু কসরত করে নিচে নামিয়ে এনেছে রানা আরও কয়েকজনের সাহায্যে। সবাই যে পথে ম্যানসনে ঢুকেছে, সেই পথেই বের করা হলো তাকে। ওই পথে স্ট্রেচারে করে এক আহতকে বয়ে নিয়ে এইটি এইটথ স্ট্রীটে পৌঁছানো, তাও হান্টারের মত চারমণী একজনকে, কী

ভয়ানক দুঃসাধ্য সাধন, হাড়ে হাড়ে টের পেল ওরা।

নিজেদের পে-বুকের এক ডাক্তারকে তার চিকিৎসার ভার দিয়েছে পল হ্যামন্ড। যে এ জাতীয় এমার্জেন্সির জন্যে সদাপ্রস্তুত এবং ভাঙা হাড়গোড় জোড়া লাগাতে সমগ্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অদ্বিতীয়। হ্যামন্ডের ফোন পেয়েই প্রস্তুত হয়ে গেছে সে। ধরাধরি করে অপেক্ষমাণ অ্যাম্বুলেন্সে তোলা হলো হান্টারকে। প্রচুর রক্ত হারিয়ে একেবারে নির্জীব হয়ে গেছে তখন লোকটা। দেখতে লাগছে বিশাল এক পঙ্গু ভালুকের মত।

ডান হাতে চোখ ঢেকে চিত হয়ে পড়ে আছে স্ট্রেচারে। প্রাণপণ চেষ্টা করছে গোঙানি ঠেকাতে, কিন্তু পারছে না। ভেতর থেকে আপনাআপনি উঠে আসছে ওটা। এখনও কি করে লোকটা সজ্ঞান আছে ভেবে অবাক লাগছে পল হ্যামন্ডের। ও আদৌ মানুষ কি না, তাই ভাবছে সে এখন।

'আপনারা কে যাবেন এর সাথে, জলদি উঠুন!' তাড়া লাগাল অ্যাম্বুলেন্সের সাথে আসা ডাক্তারের সহকারী।

মাসুদ রানার দিকে তাকাল পিটার হোয়াইটসাইড, তারপর হ্যামন্ডের দিকে।

'কিছু বলবেন?' প্রশ্ন করল রানা।

ঘুরে ম্যানসনের দিকে তাকাল লোকটা। 'ওর সঙ্গে আমারই যাওয়া উচিত, কিন্তু এদিকে থাকাটাও কম জরুরী ছিল না।'

'এদিকের অগ্রগতির খবর আমি ফোনে জানাব আপনাকে,' আশ্বস্ত করল তাকে রানা। 'কিচ্ছু ভাববেন না। আমাদের ওপর আস্থা রাখতে পারেন আপনি।'

'না, ঠিক তা নয়। ভাবছি, হান্টারের অপারেশন হয়ে গেলেই আমি চলে আসব। শত হলেও...'

'অপারেশন শেষ হতে সময় লাগবে প্রচুর,' বলল ও। 'ততক্ষণ আমরা এখানে থাকব বলে মনে হয় না। তবে যাই করি, আপনাকে জানাব আমি। অহেতুক দুশ্চিন্তা করবেন না।'

তবু দ্বিধা কাটতে চায় না হোয়াইটসাইডের। অবশ্য হান্টারের আরেকটা আর্ত গোঙানি কানে যেতেই ব্যস্ত হয়ে উঠল সে, উঠে পড়ল গাড়ির পিছনে। 'ঠিক আছে,' একটা দীর্ঘশ্বাস চেপে বলল। 'আমি আপনার ফোনের অপেক্ষায় থাকব।'

মাথা ঝাঁকাল রানা। অ্যাম্বুলেন্সের বিলীয়মান ব্যাক লাইটের দিকে তাকিয়ে বলে উঠল হ্যামন্ড, 'ব্যাটা আপনাকে বিশ্বাস করেনি! ও কথা বলার কি প্রয়োজন ছিল তাকে শুধু শুধু?'

'কোন কথা?'

'ওই যে বললেন, হান্টারের অপারেশন শেষ হওয়া পর্যন্ত এখানে থাকব না আমরা?'

'ও,' হাসল মাসুদ রানা। তারপর মাথা দোলাল। 'শুধু শুধু বলিনি, সত্যিই বলেছি। আমার অন্তত তাই ধারণা।'

'কি রকম?'

'আগে কফিনটা খোলা হোক। তারপর নিশ্চিত হয়ে বলা যাবে। চলুন, ফেরা যাক। ওদিকে কতদূর হলো দেখতে হবে।'

ফিরে এল ওরা স্যাডলার ম্যানসনে। মাঝরাত পেরিয়ে গেছে আগেই। তখনও বাক্সটা তোলা সম্ভব হয়নি। অধীর প্রতীক্ষায় থাকল সবাই। ঘড়ির কাঁটা যত এগোয়, ওদের উত্তেজনাও ততই বাড়ে। ওপরের ডলারের গুদামের কথা খেয়াল নেই কারও তেমন, কফিনটাই এখন সবার প্রধান চিন্তা। এমনকি হ্যামন্ডেরও ডাইনিং রুমে বসে আছে সে টেবিলে মাথা রেখে। একটু ঘুমের জন্যে চোখ, সর্বাঙ্গ ক্রমাগত নীরবে চিৎকার করছে তার, অথচ চোখ বুজলেই পালিয়ে যায় ঘুম।

মাসুদ রানা আর লেসলিও বসে আছে তার মুখোমুখি, টেবিলের ওপাশে কখন নিচ থেকে ডাক আসে সেই আশায়। অবশেষে এল ডাক। দ্রুত বেজমেন্টে নেমে এল ওরা। উত্তেজনায় ভেতরে ভেতরে ছিলার মত টান হয়ে আছে মাসুদ রানা, কিন্তু ভাবটা লুকিয়ে রেখেছে সযত্নে। কেমন এক অদ্ভুত অনুভূতির সাড়া পাচ্ছে ও নিজের ভেতর। এমন এক অনুভূতি, অন্যকে বোঝানো দূরে থাক, ও নিজেই বুঝে উঠতে পারছে না। তবে রানার মন বলছে, ও বোধহয় জানে কি আছে ওই কফিনের ভেতর।

সমাধিক্ষেত্রে এসে দাঁড়াল রানা, লেসলি ও হ্যামন্ড। কথা নেই কারও মুখে। হাজার হোক, মৃতকে নিয়ে এমন টানাটানি খুব একটা প্রীতিকর কাজ নয়। গর্তটার দু'পাশে স্তূপ হয়ে আছে কংক্রিটের ছোট-বড় খণ্ড, সুরকি, বালি ইত্যাদি।

ওগুলো দেখল হ্যামন্ড। লেসলির দিকে তাকাল। 'চিন্তা কোরো না। প্রাইভেট প্রপার্টির যথাযথ সম্মান দিতে জানি আমরা। কাজটা শেষ হলে এ জায়গা নতুন করে মেরামত করে দেয়া হবে!'

উত্তরে কেবল কাঁধ ঝাঁকাল লেসলি। কিছু বলল না।

'অবশ্য,' চতুর একটুকরো হাসি দিল ট্রেজারি এজেন্ট, মাসুদ রানার দিকে তাকাল এক পলক। 'কফিনের ভেতর ইন্টারেস্টিং কিছু যদি থাকে, সেটা হয়তো তখন গর্তে থাকবে না। তবে বাক্সটা থাকবে, তাতে সন্দেহ নেই।'

'হু কেয়ারস?' মৃদু কণ্ঠে বলল মেয়েটি।

ওক কাঠের ভারি বাক্সটা তোলা হলো ওপরে। বহু বছর কংক্রিটের সংস্পর্শে থেকে রং ফ্যাকাসে হয়ে গেছে ওটার। খননকারীদের একজন খুঁজেপেতে সরু মাথাওয়ালা একটা লোহার রড নিয়ে এল বেজমেন্টের স্টোর থেকে। ওটা লিভারের মত ব্যবহার করে কফিনের ঢাকনার পেরেকগুলো আলগা করা হলো।

ওটার মাথার দিকে দাঁড়িয়ে আছে মাসুদ রানা। বুকের ভেতর ক্রমাগত হাতুড়ির বাড়ি পড়ছে ওর। হাতের তালু ঘেমে উঠছে ঘন ঘন, গলা শুকিয়ে আসছে। হাতের আলোটা উঁচু করে ধরে আছে রানা। কফিনের পায়ের কাছে রয়েছে লেসলি ম্যাকঅ্যাডাম। বাক্সটার চাইতে মাসুদ রানাকেই বেশি দেখছে সে। মনে হলো উত্তেজনায় মৃদু মৃদু কাঁপছে মাসুদ রানা।

পেরেক আলগা করার কাজ শেষ হতে ঢাকনার দুই মাথা ধরল দু'জন খননকারী, ওপর দিকে টান দিল জোরে। ক্যাঁচকোঁচ আওয়াজ তুলল ওক কাঠ, যেন শান্তি ভঙ্গ করার কারণে বিরক্তি প্রকাশ করছে। প্রথম দফা ব্যর্থ হলো লোক দুটো।

'আরও জোরে,' রুদ্ধশ্বাসে বলল হ্যামন্ড।

হ্যাঁচকা টান না মেরে হাতের চাপ একটু একটু করে বাড়াল তারা ঢাকনায়

ওপর। কয়েক মুহূর্ত অনড় থাকল ওটা, তারপর আচমকা উঠে এল। সঙ্গে সঙ্গে বিশ্রী একটা দুর্গন্ধ ভক্ করে ধাক্কা মারল সবার নাকে। দ্রুত এক পা পিছিয়ে গেল লেসলি। হাত দিয়ে নাকের সামনে বাতাসে ঝাপটা মারল সে কয়েকবার, আবার এগিয়ে এল।

ঘরের প্রতিটি চোখ লেপটে আছে কফিনের ভেতর। শূন্য দুই অক্ষিকোটরের ওপর। দৃষ্টিহীন চাউনিতে ওদের সবাইকে দেখছে ভীতিকর কালো গর্ত দুটো। স্তম্ভিত চোখে সবাই চেয়ে আছে স্যাটেড-বুটেড কঙ্কালটার দিকে। যার-ই হোক, মৃত্যু যখন তাকে আচমকা আলিঙ্গন করে, ওই পোশাকেই ছিল সে তখন। কমপ্লিট থ্রী পীস সুট, টাই, জুতো-মোজা, হাতঘড়ি ইত্যাদিসহ কবর দেয়া হয়েছে মানুষটিকে।

বুক-পেট নেই, বহু আগেই পচে-গলে মিশে গেছে কফিনের পাটাতনের সাথে, কিন্তু কোটের বাঁ পকেটের পাশে খুব কাছাকাছি চারটে ছিদ্র জানান দিচ্ছে কিভাবে মৃত্যু হয়েছে হতভাগ্য লোকটির। সারা কোটে লেগে আছে অনেক পুরানো রক্তের শুকিয়ে কালচে হয়ে যাওয়া দাগ। খননকারীরা হতবাক হয়ে তাকিয়ে আছে সেদিকে। এমন দৃশ্য দেখতে হবে কল্পনাই করেনি তারা।

চোয়াল ঝুলে পড়েছে হ্যামন্ডের। হাঁ করে সামনের অভাবনীয় আবিষ্কার দেখছে সে। মনে হলো কে যেন অনেক ওপর থেকে আছড়ে ফেলেছে তাকে মাটিতে। লেসলিকে বেশ অসুস্থ দেখাচ্ছে, হাঁটুর জোর হারিয়ে ফেলেছে যেন। কাঁপছে থর থর করে। একমাত্র মাসুদ রানা স্থির। কারণ এ ধরনের কিছুই আশা করছিল ও। পুরোপুরি অবিচলিত সে। দীর্ঘ সময় কঙ্কালটার দিকে তাকিয়ে থাকল রানা, তারপর ঘুরিয়ে নিল মুখ।

পালিয়ে যাবে না বাক্সের কঙ্কাল, সে ক্ষমতা নেই তার। পরিচয়টা তার একটু পরে জানলেও অসুবিধে নেই। নিস্তব্ধ চারদিক। কথা নেই কারও মুখে।

পেটের ভেতর ওলট পালট শুরু হয়ে গেছে সবার। কফিনের ভেতর থেকে বেরিয়ে আসা দুর্গন্ধে ঘর ভরে গেছে, সামাল দেয়া কষ্টকর হয়ে পড়েছে ভীষণ। আবার কফিনের ভেতরে তাকাল মাসুদ রানা। পরস্পরের সাথে লেগে থাকা কঙ্কালের দুই সারি সুগঠিত দাঁত হাসছে সারাক্ষণ। ভৌতিক হাসি।

মৃতের খসে-ফেঁসে যাওয়া সুটটার দিকে তাকাল রানা। যথেষ্ট দামী কাপড়। নাকে রুমাল চাপা দিয়ে ঝুঁকে এল ও সামনে, হাতের আলোটা এগিয়ে দিল হ্যামন্ডের দিকে। দুর্গন্ধ অসহ্য, কিন্তু ব্যাপারটা প্রাণপণে ভুলে থাকার চেষ্টা করল মাসুদ রানা। হাত বাড়াল কঙ্কালটার দিকে। তাড়াতাড়ি এক পা এগিয়ে এল ট্রেজারি এজেন্ট, অবাক চোখে দেখছে রানাকে। 'কি করছেন আপনি?'

উত্তর দিল না রানা। আরও খানিকটা ঝুঁকতে হলো ওকে কঙ্কালের শার্টের কলারের নাগাল পেতে। দু'আঙুলের ডগা দিয়ে মাংস পচে শুকিয়ে শক্ত হয়ে যাওয়া নোংরা কলারটা আলতো করে ধরল ও, নেকবোনে যাতে হাত লেগে না যায় সে বিষয়ে সতর্ক। কলারটা ওপরদিকে টান দিল মাসুদ রানা, খুবই আস্তে করে, যাতে মৃতের অসম্মান না হয়। মৃদু শব্দ করে আরেক দিকে ঘুরে গেল কঙ্কালের মাথা। মুখ ফিরিয়ে শুলো যেন। অক্ষিকোটর দেখা যাচ্ছে না এখন ওটার, তবে জমাট হাসি চোখে পড়ছে।

'করছেন কি, মিস্টার রানা?' আবার জানতে চাইল হ্যামন্ড।

'পরিচয় খুঁজছি,' গম্ভীর কণ্ঠে বলল ও।

'পরিচয়? কার পরিচয়?'

'মৃতের। এবং সম্ভবত আর্থার স্যান্ডলারের।'

হতভম্ব দেখাল হ্যামন্ডকে। 'বলছেন কি আপনি?'

'এখনও বুঝতে পারছেন না?'

'না,' দ্রুত মাথা দোলাল লোকটা। 'সত্যিই পারছি না।'

'আর্থার স্যান্ডলারের দ্বিতীয় পরিচয় খুঁজছি আমি। যার ভেতর নিজেকে লুকিয়ে রেখেছে আপনাদের স্যান্ডলার বা প্রেমাকভ, যাই বলুন।'

লেসলির মুখের রং ফ্যাকাসে, চেহারায় বিতৃষ্ণা নিয়ে রানার কার্যকলাপ দেখছে সে। গলা দিয়ে নাড়িভুঁড়ি সব পাক খেয়ে উঠে আসতে চাইছে তার। ওদিকে পুরোদস্তুর বেকুবের মত চেহারা হয়েছে ট্রেজারি এজেন্টের। মাসুদ রানার ব্যাখ্যা পুরোপুরি মাথায় ঢোকেনি এখনও তার। শার্টের কলার ছেড়ে এবার কোটের কলারের দিকে হাত বাড়াল রানা। ভেতরের দিকে সাঁটা লেবেলটা দেখল এক পলক, তারপর সোজা হয়ে দাঁড়াল। চোখ বুজে আনমনে খুলির পিছনদিক চুলকাল খানিক। চিন্তায় কুঁচকে আছে কপাল।

'১৯৫৯ সালের অক্টোবরের শেষদিকে, অথবা নভেম্বরের প্রথম দুই একদিনের ভেতর অস্ট্রিয়ায় আসল আর্থার স্যান্ডলার খুন হয় বলে হোয়াইটসাইডের মুখে শুনেছি আমরা কয়েক ঘণ্টা আগে, তাই না?' বলল মাসুদ রানা।

'হ্যাঁ,' বলল হ্যামন্ড। লেসলি নীরবে মাথা দোলাল।

'তারপর তার ডবল, কেজিবির ইয়েভগেনি প্রেমাকভ আর্থার স্যান্ডলার হয়ে প্রবেশ করে এদেশে, কেমন?'

'হ্যাঁ,' দু'চোখে গভীর আগ্রহ নিয়ে ওকে দেখছে হ্যামন্ড।

'এবং ১৯৬৪ সালে ব্রিটিশ ইন্টেলিজেন্স তাকে "পুট ডাউন" করার নির্দেশ দিয়েছে, এ খবর জানতে পেরে ড্যানিয়েলসের সাহায্যে নিজের আরেক ডবল খাড়া করে পালিয়ে যায় প্রেমাকভ। আর ব্রিটিশরা ভুল করে ইয়েভগেনির পরিবর্তে অজ্ঞাত পরিচয় সেই লোকটিকে হত্যা করে।'

মন্ত্রমুগ্ধের মত মাথা দোলাল লেসলি ও পল।

'স্যান্ডলাররূপী প্রেমাকভ তখন বুঝে যায়, নিজের চেহারা, অর্থাৎ স্যান্ডলারের চেহারা আর কি, বাইরে দেখানোর কোন উপায় নেই তার। কারণ দুনিয়া জানে সে মরে গেছে। কাজেই তার আরেক পরিচয়–চেহারা প্রয়োজন হয়ে পড়ে। সেজন্যে আগেই অবশ্য ভেতরে ভেতরে প্রস্তুতি নিয়ে রেখেছিল সে, এবং অবশ্যই ড্যানিয়েলসের পরামর্শ অনুযায়ী। কার ভেতরে নিজেকে ঢোকাতে হবে সে পরামর্শ ড্যানিয়েলসই দিয়েছে তাকে। তার সাহায্য ছাড়া প্রেমাকভের সাধ্য ছিল না সফল হয়।

'তারপর আবার সেই পুরানো কাহিনী। প্লাস্টিক সার্জারি ইত্যাদি ইত্যাদি এবং ইত্যাদি। সময়মত যার ভেতরে ঢুকতে হবে প্রেমাকভকে, তাকে হত্যা করা হলো, ফলে পুরোপুরি নিরাপদ হয়ে গেল প্রেমাকভ, নির্ভয়ে নাক জাগাল সে।

আরেকজনের মধ্যে ''মৃত'' একজনকে খুঁজতে আসবে কে?'

সিগারেট ধরাল মাসুদ রানা। 'একটা ছোট বিমানের আয়োজন করুন, মিস্টার হ্যামন্ড। খুব দ্রুত।'

'কেন!' চোখ কুঁচকে উঠল ট্রেজারি এজেন্টের।

'এই মুহূর্তে একটা বিমান প্রয়োজন আমাদের, যত তাড়াতাড়ি ম্যানেজ করতে পারবেন তত ভাল হবে। নইলে হয়তো প্রেমাকভকে চিরতরে হারাবেন আপনারা। তার আমেরিকা ছেড়ে পালিয়ে যাওয়ার সব আয়োজন চূড়ান্ত।'

'সরি। বুঝলাম না।'

'বুঝলেন না? গত দু'দিন ধরে নিউ ইয়র্কের সমস্ত পত্রিকায় লীড নিউজ হিসেবে ছাপা হচ্ছে খবরটা, ব্যানার হেডিঙে।'

একভাবে ওকে দেখছে লেসলি। 'খুলে বলো, রানা। কি বোঝাতে চাইছ তুমি?'

হাসির ভঙ্গি করল রানা। থুতনি তাক করে কফিনের ভেতরটা দেখাল। 'ভেতরে আলো ফেলো। দেখো। এনগ্রেভার বন্ধুটির বর্তমান পরিচয় এনগ্রেভ করা আছে এর কোটের কলারে।'

দুর্গন্ধের কথা ভুলে আলো নিয়ে প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়ল পল হ্যামন্ড। চোখ কুঁচকে পড়ল লেবেলটা। প্রথমবার কিছুই বুঝল না সে। দ্বিতীয়বারও না। তবে তৃতীয়বার বুঝল। সঙ্গে সঙ্গে যেন হাজার ভোল্টের বৈদ্যুতিক শক খেলো মানুষটা, পক্ষাঘাতগ্রস্তের মত হাঁ করে তাকিয়ে থাকল লেবেলটার দিকে। লেসলিও তাকাল। ওতে লেখা:

ডানহিল টেইলর্স
নিউ ইয়র্ক
১৯৬৪
ক্রেতা: এ. জেঙ্গার

সাত

কয়েক মুহূর্ত পাথর হয়ে দাঁড়িয়ে থাকল পল হ্যামন্ড। ডাঙায় তোলা মাছের মত বারবার মুখ খুলছে আর বন্ধ করছে। কিছু বলতে চায়, অথচ কথা বের হচ্ছে না গলা দিয়ে। ওদিকে অবর্ণনীয় চেহারা হয়েছে লেসলি ম্যাকঅ্যাডামের।

অনেক সংগ্রাম করে নিজেকে সামাল দিতে সক্ষম হলো হ্যামন্ড। বিস্ময়ে চেঁচিয়ে উঠল সে প্রায়, 'জেঙ্গার! অ্যাডলফ জেঙ্গার!'

'কঙ্কালের সুটটা তো সেরকমই বলে।' মাসুদ রানা নির্বিকার। 'যুক্তিও বলে একই কথা। কাজেই আর সন্দেহের অবকাশ কই?'

'পত্রিকার কথা কি যেন বললে তখন, রানা?' চিন্তায় কুঁচকে আছে লেসলির কপাল। 'ব্যানার হেডিং…!'

থুতনি চুলকাল ও। 'রুশ ফিশিং ফ্লীট।'

এক চুল এক চুল করে কপালে উঠতে আরম্ভ করল ওদের চোখ। 'ওহ্, গড!' ফিসফিস করে বলল মেয়েটি, 'ও মাই গড!'

'একজন ব্যতিক্রমী মানুষ!' জেঙ্গার সম্পর্কে ড্যানিয়েলসের মন্তব্যটা আওড়াল মাসুদ রানা। গলায় রাগ, বিদ্রূপ বা তিক্ততা, কোন কিছুর আভাস নেই ওর। 'সত্যিই ব্যতিক্রমী।'

এক ঘণ্টা পর। লা গুয়ারডিয়া এয়ারপোর্ট। বৃষ্টিভেজা মেরিন এয়ার টার্মিন্যালের খুদে ল্যান্ডিং ফিল্ডের এক প্রান্তে দাঁড়িয়ে আছে ওরা তিনজন। এমনিতেই প্রচণ্ড শীত, তার সাথে বৃষ্টি যোগ হওয়ায় মারাত্মক অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। থেকে থেকে আচমকা পানিতে পড়া কুকুরের মত গা ঝাড়া দিচ্ছে ওরা, কাঁপছে হি হি করে।

সিগারেট ধরাল মাসুদ রানা। ওভারকোটের কলার তুলে ঘাড় গোঁজ করে দাঁড়াল। তাকিয়ে আছে সামনের দিকে। ঘুমের অভাবে চোখ জ্বলছে ভীষণ। হাই তুলছে ঘন ঘন। তিনজনেরই এক অবস্থা। গত দুই দিন দুই রাত বিছানায় পিঠ ছোঁয়ানোর সুযোগ ঘটেনি কারও, তারওপর রয়েছে সার্বক্ষণিক উদ্বেগ আর উৎকণ্ঠা। সবচেয়ে করুণ অবস্থা হয়েছে লেসলির। বিস্বাদ লেগে ওঠায় সিগারেট ফেলে দিল রানা। পানিতে পড়ে ফাঁৎ করে নিভে গেল ওটা।

প্লেনটার দিকে তাকাল রানা। ইউএস ট্রেজারি ডিপার্টমেন্টের খুদে একটা প্লেন। ফুয়েলিং সেরে ট্যাক্সিইং করে এদিকেই আসছে। ওদের মাত্র ত্রিশ গজ দূরে থামল এসে বিমানটা, খুদে কেবিন ডোর খুলে বেরিয়ে এল এক যুবক। নিচু গলায় হ্যামন্ডের সাথে মিনিটখানেক কথা বলল সে। কথা শেষ হতে রানার দিকে ফিরল ট্রেজারি এজেন্ট। 'চলুন, যাওয়া যাক। প্লেন রেডি।'

নীরবে মাথা দোলাল ও। পা বাড়াল দ্রুত, প্লেনের উষ্ণ পেটে ঢুকতে পারলে বাঁচে যেন। ওর পরামর্শ অনুযায়ী সাথে একটা লং রেঞ্জ রাইফেল নিয়েছে কেবল হ্যামন্ড। ওটার কেস খুলল মাসুদ রানা। ভেতরে ফোমের ওপর সযত্নে সাজিয়ে রাখা রাইফেলটার বিভিন্ন পার্টস, টেলিস্কোপিক সাইট ইত্যাদি ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখল। চমৎকার জিনিস। সন্তুষ্ট মনে সব বাক্সে ভরে রাখল রানা, ডালা নামিয়ে তুলে দিল ল্যাচ। তিন মিনিট পর আকাশে উঠল ওদের প্লেন।

রানার পাশের আসনে বসেছে লেসলি ম্যাকঅ্যাডাম। পল হ্যামন্ড বসেছে আইলের ওপাশে। বাইরে আলোয় আলোয় ঝলমল করছে নিউ ইয়র্ক, কিন্তু ভেতরে বসে তা টের পাওয়ার উপায় নেই। জানালার ভারি পর্দা টেনে দেয়া আছে, সিলিঙে জ্বলছে অল্প ওয়াটের আলো। মেঘ ফুঁড়ে ছুটে চলেছে খুদে বিমান। যার যার আসনে বসে আছে ওরা তিনজন, কথা নেই কারও মুখে। গভীর চিন্তায় মগ্ন প্রত্যেকে।

অ্যাডলফ জেঙ্গারের কথা ভাবছে মাসুদ রানা। বিপদ টের পেয়ে ১৯৬৪ সালে যখন আর্থার স্যান্ডলাররূপী ইয়েভগেনি প্রেমাকভের আরেক 'ডবল' খাড়া করা হয়, সবাই বলছে, সে সময় আমেরিকা থেকে পালিয়ে যায় প্রেমাকভ। অস্ট্রিয়ায় চলে যায়। এরপর একদিন; কবে, কেউ নিশ্চিত করে বলতে পারে না,

অ্যাডলফ জেঙ্গার হয়ে স্যান্ডলার ম্যানসন থেকে বেরিয়ে এল সে। প্রকাশ্যে ঘোষণা করল নিজের স্বেচ্ছা অবসর গ্রহণের কথা।

অর্থাৎ নিজেকে জেঙ্গার বানিয়ে অত্যন্ত গোপনে আবার আমেরিকায় প্রবেশ করে প্রেমাকভ। তারপর ড্যানিয়েলসকে দিয়ে জেঙ্গারকে স্যান্ডলার ম্যানসনে ডাকিয়ে এনে হত্যা করে তাকে। দ্বিতীয় দফা প্লাস্টিক সার্জারি কোথায় হয় প্রেমাকভের, অস্ট্রিয়ায়, মস্কোয়? নাকি আসলে স্যান্ডলার ম্যানসনেই? আসল জেঙ্গারের কথা ভাবল রানা। বেচারী! চোখের সামনে আরেক জেঙ্গারকে দেখে মৃত্যুর আগে নিশ্চয়ই অপরিসীম বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যায় মানুষটা।

'বাস্টার্ড! বাস্টার্ড! বাস্টার্ড!' বিড় বিড় করতে লাগল মাসুদ রানা। প্রচণ্ড আক্রোশে দু'হাত মুঠো পাকিয়ে গেল ওর আপনাআপনি।

'রানা!' ডেকে উঠল লেসলি।

সচকিত হলো ও। 'বলো।'

'তুমি কি বলছ বিড় বিড় করে?'

'না, কিছু না।' পর্দা সরিয়ে বাইরে উঁকি দিল ও। অনেক নিচে হলুদ কয়েকটা আলো দেখা গেল, টিপটিপ করছে। উত্তরপুব উপকূলরেখা অতিক্রম করছে এখন ওদের প্লেন। সেদিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে আবার ডুবে গেল রানা ভাবনায়। মৃদু বাম্প করল প্লেন, ঝাঁকিটা ওকে সাহায্য করল নিজেকে ফিরে পেতে।

পুবদিকে তাকাল মাসুদ রানা। উজ্জ্বল লাগছে কিছুটা আকাশ। কেমন এক ঝলমলে আভা, নীলচে-ধূসর আলোর বিচ্ছুরণ; সূর্যাস্তের আগমনী ঘোষণা করছে প্রকৃতি। পর্দা ফেলে দিল মাসুদ রানা, মুখ ঘুরিয়ে বিমানের ভেতরটা দেখতে লাগল। পরিসর খুব ছোট। আইলের দু'দিকে দুই সারিতে মোট আটটা আসন। প্রতিটি প্রশস্ত এবং আরামদায়ক।

মাত্র তিন-চার গজ সামনে খোলা ককপিট এবং পাইলটকে দেখা যাচ্ছে। পাইলটের মাথার পিছনে ছোট্ট টাক চিকচিক করছে কেবিনের মৃদু আলোয়। ধূমপান করছে সে, প্লেন অটোপাইলটের ওপর ছেড়ে দিয়ে। গোঁ-গোঁ শব্দ তুলে ছুটছে ওটা নানটুকেটের দিকে। ডিঙি নৌকার মত ডানে-বাঁয়ে বিরতিহীন দোল খাচ্ছে। সেই সঙ্গে বাম্প করছে কিছুক্ষণ পর পর।

হ্যামন্ডের দিকে তাকাল মাসুদ রানা। ঘুম দূরের কথা, ঝিমুনির রেশ পর্যন্ত নেই তার মধ্যে। চোখ মেলে সোজা সামনে তাকিয়ে বসে আছে, পিঠ খাড়া। তবে মানুষটা যে ক্লান্ত, সে ছাপ চেহারায় স্পষ্ট। এতই ক্লান্ত যে ঘুম আসছে না, এতই শ্রান্ত যে কথা বলতে ইচ্ছে করছে না। বয়সটাই মূল বাধা হ্যামন্ডের। কত হবে লোকটার বয়স? অনুমান করল মাসুদ রানা, ষাট? পঁয়ষট্টি? কতই বা ছোটাছুটি করতে পারে মানুষ এ বয়সে? ঘুম নেই, বিশ্রাম নেই, একবার এদিক ছোটো, আরেকবার ওদিক। তারওপর আছে টেনশনের বোঝা। সহ্যেরও তো সীমা আছে!

মুখ ঘোরাল ও। লেসলির দিকে তাকাল। চোখ মুদে বসে আছে মেয়েটি মড়ার মত। চোখমুখ শুকনো লাগছে। ওর জন্যে দুঃখ হয় রানার, আতঙ্ক আর নকলের তাড়া খেতে খেতেই জীবনের অর্ধেকটা ফুরিয়ে গেল বেচারীর। কী এক জীবন! এমন এক পরিচয়ের নিগড়ে বাঁধা পড়ে আছে যা ওর নিজের নয়। নিজের

পরিচয়ের স্বীকৃতি চাইবে, তাও পারেনি, সর্বক্ষণ মৃত্যুভয় তাড়িয়ে নিয়ে ফিরেছে লেসলিকে।

অর্ধেক জীবন লাফ-ঝাঁপ করে, আর ছায়ায় ছায়ায় মুখ লুকিয়েই ফুরিয়ে গেল। না পেরেছে স্যান্ডলার পদবী ব্যবহার করতে, না ম্যাকঅ্যাডাম। পরেরটা জিসারেল্লি ঘটনার পর পারতপক্ষে ব্যবহার করেনি লেসলি। করতে পারেনি। লন্ডনে শেষবার সফরের সময় যখন নিজের ভবিষ্যৎ নিয়ে শঙ্কিত দিন কাটাচ্ছে লেসলি, সেই সময় যদি মার্কিন ট্রেজারি ডিপার্টমেন্ট সাহায্যের হাত না বাড়াত, সম্ভবত অনেক আগেই শেষ হয়ে যেত লেসলি উপাখ্যান। এ ঝামেলায় পড়তে হত না মাসুদ রানাকেও।

'তোমার আত্মা উৎসর্গ করো,' লেসলিকে বলেছিল ল্যাসিটার, রানা শুনেছে ওর মুখে। 'আমাদের সাহায্য করো আর্থার স্যাণ্ডলারকে হত্যা করতে, বিনিময়ে ব্যক্তিস্বাধীনতা ফিরিয়ে দেব আমরা তোমাকে'। নিজস্ব দৃষ্টিকোণ থেকে প্রস্তাবটা যাচাই করে দেখেছে মাসুদ রানা। প্রস্তাবে সাড়া দিয়ে ঠিকই করেছে মেয়েটি, রানা নিজে ওর জায়গায় হলে তাই করত। প্রাণের চেয়ে বড়, মূল্যবান আর কি আছে? ওটা যখন যেতে বসে, বাঁচার জন্যে কী না করে মানুষ?

ড্যানিয়েলসের রোগগ্রস্ত মুখ চোখের সামনে ভেসে উঠল ওর। গত কয়েকদিনে লোকটি সম্পর্কে পুরানো পত্রিকা ঘেঁটে যতটুকু জেনেছে রানা, তাতে পরিষ্কার বোঝা যায় প্রচণ্ড দেশপ্রেমিক ছিল মানুষটা। অথচ হোয়াইটসাইডের বিতর্কিত মন্তব্য আর প্রশ্নগুলো সব ওলটপালট করে দিল। পুরো ব্যাপারটা পর্যালোচনা করে দেখেছে রানা সম্ভাব্য সবদিক থেকে। এবং ড্যানিয়েলসের যে আরও একটা পরিচয়ও ছিল, তা দিনের আলোর মত স্পষ্ট বুঝে গেছে। কোন সন্দেহ নেই এখন ওর।

আত্মনিবেদিত এক মার্কসবাদী ছিল উইলিয়াম ওয়ার্ড ড্যানিয়েলস। এক-জন্ম আমেরিকান। কবে কখন কোথায় জীবনের কোন পর্যায়ে তাকে রিক্রুট করে কেজিবি, কে জানে। হয়তো কলেজ জীবনে। যখন চোখের সামনে দুনিয়ার সবকিছুই ছিল রঙিন। ওপরে ওপরে অভিনয় করে গেছে চরম ডানপন্থীর, আর তলে তলে…

পাইলটের মৃদু কাশির শব্দে ধ্যান ভাঙল মাসুদ রানার। কেবিনের আলো জ্বেলে দিল সে। পালা করে দেখল ওদের। 'প্রস্তুত হয়ে নিন সবাই,' বলল লোকটা। 'আর বিশ মিনিটের মধ্যে অবতরণ করতে যাচ্ছি আমরা।'

লম্বা করে হাই তুলল মাসুদ রানা। দু'হাত মাথার ওপর তুলে আড়মোড়া ভাঙল। পর্দা সরিয়ে বাইরে তাকাল। সূর্য ওঠেনি এখনও, তবে বেশি দেরিও নেই। ভোরের প্রথম আলোয় হাসছে নিচের সমগ্র উপকূল। বৃষ্টি পড়ছে টিপ টিপ করে, তবে মেঘ নেই তেমন। আশা করা যায় কেটে যাবে যেটুকু আছে। হয়তো উন্নতি ঘটবে আজ আবহাওয়ার। দিনের শুরুটা সেরকম আভাসই দিচ্ছে।

সেফটি বেল্ট বেঁধে রানার দিকে ফিরল লেসলি। মুখে নার্ভাস হাসি। 'হোয়াইটসাইডকে আমার মুখোমুখি করেছিলে কি শুধুই কাহিনীর বাকি অংশ শোনার জন্যে, না আমার পরিচয় সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়ার জন্যেও?'

'দুটোর জন্যেই।'

'কিন্তু সে তো প্রথম থেকেই আমাকে ভুয়া প্রমাণ করতে উঠে পড়ে লেগেছিল।'

'তাতে কি?'

'ধরো যদি ওখানেও সে একই কথা...' রানাকে মাথা দোলাতে দেখে থেমে গেল লেসলি।

'আগেই তার সে পথ বন্ধ করে দিয়েছিলাম আমি।'

'কি ভাবে?' বিস্মিত হলো লেসলি।

'স্যান্ডলার ম্যানসনের ডাইনিংরুমে ঢোকার আগে কায়দা করে সামনে ঠেলে দেই তাকে আমি, যাতে তোমরা দু'জন আচমকা মুখোমুখি পড়ে যাও।'

'তাতে কি?'

মৃদু হাসি ফুটল রানার মুখে। 'একই সাথে তোমাদের দু'জনের চোখের ভাষা যাতে পড়তে পারি আমি। মুখ যতই বলুক, চোখ কখনও মিথ্যে বলে না লেসলি। চোখের স্বীকারোক্তি বুঝতে চেয়েছিলাম আমি কেবল।'

'এবং?'

'এবং হোয়াইটসাইডের তোমাকে দেখার মুহূর্তেই আমি বুঝে ফেলি তুমি নকল নও। অবশ্য সে অস্বীকার করলেও কিছু আসত-যেত না তখন।'

'কেন? আসত-যেত না?'

'কারণ তার আগে থেকেই আমি প্রায় নিশ্চিত জানতাম যে তুমি, হোয়াইটসাইড এবং হান্টার, তোমরা তিনজনেই আসল।'

খানিক ভাবল লেসলি। 'কি করে নিশ্চিত জানলে?'

'ইনট্যুইশন,' কাঁধ ঝাঁকাল মাসুদ রানা। 'সহজাত অনুভূতি।'

'ব্যস? আর কিছু নয়?'

হাসল ও। 'আমি যাতে বেঘোরে না মরি, সে ব্যাপারে তোমাকে যথেষ্ট সচেতন দেখেছি আমি। অথচ ঘটার কথা ছিল উল্টো। আমি তোমার সম্পর্কে প্রায় সবকিছুই জেনে গিয়েছিলাম। ভুয়া হলে তোমার জন্যে বিপজ্জনক হয়ে ওঠার কথা ছিল আমার। সেটাই ছিল স্বাভাবিক। অতএব, আমাকে মেরে ফেলাই ছিল তোমার জন্যে সঠিক কাজ। অথচ তুমি করেছ উল্টোটা।'

একটা হালকা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে হেলান দিল লেসলি। মৃদু ঝাঁকির সাথে নানটুকেট এয়ারপোর্টের টারম্যাক স্পর্শ করল ওদের প্লেন। পুব আকাশে সবে উঁকি দিতে আরম্ভ করেছে তখন সূর্য।

পল হ্যামন্ডের নির্দেশ অনুযায়ী এয়ারপোর্ট টার্মিন্যালের বাইরে ওদের অপেক্ষায় ছিল নানটুকেট পুলিসের ছাপহীন একটা কার। পার্কিং লটের এক কোণে দাঁড়িয়ে আছে ওটা। পিছনের দরজা খুলে ফুটবোর্ড ম্যাটের নিচে হাত চালিয়ে ওটার চাবি বের করে আনল ট্রেজারি এজেন্ট, থাবা দিয়ে ওটা কেড়ে নিল মাসুদ রানা। উঠে বসল ড্রাইভিং সীটে। হ্যামন্ড বসল তার পাশে। রাইফেল কেস নিয়ে লেসলি উঠল পিছনে।

এক মিনিটের মধ্যে রওনা হয়ে গেল ওরা।

আট

প্রায় নিঃশব্দে অ্যাডলফ জেঙ্গার ওরফে ইয়েভগেনি প্রেমাকভের বন্ধ সীমানা গেটের সামনে এসে থেমে দাঁড়াল স্টেট পুলিসের গাড়িটা। সবে সূর্য উঠেছে তখন। কাঁচা সোনা রঙের রোদে চিকচিক করছে নানটুকেট সাউন্ড। বাতাস আছে। সাউন্ডের নীল পানি অনবরত দোল খাচ্ছে। পাখিদের কিচিরমিচির খুব মিষ্টি লাগছে কানে। ছোটাছুটির বিরাম নেই তাদের।

এয়ারপোর্ট থেকে দশ মিনিটের গাড়ি পথ ছয় মিনিটে পেরিয়ে এসেছে মাসুদ রানা অস্বাভাবিক দ্রুত গতিতে। প্রেমাকভকে হারানোর ভয় তাড়িয়ে নিয়ে এসেছে ওকে। গাড়িতে উঠেই রেডিওটা অন করে দিয়েছিল পল হ্যামন্ড, কেপ কড স্টেশনের ভোরের খবর শুনতে শুনতে এসেছে ওরা। খবরের প্রায় পুরোটা জুড়ে ছিল উত্তর আটলান্টিকে সোভিয়েত ও পোলিস ফিশিং ফ্লীটের অবৈধ উপস্থিতি, মাছ আহরণ ইত্যাদি ইত্যাদি।

নানটুকেটের দক্ষিণে, মার্কিন উপকূলের ওপাশের আটলান্টিক ছেয়ে ফেলেছে দেখতে মাছ ধরার ট্রলারের মত, অথচ অত্যাধুনিক রাডার ডিভাইস, অ্যান্টেনা ইত্যাদি সজ্জিত শতাধিক ছোট-বড় জাহাজ। বিষয়টাকে গুরুত্বের সাথে পর্যবেক্ষণ করছে মার্কিন কোস্ট গার্ড বাহিনী। এ কাজে নিজেদের প্রতিটি জলযান নিয়োগ করেছে ওয়াশিংটন, কারণ এ ধরনের আজব তৎপরতা আগে কখনও দেখা যায়নি রুশদের মধ্যে। পোল্যান্ড তো পরের কথা। এর পিছনে আর কোন কারণ আছে কি না সেটাই এখন মার্কিন সরকারের আসল মাথা ব্যথা।

স্টার্ট বন্ধ করে হ্যান্ড ব্রেক টানল মাসুদ রানা, দ্রুত বেরিয়ে এল গাড়ি ছেড়ে। হ্যামন্ড ও লেসলিও নেমে পড়ল। সাথে সাথে দু'গালে প্রচণ্ড ঠাণ্ডার চড় খেলো ওরা। দম ছাড়লেই মুখের সামনে ধোঁয়ার মেঘ সৃষ্টি হচ্ছে, নিতে গেলে ধারাল ছুরির খোঁচা লাগে কলজেতে। গভীর আগ্রহে বাড়িটার দিকে তাকাল পল হ্যামন্ড। সামনের দরজা বন্ধ। স্বাভাবিক। এত সকালে হয়তো বিছানা ছাড়ার অভ্যেস নেই প্রেমাকভের। জানালার পর্দাও নামানো।

'কি মনে হয়,' চোখ কুঁচকে মাসুদ রানার দিকে তাকাল ট্রেজারি এজেন্ট, 'হারামজাদা আমাদের আশা করছে?'

'হয়তো,' চিন্তিত স্বরে বলল ও। পিছনের সীটে রাখা লং রেঞ্জ রাইফেলের দীর্ঘ কালো কেসটার দিকে তাকাল। আপাতত ওটার প্রয়োজন নেই। আগে এগিয়ে দেখা যাক পরিস্থিতি। কিন্তু পা বাড়াতে গিয়েও শেষ মুহূর্তে থমকে গেল মাসুদ রানা। ভাল করে বাড়ির সামনের রাস্তা এবং আশপাশটা দেখে নিল।

'কি দেখছ?' প্রশ্ন করল লেসলি।

'পায়ের ছাপ।'

'মানে?'

'আশেপাশে ওর বন্ধুরা আমাদের জন্যে অ্যামবুশ পেতে বসে আছে কি না

আবিষ্কারের চেষ্টা করে দেখলাম আর কি।' বলল বটে, কিন্তু মনে মনে সম্ভাবনাটা উদয় হওয়ার প্রায় সাথে সাথেই বাতিল করে দিয়েছে মাসুদ রানা। তেমনটি ঘটার চান্স নেই। এখন জান নিয়ে পালানোর সময় লোকটার। তাই করবে সে। অবশ্য কে বলতে পারে করেই ফেলেছে কি না! সীমানা গেট খুলে ভেতরে পা রাখল মাসুদ রানা, ডান হাত হোলস্টারে। চোখ সেঁটে আছে জেঙ্গারের বন্ধ দরজা-জানালায়।

পিছন থেকে ওর কাঁধে আলতো করে একটা হাত রাখল হ্যামন্ড। অন্য হাতে পিলে চমকানো সাইজের এক পুলিস অটোমেটিক শোভা পাচ্ছে। 'প্লীজ, মিস্টার রানা,' অনুনয়ের সুরে বলল সে। 'শেষ কাজটা অন্তত আমাকে করতে দিন। আমি সামনে নক করি, আপনারা দু'জন পিছনটা পাহারা দিন দয়া করে।'

'ঠিক আছে,' তৎক্ষণাৎ রাজি হয়ে গেল মাসুদ রানা। এত বছর পর একটা কাজের কাজ করার সময় এসেছে, সুযোগটা হাতছাড়া করতে চাইছে না লোকটা। 'গো অ্যাহেড।'

'ধন্যবাদ,' পা বাড়াল হ্যামন্ড সামনের দরজা লক্ষ্য করে।

ওদিকে রানা ও লেসলি দ্রুত, নিঃশব্দ পায়ে লন পেরিয়ে পৌঁছে গেল বাড়ির দুই পাশে, তারপর পিছনদিকে। রানার হাতে ওয়াল প্রস্তুত, লেসলিও বের করে ফেলেছে একটা নাকবোঁচা খুদে পিস্তল। পিছনে দুটো জানালা, দুটোরই পর্দা ফেলা। বন্ধ দরজার সামনে দাঁড়াল ওরা সাগরের দিকে পিঠ দিয়ে। আকাশের দিকে তাকাল মাসুদ রানা। মেঘের আড়ালে সূর্য উধাও হয়ে গেছে হঠাৎ করে। সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগছে আকাশ। আগের চেহারায় ফিরে যাবে, নাকি মুখের সামনে বর্তমানের পর্দা বহাল রাখবে বুঝে উঠতে পারছে না যেন।

নীরবে এক মিনিট কেটে গেল। তারপর আরেক মিনিট। কোন সাড়া শব্দ আসছে না সামনে থেকে। নক করার শব্দ শুনতে পায়নি ওরা। চোখ কুঁচকে মাসুদ রানাকে দেখল মেয়েটি, চোখে প্রশ্ন, করছে কি হ্যামন্ড? বসে আছে কেন হাত গুটিয়ে? কাঁধ ঝাঁকাল ও জবাবে, চোখ নামিয়ে ডোর নবের দিকে তাকাল। ওটা নড়ে ওঠে কি না লক্ষ রাখছে। আরও ত্রিশ সেকেন্ড পেরিয়ে গেল।

কানের কাছে আচমকা বাজ পড়ল বিকট শব্দে। শক্ ওয়েভের প্রচণ্ড ধাক্কায় শূন্যে উঠে গেল প্রায় রানা ও লেসলি, হুড়মুড় করে পড়ে গেল চিত হয়ে। ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেছে ওরা ঘটনার আকস্মিকতায়, বিস্ফোরণের ভয়াবহ আওয়াজে কানের পর্দা মনে হলো দেবে গেছে ভেতরদিকে। পিছনের দুই জানালার কাঁচ টুকরো টুকরো হয়ে ছড়িয়ে পড়ল অনেকখানি জায়গা জুড়ে। আপাদমস্তক ভীষণরকম এক ঝাঁকি খেলো বাড়িটা।

সামলে নিয়েই তড়াক করে উঠে দাঁড়াল মাসুদ রানা, কাপড়-চোপড়ে লেগে থাকা কাঁচের অসংখ্য টুকরো ঝরে পড়ল মাটিতে। তীরবেগে ছুটল ও সামনের দিকে। বুঝে ফেলেছে বিস্ফোরণটা সামনের দরজাতেই ঘটেছে। এক মুহূর্ত পর উঠল লেসলি, সে-ও ছুটল পড়িমরি করে। সামনে পৌঁছে থমকে দাঁড়াল মাসুদ রানা, সামনের ভারি ওক কাঠের দরজা ছিন্নভিন্ন হয়ে উড়ে গেছে দিগ্বিদিক।

উড়ে গিয়ে প্রায় পঞ্চাশ ফুট দূরের সীমানা দেয়ালের কাছাকাছি আছড়ে

পড়েছে ট্রেজারি এজেন্ট, অথবা তার অবশিষ্ট দেহাবশেষ। সবটা দেখার আগেই বুঝে ফেলল রানা কি ঘটে গেছে। ওদের সাদর অভ্যর্থনা জানানোর জন্যে বোমার ফাঁদটা পেতে রেখে আরও আগেই পালিয়ে গেছে জেঙ্গার। বুঝতে পারেনি ব্যাপারটা হ্যামন্ড, নক না করে ডোর নব ঘুরিয়ে অবস্থানকারীর অজান্তে ভেতরে ঢুকতে চেয়েছিল।

বিষণ্ন ভঙ্গিতে মাথা দোলাল মাসুদ রানা। বুবিট্র্যাপ পাতা ছিল নবে। অনুসরণকারীদের উষ্ণ শুভাগমন জানাবার জন্যে পেতে রেখে গেছে ধূর্ত চূড়ামণি জেঙ্গার ওরফে প্রেমাকভ। তার বিদায় বার্তা ছিল ওটা। চিরবিদায়কে স্মরণীয় করে রাখার শেষ চমক। লোকটা বুঝতে পেরেছিল সময় শেষ, যে কোন মুহূর্তে হাজির হবে তার মৃত্যুদূত, অতএব তৈরি হয়েই ছিল সে।

হ্যামন্ডের পাশে হাঁটু মুড়ে বসে আছে লেসলি ম্যাকঅ্যাডাম; কাঁদছে ঝর ঝর করে। ঘন ঘন মাথা দোলাচ্ছে। যেন বলতে চায়, না, এ হতে পারে না। হতে পারে না। তাড়াতাড়ি সেদিকে এগোল মাসুদ রানা। হ্যামন্ডের দিকে তাকাল। বুকের কাছে পুরু ওভারকোটসহ যাবতীয় পরিধেয় ছিঁড়ে-ফেটে একাকার। পুড়ে কালো হয়ে গেছে। বুক-পেটের চামড়া ঝলসে রোস্ট হয়ে গেছে হতভাগ্য ট্রেজারি এজেন্টের। কোথাও কোথাও একেবারেই নেই চামড়া, যেন ছুরি দিয়ে চেঁছে তুলে ফেলা হয়েছে।

হাড়গোড় একটাও সম্ভবত আস্ত নেই তার দেহের কোথাও। হাত-পা অদ্ভুত ভঙ্গিতে দুমড়ে-মুচড়ে গেছে। মাটিতে মুখ গুঁজে পড়ে আছে রক্ত আর ধুলোবালি মেখে একাকার দেহটা। অনেক আগেই মৃত্যু হয়েছে পল হ্যামন্ডের, সন্দেহের বিন্দুমাত্র অবকাশ নেই। সম্ভবত বিস্ফোরণের কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই। লোকটা কি জেনে যেতে পেরেছে কিসের আঘাতে মৃত্যু হলো তার? মাথা ঝাঁকিয়ে আবোল তাবোল ভাবনাগুলো দূর করে দিল মাসুদ রানা।

'আমার জন্যেই!' অস্ফুটে বিলাপ করতে লাগল লেসলি, চোখের পানিতে সারামুখ মাখামাখি। 'আমার জন্যেই মরল মানুষটা। আমারই জন্যে···।'

সময় নষ্ট না করে ঘুরে দাঁড়াল মাসুদ রানা। আগুন ধরে গেছে বাড়িটায়, ক্রমেই তা ছড়িয়ে পড়ছে। ভেতরের এটা-ওটা পুড়ছে চড়চড় শব্দে। ধোঁয়ায় ভরে গেছে ঘর। তবে বাতাসের বেগ বেড়ে যাওয়ায় স্থির থাকতে পারছে না, বেরিয়ে যাচ্ছে দরজা-জানালা দিয়ে। জানে গিয়ে লাভ নেই, তবু নিজেকে সামলাতে পারল না রানা। এক ছুটে ঢুকে পড়ল ঘরের ভেতরে। কতক্ষণ আগে পালিয়েছে হারামজাদা প্রেমাকভ? কবে? আজ, কাল, নাকি পরশু?

হলওয়ে পেরিয়ে লিভিংরুমে এসে দাঁড়াল মাসুদ রানা, ব্যগ্র চোখে এদিক ওদিক তাকাল। চারদিকের সবকিছু পুড়ছে, গায়ে আগুনের আঁচ লাগছে। চোখের সামনে প্রেমাকভের আসন, বড় কুশন চেয়ারটা জ্বলছে দাউ দাউ করে। কাছের পিকচার উইণ্ডো উড়ে গেছে ফ্রেমসহ। শুধু পর্দাটা আছে, পুড়ছে।

নিজের অজান্তেই চেঁচিয়ে উঠল মাসুদ রানা। 'প্রেমাকভ! হারামজাদা, খুনী, বেরিয়ে এসো! সাহস থাকে তো বেরিয়ে এসো আড়াল ছেড়ে! কোথায় তুমি, বাস্টার্ড?'

সাড়া দিল না প্রেমাকভ। শূন্য বাড়ি উপহাস করল যেন ওকে। পরাজিত সেনাপতির মত দাঁড়িয়ে থাকল মাসুদ রানা। সব শেষ হয়ে গেল। এত দৌড়ঝাঁপ, ছোটাছুটি বিফলে গেল সব। সামনের জ্বলন্ত চেয়ারটার দিকে তাকাল ও, তারপর পিকচার উইন্ডো দিয়ে সাগরের দিকে। ঢেউ দেখতে লাগল নানটুকেট সাউন্ডের। হঠাৎ একটা ঝাঁকি খেয়ে সচকিত হলো মাসুদ রানা। সাউন্ডের বুকে, অনেক দূরে কি যেন ঝিকিয়ে উঠল মুহূর্তের জন্যে। অজান্তেই জানালার দিকে দু'পা এগোল ও। আরও ভাল করে দেখতে চায় ওটা কি।

আগুনের তাপে চোখমুখ কুঁচকে উঠল, কিন্তু পাত্তা দিল না ও ব্যাপারটাকে, তাকিয়েই থাকল। কয়েক সেকেন্ড পর আবার দেখা গেল ওটা। ছোটখাট একটা লাফ দিল রানার কলজে। বুঝে গেছে ও জিনিসটা কি। ঘুরে দাঁড়িয়েই পিছনের দরজা লক্ষ্য করে ছুটল মাসুদ রানা, মুহূর্তে বেরিয়ে এল খোলা জায়গায়। হ্যাঁ, ঠিক যা ভেবেছিল! ঘাটে একটা ক্র্যাফট বাঁধা কেবল, অন্যটা নেই। নিয়ে পালিয়ে গেছে প্রেমাকভ। ওটাই দু'বার ঝিকিয়ে উঠে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে মাসুদ রানার।

চলে যাচ্ছে আর্থার থেকে জেঙ্গারে রূপান্তরিত ইয়েভগেনি প্রেমাকভ, নিজ দেশে। শত্রু রাষ্ট্রে সুদীর্ঘ কয়েক দশকের মিশন সাফল্যের সাথে সেরে ফিরে চলেছে মাস্টার স্পাই। উল্টোদিকে ছুটল রানা। ঘুরে চলে এল বাড়ির সামনে। এখনও হ্যামন্ডের মৃতদেহের পাশে বসে আছে লেসলি। ওর পায়ের শব্দে ঘুরে তাকাল সে। রানার চেহারা দেখেই বুঝল কিছু একটা ঘটেছে। চোখের পানি মুছতে মুছতে উঠে পড়ল সে দ্রুত। 'কি হয়েছে?'

'জলদি রাইফেলটা নিয়ে এসো!'

'কি?'

'রাইফেল রাইফেল! জলদি, জেঙ্গার পালিয়ে যাচ্ছে!'

'কই! কোথায়?' উত্তরের অপেক্ষায় না থেকে দুই লাফে গাড়ির কাছে পৌঁছে গেল মেয়েটি।

'ওটা নিয়ে পিছনদিকে এসো,' হাত তুলে সাগর ইঙ্গিত করল রানা। 'জেটিতে। আমি যাচ্ছি ওখানে।'

'রানা, দাঁড়াও! আমিও…।' থেমে গেল লেসলি। ওর কথা শুনতে পায়নি মাসুদ রানা, এক লাফে বাড়ির আড়ালে চলে গেল। পিছনের রাস্তায় উঠেই ঝড়ের বেগে সৈকতের উদ্দেশে ছুটল রানা। সাগর সম্পর্কে জেঙ্গারের সেদিনের মন্তব্যটা কানে বাজছে মাসুদ রানার: 'সময় হয়ে এসেছে। আর বেশি দেরি নেই। একদিন হঠাৎ করেই হারিয়ে যাব আমি, চলে যাব দীর্ঘ সাগর যাত্রায়, ডুব দিয়ে। আর কোনদিন ফিরব না'।

ডুব দিয়ে? ভাবল ও, তার মানে?

ছুটতে ছুটতে রাশিয়ান আর পোলিস মাছ ধরার নৌবহরের উদ্দেশে অভিসম্পাত দিতে লাগল মাসুদ রানা। মার্কিন আন্তর্জাতিক জলসীমার বাইরে এসে জড়ো হয়ে মার্কিন উপকূল রক্ষীদের ধাপা দিচ্ছে আসলে ওরা। কিছু একটা ঘটবে বলে যখন সবাই হাঁ করে ওদিকে তাকিয়ে আছে, সেই ফাঁকে অন্যদিকে আরেক খেলা খেলছে আসলে মস্কো। মাস্টার স্পাইকে তুলে নিয়ে যাওয়ার জন্যে

সাবমেরিন পাঠিয়েছে সে। নিশ্চই তাই! দীর্ঘ সাগর যাত্রা…ডুব দিয়ে…। সাবমেরিন ছাড়া আর কার দ্বারা সম্ভব তা?

কেউ কিছু টের পাবে না, ভাবতে ভাবতে তিক্ততায় ছেয়ে গেল ওর অন্তর, সবার অলক্ষে আসবে সাবমেরিন, নির্দিষ্ট জায়গা থেকে জেঙ্গারকে তুলে নিয়ে আবার সবার অজান্তেই ফিরে যাবে ডুব দিয়ে। ফিশিং ফ্লীটটা আসলে ডাইভার্শন।

দেখতে মনে হয় কাছেই, আসলে কম করেও সিকি মাইল পেরোতে হলো মাসুদ রানাকে জেটিতে পৌঁছতে। লেসলি তখন অনেক পিছনে। জেটিতে উঠে হাঁপাল ও খানিক, তাকিয়ে থাকল ক্যানভাস দিয়ে ঢাকা বোটটার দিকে। সুস্থির হয়ে এগিয়ে গেল রানা, এক টানে আচ্ছাদনটা তুলে ফেলল। লাফ দিয়ে উঠে পড়ল বোটে। আরেকবার দূরে তাকাল ও, খুদে একটা গুবরে পোকার মত লাগছে জেঙ্গারের বোটটাকে। অনেক দূরে চলে গেছে লোকটা, প্রায় নাগালের বাইরে। মনটা হতাশায় ভেঙে পড়তে চাইলেও নিজেকে সাহস জোগাল মাসুদ রানা। একবার চেষ্টা করে দেখো, নিজেকে বোঝাল ও, শেষ একটা চেষ্টা। দেখো ফল কি দাঁড়ায়।

বোটের এঞ্জিনরুমে এসে ঢুকল রানা। ড্যাশবোর্ডটা কাঠের প্যানেল দিয়ে ঢাকা দেয়া আছে। প্যানেলটা লক করা। পিছনের বাল্কহেডে খুদে এক ফায়ার এক্সটিংগুইশারের পাশে একটা ফায়ার অ্যাক্স ঝুলতে দেখে হাত বাড়াল রানা। তিন-চারটা জোরাল কোপ খেয়ে ভেঙে গেল প্যানেল, ভাঙা টুকরোগুলো দ্রুত সরিয়ে মুক্ত করল বোর্ড। প্রথমেই ফুয়েল গজে চোখ বোলাল–প্রায় সিকি ট্যাঙ্ক ডিজেল আছে।

জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল মাসুদ রানা, এসে পড়েছে লেসলি। ইগনিশন সুইচের দিকে হাত বাড়াল। শেষ মুহূর্তে কি ভেবে থমকে গেল ও। এটাতেও কোন বোমা পেতে রেখে যায়নি তো জেঙ্গার? স্টার্ট দিলেই বুম্‌ম্? ইগনিশনের তারগুলো লক্ষ করল রানা সতর্ক চোখে, আরও সন্তুষ্ট হওয়ার জন্যে সংখ্যা মিলিয়ে দেখল, না বাড়তি কোন তার নেই। অর্থাৎ বোমা যদি থেকেও থাকে এটায়, ইগনিশনের সাথে তার সংযোগ নেই কোন।

খুব দ্রুত এঞ্জিন রুমটা চেক করে দেখল মাসুদ রানা। বিশেষ করে ড্যাশবোর্ডের তলার ফাঁক ফোকরগুলো পরখ করল দু'তিনবার। এই শেষ মুহূর্তে বোমার ঘায়ে মরার কোন ইচ্ছে নেই ওর। আরও দুই মিনিট মহামূল্যবান সময় নষ্ট করল রানা নিচের এঞ্জিন ও বোমা লুকিয়ে রাখার অন্যান্য সব সম্ভাব্য জায়গায় চোখ বোলাতে গিয়ে। অবশেষে নিঃসন্দেহ হলো। না, নেই কোন বোমা

আল্লার নাম স্মরণ করে ইগনিশন সুইচে চাপ দিল মাসুদ রানা, গুরুগম্ভীর গর্জন ছেড়ে স্টার্ট নিল ক্রিস ক্র্যাফট। জেটির সঙ্গে ওটাকে বেঁধে রাখা দড়িদড়া লেসলি আগেই খুলে ফেলেছে ওর নির্দেশে। গিয়ার দিয়ে বোটটা খানিক পিছিয়ে আনল মাসুদ রানা। নাক ঘুরিয়ে খোলা সাগরমুখো করল, তারপর থ্রটল সামনে ঠেলে দিল যতদূর যায়। হুঙ্কার ছেড়ে লাফ দিল বোট, নাক উঁচু করে ঢেউয়ের মাথায় চাঁটি মেরে ছুটল নাচতে নাচতে। ততক্ষণে আরও ছোট হয়ে গেছে জেঙ্গারের বোট।

দিগন্তে পৌঁছে গেছে ওটা, বিন্দুর আকার পেয়েছে। কম করেও তিন মাইল এগিয়ে আছে ব্যাটা, অনুমান করল মাসুদ রানা। কম্পাসের দিকে তাকাল, বুঝতে চেষ্টা করছে কোনদিকে যাওয়ার ইচ্ছে জেঙ্গারের। আরেকবার তাকাল ফুয়েল গজের দিকে। কতদূর যাওয়া যাবে এই তেলে? কোন জায়গায় সারমেরিনের সাথে মিলিত হতে যাচ্ছে লোকটা? আরেকটু জোরে ছুটতে পারে না এই হতচ্ছাড়া বোট? থ্রটল ধরে আরেকবার টানাটানি করল মাসুদ রানা, কিন্তু কাজ হলো না, একচুলও বাড়ল না বোটের গতি।

যত গভীরের দিকে এগোচ্ছে ওরা, ততই বাড়ছে সাউন্ডের ঢেউ। বোটের খোলে ঢেউয়ের অনবরত থপাস্ থপাস্ শব্দ উঠছে। এলোমেলো ঢেউ, সামনে পিছনে যেমন দুলছে বোট, তেমনি দুলছে ডানে-বাঁয়ে। থেকে থেকে বো-র আঘাতে ছিটকে ওপরে উঠে আসছে লোনা পানি, ভিজিয়ে দিচ্ছে সামনের ডেক।

জেঙ্গারের খোলসে গা ঢাকা দেয়া মানুষটির কথা ভাবল মাসুদ রানা। আজ তাকে ফিরিয়ে নেয়ার যে আয়োজন, নিশ্চয়ই তা কয়েক বছর আগে থেকেই নির্ধারণ করে রাখা হয়েছিল। স্ট্যান্ডবাই, ইমার্জেন্সি এস্কেপ প্ল্যান। খুব অল্প সময়ের নোটিশে যাতে কাজে নামতে এবং সফল হতে পারে, সে জন্যে সতর্ক অবস্থায় রাখা হয়েছিল সংশ্লিষ্ট সকল জাহাজ ও ক্রুদের। একজন মাত্র এজেন্টের জন্যে এতবড় আয়োজন, এ থেকে বোঝা যায় মস্কোর কাছে লোকটা কতখানি গুরুত্বপূর্ণ। কত মূল্যবান।

মিনিটের পর মিনিট পেরিয়ে যাচ্ছে, লাফাতে লাফাতে তুমুল গতিতে ছুটছে ক্রিস ক্র্যাফট, কিন্তু মাঝের ব্যবধান একটুও কমেছে বলে মনে হয় না, আগের মতই বিন্দু হয়ে আছে সামনের ক্র্যাফট। তার মানে ওটাও পূর্ণ গতিতে এগোচ্ছে। সেটাই অবশ্য স্বাভাবিক। তাড়া কম নয় প্রেমাকভের। ফুয়েল গজের ওপর চোখ গেল মাসুদ রানার, এর মধ্যে 'E'-এর দিকে নেমে গেছে ওটা বেশ খানিকটা। অথচ গায়ে হাওয়া লাগানো ছাড়া কাজের কাজ কিছুই হচ্ছে না। হুইলের দায়িত্ব লেসলির হাতে দিয়ে পিছিয়ে এল রানা।

জানে না দৌড়ের ফলাফল কি হবে, তবু তৈরি থাকতে চায় ও। রাইফেল কেস খুলে কাজে লেগে গেল রানা। দীর্ঘ ব্যারেলের হাই-পাওয়ারড স্নাইপিং রাইফেলটার বিযুক্ত অংশগুলো ধীরেসুস্থে যত্নের সাথে জুড়ল। সবশেষে ব্যারেলের সাথে স্পেশাল ব্রাউনিং টেলিস্কোপিক সাইট আঁটল রানা শক্ত করে। রাইফেল কাঁধে ঠেকিয়ে সাইটে চোখ রাখল ও, তাকাল সামনের বোটটার দিকে। এক লাফে সামনে চলে এল ওটা। কিন্তু বোটের বিরতিহীন লাফালাফির কারণে কিছু দেখা গেল না ভালমত। দুটোই নাচছে সমানে। এটা ঢেউয়ের মাথায় চড়ে তো ওটা নামে, ওটা চড়ে তো এটা নামে। রাইফেল নামাল মাসুদ রানা। বিষয়টা চিন্তায় ফেলে দিয়েছে।

সুযোগ পাবে না ধরেই রেখেছে মাসুদ রানা। কিন্তু বাই চান্স যদি পেয়েই যায়, এই ঢেউয়ের কারণে তা ফসকে যাওয়ার সম্ভাবনাও আছে ষোলো আনা। প্রেমাকভের কাছেও নিশ্চই অস্ত্র আছে, ভাবতে লাগল রানা, সেটা কি হতে পারে? এমনি কোন লং রেঞ্জ রাইফেল? ধরে নিতে হবে তাই। ওর মত একজন

প্রফেশনালকে সমঝে না চললে পরিণতি কি হতে পারে জীবন দিয়ে তা প্রমাণ করে গেছে পল হ্যামন্ড।

আরেকবার গজের দিকে তাকাল মাসুদ রানা। মজুত প্রায় অর্ধেক শেষ এরইমধ্যে। আর কতদূর যাওয়া যাবে বাকি ফুয়েলে? পিছন দিকে তাকাল ও, অনেক পিছনে ফেলে এসেছে ওরা নানটুকেট। কেন যেন ছাঁৎ করে উঠল বুকটা। কেউ সতর্ক করল ওকে ভেতর থেকে। 'রানা! সামনে বিপদ! এখনও সময় আছে, বোট ঘোরাও, ফিরে চলো! আর এগিয়ো না, ফিরে চলো, ফিরে চলো!'

ঘুরে তাকাল লেসলি ম্যাকঅ্যাডাম। ফোলা চোখে রাইফেলটা ইঙ্গিত করল। 'রেডি?'

'হ্যাঁ।' মাথা দোলাল রানা। ঝুঁকে কালো কেসটার ভেতর থেকে ছয় গুলির ম্যাগাজিন বের করল একটা। বুলেটগুলো ছুঁচলো মাথার, দীর্ঘ। দুটো ম্যাগাজিন। বারোটা বুলেট, মাসুদ রানার শেষ এবং একমাত্র ভরসা।

বোল্ট টানল মাসুদ রানা, ম্যাগাজিন চেম্বারে পুরে আরেকবার সাইটের সাহায্যে সামনে নজর বোলাল। একই অবস্থা। লাফালাফির কারণে কিছুই ভালমত দেখার উপায় নেই। সাইটের অ্যাডজাস্টমেন্ট পরখ করল আবার রানা, তারপর ড্যাশবোর্ডের ওপর শুইয়ে রাখল রাইফেল। সামনে তাকাল ও, প্রেমাকভের বোটের দিকে। চোখ কোঁচকাল। উৎসাহ বোধ করছে। 'মাঝখানের দূরত্ব কমছে,' বলল ও।

'কি বললে?'

'দুই বোটের ব্যবধান কমে আসতে শুরু করেছে।'

'অসম্ভব!' বলেই ঝট করে সামনে তাকাল লেসলি। অনেকক্ষণ ধরে দিগন্তের বিন্দুটা দেখল। ঠিকই তো! ভাবল ও, আসলেই তাই। যে জন্যেই হোক, নিজের বোটের গতি কমিয়ে দিয়েছে প্রেমাকভ। ধীরগতিতে হলেও ক্রমেই কমে আসছে মাঝখানের দূরত্ব।

'আমাকে দাও হুইল,' এগিয়ে এসে বোটের দায়িত্ব নিল মাসুদ রানা। কম্পাসের দিকে তাকাল। সামনের বোটের সঙ্গে তাল রাখতে গিয়ে নিজেদেরটার নাক ঘোরাল সামান্য, স্থান বদল করল কম্পাসের কাঁটা। কোর্স বদলাচ্ছে প্রেমাকভ, ভাবল ও, কেন? এরমধ্যে আগের থেকে দেখতে বেশ খানিকটা বড় হয়েছে সামনের বোট।

'কোর্স অলটার করছে হারামজাদা,' বিড়বিড় করে বলল লেসলি।

'তাইতো দেখছি।' দুই তিন সেকেন্ড অপেক্ষা করল ও পরিস্থিতি বোঝার জন্যে। 'বোট ঘোরাচ্ছে মনে হয়,' অনিশ্চিত কণ্ঠে বলল রানা। উত্তেজিত হয়ে উঠল। 'হ্যাঁ, তাই! কিন্তু কেন? ওখানে কেন বোট…।'

পিছনে তাকাল লেসলি। ধূসর কাগজে আবছা সবুজ একটা ফোঁটার মত লাগছে নানটুকেটকে, দেখা যায় কি যায় না। আন্তর্জাতিক জলসীমায় চলে এসেছে ওরা অনেক আগেই। ঢেউয়ের আকার বেশ বড় এখানে, তের মতিগতিও উল্টোপাল্টা। ফুয়েল গজের কাঁটা 'E' ছুঁয়েছে, প্রায় শেষ পর্যায়ে পৌঁছে গেছে তেলের মজুত।

'লোকটা পাগল হয়ে গেল নাকি?' প্রেমাকভ দেখতে দেখতে আরও বেশ খানিকটা পিছিয়ে পড়েছে দেখে বলল মেয়েটি। 'গতি কমাচ্ছে কেন?'

'নিশ্চই কোন কারণ আছে,' ওটার চারদিকে সতর্ক নজর বোলাবার ফাঁকে বলল মাসুদ রানা। দৃষ্টি অস্থির হয়ে উঠেছে, খুব দ্রুত স্থান বদল করছে। প্রতি মুহূর্তে কিছু একটা ঘটার আশঙ্কা করছে যেন ও।

হঠাৎ করেই এঁকেবেঁকে চলতে আরম্ভ করল সামনের বোটটা। কিন্তু মাসুদ রানা কোর্স বদল করল না। উপায় নেই। যে-কোন মুহূর্তে বন্ধ হয়ে যাবে এঞ্জিন, কারণ তেল আর সামান্যই আছে। এ সময় ও ধরনের কিছু করতে যাওয়া একেবারেই অর্থহীন। আগের মতই সোজা এগোতে থাকল ও। তাতে বরং লাভই হলো। ঘনঘন ডানে-বাঁয়ে করতে গিয়ে আরও পিছিয়ে পড়ল সামনের বোট, মাঝের ব্যবধান দ্রুত আরও কমে এল।

একটু পর পিছনে তাকাল প্রেমাকভ পলকের জন্যে। সঙ্গে সঙ্গে নিজের ভুলটা ধরতে পারল সে, তাড়াতাড়ি হুইল সোজা করে নিয়ে নাক বরাবর ছুটল কিছুক্ষণ। তারপর বাঁক নিতে আরম্ভ করল অনেকখানি জায়গা জুড়ে। হুইল হাউসের মাথায় বসানো রাডার স্কোপ চালু আছে তার, বোটের সাথে তাল রেখে ওটাও ঘুরছে একটু একটু।

আরও কয়েক মিনিট কেটে গেল। প্রতি মুহূর্তে আশঙ্কা করছে মাসুদ রানা, এই বুঝি গেল থেমে বোট। গেল বুঝি এঞ্জিন বন্ধ হয়ে। চারদিকে পানি আর ওরা ছাড়া আর কিছুই নেই। কেবল পানি আর পানি। এখনও বাঁক নিচ্ছে প্রেমাকভ। বলতে গেলে একই জায়গায় ঘুরছে লোকটা। দেখে মনে হয় কিছু খুঁজছে হয়তো, অথবা কোন কিছুর দেখা পাওয়ার আশায় আছে। একই সঙ্গে পিছনের বোটটা যাতে আর কাছে না আসতে পারে, সেদিকেও সমান নজর রয়েছে তার। এরই মধ্যে তার আধ মাইলের মধ্যে পৌঁছে গেছে ধাওয়াকারী, আর এগোতে দিতে চায় না সে ওদের।

হঠাৎ করে শুরু হলো বৃষ্টি।

আচমকা বাঁ দিকে ঘুরে গেল প্রেমাকভের বোটের নাক, তীক্ষ্ণ এক বাঁক নিল সে। মনে হলো যেন প্রার্থিত বস্তুটির দেখা পেয়েছে লোকটা। হ্যাঁ, সত্যিই পেয়েছে। প্রেমাকভ যা দেখেছে, কয়েক মুহূর্ত পর ওরাও তা দেখতে পেল।

সামনের বোট যেদিকে নাক ঘোরাল, সেদিকে, বড়জোর এক মাইল দূরে, পানি ফুঁড়ে মাথা তুলল একটা সরু, কালো রঙের দণ্ড। নীলচে-রূপালী পানি দু'ভাগ করে এগিয়ে আসতে থাকল ওটা। রাইফেলের সাইটে চোখ রেখে জিনিসটা দেখল মাসুদ রানা। দেখতেই থাকল স্তম্ভিত বিস্ময়ের সাথে। পৌঁছে গেছে প্রেমাকভের এস্কেপ ভেসেল।

দণ্ডটা আর কিছু নয়, একটা লোহার পাইপ, দৈর্ঘ্য বাড়ছে ওটার একটু একটু করে। সোজা প্রেমাকভের বোটের দিকে চলেছে। বৃষ্টির বেগ বেড়ে গেছে এর মধ্যে, তবু ওর মধ্যে দিয়ে লেসলিও দেখল পাইপটা। 'ওটা কি?' লাফিয়ে উঠল সে। উত্তরটাও সাথে সাথেই পেয়ে গেল নিজে থেকে, কাউকে বলে দিতে হলো না।

বেখেয়ালে গতি সামান্য কমিয়ে দিয়েছিল মাসুদ রানা, সংবিৎ ফিরতে প্রটেল

ধরে সজোরে সামনে ঠেলে দিল আবার। নাক উঁচু করে ঝাঁপ দিল ক্রিস ক্র্যাফট। এখন বাঁচতে হলে সামনেই যেতে হবে। এটার তেল শেষ। প্রাণে বাঁচলে এবং নানটুকেট ফিরে যাওয়ার আশা পূরণ করতে হলে যে কোন মূল্যে প্রেমাকভের বোট দখল করতে হবে এখন ওদের। সঙ্গে তার পাওনা চুকিয়ে দেয়ার বিষয়টা তো রয়েইছে। অবশ্য যদি সে সুযোগ হয় আর কি!

'আমরা বোধহয় ব্যর্থ হলাম, রানা,' তীব্র হতাশা মাখা গলায় বলল লেসলি। 'পারলাম না প্রতিশোধ নিতে।'

উত্তর না দিয়ে গজের দিকে তাকাল ও। E ছাড়িয়ে আরও অনেক নেমে গেছে কাঁটা। ট্যাঙ্কে আর এক মিনিট চলার মত ফুয়েলও আছে কিনা সন্দেহ। পাইপটার দিকে তাকাল। আরও খানিকটা জেগে উঠেছে ওটা, অনেক বেশি পানি কাটছে এখন।

'হোলি জেসাস!' আঁতকে উঠল মেয়েটি। 'রানা, দেখো!'

পাইপটা এরমধ্যে ফুটখানেক মাথা জাগিয়েছে ওপরে, আরও কয়েকটা যোগ হলো তার সাথে, লোহা আর ইস্পাতের পাইপ। কাছে চলে আসায় এখন পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে সব খালি চোখেই। পেরিস্কোপ। তারপর টনকে টন নীল পানি পিঠের ওপর দিয়ে দু'দিকে গড়িয়ে দিয়ে মাথা তুলল দৈত্যাকার এক সোভিয়েত সাবমেরিন। ভীতিকর এক জলদানবের মত লাগল ওটাকে। গায়ের রং ধূসর, তারওপর হালকা ধূসরের কোদালে মেঘের মত আঁকিবুঁকি।

আক্ষরিক অর্থেই চোখ কপালে উঠল মাসুদ রানার। চেহারা দেখেই বোঝা যায় পারমাণবিক শক্তি চালিত অন্যতম বৃহৎ সোভিয়েত সাবমেরিনগুলোর একটা ওই জলদানব। আর যা-ই হোক, এতটা আশঙ্কা ভুলেও করেনি মাসুদ রানা। একজন মাত্র স্পাইকে দেশে ফিরিয়ে নিতে মস্কো এই মাল পাঠিয়েছে, দেখেও বিশ্বাস করতে কষ্ট হচ্ছে ওর।

মাঝ পেট পর্যন্ত ভাসিয়ে দিল ওটা পানির ওপর। রাজকীয় ভঙ্গিমায় ধীরে ধীরে পাশ ফিরল ওদের দিকে। প্রেমাকভের সুবিধের জন্যে। ওটার ভেতরের কয়েকটা হলুদ ডেক লাইট চোখে পড়ল রানার। এখনও সমান তালে ওটার দিকে এগোচ্ছে দুই ক্রিস ক্র্যাফট। দুটোর মাঝের ব্যবধান আধ মাইলের কিছু বেশিই হবে এ মুহূর্তে। সাবমেরিন অনেক কাছে পৌঁছে গেছে প্রেমাকভ। ওটার পাশে তার বোটটাকে লাগছে পাহাড়ের পাদদেশে নেংটি ইঁদুরের মত।

ডুবোজাহাজের উত্থান পর্ব সম্পন্ন হতেই ওপরের হ্যাচওয়ে খুলে গেল। কয়েকজন নাবিক টপাটপ বেরিয়ে এল বাইরে। একটা লম্বা দড়ির মই ছুঁড়ে দিল নিচে। মাত্র শ'খানেক গজ অতিক্রম করতে বাকি তখন প্রেমাকভের। বোটের নিচু সিলিঙের কারণে ঝুঁকে ওপরে তাকাল মাসুদ রানা। রাশিয়ার চিরপরিচিত লাল হাতুড়ি আর কাস্তের প্রতীকটা দেখা গেল পরিষ্কার।

স্নায়ুযুদ্ধের এই চরম উত্তেজনাকর সময়ে স্বয়ং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উপকূলীয় সীমানার এত কাছে, খোলা মেলা সাগরে দাঁড়িয়ে আছে এক সোভিয়েত নিউক্লিয়ার সাবমেরিন, দিনে দুপুরে, অবিশ্বাস্য! ওটাকে ধাওয়া করা দূরে থাক, 'হেই!' করারও কেউ নেই। শত্রু দেশে তিন দশক ধরে একাধিক হত্যাসহ আরও।

অসংখ্য জঘন্য নোংরা কাজের হোতাকে নিরাপদে নিজভূমে ফিরিয়ে নিতে এসেছে ওটা, কী সাড়ম্বরে জাহির করছে নিজেকে।

জায়গামত পৌঁছে গেল প্রেমাকভ। হুইল হাউস থেকে বেরিয়ে পিছনে তাকাল এক পলক। বোটের দুলুনীর সাথে দেহের ভারসাম্য বজায় রাখার কসরত করতে করতে কাছে গিয়ে দু'হাতে ধরল দড়ির মই। তারপর সাবধানে এক পা এক পা করে উঠে যেতে লাগল। বাঁধন ছেঁড়া তরীর মত ভাসছে তার ক্রিস ক্র্যাফট, একটু একটু করে সরে যাচ্ছে স্রোতের টানে। খুব ধীরে ধীরে হলেও তার স্থান পরিবর্তনের ব্যাপারটা চোখে পড়ল মাসুদ রানার।

মাঝামাঝি পর্যন্ত উঠে থামল প্রেমাকভ। আবার পিছনে তাকাল। রানার মনে হলো মুহূর্তের জন্যে দাঁত দেখা গেল লোকটার। হাসছে? বিজয়ের আনন্দে? নাকি ওদের দুর্দশার কথা ভেবে? ও কি জানে এই বোটের ফুয়েলের অবস্থা? নিশ্চই জানে! একটু গভীরভাবে মাথা খাটালেই বোঝা যায় এই আয়োজনটাও তার নিজের করা। সাবমেরিনে চড়তে কতখানি পথ পাড়ি দিতে হবে, তাতে কতটা ফুয়েল প্রয়োজন, সব হিসেব করেই তার সম্ভাব্য ধাওয়াকারীর জন্যে এ ব্যবস্থাটা করেছে সে।

যাতে ঠিক সময়মত তেল ফুরিয়ে অকেজো হয়ে পড়ে বোট, নানটুকেট ফিরে যাওয়ার কোন উপায় না থাকে তাদের। ভাবনাটা শেষ হওয়ার সুযোগ পেল না মাসুদ রানার, তার আগেই খক করে কেশে উঠল এঞ্জিন। হেঁচকি তুলল পরপর কয়েকটা অদৃশ্য দেয়ালে বাধা পেল যেন ওটা, দ্বিধান্বিত ভঙ্গিতে ঝাঁকি খেতে খেতে আরও খানিকটা এগোল। তারপর হঠাৎ করে স্তব্ধ হয়ে গেল, ট্যাঙ্কের শেষ ফোঁটাটিও নিঃশেষ হয়ে গেছে।

প্রাণের স্পন্দন হারিয়ে অসহায়ের মত দোল খেতে লাগল বোটটা। ফুয়েলের মিটারে একটা লাল আলো জ্বলছে। গজের কাঁটা E ছাড়িয়ে অনেক নিচে নেমে গেছে। আর নামার উপায় নেই। ঠেকে গেছে। ওদিকে তরতরিয়ে দড়ির মই বেয়ে উঠে যাচ্ছে প্রেমাকভ। ওপরের ডেকে দাঁড়িয়ে ঝুঁকে পড়ে দেখছে তাকে তিন-চার নাবিক। বাতাসে মইয়ের নিচের দিক দোল খাচ্ছে ডানে-বাঁয়ে।

ওভারকোট সামলে ওই মই বেয়ে ওঠা একেবারে সহজ নয়। কিন্তু প্রেমাকভের কোন অসুবিধে হচ্ছে বলে মনে হয় না। হাঁ করে তাকে দেখছে লেসলি ম্যাকঅ্যাডাম। চলে যাচ্ছে তার দুঃখিনী মায়ের হত্যাকারী, লেসলির প্রাণের শত্রু, যার ভয়ে জীবনের বেশির ভাগ সময় পালিয়ে পালিয়ে বেড়াতে হয়েছে তাকে—ইয়েভগেনি প্রেমাকভ ওরফে আর্থার এডওয়ার্ড স্যান্ডলার ওরফে অ্যাডলফ জেঙ্গার।

সাবমেরিনের মাত্র আধ মাইল দূরে এখন ওরা।

নয়

উঁচু এক ঢেউয়ের ধাক্কায় জোরে দুলে উঠল বোট। ড্যাশবোর্ড আঁকড়ে ধরে

পতনের হাত থেকে নিজেদের রক্ষা করল রানা ও লেসলি। স্রোতের ধাক্কায় একটু একটু করে ঘুরে যেতে শুরু করেছে ওটা।

'চলে গেল!' তীব্র হতাশার সাথে বলল লেসলি। অসহায় রাগে ড্যাশবোর্ডের ওপর ধুম করে এক কিল মারল। 'ঠেকানো গেল না?' নিজেকে প্রশ্ন করল যেন।

কিছু বলল না মাসুদ রানা। থাবা দিয়ে রাইফেলটা তুলে নিয়ে পা বাড়াল বেরিয়ে যাওয়ার জন্যে। ওর আস্তিন টেনে ধরল মেয়েটি। 'রানা, কি করছ? এখন গুলি করা মারাত্মক ভুল হবে। আমাদের···আমাদের ডুবিয়ে দেবে তাহলে ওরা।'

জোর করে হাত ছাড়িয়ে নিল ও। মাথা দোলাল। 'না, সে সম্ভাবনা কম। ওরা এসেছে শুধুই প্রেমাকভকে তুলে নিয়ে যেতে। ওদের কারও ওপর গুলি ছোঁড়ার নির্দেশ মস্কো দিয়েছে বলে মনে হয় না।'

'কিন্তু আশেপাশে বাধা দেয়ার কেউ নেই, ওরা জানে। যদি···'

'এখন ওসব ভাবার সময় নেই। মস্কোর নির্দেশ যদি থাকে, তাহলে অন্য কথা। নইলে একটা আঙুলও তুলবে না ওরা, আমি জানি। অবশ্য নির্দেশ ছাড়াও বিশেষ পরিস্থিতিতে ওরা তা করতে পারে, একমাত্র যদি সরাসরি কেউ হামলা চালায় ওদের ওপর, তাহলেই।'

বেরিয়ে এল মাসুদ রানা। স্টারবোর্ড সাইডের নিচু রেলিং ঘেঁষে বসে পড়ল, নিজেকে যথাসম্ভব স্থির রাখার জন্যে পিঠ ঠেকাল পিছনের বাল্কহেডে। রাইফেলের নলের ভর চাপাল রেলিঙে। আগের মতই দুলছে বোট, তার ওপর বৃষ্টি। সাইটে চোখ রেখে এইম করা এ অবস্থায় প্রায় দুঃসাধ্য এক কাজ, তার ওপর নিশানাও অনেক দূরে রয়েছে। যতবড় ওস্তাদ শূটারই হোক না কেন, তেমন একটা ভরসা করা যায় না সফল হওয়ার ব্যাপারে।

ওর পাশে এসে বসল লেসলি। 'এই রাইফেলের রেঞ্জ কেমন?'

'ওই হারামজাদাকে পেড়ে ফেলার জন্যে যথেষ্ট ছিল, কিন্তু ঢেউ বৃষ্টি আর বাতাস মিলে···' থেমে সাইটে চোখ রাখল ও। সাবমেরিনের ক্রুরা ভুলেও একবার তাকাচ্ছে না এদিকে, যেন দ্বিতীয় বোটটিকে দেখেইনি ওরা এখনও। দু'জন ঝুঁকে হাত বাড়িয়ে দিল প্রেমাকভকে সাহায্য করার জন্যে। 'এ মুহূর্তে পাঁচশো গজ পর্যন্ত নিশ্চয়তা দেয়া যায় টার্গেট হিট করার ব্যাপারে। তার বাইরে হলে বাতাস আর ভাগ্যের সহায়তাও প্রয়োজন হবে।'

দৈত্যাকার জলযানটার দিকে তাকিয়ে দূরত্ব অনুমানের চেষ্টা করল লেসলি। 'নিশ্চই পাঁচশো গজের অনেক বাইরে রয়েছে সাবটা?'

'অবশ্যই। আট থেকে নয়শো গজ দূরে আছি আমরা ওটা থেকে।'

'রানা!'

মেয়েটির গলায় অস্বাভাবিক কিছু একটার আভাস পেয়ে ঘুরে তাকাল ও। 'বলো।'

'রাইফেলটা আমাকে দেবে?'

বুঝল রানা ওর মনের কথা। বিন্দুমাত্র দ্বিধা না করে রাজি হয়ে গেল। 'নিশ্চই। এ ধরনের অস্ত্র চালিয়েছ কখনও?'

'সাধারণ রাইফেল চালিয়েছি। হরিণ শিকার করেছি কয়েকবার।'

'গুড, ওতেই চলবে। এটা বরং আরও সহজ টার্গেট মার্কিঙের ক্ষেত্রে।' টেলিস্কোপিক সাইটে চোখ রাখল মাসুদ রানা, নব ঘুরিয়ে হেয়ার ক্রসে প্রেমাকভের মাথাটা স্পষ্ট ফুটিয়ে তুলল। 'নাও। সাবধানে।'

থাবা দিয়ে অস্ত্রটা নিল লেসলি ম্যাকঅ্যাডাম। চোখেমুখে দৃঢ় প্রতিজ্ঞার ছাপ ফুটল তার। দ্রুত বোল্ট টেনে তৈরি হলো, পিছনে হেলান দিয়ে বসল রানার মত, তারপর চোখ রাখল সাইটের ক্রসে।

'গুলি করবে বোট যখন ঢেউয়ের মাথায় উঠে স্থির হবে, তখন,' বলল ও। 'ওর মাথার এক ফুট ওপরে এইম করবে।'

দ্রুত মাথা ঝাঁকাল লেসলি। দৃষ্টি এবং মন দুটোই তার এ মুহূর্তে প্রেমাকভের ওপর কেন্দ্রীভূত। এক নাবিকের হাত ধরল প্রেমাকভ, আরেক ধাপ উঠল, আরেক নাবিকের বাড়ানো হাত প্রত্যাখ্যান করল মাথা নেড়ে। প্রথমজনের হাত ছেড়ে ডেকের রেলিং আঁকড়ে ধরল, হেঁচড়ে তুলে ফেলল নিজেকে।

হাঁটুতে ভর দিয়ে ডেকে বসে পড়ল প্রেমাকভ। মনে হলো জিরিয়ে নিচ্ছে। ক্লান্ত হয়ে পড়েছে হয়তো। কত বয়স হবে লোকটার? ভাবল রানা, ষাট-পঁয়ষট্টি? সত্তর? নাকি আরও বেশি? দুলে উঠল ওদের ক্রিস ক্র্যাফট, ঢেউয়ের মাথায় চড়তে শুরু করেছে। মেয়েটির কাঁধ শক্ত হয়ে উঠতে দেখল রানা। মাথা কাত করে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে সাবমেরিনের দিকে। এখনও উঠছে বোট।

'উত্তেজিত হয়ো না,' বলল মাসুদ রানা। 'ব্যক্তিগত আক্রোশ ভুলে শান্ত থাকার চেষ্টা করতে হবে এখন।'

'ভীষণ দুলছে বোট,' বিড়বিড় করে বলল লেসলি।

'ভুলে যাও। সঠিক সময়ের অপেক্ষায় থাকো। তোমাকে সফল হতেই হবে।'

উত্থান শেষ হলো বোটের। প্রায় স্থির ওটা এখন, পতন শুরু হবে যে কোন মুহূর্তে। ট্রিগার পেঁচিয়ে ধরা আঙুলের নখ সাদা হয়ে গেছে লেসলির, মৃদু একটা চাপ, কাজ সম্পন্ন করল হেয়ার স্প্রিং, দীর্ঘ ব্যারেল থেকে বেরিয়ে গেল প্রথম গুলিটা। ফল হবেই, আশা না করলেও ভেতরে ভেতরে শক্ত হয়ে গেল মাসুদ রানা। সাবমেরিনের ডেকের দিকে তাকিয়ে থাকল।

কোন প্রতিক্রিয়া নেই সেখানে। উঠে দাঁড়াতে শুরু করেছে প্রেমাকভ। মিস করেছে লেসলি প্রথম গুলিটা। বৃষ্টির ধূসর পর্দা ভেদ করে বেরিয়ে গেছে ওটা ব্যারেল সামান্য নিচু করে প্রায় সঙ্গে সঙ্গে আবার ট্রিগার টানল ও। ফলাফল শূন্য তৃতীয়বার গুলি করল লেসলি। কোন প্রতিক্রিয়া হলো না সাবমেরিনের ডেকে দাঁড়িয়ে পড়েছে প্রেমাকভ।

দুই হাতে কাপড়ে লেগে থাকা ময়লা পানি ঝাড়ছে জোরে জোরে। একেবারে নিশ্চিন্ত সে, নিরুদ্বিগ্ন। কারণ এতক্ষণে বুঝে ফেলেছে সে যে ওর ফাঁদে আটকে গেছে মাসুদ রানা ও লেসলি। আর এগোতে পারছে না। নিজেদের নিয়েই ব্যস্ত এখন ওরা। ব্যারেল এক চুল পরিমাণ উঁচু করে চতুর্থ গুলিটা ছুঁড়ল লেসলি বিড়বিড় করে কি যেন বলছে।

এইবার কিছু একটা ঘটল, সাবমেরিনের ওপরে দাঁড়ানো দলটা ঝট করে ঘুরে তাকাল ওদের বোটের দিকে, মনে হলো থতমত খেয়ে গেছে সবাই। হয়তো

সাবমেরিনের দেহে আঘাত করেছে শেষ গুলিটা, শব্দ শুনতে পেয়েছে ওরা। বাতাস সামান্য দিক বদল করল হঠাৎ করে। সাবমেরিনের দিক থেকে এদিকে আসছে এখন।

হৈ-চৈর আওয়াজ কানে এল ওদের। ডুবো জাহাজের ডেকে উপস্থিত সবাই কথা বলছে একযোগে। উত্তেজিত। রেলিঙে পেট বাধিয়ে উঁচু হয়ে নিচে কি যেন দেখছে। ঠিক, ভাবল মাসুদ রানা, শেষ বুলেটটা ওটার দেহে লেগেছে। খুশি হয়ে উঠল লেসলি, দেরি না করে আবার গুলি করল। এবং ব্যর্থ হলো। প্রথম ম্যাগাজিনের আর মাত্র একটা বুলেট বাকি আছে। সাবমেরিনের পেটের ভেতর কোথাও উজ্জ্বল হলুদ একটা আলো আচমকা বিস্ফোরিত হলো এই সময়। মুহূর্তের জন্যে জ্বলে উঠেই নিভে গেল।

ক্র্যাম্বল করার নির্দেশ। ঘুরে দাঁড়াল ক্রুরা তৎক্ষণাৎ, পা বাড়াল খোলা হ্যাচওয়ের উদ্দেশে। কিন্তু প্রেমাকভ নড়ল না। একভাবে তাকিয়ে আছে এদিকে, যেন বুঝতে চায় কে করছে গুলি। আবারও গুলি আসতে পারে, সে পরোয়া নেই।

'জলদি জলদি!' ছিলার মত টানটান হয়ে আছে মাসুদ রানা। জানে ও, আর মাত্র কয়েক সেকেন্ড সময় পাওয়া যাবে। তারপর ওটার পেটের নিরাপদ আশ্রয়ে চলে যাবে প্রেমাকভ, শেষ হয়ে যাবে সব আশা-ভরসা।

সাবমেরিন থেকে একটা সাইরেনের আওয়াজ ভেসে এল। ডাইভ সিগন্যাল, ডুব দিতে যাচ্ছে ওটা।

যথেষ্ট সতর্কতার সাথে শেষ গুলিটা ছুঁড়ল লেসলি। এটাও মিস। তীব্র ক্ষোভ আর বেদনায় মুখটা কালো হয়ে গেল লেসলির। চোখে অপরাধীর দৃষ্টি। রাইফেল নামিয়ে ফেলল সে। সাইরেনের টানা আওয়াজ এখনও আসছে। ক্রুরা সবাই অদৃশ্য হয়ে গেছে, কিন্তু ওই লোকটির মধ্যে কোনরকম ব্যস্ততার লক্ষণ নেই। দাঁড়িয়েই আছে। জেনে গেছে, গুলি ফুরিয়ে গেছে শত্রুর। আর তাকে গুলি করতে পারছে না ওরা। লেসলিকে রাইফেল নামাতে দেখে হাসল সে দাঁত বের করে।

মাসুদ রানা দেখছে তাকে। দাঁড়িয়ে আছে কেজিবির মাস্টার স্পাই, সম্পূর্ণ শান্ত, স্থির। ভেতরের হলুদ আলোটা আবার ঝলসে উঠল, ভেতরে ঢুকে পড়তে বলছে ওটা প্রেমাকভকে। সাইরেন এখনও বেজে চলেছে। তবু পাত্তা দিল না লোকটা। নড়লই না। হঠাৎ দু'হাত মাথার ওপর তুলল সে, নাড়তে লাগল ওদের লক্ষ্য করে। মনে হলো যেন 'V' দেখাচ্ছে। নিজের বিজয় ঘোষণা করছে।

থাবা দিয়ে লেসলির হাত থেকে রাইফেলটা নিল মাসুদ রানা। ব্যবহৃত ম্যাগাজিনটা বের করে ছুঁড়ে ফেলল সাগরে। দ্বিতীয়টা চেম্বারে ঢুকিয়েই বোল্ট টানল দ্রুত। হতাশ ভঙ্গিতে মাথা দোলাল লেসলি। যেন বোঝাতে যায়, লাভ নেই। খেয়াল করল না রানা। রাইফেল তুলল, কাঁধে ঠেকিয়ে রাখল সাইটে।

ওর এই তৎপরতা চোখে পড়েনি প্রেমাকভের, তার আগেই হাত নামিয়ে ঘুরে দাঁড়িয়েছে সে। বীরদর্পে এগিয়ে চলেছে হ্যাচের দিকে। একবার ভেতরে ঢুকতে পারলেই হলো, সেখানে তার জন্যে অপেক্ষা করছে নিয়ন আলো ও বিশুদ্ধ বাতাসের আরেক জগৎ। সম্পূর্ণ নিরাপদ। রাজকীয় ভঙ্গিতে হাঁটছে লোকটা। বিজয় উপভোগ করছে বেশ।

খুব সতর্কতার সাথে লক্ষ্য স্থির করল মাসুদ রানা, প্রেমাকভের কুটিল মাথাটার ছয় ইঞ্চি ওপরে। বাতাসের বেগ সামান্য কমেছে, বোটের দুলুনিও কমে গেছে কিছুটা। লম্বা করে দম নিল রানা, পরবর্তী ঢেউয়ের মাথায় বোটের স্থির হওয়ার অপেক্ষা করছে। দৃঢ় সংবদ্ধ ঠোঁটে দৃঢ় সংকল্প ওর, চোখে খুনের নেশা।

হ্যাচের মুখে পৌঁছে আবার দাঁড়াল প্রেমাকভ। ঘুরে তাকাল এদিকে শেষবারের মত। সঙ্গে সঙ্গে ট্রিগার টানতে আরম্ভ করল রানা। কোন বিরতি না দিয়ে পর পর ছয়বার ট্রিগার টেনে গেল ও, ব্যারেল চুল পরিমাণ এদিক ওদিক ঘুরিয়ে বুলেটগুলো ছড়িয়ে দিল প্রেমাকভের অবস্থানের চারদিকে। কল্পিত এক বৃত্তের মধ্যে।

তারপর প্রতীক্ষা।

মাঝখানের সামান্য দূরত্বটুকু পেরোতে কয়েক যুগ লেগে গেল যেন ছুঁচলো বুলেটগুলোর। অবশেষে শেষ হলো অনিশ্চিত প্রতীক্ষার পালা। ঠিক কোন বুলেটটা লক্ষ্যে আঘাত হানল বোঝা গেল না। হয়তো প্রথম, বা দ্বিতীয়, অথবা চতুর্থ কি শেষটা, কে বলতে পারে! সাইটে দৃশ্যমান ইয়েভগেনি প্রেমাকভের বড়সড় তরমুজের মত মাথাটা আচমকা বিস্ফোরিত হলো গ্রেনেডের মত। হেভি ক্যালিবার বুলেট প্রচণ্ড ধাক্কায় ডেক থেকে শূন্যে তুলে ফেলল তার নিশানাকে। রক্তে গোসল হওয়া বিধ্বস্ত মাথা পিছনে হেলে পড়ল প্রেমাকভের, পরমুহূর্তে ডেকে পিঠ দিয়ে আছড়ে পড়ল সে।

হুড়োহুড়ি পড়ে গেল সাবমেরিনের ভেতর। হয়তো প্রেমাকভের মরণ গোঙানি কানে গেছে ওদের, দুদ্দাড় করে ওপরে উঠে এল কয়েকজন নাবিক। সামনের দৃশ্য দেখে হতভম্ব হয়ে পড়ল লোকগুলো। থতমত খেয়ে গেল। চোখমুখ কুঁচকে 'ওয়াক!' করে উঠল একজন। পরমুহূর্তে ওদের বোটের দিকে তাকাল সবাই খানিকটা ভয়ে ভয়ে, তারপর মহাব্যস্ত হয়ে উঠল। দুই পা ধরে প্রেমাকেভের দেহটা হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে গেল তারা হ্যাচের কাছে। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে লাশসহ ডুবোজাহাজের পেটের ভেতর অদৃশ্য হয়ে গেল প্রত্যেকে।

রাইফেলটা লেসলির হাতে তুলে দিতে যাচ্ছিল মাসুদ রানা, আচমকা ওর বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ল সে। পাগলের মত চুমু খেতে লাগল ওর নাকেমুখে। কাঁদছে। ভেতরের উচ্ছ্বাস পানি হয়ে গলে বেরোচ্ছে তার চোখ দিয়ে। জোর করে মেয়েটিকে নিজের থেকে বিচ্ছিন্ন করল রানা। 'লেসলি, শান্ত হও। একটা জরুরী কাজ বাকি আছে এখনও। রাইফেল ধরো। সারতে দাও কাজটা।'

নিল সে ওটা। চোখ মুছতে মুছতে রানার কার্যকলাপ দেখতে লাগল। হুইল হাউসে এসে ঢুকল মাসুদ রানা। রাশিয়ান সাবমেরিন বা তার অফিসার-ক্রুদের সঙ্গে ওর কোন শত্রুতা নেই। ওরা ওদের ওপর রাষ্ট্রের অর্পিত দায়িত্ব পালন করেছে মাত্র। মাসুদ রানা পালন করেছে তারটা, উইলিয়াম ওয়ার্ড ড্যানিয়েলসের অর্পণ করে যাওয়া। তাই কি? ভাবল রানা, তিনি কি এভাবেই লেসলির সমস্যার সমাধান চেয়েছিলেন? ঠিক এভাবে না হলেও, প্রেমাকভের এই পরিণতিই তিনি আশা করেছিলেন নিঃসন্দেহে। কারণ এটা না হলে লেসলির দাবি প্রতিষ্ঠা করতে

দিত না লোকটা কিছুতেই। যার অর্থ দাঁড়ায়, নিজের রিক্রুট করে যাওয়া প্রেমাকভ শেষ হয়ে যাক, তাই চাইছিলেন ড্যানিয়েলস। কেন? এর জবাব হয়তো কোনদিন পাওয়া যাবে না।

হুইল হাউস থেকে একটা স্পটলাইট নিয়ে বেরিয়ে এল রানা। ওরা এসেছে ইয়েভগেনি প্রেমাকভকে নিয়ে যেতে, ভাবছে ও, আর রানা চেয়েছে আর্থার স্যাণ্ডলার যাতে পালাতে না পারে। উভয়ের উদ্দেশ্যই সফল। শোধবোধ। সামনের খোলা ডেকে এসে দাঁড়াল মাসুদ রানা। কয়েকবার অন-অফ করে দেখল লাইটটা ঠিকমত কাজ করছে কি না, তারপর মোর্স সিগন্যাল পাঠাতে শুরু করল সাবমেরিনের উদ্দেশে, আন্তর্জাতিক সীজ ফায়ার সিগন্যাল। পরপর কয়েকবার একই সঙ্কেত পাঠাল ও।

কোন জবাব এল না ও তরফ থেকে। দু'মিনিট স্থির দাঁড়িয়ে থাকল ডুবোজাহাজটা, তারপর খুব ধীর ভঙ্গিতে নড়ে উঠল। বন্ধ হয়ে গেল হ্যাচকভার। ভয় হলো রানার ওটা কিছু একটা অঘটন না ঘটিয়ে বসে। গোলাগুলি না ছুঁড়লেও ধাক্কা মেরে ডুবিয়ে না দেয় ওদের খুদে ক্রিস ক্র্যাফট। অসম্ভব নয়। কিন্তু তেমন কিছু করল না ওটা। যেন সীজ ফায়ার সিগন্যালের প্রতি সম্মান দেখানোর জন্যেই আস্তে আস্তে ঘুরে গেল পুব দিকে। চলতে শুরু করল। সেই সঙ্গে তলিয়ে যাচ্ছে একটু একটু করে।

একদৃষ্টে ওটার দিকে চেয়ে থাকল রানা-লেসলি। বেশ দূরে চলে গেছে জাহাজটা দেখতে দেখতে, পুরো দেহ পানির নিচে তার, শুধু পেরিস্কোপের দণ্ডটা জেগে আছে। এক সময় ওটাও আর দেখা গেল না। দিগন্তে মিশে গেছে। বোট দুটো ছাড়া চোখের সামনে দিগন্ত বিস্তৃত শূন্য আটলান্টিক নাচছে কেবল। এইমাত্র এখানেই ছিল দানবাকৃতির এক নিউক্লিয়ার সাবমেরিন, ভাবতেও যেন কেমন লাগে। চুপ মেরে আছে খুদে দুই বিলাসতরী, একটার জ্বালানি আছে নিয়ন্ত্রক নেই, অন্যটির নিয়ন্ত্রক আছে জ্বালানি নেই।

হুইল হাউসে এসে বসল রানা ও লেসলি। দু'জনেই প্রচণ্ড ক্লান্ত, পরিশ্রান্ত। ঘুমের অভাবে টকটকে লাল রং পেয়েছে ওদের চোখ। বৃষ্টিতে ভেজা চুল লেপটে আছে খুলির সাথে, গালে-কপালে। কথা নেই কারও মুখে। কি ভাবে নানটুকেট ফিরবে সেই ভাবনায় ডুবে আছে ওরা। ডেকে বৃষ্টির ফোঁটা আছড়ে পড়ার, আর বাতাসের উন্মত্ত ছোটাছুটির আওয়াজ শুনছে। সেই সাথে দোল খাচ্ছে নাগরদোলায়।

লেসলির মুখে স্বস্তির আভাস দেখতে পেল মাসুদ রানা। ভাল লাগল ওর। নয় বছর বয়স থেকে যে বিভীষিকাময় অধ্যায়ের সূত্রপাত হয়েছিল মেয়েটির জীবনে, আজ তার অবসান ঘটেছে। মৃত্যুভীতি এখন আর তাড়া করে ফিরবে না ওকে, পিয়ানোর তারের ফাঁস দুঃস্বপ্ন হয়ে আর কখনও হানা দেবে না ওর নিবিড় ঘুমের রাজ্যে। মাসুদ রানা ওকেই দেখছে টের পেয়ে মুখ তুলল মেয়েটি। লজ্জিত হাসি ফুটল তার লোভনীয় অধরে। রানার কাঁধে মাথা রাখল সে। 'ধন্যবাদ, রানা। নাইস শূটিং। আমি কল্পনাই করিনি কাজ হবে। জানো, খুব কাঁদতে ইচ্ছে করছে আমার, আনন্দে। এ যে কী অনাবিল আনন্দ, হাজার চেষ্টা করলেও তোমাকে

বোঝাতে পারব না আমি। তুমি বুঝবেও না।'

'ঠিক বলেছ,' হাসল ও। 'যার আনন্দ সে ছাড়া আর কেউ বোঝে না। তবে তোমার মনোভাব কিছুটা হলেও অনুভব করতে পারছি আমি।'

হাসি মিইয়ে এল লেসলির। চাউনি বিষণ্ণ হয়ে উঠল। 'বেচারা হ্যামন্ড! বেঁচে থাকলে কী খুশিই না হত এখন। ল্যাসিটারের নির্দেশে বহু বছর ধরে আমার সাথে ছায়ার মত লেগে থেকেছে মানুষটা, বিপদে-আপদে বুক দিয়ে আগলেছে আমাকে।'

মাথা দোলাল মাসুদ রানা। আলোচনার মোড় ঘোরাবার চেষ্টা করল। 'এবার? সমস্যা তো মিটল তোমার, এখন কি করবে?'

মুখ নামিয়ে হাতের তালু পরখ করল মেয়েটি। 'সে তো পরের কথা, আগে আমাদের তীরে পৌঁছার কি ব্যবস্থা করা যায়, ভেবেছ কিছু?'

'দেখি।' কপাল কুঁচকে বাইরে তাকাল ও। আধমাইল দূরে নাচছে প্রেমাকভের বোটটা, একই গতিতে স্রোতের টানে ভেসে চলেছে ওদের সাথে তাল মিলিয়ে। ওটাকে ধরার একটা সুযোগ পেলে··· কিন্তু তা কোনমতেই সম্ভব নয়। 'কোন জাহাজ যদি এদিকে আসে দিন থাকতে, তাহলে তো কথাই নেই। না হলে রাতে সার্চলাইট দিয়ে মোর্স সিগন্যাল পাঠাতে থাকব। একটা না একটা ব্যবস্থা আশা করি হবেই।'

নীরবে বসে আছে লেসলি। ভাবছে। 'আপাতত মনট্রিয়ল ফিরে যাওয়া ছাড়া উপায় নেই আমার। থিসিসটা শেষ করতে হবে আগে। ইচ্ছে আছে ডক্টরেট নিয়ে ওখানেই সেটল্ করব। একটা চাকরি জুটিয়ে নেব কোথাও।'

'চাকরি কেন?' বিস্মিত হলো মাসুদ রানা। 'এত বিশাল স্যান্ডলার এস্টেট···'

বাধা দিল লেসলি। 'না, রানা। ওই এস্টেটের স্বীকৃতি চাইতে গিয়ে নৃশংসভাবে খুন হয়েছে আমার নিরপরাধ মা। তাছাড়া ওর প্রতি পরতে পরতে জড়িয়ে আছে অসৎ পথে উপার্জিত টাকার দুর্গন্ধ। ওসব সহ্য হবে না আমার। আমি কষ্টার্জিত টাকায় জীবন ধারণ করতে চাই।'

'অর্থাৎ তুমি স্যান্ডলার উপাধি ধারণ করতে চাও না?'

'না, চাই না। ম্যাকঅ্যাডাম আছি, ম্যাকঅ্যাডামই থাকতে চাই।'

একটু ভাবল মাসুদ রানা। 'তোমার প্রতি আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা রইল, লেসলি। আশা করছি জীবন যুদ্ধে তুমি জয়ী হবে।'

'অসংখ্য ধন্যবাদ তোমাকে, রানা।'

আরও কি যেন বলতে যাচ্ছিল ও, থেমে গেল লেসলির বিস্ফারিত, আতঙ্কিত চোখের দিকে তাকিয়ে। ওর কাঁধের ওপর দিয়ে পিছনে তাকিয়ে আছে মেয়েটা। 'জেসাস!' রুদ্ধ শ্বাসে বলল সে। 'রানা! দেখো!!' বলেই তড়াক করে উঠে দাঁড়াল। আতঙ্কে দু'চোখ ঠিকরে পড়ার জোগাড় লেসলির। 'ওহ গড! ওহ গড!'

আরও আগেই সবেগে সীটের ওপর ঘুরে বসেছে মাসুদ রানা। জিনিসটা দেখামাত্র ভয়ের হিমশীতল একটা ধারা মেরুদণ্ড বেয়ে শিরশির করে নেমে গেল নিচের দিকে। ঘাড়ের খাটো চুলগুলো দাঁড়িয়ে গেল পলকে।

সেই সাবমেরিন!

ফিরে এসেছে আবার। মাত্র একশো গজ দূরে মাথা তুলেছে ওটা, সরাসরি এগিয়ে আসছে ওদের বোট লক্ষ্য করে, নাকটা তাক করা আছে বোটের পেট সোজা। ওদের ডুবিয়ে মারার জন্যে ফিরে এসেছে ডুবোজাহাজটা, তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। চরম সত্যটা উপলব্ধি করে চোয়াল ঝুলে পড়ল রানার, মুখটা আপনাআপনি হাঁ হয়ে গেল। জমে গেছে জায়গায়, নড়াচড়ার ক্ষমতা নেই।

পানি কেটে খুব দ্রুত ছুটে আসছে সাবমেরিন। আর কয়েক মুহূর্ত মাত্র, তারপরই শেষ হয়ে যাবে সব। অথচ কিছু করার নেই। ওর দানবীয় শক্তির বিরুদ্ধে করার আছেই বা কি? হৃৎস্পন্দন প্রায় থেমে এল মাসুদ রানার। বাঁচার কোন উপায় দেখছে না ও। এক পারে সাগরে লাফিয়ে পড়তে, কিন্তু সে হবে আত্মহত্যারই নামান্তর।

সাগরের পানি বরফের মত ঠাণ্ডা, ঢেউ আর স্রোতের ব্যাপারটা না হয় বাদ দেয়া গেল। ওর মধ্যে বড়জোর এক ঘণ্টা টেকা যাবে। তারপর? ঠাণ্ডায় জমে মরা ছাড়া আর কোন পথ থাকবে না। পাশ থেকে ওকে জড়িয়ে ধরল লেসলি। কাঁপছে থরথর করে। 'এখন কি হবে?' বলতে গিয়ে গলা ভেঙে গেল তার। 'ওটা মনে হয়, ওটা···!'

'হ্যাঁ। আমাদের ডুবিয়ে দিতে এসেছে।' মন্ত্রমুগ্ধের মত ডুবো-জাহাজটার দিকে চেয়ে আছে মাসুদ রানা।

এগিয়ে আসছে ওটা অমোঘ নিয়তির মত। পঞ্চাশ গজ! ত্রিশ গজ!

হঠাৎ করে বাঁ দিকে ঘুরে গেল সাবমেরিনের নাক, তার বিশাল হালের আঘাতে পাহাড় সমান ঢেউ উঠল সাগরে, অস্বাভাবিক উঁচু একেকটা ঢেউ। কম করেও ত্রিশ ফুট উঁচু, অনুমান করল রানা—অবিশ্বাস্য!

ওদের পাশ কাটিয়ে চলে যাচ্ছে ডুবোজাহাজ, তার সৃষ্ট আকাশছোঁয়া অসংখ্য ঢেউ বোটের দিকে ছুটে আসছে উদ্বাহু নৃত্য করতে করতে। বুঝে ফেলল রানা ওদের পরিকল্পনা। সরাসরি কোন মার্কিন বোটকে আঘাত করার ইচ্ছে নেই ওটার। চায় বোটটা ঢেউয়ের আঘাতে ডুবিয়ে দিতে। পরিকল্পনা মোটামুটি একই, কেবল পদ্ধতিটা ভিন্ন, এই যা। ওদেরকে নিজের বিশ গজ বাঁয়ে রেখে দশ গজমত এগিয়ে গেল সাবমেরিন, তারপর তলিয়ে যেতে শুরু করল। দ্রুত বেগে।

বিস্ফারিত চোখে ধেয়ে আসা ঢেউগুলোর দিকে তাকিয়ে আছে মাসুদ রানা। দলবদ্ধভাবে ছুটে আসছে ওদের মৃত্যুদূত। শত্রুপক্ষের বোট ডুবিয়ে দেয়ার কী নিষ্ঠুর আয়োজন করেছে ডুবোজাহাজটা। এর মধ্যেও ভাবল রানা, ওর ধারণাই ঠিক, কাউকে সরাসরি আঘাত করার অনুমতি দেয়নি ওদের মস্কো। তাই এই অভিনব ব্যবস্থা।

প্রথম পাহাড়টা কয়েক লক্ষ টন পানি নিয়ে বোটের স্টার সাইডে আঘাত করল, মুহূর্তে বেসামাল হয়ে পড়ল ওটা। কয়েক মুহূর্ত বিরতি দিয়ে আছড়ে পড়ল দ্বিতীয় পাহাড়, সঙ্গে সঙ্গে কাত হয়ে গেল বোট। ঢেউটা তলা দিয়ে বেরিয়ে যাওয়ার সময় নিজেই খানিকটা ধাক্কা দিল ওটাকে উল্টোদিকে। সামলে উঠতে যাচ্ছিল প্রায় বোটটা, এই সময় সবেগে ঝাঁপিয়ে পড়ল পরবর্তী ঢেউ, প্রচণ্ড এক ঝাঁকি খেলো বিলাসতরী, কড়কড় মড়মড় আওয়াজ উঠল তার সর্বাঙ্গ থেকে

দেখতে দেখতে কাত হয়ে শুয়ে পড়ল ওটা।

উল্টোদিকের রেলিং ধরে অসহায়ভাবে ঝুলে আছে, রানা ও লেসলি। ডুবে যাচ্ছে ক্রিস ক্র্যাফট, আর মাত্র কয়েক মুহূর্তের ব্যাপার, তলিয়ে যাবে তারপর সাবমেরিনটার ওপর চোখ পড়ল রানার। মুহূর্তের দশ ভাগের এক ভাগ সময়ের জন্যে তার টকটকে লাল কাস্তে ও হাতুড়ির প্রতীকটা দেখতে পেল সে, পরক্ষণে ডুব দিল ওটা। শুধু পেরিস্কোপের দণ্ডটা দেখা যাচ্ছে এখন। একটু একটু করে দৈর্ঘ্য কমছে ওটারও।

আরেকটা ঢেউ ভেঙে পড়ল বোটের ওপর, আর্তনাদ করে উঠল বোটটা।

'ধরে থাকো!' লেসলির উদ্দেশে চেঁচিয়ে বলল মাসুদ রানাও। 'শক্ত করে ধরে থাকো।'

শেষবারের মত ককিয়ে উঠল বোট। তলিয়ে যেতে শুরু করল। চারদিক থেকে হড়হড় করে পানি ঢুকতে আরম্ভ করেছে খোলের মধ্যে, দ্রুততর করছে ওটার অতলযাত্রার পথ। পানির বিস্তার দেখে ভীত কণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠল লেসলি ম্যাকঅ্যাডাম। কি যেন বলল রানাকে। কিন্তু কানে গেল না ওর।

শোনার মত অবস্থা নেই তখন মাসুদ রানার।

'ধুশ শা-লা!' ঢেউয়ের ধাক্কায় জাহাজ আচমকা ঘোড়ার মত লাফিয়ে উঠতেই হাতে ধরা মগ থেকে ছলকে গায়ে পড়ল বেশ খানিকটা গরম কফি, মেজাজ বিগড়ে গেল ইউ. এস. কোস্ট গার্ড কাটার লা গুয়ারডিয়ার রাডার অফিসার জেফ প্যাটারসনের মেজাজ। তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়িয়ে কাপড় ঝাড়তে শুরু করল সে।

তার যে কাজ তাতে লাফালাফিতেই অভ্যস্ত জেফ, এরকম দু'চারটে আচমকা লাফে হাত থেকে কফি ফেলে দেয়ার বান্দা সে নয়। এসবে ভালই অভ্যস্ত জেফ প্যাটারসন। কিন্তু আজ পড়ে গেল, কারণ সে অন্যমনস্ক ছিল, অপ্রস্তুত ছিল। বসে বসে সদ্য বিয়ে করা বউ ডোরার কথা ভাবছিল। প্রেমিকাকে বিয়ে করার জন্যে গত প্রায় এক বছর ধরে প্রস্তুতি নিচ্ছিল জেফ, ছুটি এবং টাকা, দুটোই জমা করছিল হাড় কিপটের মত। ঠিক করে রেখেছিল বছর শেষে একবারে এক মাসের ছুটি নেবে, তারপর বিয়ে সেরেই বউকে বগলদাবা করে নিউ ইর্য়কে যাবে হানিমুন উদযাপন করতে।

কিন্তু কর্তৃপক্ষের এক অর্ডারে গুবলেট হয়ে গেল সব পরিকল্পনা। না, সব না, অর্ধেকটা। ছুটি জেফ পেয়েছে ঠিকই, নির্ধারিত দিনে সুন্দরী ডোরাকে বিয়েও করেছে, কিন্তু তার পরেরটুকু হয়নি। হানিমুনে যেতে পারেনি ওরা। সবকিছু রেডি, কেবল সকালে নানটুকেট এয়ারপোর্ট থেকে প্লেনে উঠবে স্বামী-স্ত্রী, হলো না। ভোররাতে টেলিফোনের আওয়াজ ঘুম ভাঙাল জেফ প্যাটারসনের, চীফের নির্দেশ জানিয়ে দেয়া হলো ডিপার্টমেন্ট থেকে, এই মুহূর্তে বেরিয়ে পড়তে হবে তাকে, সোজা অফিসে গিয়ে রিপোর্ট করতে হবে। ছুটি বাতিল।

একেবারে আকাশের ওপর থেকে আছড়ে পড়ল জেফ। কেন? জরুরী অবস্থা ঘোষণা করা হয়েছে সমগ্র ম্যাসাচুসেটস উপকূলে। সোভিয়েত ও পোলিশ ফিশিং ট্রলার ঝাঁক বেঁধে এসে উপস্থিত হয়েছে মার্কিন উপকূলীয় সীমানার কাছে,

তাৎক্ষণিক সুবিধের নয়, ওদের ওয়াচ করা জরুরী হয়ে দেখা দিয়েছে। অতএব উপকূল রক্ষী বাহিনীর প্রত্যেককে এই মুহূর্তে ডিপার্টমেন্টের প্রয়োজন। সব ধরনের ছুটি বাতিল করে দেয়া হয়েছে। পরে সবাইকে পুষিয়ে দেয়া হবে ইত্যাদি ইত্যাদি।

ডোরাকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে বেরুতে আট ঘণ্টা লেগেছিল জেফের সে রাতে। সে পাঁচদিন আগের কথা। সেই যে বেরিয়েছে জেফ প্যাটারসন, আর ঘরমুখো হওয়ার সুযোগ পায়নি। অফিসে পৌছার আধঘণ্টা পর নানটুকেট বন্দর ত্যাগ করে লা গুয়ারডিয়া। সাগরেই কেটেছে তার পাঁচদিন চার রাত। জরুরী অবস্থার সাথে মোটামুটি পরিচিত সে, কিন্তু এ বারের ব্যাপারটা একেবারেই অন্যরকম। ঐতিহাসিক এক ঘটনা। ওই বহরে দু'শোরও বেশি মাছ ধরার ট্রলার আছে। তার মধ্যে গোটা ত্রিশেক পোলিশ, বাকি সব সোভিয়েত। অবিশ্বাস্য কাণ্ড!

আন্তর্জাতিক জলসীমাতেই রয়েছে ওরা যদিও, কিন্তু মার্কিন উপকূলের একেবারে কিনারা ঘেঁষে। যতটা না মাছ ধরছে, তার চেয়ে ঢের বেশি ঘুরঘুর করছে। চাট্টিখানি কথা নাকি? দুইশো ট্রলার! ম্যাসাচুসেটসের বাইরের দু'তিন স্টেট থেকেও কোস্ট গার্ড বাহিনীর প্রচুর জাহাজ এসে যোগ দিয়েছে জেফদের সাথে। চব্বিশ ঘণ্টা সদা সতর্ক তারা। ওরা যে কোন বদ মতলব নিয়ে এসেছে তাতে কোন সন্দেহই নেই, কিন্তু সেটা যে কি অনুমান করতে পারছে না কর্তৃপক্ষ। অতএব চেয়ে থাকো, দেখো, কখন কি করে ওরা। তাই করে এসেছে এতদিন মার্কিন বাহিনী। সীমানার ওধারে ওরা ঘুরঘুর করছে, এধারে এরা। স্রেফ পায়চারি, আর কিছু না।

কোন রকম উস্কানী আসছে না ওদের তরফ থেকে যে ধাওয়া করবে যুদ্ধ জাহাজ নিয়ে। সুযোগ দিচ্ছে না লালমুখো বাঁদরের দল। এদিকে বাড়ি ফেরার জন্যে ভেতরে ভেতরে অস্থির হয়ে পড়েছে জেফ, কিছুই ভাল লাগছে না তার। রাডার স্ক্যানারের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে একঘেঁয়েমীতে পেয়ে বসে প্রায়ই। অন্যমনস্ক হয়ে পড়ে সে। তার মনের অবস্থা বুঝতে পেরেই বোধহয় জেফকে বাড়ি ফিরে যাওয়ার একটা সুযোগ জুটিয়ে দিয়েছেন আজ ঈশ্বর। সকালের দিকে লা গুয়ারডিয়ার এঞ্জিনে একটা সমস্যা দেখা দিয়েছে, সমস্যাটা সমাধানের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে জাহাজের এঞ্জিনিয়ারের। যেমন-তেমন ঝাড়ফুঁকে কাজ হবে না, মেজর অপারেশন প্রয়োজন।

সেজন্যে যা যা দরকার জাহাজে নেই তা। অতএব বন্দরে ফিরে যাওয়া ছাড়া কোন উপায় থাকল না লা গুয়ারডিয়ার। তাই করছে সে এ মুহূর্তে, ঘরমুখো চলেছে। এবং সুযোগটা যখন এসেই গেল, জেগে জেগে ডোরার স্বপ্নে মশগুল হয়ে পড়ল প্যাটারসন। আর তাই করতে গিয়েই বেখেয়ালে গরম কফি গায়ে ঢেলে দিয়েছে বান্দা। কাপড় ঝেড়ে-ঝুড়ে আসনে বসল সে, দুই দীর্ঘ চুমুকে পেটে চালান করে দিল বাকি কফি।

মগটা ঠক করে টেবিলে রাখল জেফ প্যাটারসন, তারপর স্ক্যানারের দিকে তাকাল। সঙ্গে সঙ্গে হাজার ভোল্টের বৈদ্যুতিক শক খেলো যেন, একটু একটু করে চোয়াল ঝুলে পড়তে লাগল তার। হাঁ হয়ে গেল যুবক। বিশালাকৃতির অজ্ঞাত

এক নৌযানের উপস্থিতির কথা জানান দিচ্ছে তার স্ক্যানার। পর্দায় প্রায় মাঝখানে ভাসছে বড়সড় একটা ফোঁটা। এমন বেকুব জীবনে কখনও হয়নি প্যাটারসন। মুখ বন্ধ করার কথা ভুলে বিস্ফারিত চোখে ওটার দিকে চেয়েই থাকল।

তার মানে? কি ওটা, কোত্থেকে এল? যা-ই হোক জিনিসটা, ওদের পনেরো বিশ মাইল সামনেই রয়েছে, পিছনে নয়। সিদ্ধান্তে পৌঁছল প্যাটারসন, নানটুকেট উপকূলে রয়েছে। এবং অবশ্যই মার্কিন পানিসীমার মধ্যে। কিন্তু…ওখানে তো কোন মার্কিন নৌযান নেই! থাকার কথাও নয়। তাহলে? ওটা কি…!' প্রচণ্ড এক ঝাঁকি খেয়ে সোজা হলো জেফ প্যাটারসন।

দুই মিনিটের মধ্যেই হুলস্থূল পড়ে গেল লা গুয়ারডিয়ায়। ঝুঁকি আছে জেনেও সর্বোচ্চ গতিতে জাহাজ ছোটানোর নির্দেশ দিল ক্যাপ্টেন। বিষয়টা পিছনে রেখে আসা কোস্ট গার্ড বাহিনীর ডিউটি-ইন-চার্জকে রিপোর্ট করতে ভুল হলো না তার।

ডুবে যাচ্ছে ক্রিস ক্র্যাফট। এরই মধ্যে প্রায় নব্বই ভাগ তলিয়ে গেছে পানির নিচে। হালের সামান্য অংশ এখনও ভেসে আছে পানির ওপর, খোলে বাতাস আটকে যাওয়ায় ঠেকে আছে তার অতল অভিযান। মাসুদ রানা জানে, যে কোন মুহূর্তে ডুবে যাবে এটা। বড়জোর আর কয়েক মিনিট।

'লেসলি!' ব্যস্ত গলায় বলল মাসুদ রানা। 'বাঁচার জন্যে শেষ একটা চেষ্টা করতে হবে আমাদের।'

পানি ভরা চোখে ওর দিকে তাকাল মেয়েটি। 'কি করব? কি করার আছে?'

'ওই বোটটা ধরতে হবে আমাদের যে করে হোক!'

ঘুরে তাকাল ও সেদিকে। আবেগে ঠোঁট কাঁপছে। টপ টপ করে দু'ফোঁটা পানি গড়িয়ে পড়ল গাল বেয়ে। 'আমি পারব না, রানা। তুমি চলে যাও। নিজেকে বাঁচাও।'

'বাজে বোকো না!' ধমকে উঠল মাসুদ রানা। 'বাঁচলে দু'জন একসাথে বাঁচব।'

'আমি পারব না, রানা,' মাথা দোলাল লেসলি। 'হাত-পায়ে তেমন সাড়া পাচ্ছি না। আমার পক্ষে সাঁতরানো অসম্ভব।'

একটু ভাবল মাসুদ রানা, একরাশ বুদ্বুদ ছেড়ে আরও খানিকটা দেবে গেল বোট। অস্ফুট আর্তনাদ করে উঠল মেয়েটি। মৃদু কণ্ঠে বোঝাতে শুরু করল ও, 'লেসলি, হাত-পা গুটিয়ে বসে থেকে মৃত্যুকে বরণ করে নেয়া কোন কাজের কথা নয়। জীবনে কম করেও দু'বার নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে নিজেই বাঁচিয়েছ তুমি নিজেকে। তোমাকে এই হাল ছেড়ে দেয়া একেবারেই মানায় না। একবার চেষ্টা করে দেখতে দোষ কি? এখানে বসে বসে না মরে নড়েচড়ে মরি। আর যদি কোনমতে একবার ওটায়…'

'অনেক দূরে রয়েছে বোটটা, রানা।'

'ভয়-পাওয়া চোখে অনেক দূর মনে হচ্ছে, লেসলি। আসলে তা নয়। সাত-আটশো গজ কোন ব্যাপার হলো?' মেয়েটিকে নয়, আসলে নিজেকে সাহস জোগানোর চেষ্টা করছে মাসুদ রানা। ও ভালই জানে, এই বরফ পানিতে দু'শো

গজ পাড়ি দেয়াও প্রায় অসম্ভব। 'মনে জোর রাখো। কষ্ট হবে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত আমরা জয়ী হবই। চলো, নেমে পড়ি।

চুপ করে থাকল লেসলি, দোটানায় পড়েছে। এক হাত পানিতে চোবাল সে, সঙ্গে সঙ্গে শিউরে উঠল। 'উহ্! মাগো!'

ওকে সময় নষ্ট করতে দেয়া যাবে না, ভাবল রানা। সময় যত যাবে, ততই মনোবল হারাবে লেসলি। হারাবে রানা নিজেও। 'চলো, নামা যাক।'

করুণ চোখে তাকাল লেসলি। 'কিন্তু...!' থেমে গেল, কপালে উঠেছে আতঙ্কিত চোখ, জোর ঝাঁকি খেয়ে আরও খানিকটা তালিয়ে গেছে বোট। '...ওহ্, গড!' ককিয়ে উঠল সে।

ঘুরে আরেকবার প্রেমাকভের বোটটা দেখল মাসুদ রানা। তারপর খপ করে লেসলির কবজি ধরল মুঠো করে। 'ওঠো!' নির্দয়, খ্যাপাটে কণ্ঠে বলল ও। 'এটা তোমাকে বসে মরারও সুযোগ দেবে না। বড়জোর দু'মিনিট টিকবে, এই সময়ে কিছুটা হলেও ওটার দিকে এগিয়ে যাব আমরা। চলো!'

ওকে আর এক মুহূর্তও নষ্ট করার সুযোগ দিল না মাসুদ রানা, হ্যাঁচকা এক টানে তুলে ফেলল। তারপর একযোগে ঝাঁপ দিল সাগরে। পানিতে পড়েই টের পেল রানা কত বড় ভুল করে বসেছে ও। পানি নয়, যেন তরল বরফ। পড়ামাত্র দাঁত-কপাটি লেগে যাওয়ার জোগাড় হলো। ঠাণ্ডার কামড়ে জমে যাওয়ার প্রক্রিয়া শুরু হয়ে গেছে ভেতরে, ইচ্ছেমত নড়ানো যাচ্ছে না হাত-পা। ব্যাপারটা ভুলে থাকার চেষ্টা করল ও।

লেসলির চোখে পরিষ্কার মৃত্যুভয় দেখল মাসুদ রানা। ওর চোখে কি দেখল মেয়েটি, জানে না। জানতে চায়ও না। মাথা ঝাঁকিয়ে এগোতে বলল রানা লেসলিকে। শুরু হলো ওদের বেঁচে থাকার মরণপণ সংগ্রাম।

পাথরের মত ভারি হাত-পায়ের সাহায্যে ইঞ্চি-ইঞ্চি করে এগোতে লাগল ওরা। কিছুদূর এগোবার পর পুরোপুরি মেশিন বনে গেল যেন দু'জনেই। এক হাত যন্ত্রচালিতের মত উঠছে, সেই সাথে এক পা ঠেলা দিয়ে কয়েক ইঞ্চি এগিয়ে দিচ্ছে দেহটাকে, তারপর ঝপ্ করে পড়ছে হাত, অন্যটা উঠে যাচ্ছে শূন্যে। ফের অন্য পা পানির বুকে ধাক্কা মেরে ঠেলে দিচ্ছে সামনে। একেক সময় হতাশ হয়ে থেমে পড়তে ইচ্ছে হচ্ছে খুব। অনেক তো হলো, আর কত! যাক না চুকেবুকে জীবনের সমস্ত হিসেব, কি আসবে-যাবে?

পরক্ষণেই কোন এক অদৃশ্য শক্তির ইন্ধন পেয়ে সচকিত হচ্ছে মাসুদ রানা, পিছন ফিরে কর্কশ গলায় ধমক-ধামক মারছে লেসলিকে। কখনও নিষ্ঠুরের মত হাত ধরে হ্যাঁচকা টানে সামনে ঠেলে দিচ্ছে ওকে, নয়তো পিছন থেকে ধাক্কা দিচ্ছে। চিৎকার করে কেঁদে উঠছে লেসলি কখনও কখনও, লোনা পানি খেয়ে কাশতে কাশতে অকথ্য ভাষায় গাল দিয়ে গুষ্ঠি উদ্ধার করছে রানার। কিন্তু রেহাই দিচ্ছে না ওকে জঘন্য একরোখা মানুষটা।

কতক্ষণ বা কত যুগ পর মনে নেই, হাতে যখন প্রেমাকভের বোটটার স্পর্শ পেল মাসুদ রানা তখন পুরো শরীর ওর অসাড়। হুঁশ প্রায় নেই। তবু শেষ পর্যন্ত বোটে উঠতে সক্ষম হলো ও। লেসলিও পৌঁছল রানার পিছন পিছন।

বোটে উঠে পরস্পরকে সবলে আঁকড়ে ধরে মেঝেতে শুয়ে পড়ল রানা-লেসলি। একটা আঙুল নাড়ারও শক্তি নেই কারও। বলির পাঁঠার মত ঠক ঠক করে কাঁপছে দু'জনে। দাঁতে দাঁত বাড়ি খাচ্ছে প্রবল বেগে। দু'জনেই প্রায় ফ্যাটাল নিউমোনিয়ার পর্যায়ে পৌঁছে গেছে তখন। এর আধ ঘণ্টা পর ঘটনাস্থলে পৌঁছল লা গুয়ারডিয়া। ওদের যখন ধরাধরি করে তোলা হলো কোস্ট গার্ড কাটারে, দু'জনেই প্রায় অজ্ঞান।

প্রচণ্ড শীতে জমে গেছে, কথা বলার ক্ষমতা পর্যন্ত নেই। অবস্থা বেগতিক দেখে ক্যাপ্টেনের কেবিনে এনে ঢোকানো হলো দু'জনকে। সম্পূর্ণ উলঙ্গ করে একেকজনকে চারটে করে কম্বল দিয়ে মুড়ে ফেলা হলো, সেই সঙ্গে ঘর গরম রাখার হিটারের উত্তাপ যোগ হলো। ক্রিস ক্র্যাফট পিছনে বেঁধে নানটুকেট ফিরে চলল কোস্ট গার্ড কাটার।

রাডারে দেখা প্রকাণ্ড অজ্ঞাত নৌ-যানটির হদিস অজ্ঞাতই রয়ে গেল। লা গুয়ারডিয়া জায়গামত পৌঁছার অনেক আগেই পগার পার হয়ে গেছে রুশ সাবমেরিন।

দশ

শেষ পর্যায়ে এসে কেমন যেন ইয়ে হয়ে গেল কেসটা। ব্যাপারটা পছন্দ হয়নি অ্যারাম সাশাদের। এ যেন 'শেষ হইয়াও হইল না শেষ'। সৌভাগ্যবশত হোক অথবা দুর্ভাগ্যবশত, যে বশতই হোক, বিষয়টার সঙ্গে একেবারে প্রথম থেকেই জড়িয়ে পড়েছিল সে। গিয়েছিল পুঁটি ধরতে, কিন্তু বড়শিতে যে বোয়াল ধরা পড়বে কে জানত?

তারপরও ভেতরের গভীর ষড়যন্ত্রের ব্যাপারটা আঁচ করতে পেরে মামলাটা সে নিজে থেকেই তুলে দিতে চেয়েছিল এফ.বি.আইয়ের হাতে। দিয়েওছিল। কিন্তু ওরা ভাল ব্যবহার করেনি সাশাদের সাথে। ভাল ব্যবহার করেনি মানে, মামলাটা কোন পর্যায়ে আছে জানতে চেয়েও জবাব পায়নি সাশাদ। জবাব ওরা দিয়েছে বটে, কিন্তু পছন্দ হয়নি তার। সে ঠিকই বুঝেছে যে সঠিক কথা বলছে না এফ.বি.আই। চেপে যাচ্ছে কিছু কিছু। ওদের কাছে এ ব্যবহার আশা করেনি সে।

মামলাটা কোন পর্যায়ে আছে জানার জন্যে অস্থির অ্যারাম সাশাদ, অথচ পারছে না। পরিচিত যাকেই জিজ্ঞেস করে, সে-ই যেন কেমন কেমন আচরণ করে। হাঁ করে তো করে না, মুখ খোলে তো খোলে না, আড়ে আড়ে তাকায় ইত্যাদি। সম্ভবত ওরা তাকে বিশ্বাস করতে পারছে না। হেসে বাঁচে না সাশাদ। দেখো কাণ্ড! কেসটা যে তুলে দিল ওদের হাতে, তাকেই ওরা অবিশ্বাস করছে! সাশাদের চাকরি জীবনের সবচেয়ে রহস্যময়, বিভ্রান্তিকর মামলা ছিল এটা। স্বাভাবিকভাবেই যে কারও আগ্রহ জন্মাবে ভেতরের সবকিছু জানার।

একটা দুটো নয়, প্রায় আধডজন খুন, জালিয়াতি, বিদেশী এক গোয়েন্দা চক্র, কত কিছুই জড়িত ছিল এ কেসে, শেষ পর্যন্ত তার কি সুরাহা হলো জানতে

চাওয়ায় দোষ কোথায়? অথচ এফ.বি.আই সাশাদকে তাইরে-নাইরে বুঝ দিয়ে বিদায় করে দিল। খুবই সংক্ষিপ্ত বক্তব্য ওদের, এত সংক্ষেপ আশা করেনি সাশাদ।

রোটা ফিলমস ছিল কম্যুনিস্টদের একটা ফ্রন্ট, ব্যাখ্যা করেছে ওরা, যেন জানত না সে। জাল টাকা চালাচালি করত ওরা, ফিলম ক্যানে জাল টাকা ভরে ইউরোপে পাঠাত নিয়মিত। এটাও মায়ের কাছে মামাবাড়ির গল্প। তবু মেনে নিয়েছে সাশাদ। ওরা এ-ও বলে দিয়েছে, মার্ক রাইডার, জ্যাকবাস, ম্যানহাটন ব্রিজের নিচে ভাসমান অবস্থায় উদ্ধার করা সেই মৃতদেহ, প্রতিটিই অত্যন্ত গোপনীয়, এসব নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করা ঠিক হবে না। আর ওসব হত্যাকাণ্ডে জড়িতদের পিছনে ছোটারও প্রয়োজন নেই। বিশেষ করে সেই মেয়েটি, যাকে জ্যাকবাসের ফ্ল্যাটের পিছন দরজা দিয়ে বের হতে দেখা গিয়েছিল যেদিন সে নিহত হয়, তাকে নিয়ে বিন্দুমাত্র মাথা ঘামাতে হবে না সাশাদকে।

'আর ওই লোক? মাসুদ রানা?' প্রশ্ন করেছিল সে। 'ওর ব্যাপারে কি? ও ব্যাটা যে সেদিন ফাঁকি দিয়ে…'

'ভুলে যান। লোকটার অবস্থা ভাল না।'

'ভাল না? কেন?'

'মরতে মরতে বেঁচে গেছে অল্পের জন্যে।'

এরপর প্রায় তিন মাস কেটে গেছে, নিত্য নতুন ঝামেলায় ওসব প্রায় ভুলেই গেছে অ্যারাম সাশাদ। সেদিন ছিল তার সাপ্তাহিক ছুটি, সোমবার। সকালেই বাসা ছেড়ে বেরিয়ে পড়েছে সাশাদ। এক বন্ধুর ওখানে যাবে, তাস পেটাবে সারাদিন। কিন্তু এইটি নাইনথ স্ট্রীট ক্রসিং পেরিয়ে আসতেই বাধা পেল: স্যান্ডলার ম্যানসনের উল্টোদিকের ফুটপাথে দাঁড়ানো দু'টি চেনামুখের ওপর চোখ পড়ল তার। মাসুদ রানা ও সেই মেয়েটি! এক্সিলারেটরের ওপর পায়ের চাপ কমাল সাশাদ।

এখানে কি করছে ব্যাটা? ওদের নজর অনুসরণ করে ডানে তাকাল সে। আকাশছোঁয়া একটা ক্রেন দেখা গেল, ওটার দীর্ঘ বাহুর সাথে তারে বাঁধা একটা প্রকাণ্ড লোহার ক্রাশিং বল ঝুলছে। কয়েকশো মন ওজন হবে বলটার। কি হচ্ছে ওখানে? পেভমেন্ট ঘেঁষে গাড়ি দাঁড় করাল অ্যারাম সাশাদ। নেমে পড়ল ঝটপট।

'হ্যালো, মিস্টার রানা!' ওর কাছে গিয়ে দাঁড়াল ডিটেকটিভ। 'অনেকদিন পর দেখা। তারপর, কেমন আছেন?' ইচ্ছে না থাকলেও লেসলির উদ্দেশে মৃদু নড করল সে।

ঘুরে লোকটাকে দেখল মাসুদ রানা। নিরাসক্ত কণ্ঠে বলল, 'হ্যালো, অফিসার!' আবার স্যান্ডলার ম্যানসনের দিকে তাকাল। ক্রেনের বাহুটা বিকট ঘড়ঘড় শব্দে নড়তে আরম্ভ করেছে ওদিকে। বলটা অর্ধবৃত্তাকারে ঘুরে এসে প্রচণ্ড শক্তি নিয়ে আছড়ে পড়ল ম্যানসনের সামনের দিকের দেয়ালে। অনেকখানি দেয়াল চুরমার হয়ে সেঁধিয়ে গেল ভেতরে।

'হচ্ছে কি ওখানে?' প্রশ্ন করল বিস্মিত ডিটেকটিভ।

'ভেঙে ফেলা হচ্ছে স্যান্ডলার ম্যানসন।'

'এখানেই না থাকত এক বুড়ি, ভিক্টোরিয়া না কি নাম যেন?'
'হ্যা।'
'প্রচুর টাকার মালিক ছিল এই পরিবার,' আপনমনে বলল সে
'ছিল, কখনও।'
'এখন নেই?'
'না।'
কিছু সময় চুপ করে থাকল সাশাদ কথাটা কি ভাবে পাড়বে ভাবছে অবশেষে মুখ খুলল সে। 'এখন যদিও ব্যাপারটার কোন গুরুত্ব নেই। তবু, ... মানুষটা একটু ইয়ে···মানে, ঘটনাটা জানতে খুব আগ্রহী।'
'কোন ঘটনাটা বলুন তো?' চোখ কুঁচকে ঘুরে তাকাল মাসুদ রানা। লেসলিও দেখছে তাকে।
'কামন, মিস্টার। ইউ নো! ঘটনার অর্ধেক জানি আমি, বাকি অর্ধেক জানতে পেলে খুব খুশি হব।'
উত্তর দিল না মাসুদ রানা। ঘুরে তাকাল বাড়িটার দিকে, আবার ... শব্দে আছড়ে পড়েছে বলটা। এপাশের দেয়ালের ... ফেলল ওটা একের পর এক ভয়ঙ্কর আঘাতে। জং ধ... পানির পাইপ ... বেরিয়ে পড়ল কয়েক জায়গায়। আবার ফিরে এল বল ... রানার গায়ের সাথে ঘেঁষে দাঁড়াল লেসলি, এক হাতে মুঠো করে ধরেছে রানার হাত দৃষ্টি ধ্বংসযজ্ঞের ওপর স্থির
'ওয়েল?' ধৈর্যচ্যুতি ঘটল সাশাদের। 'কিছু একটা বলুন দয়া করে।'
আগের মতই নির্বিকার রানা। নিরুত্তর। আজ বেশ গরম পড়বে, ভাবছে ... সময়ের সাথে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে সূর্যের তেজ। দমকা বাতাস এসে পথে প... থাকা কিছু ঝরা পাতা উড়িয়ে নিয়ে গেল। অসময়ে ঝরে পড়েছে ওগুলো দিনটাও তেমনি, সময় হওয়ার আগেই উত্তাপ নিয়ে হাজির হয়েছে
'ঠিক আছে,' হতাশ হয়ে হাল ছেড়ে দিল ডিটেকটিভ। 'বলতে হবে না।'
ফিরে গিয়ে গাড়িতে উঠল অ্যারাম সাশাদ। গাড়ি ছেড়ে দিল। তবু ফিরে তাকাল না মাসুদ রানা। এক সময় বাঁক নিয়ে হারিয়ে গেল সাশাদের গাড়ি।
মাসুদ রানার ওপর রেগে কাঁই হয়ে আছে সে। বিড়বিড় করে ও... চটকাচ্ছে। তবু ভাল এফ. বি. আই দু'য়েকটা প্রশ্নের উত্তর দিয়েছিল তার, কিন্তু এ লোক দেখছি ওদের চাইতেও বড় হারামজাদা! উহ্, কী দেমাগ! কথাই বলতে চায় না, তাকালই না ওর দিকে। অথচ একে রক্ষার জন্যে কত কী-ই না করেছে অ্যারাম সাশাদ। বেঈমান, বেঈমান! সব শালা বেঈমান! রাগের চোটে অ্যাক্সিলারেটরটা ফ্লোর বোর্ডের সাথে চেপে ধরল ডিটেকটিভ।